বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত
ও
ভ্রমনিরাস

সম্পাদনা

ডঃ কুমুদকুমার ভট্টাচার্য

চিরায়ত প্রকাশন
প্রাইভেট লিমিটেড
১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট • কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম চিরায়ত সংস্করণ
বৈশাখ, ১৩৫৯

প্রকাশক

শিবব্রত গঙ্গোপাধ্যায়
চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড
১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

মুদ্রাকর

শুভঙ্কর বসু
জে. জি. প্রিণ্টার্স
১৮৯ অরবিন্দ সরণী, কলকাতা ৭০০ ০০৬

প্রচ্ছদ

সুবোধ দাশগুপ্ত

সূচীপত্র

বৃত্তি প্রাপ্তি, অলঙ্কার, স্মৃতি, ন্যায়, বেদান্ত-শ্রেণীতে অধ্যয়ন, ল-কমিটির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য কঠোর পরিশ্রম ও সারারাত অধ্যয়ন, ত্রিপুরায় জজ-পণ্ডিতের পদে নিযোগপত্র লাভ, কবি-গান শোনার আগ্রহ, পীড়িত ব্যক্তিদের সেবাশুশ্রূষা, ছাত্রদের প্রতি মমত্ববোধ, রোদনপ্রবণতা, কপাটি ও লাঠি খেলা, পরিধেয় বস্ত্র দান, স্বহস্তে ধান কাটা, বেদান্ত শ্রেণীতে অধ্যয়ন, শিক্ষালাভার্থে তৃতীয় সহোদর শম্ভুচন্দ্রের কলকাতায় আগমন, অস্বাস্থ্যকর-অন্ধকার রান্নাঘর, আরশুলা ভক্ষণ, শম্ভুচন্দ্রের উদরাময় রোগে সেবাশুশ্রূষা, বিপত্নীক শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতির বৃদ্ধবয়সে পুনর্বিবাহ এবং বালিকা গুরুপত্নী দর্শনে ক্রন্দন, বার্ষিক সংস্কৃত গদ্য ও পদ্য রচনার পরীক্ষায় সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ, মধ্যম সহোদর দীনবন্ধুর বিবাহ, পিতৃ-ঋণ পরিশোধের জন্য কলকাতায় কায়ক্লেশে দিনযাপন, ন্যায়শ্রেণীতে অধ্যয়ন, দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক নিমচাঁদ শিরোমণির প্রয়াণ ও অগ্রজের উদ্যোগে জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননের নিয়োগ, বীরসিংহে কৃষ্ণচন্দ্র বিশ্বাসের মাতৃশ্রাদ্ধোপলক্ষে সংস্কৃত কবিতা রচনা ও শাস্ত্রীয় বিতর্কে অগ্রজের কাছে রামমোহন তর্কসিদ্ধান্তের পরাজয়, অগ্রজের অর্থোপার্জন এবং পিতৃদেবকে তীর্থপর্যটনের জন্য উক্ত অর্থ প্রদান, মার্শেলের সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারির পদ-পরিত্যাগ এবং উক্ত পদে কলকাতার ছোট আদালতের জজ রসময় দত্তের নিয়োগ, সহকারি সম্পাদক-পদে মধুসূদন তর্কালঙ্কার, বিভিন্ন বিষয়ের পরীক্ষায় সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান লাভের জন্য সর্বমোট দুশ তেত্রিশ টাকা পারিতোষিক লাভ, জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের অনুরোধে গোপাল-বিষয়ক সংস্কৃত-শ্লোক রচনা, ষড়দর্শনে বিশেষ ব্যুৎপত্তিলাভ, বড়বাজারের সিংহ-পরিবারের আর্থিক দুর্দশা, সিংহ-বাড়ি পরিত্যাগ ও বউবাজারে বাড়িভাড়া, মধুসূদন তর্কালঙ্কার প্রয়াত হওয়ায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেরেস্তাদার পণ্ডিত অর্থাৎ প্রধান পণ্ডিতের পদ ও সংস্কৃত কলেজের সহকারি সম্পাদকের পদ শূন্য, এই পদে অগ্রজকে নিয়োগের প্রস্তাব।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান পণ্ডিতের পদে নিয়োগ, হিন্দি ও ইংরেজি ভাষা শিক্ষা, অগ্রজের অনুরোধে পিতৃদেবের কর্মত্যাগ, মার্শেলের অনুরোধে সংস্কৃত কলেজের জুনিয়ার ও সিনিয়ার ডিপার্টমেন্টের বৃত্তি-পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, অগ্রজের কাছে বিভিন্ন ব্যক্তির সংস্কৃত-শিক্ষাগ্রহণ, অক্ষয়কুমার দত্তের রচনা-সংশোধন, তত্ত্ববোধিনী সভার সঙ্গে সম্পর্ক, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সংস্কৃত-শিক্ষা দান, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের সঙ্গে সুসম্পর্ক, অগ্রজের অনুরোধে মার্শেল কর্তৃক মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতের পদে এবং মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশকে মাদ্রাসা কলেজের পণ্ডিতের পদে নিয়োগ, হার্ডিঞ্জের অনুরোধে একশত বঙ্গ-বিদ্যালয় স্থাপন, এই বিদ্যালয়গুলির পণ্ডিতের পদে অগ্রজের পরামর্শে

সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন ছাত্রদের নিয়োগ, কলেরা-রোগীদের চিকিৎসায় অগ্রজ, মধ্যম সহোদরের সহায়তা, হরনাথ তর্কভূষণ ও গঙ্গাধর তর্কবাগীশের মৃত্যু, তর্ক-ভূষণের পদে তারানাথ তর্কবাচস্পতিকে নিয়োগের জন্য অগ্রজের বিশেষ প্রয়াস ও তর্কবাচস্পতির নিয়োগ, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণকে পঞ্চাশ টাকা বেতনে ও গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নকে ত্রিশ টাকা বেতনে নিয়োগ, ববার্ট কস্টের অনুরোধে তাঁর সম্বন্ধে সংস্কৃত-কবিতা রচনা, দীনবন্ধু নির্ভুল ব্যাকরণ লেখা সত্ত্বেও সহোদর-হেতু পুরস্কার-লাভে বঞ্চিত, কস্টের অনুরোধে পুনরায় সংস্কৃত-শ্লোক রচনা, মেঘ-বিষয়ক সংস্কৃত-শ্লোক রচনা, বিভিন্ন বিষয়ে সংস্কৃত-শ্লোক রচনা, সীটনকার-কস্ট-চ্যাপম্যান-সিসিল বীডন-গ্রে-গ্রাণ্ড-হ্যালিডে-লর্ড ব্রাউন-ইডেন প্রমুখ সিভিলিয়ানদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা, পরীক্ষা সংক্রান্ত কাজে সততা ও ন্যায়বোধ, সিনিয়াব ডিপার্টমেণ্টের পরীক্ষায় মধ্যম সহোদবের সর্বপ্রধান স্থান লাভ, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেধা-শক্তির পরিচয়, সংস্কৃত কলেজে শিক্ষাগ্রহণের নিয়ম, ডাঃ দুর্গাচবণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা, সংস্কৃত কলেজে সহকারি সম্পাদকের পদে অগ্রজের নিয়োগ ও তাঁর পরামর্শে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে তাঁর শূন্য পদে মধ্যম সহোদব দীনবন্ধুকে নিয়োগ, দুগ্ধজাত খাদ্যদ্রব্য গ্রহণে অস্বীকার ও পরিত্যাগ, সংস্কৃত-কলেজের শিক্ষা-সংস্কারের প্রয়াস, নতুন প্রণালী প্রচলন, শিক্ষকদের বদ-অভ্যাস দূরীকরণ, শৃঙ্খলা স্থাপন, নিয়মিত হাজিরা, ব্যাকরণ ও অঙ্ক-শিক্ষা গ্রহণে নতুন নিয়ম, হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ কার সাহেবের সঙ্গে বিবোধ—সাহেবের জুতা প্রদর্শনের জবাবে তালতলার চটী প্রদর্শন, জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের মৃত্যু হেতু সাহিত্যাধ্যাপকের পদ শূন্য হওয়ায় উক্ত পদে সহপাঠী মদনমোহন তর্কালঙ্কারেব নিয়োগের জন্য সযত্ন প্রয়াস ও মদনমোহনের নিয়োগ, মার্শেলেব অনুরোধে ‘বেতাল পঞ্চবিংশতি’ রচনা ও প্রকাশ, কলকাতায় দ্বাদশ বর্ষীয় চতুর্থ ভ্রাতা হরচন্দ্রের মৃত্যু ও অগ্রজ গভীর শোকাচ্ছন্ন, জননীদেবীর আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ, সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে মতবিরোধ হেতু অগ্রজের আকস্মিক পদত্যাগ, পদত্যাগ-পত্র প্রত্যাহারে অসম্মতি-জ্ঞাপন ও মর্যাদাব্যঞ্জক উক্তি, অমৃতলাল মিত্র ও শ্রীনাথ চন্দ্র বসুর কাছে ইংরেজিভাবা-শিক্ষা, বাঙ্গালার ইতিহাস রচনা ও প্রকাশ, ইউরোপীয় পণ্ডিতদের জীবনচরিত বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ, এডুকেশন কাউন্সিলের সেক্রেটারি ময়েট সাহেবের অনুরোধে ক্যাপ্টেন ব্যাঙ্ককে সংস্কৃত, বাংলা ও হিন্দি ভাবা শিক্ষাদানের দায়িত্বগ্রহণ কিন্তু পারিশ্রমিক গ্রহণে অস্বীকার, মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সহায়তায় সংস্কৃত-মুদ্রাযন্ত্র স্থাপনের জন্য ছয় শো টাকা ঋণ গ্রহণ, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হেড রাইটারের চাকরিগ্রহণ, অগ্রজের পরামর্শে সংস্কৃত কলেজের গণিতশাস্ত্রাধ্যাপক-পদে প্রিয়নাথ ভট্টাচার্যকে নিয়োগ, অগ্রজকে সংস্কৃত কলেজের জুনিবার ও সিনিয়ার ডিপার্টমেণ্টের পরীক্ষার দায়িত্ব অর্পণ, নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে দায়িত্বপালনের জন্য পুরস্কৃত, পুরস্কার-লব্ধ অর্থের দ্বারা মহাভারত

জন্ম, সর্বশ্রেষ্ঠ স্থানাধিকারী রামকমল ভট্টাচার্যকে মহাভারত প্রদান, অসুস্থ রামকমলকে সেবাশুশ্রূষা, পুত্র নারায়ণের জন্ম, কলকাতায় পঞ্চম সহোদর হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যু, শোকাতুরা জননীকে কলকাতায় আনয়ন, বোধোদয় পুস্তক প্রণয়ন ও মুদ্রণ, স্ত্রীশিক্ষা, বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহ বিষয়ে চিন্তাভাবনা, বিধবার দুঃখে জননীর ক্রন্দন, বিধবাবিবাহ বিষয়ে পিতৃদেবের প্রশ্ন, 'সর্বশুভকরী' নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ, সম্পাদক রাজকৃষ্ণ মিত্রের অনুরোধে 'বাল্য বিবাহের দোষ কি?' প্রবন্ধ রচনা, হিন্দু কলেজ, হুগলী কলেজ, কৃষ্ণনগর কলেজ ও ঢাকা কলেজের ছাত্রদের পরীক্ষায় ভারতে নারীশিক্ষা দেওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রশ্ন, সাহিত্যশাস্ত্রাধ্যাপক মদনমোহন তর্কালঙ্কার মুর্শিদাবাদের জজ-পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হলে উক্ত পদে অগ্রজকে নিয়োগ, অগ্রজের অনুরোধে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে হেড রাইটারের পদে নিয়োগ, সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারির পদ থেকে রসময় দত্তর পদত্যাগ, কলেজের উন্নয়ন-বিষয়ে অগ্রজের রিপোর্ট, সংস্কৃত কলেজের সম্পাদক ও সহকারি সম্পাদকেব পদ রহিতকরণ ও নবসৃষ্ট অধ্যক্ষের পদে অগ্রজকে নিয়োগ, সাহিত্যাধ্যাপকের পদে শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নকে নিয়োগ, দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত গ্রন্থসমূহের পুনর্মুদ্রণ, কুমারসম্ভব পুঁথির মুদ্রণ, শিরঃপীড়া ও দন্তরোগে আক্রান্ত, এডুকেশন কাউন্সিলের সভাপতি বেথুনের কলকাতায় বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপনে প্রয়াস, রক্ষণশীল হিন্দু দলপতিদের আপত্তি, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে বেথুনের বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন ও লেডী ডালহৌসী কর্তৃক পরিদর্শন, দলপতিদের নির্দেশে বালিকা-বিদ্যালয়ে কন্যা প্রেরণে অনিচ্ছা, উদারনৈতিক ব্যক্তিদের কন্যারা বালিকা-বিদ্যালয়ের ছাত্রী, রক্ষণশীল দলপতিদের উদ্যোগে উদারনৈতিক ব্যক্তিদের সামাজিক বয়কট, বালিকা-বিদ্যালয়ের অবৈতনিক সম্পাদকের পদে অগ্রজকে নিয়োগ, বিদ্যালয়-উন্নয়নে অগ্রজের সর্বাত্মক প্রয়াস, বেথুনের আকস্মিক মৃত্যু ও অগ্রজের ক্রন্দন, সরকার কর্তৃক বেথুন বালিকা-বিদ্যালয়ের দায়িত্ব গ্রহণ, 'নীতিবোধ' পুস্তকের কিছু অংশ অগ্রজের অনুবাদ এবং বাকি অংশ রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুবাদ, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারীসহ পূজার ছুটিতে বীরসিংহে গমন, দরিদ্র গ্রামবাসীদেরকে গোপনে অর্থসাহায্য, সংস্কৃত-শাস্ত্র অধ্যয়নে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য-ছাত্রদের মধ্যে অধিকার-ভেদ, শূদ্র-সন্তানদের সংস্কৃত-শাস্ত্র অধ্যয়নে নিষেধাজ্ঞা, সংস্কৃত কলেজে সকল বর্ণের সন্তানদের প্রবেশাধিকার লাভের জন্য সুপারিশ করলেও শূদ্রদের স্মৃতিশাস্ত্র-অধ্যয়নে সুযোগদানের বিরোধী, ব্রাহ্মণদের আপত্তি ও অগ্রজের উত্তর, সরকার কর্তৃক অগ্রজের সুপারিশ গ্রহণ, সংস্কৃত কলেজে ছাত্র-বেতন ধার্য, সংস্কৃত উপক্রমণিকা ও ঋজুপাঠ ১ম ভাগ, ২য় ভাগ ও ৩য় ভাগ প্রণয়ন ও মুদ্রণ, গ্রীষ্মকালে স্কুলগুলিকে ছুটি দেবার জন্য সুপারিশ ও সরকার কর্তৃক গ্রহণ, বীরসিংহে অগ্রজের গমন ও বাড়িতে ভয়াবহ ডাকাতি, তদন্তের জন্য দারোগার আগমন ও উৎকোচ দাবি, উৎকোচ প্রদানে পিতৃদেবের

অস্বীকার, অগ্রজের কপাটি খেলা, হ্যালিডে কর্তৃক এডুকেশন কাউন্সিলের নতুন নামকরণ, গর্ডন ইয়ংকে ডিরেক্টর-পদে নিয়োগ, অগ্রজের আপত্তি-জ্ঞাপন, হ্যালিডের পরামর্শে ইয়ংকে কর্মশিক্ষাদান, জলপথে বীরসিংহ যাত্রা—উলুবেড়িয়া-গেঁয়োখালি-তমলুক-কোলা-বাক্সী-গোপীগঞ্জ, পিতার কাছে বীরসিংহে বিদ্যালয়-স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ, বিদ্যালয়-গৃহ নির্মাণ আরম্ভ, গৃহ নির্মাণের পূর্বে বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ, অগ্রজের বাড়ি ও নিকটস্থ প্রতিবেশীদের বাড়িতে পাঠারম্ভ, শিক্ষাদানে দীনবন্ধু, শম্ভুচন্দ্র ও অন্যান্য আত্মীয়-সন্তান, স্কুলে অধ্যয়ন-বিষয়ে গ্রামীণ কুসংস্কার, অবৈতনিক বিদ্যালয়, দরিদ্র ছাত্রদের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক, শ্লেট, কাগজ ইত্যাদি বিতরণের জন্য বীরসিংহে প্রেরণ, বীরসিংহে নাইট স্কুল স্থাপন, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা, বালিকা বিদ্যালয় নির্মাণ, প্যারীচরণ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে ফার্স্ট বুক, সেকেণ্ড বুক, থার্ড বুক ইত্যাদি পুস্তক দান, পাঠশালার শিক্ষকদের বিদ্যালয়ে নিয়োগ, সংস্কৃত কলেজে অধ্যক্ষতার সঙ্গে হুগলী-বর্ধমান-নদীয়া ও মেদিনীপুর জেলায় স্কুল স্থাপন ও পরিদর্শনের জন্য বিশেষ পরিদর্শক-পদে নিয়োগ, বিদ্যালয়-স্থাপনে ইয়ং সহ ইংরেজ রাজপুরুষদের সঙ্গে মতবিরোধ, ইংলণ্ডের শাসক কর্তৃক অগ্রজকে সমর্থন ও বিদ্যালয়-স্থাপনের আদেশ, শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয় (নরম্যাল স্কুল) স্থাপন, অক্ষয়কুমার দত্ত, মধুসূদন বাচস্পতি, রাজকৃষ্ণ গুপ্ত, রামকমল ভট্টাচার্য প্রমুখ নরম্যাল স্কুলের শিক্ষক, রামকমল ভট্টাচার্যের উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ, অগ্রজের নির্দেশে আত্মীয়গণ কর্তৃক শববহন, দেশীয় ও ইউরোপীয় পোশাক পরিধানের কাহিনী, নাসারোগে আক্রান্ত, বৈঁচি গ্রামে বালিকাবিদ্যালয় ও ইংরেজি-বঙ্গ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, চারটি জেলার বিভিন্ন স্থানে বিদ্যালয়-স্থাপনের জন্য স্থান-নির্বাচন, দরিদ্র ব্যক্তিদের অকাতরে অর্থ সাহায্য, অধ্যয়নার্থে দরিদ্র বালকদের নিজের বাড়িতে আনয়ন, চারটি জেলার স্কুলসমূহের পরিদর্শনের জন্য ডেপুটি ইন্সপেক্টর পদে দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন, তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য, মাধবচন্দ্র গোস্বামী, হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়োগ, বীরসিংহের বাড়িতে শিক্ষালাভের জন্য ষাটজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছাত্রের বসবাস ও অধ্যয়ন, কলকাতার বাড়িতে সাত-আট জন দরিদ্র ছাত্রের বসবাস ও অধ্যয়ন, ডাঃ ময়েট কর্তৃক স্থাপিত বীটন সোসাইটিতে অগ্রজ কর্তৃক 'সংস্কৃত-সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব' পাঠ, অগ্রজের তামাকু সেবন, জগদ্দুর্লভ সিংহের পুত্র ভুবনমোহন সিংহকে প্রত্যেক মাসে ত্রিশ টাকা সাহায্য প্রদান, তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর স্ত্রীকে অনুরূপ সাহায্য প্রদান এবং কন্যার বিবাহের সমস্ত ব্যয়ভার বহন, শ্যামাচরণ ঘোষালকে সাহায্য প্রদান, ইংরেজির শিক্ষক প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারীর চাকরি সংক্রান্ত ঘটনাবলী, অগ্রজের সহযোগিতায় সর্বাধিকারী মহাশয় ক্রমশ উচ্চপদে আসীন—সংস্কৃত কলেজে প্রধান শিক্ষক-অধ্যক্ষ-বহরমপুর কলেজের অধ্যক্ষ-প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক, সংস্কৃত কলেজে ইংরেজিতে অঙ্ক শিক্ষা প্রবর্তন, ইংরেজি ভাষা-শিক্ষা বাধ্যতামূলক-করণ, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী, শ্রীনাথ

প্রতাপচন্দ্র সিংহ, সারদাপ্রসাদ সিংহ প্রমুখের নিয়মিত অর্থপ্রদান, সরকার কর্তৃক ব্যয়ের অর্ধাংশের দায়িত্বগ্রহণ, বালিকাবিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি, স্ত্রীশিক্ষা-প্রসারে অগ্রজ পথপ্রদর্শক, ভারতের বিভিন্ন স্থানে ক্রমশ স্ত্রীশিক্ষার প্রসার, অগ্রজের পরামর্শে সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়কে মহাভারতের অনুবাদের কাজে নিয়োগ, 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা প্রকাশ ও দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণকে দায়িত্বভার অর্পণ।

মেট্রোপলিটান : কলিকাতা ট্রেনিং স্কুল, মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশান স্থাপন, বিদ্যালয় উন্নয়নে অগ্রজের সামগ্রিক প্রয়াস, ছাত্র-বেতন মাসিক তিন টাকা, ছাত্রদেরকে বেত্রাঘাত কিংবা দুর্বাক্য প্রয়োগ নিষিদ্ধ, নিয়ম-শৃঙ্খলা অনুসরণ, নানাবিধ বাধাবিঘ্ন অতিক্রমনান্তে এল. এ. ক্লাস প্রচলন, তৃতীয় জামাতা সূর্যকুমার অধিকারীকে কলেজ ও স্কুলের সেক্রেটারি পদে নিয়োগ, বি এ ক্লাস প্রবর্তন, বি. এল. ক্লাস প্রচলন, সূর্যকুমার অধিকারীর যত্নে শঙ্কর ঘোষ লেনে স্কুল ও কলেজের জন্য জমি ক্রয় ও গৃহনির্মাণ ইত্যাদি বাবদে এক লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা ব্যয়, শ্যামপুকুর, বৌবাজার, বড়বাজার ও বালাখানা—এই চারটি ব্রাঞ্চ স্কুল স্থাপন, দিনময়ী দেবীর প্রয়াণ, সূর্যকুমার অধিকারী পদচ্যুত ও বৈদ্যনাথ বসুকে উক্ত পদে নিয়োগ, মহাভারতের উপক্রমণিকা রচনা ও প্রকাশ, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু, কালীপ্রসন্ন সিংহকে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার স্বত্ব বিক্রয়, অগ্রজের হস্তে উক্ত পত্রিকার ভারার্পণ, কৃষ্ণদাস পালকে বিনামূল্যে উক্ত পত্রিকার স্বত্ব অর্পণ, গোবিন্দচাঁদ বসুকে নায়েবের পদে নিয়োগের জন্য অগ্রজের সুপারিশ ও গোকুলচাঁদ বসুকে সংস্কৃত প্রেস-ডিপোজিটরিতে নিয়োগ, নীলাম থেকে বসতবাটি রক্ষার জন্য গোকুলবাবুদের অর্থ সাহায্য, অনুরূপ কারণে শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়কে অর্থ সাহায্য, সংস্কৃত ডিপোজিটরিতে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়োগ, অগ্রজের সুপারিশে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক-পদে নিয়োগ ও তাঁর শূন্য পদে পঞ্চাশ টাকা বেতনে গোকুলচাঁদ বসুকে নিয়োগ ও পদচ্যুতি, ব্রজনাথবাবুকে সংস্কৃত-ডিপোজিটরির উপস্বত্ব দান, অগ্রজ কর্তৃক 'কলিকাতা পুস্তকালয়' স্থাপন, জাহানাবাদের অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রামে পনেরোটি বিধবাবিবাহ, বিধবাবিবাহ-বিরোধীদের অত্যাচার-উৎপীড়ন বন্ধে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মৌলবী আবদুল লতিব খান বাহাদুরের সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ, পুনর্বিবাহিতাদের সঙ্গে জননীদেবীর একত্রে ভোজন, গড়বেতার অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রামে বহু সংখ্যক কায়স্থজাতীয়া বিধবা কন্যার পুনর্বিবাহ, বর্ধমান জেলায় বিধবাবিবাহ, গঙ্গাতীরে পিতামহীর অন্তর্জলী, পিতামহীর শ্রাদ্ধ ভণ্ডুল করার চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত, শ্রাদ্ধে বিপুল অর্থব্যয়, রামমোহনের পুত্র রমাপ্রসাদ রায়ের কাছে জমিদার বৈদ্যনাথ চৌধুরীর জমিদারী বন্ধক, উক্ত জমিদারী দখলের উদ্দেশ্যে রমাপ্রসাদের হীন কৌশল, অগ্রজ কর্তৃক বৈদ্যনাথ চৌধুরীর ঋণ পরিশোধ, পিতৃদেবের তীর্থ-ভ্রমণ, অগ্রজের ভারত-খ্যাতি, রামকমল ভট্টাচার্য প্রমুখ ব্যক্তিদের জন্য চাকরির চেষ্টা,

দরিদ্র স্ত্রীলোকদের অর্থ সাহায্য, কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের বহু বিবাহ, প্রথমা স্ত্রীর আত্মকথা, অগ্রজের ক্রন্দন ও চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে প্রথমা স্ত্রী ও কন্যার ভরণপোষণের জন্য অর্থ সাহায্যের অঙ্গীকার, অর্থপ্রাপ্তি সত্ত্বেও কিছুকাল পরে স্ত্রী ও কন্যাকে গৃহ থেকে বহিষ্কার, বহুবিবাহ নিবারণের বিষয়ে গ্রামবাসী ও জ্ঞাতিবর্গের সঙ্গে আলোচনা, কুলীনদের বিবাহ-তালিকা তৈরি করার নির্দেশ, বহুবিবাহ নিবারণার্থে সরকারের কাছে রাজা-মহারাজা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের স্বাক্ষরিত আবেদনপত্র প্রেরণ, সীতার বনবাস রচনা ও প্রকাশ, অগ্রজের উদ্যোগে নদীয়ার রাজসম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডস্-এর অধীনে আনয়ন, কনিষ্ঠ পুত্রের মৃত্যু হেতু আন্তরিক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও প্রথম বিধবাবিবাহের অনুষ্ঠানে নবদ্বীপাধিপতি শ্রীশচন্দ্র রায়বাহাদুরের অনুপস্থিতি, ভূস্বামী সারদাপ্রসাদ সিংহরায়কে পোষ্যপুত্র গ্রহণের বিরুদ্ধে উচ্চশ্রেণীর ইংরেজি-সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপন, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা ও নানাপ্রকার দেশহিতকর কাজ করার জন্য পরামর্শ প্রদান, মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্য ঋণ গ্রহণ ও ঋণ পরিশোধের জন্য সংস্কৃত-যন্ত্র বিক্রয়, বিভিন্ন ব্যক্তিকে সাহায্যের জন্য ঋণ গ্রহণ ও ঋণ পরিশোধ, বহুসংখ্যক বিধবার পুনর্বিবাহ, রাখালদাস ন্যায়রত্নকে অর্থ সাহায্য, পিতৃদেবের স্বপ্নদর্শন ও কাশীবাসের অভিপ্রায় প্রকাশ, অগ্রজের আপত্তি-জ্ঞাপন, পিতৃদেবের কাশী যাত্রা, পাইকপাড়ার রাজাদের দ্বারা ইংরেজি-সংস্কৃত স্কুল স্থাপন, অগ্রজের লিখিত ভাষণ, পাইকপাড়া স্টেট কোর্ট অব ওয়ার্ডস্-এর তত্ত্বাবধানে আনয়ন, জগদ্দুর্লভ সিংহের কন্যা শ্রীমতী ক্ষেত্রমণি দাসীর সাহায্য প্রার্থনা, অগ্রজের মান-অপমান বোধ, অগ্রজের সুপারিশে মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নকে সংস্কৃত কলেজের অলঙ্কারশাস্ত্রের পদে নিয়োগ।

হোমিওপ্যাথি : অগ্রজের পরামর্শে রাজেন্দ্র দত্তের হোমিওপ্যাথি-চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় অগ্রজের শিরঃপীড়া উপশম, অগ্রজের হোমিওপ্যাথি-শাস্ত্র অধ্যয়ন ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা আরম্ভ, মধ্যম সহোদর দীনবন্ধু ন্যায়রত্নকে পুস্তক ও ওষুধের বাক্স সহ বীরসিংহে প্রেরণ, হোমিওপ্যাথি-শাস্ত্র অধ্যয়নে বিভিন্ন ব্যক্তিকে উৎসাহ প্রদান, অগ্রজের পরামর্শে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার কর্তৃক অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা পরিত্যাগপূর্বক হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা আরম্ভ, অগ্রজের সহৃশক্তি।

দুর্ভিক্ষ : ১২৭২-৭৩ বঙ্গাব্দের দুর্ভিক্ষ, চারিদিকে হাহাকার, অনাহারে মৃত্যু, ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ, দুর্ভিক্ষগ্রস্ত মানুষকে রক্ষার জন্য বীরসিংহে অগ্রজ কর্তৃক অন্নসত্র স্থাপন, অগ্রজের প্রচেষ্টায় সরকারি সাহায্যে মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে অন্নসত্র স্থাপন, দুর্ভিক্ষগ্রস্তদের প্রতি অগ্রজের মমত্ববোধ ও স্বহস্তে সেবা।

বিবিধ : অগ্রজের নিদ্রাহীনতা, কবিরাজী চিকিৎসায় আরোগ্যলাভ, বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক জমি দান ও গৃহনির্মাণের

জন্য বেথুন কর্তৃক অর্থসাহায্য, অগ্রজের আদেশে শম্ভুচন্দ্রের কাশীযাত্রা, স্বাস্থ্য লাভের আশায় রোগাক্রান্ত অগ্রজের বীরসিংহে গমন, নিরুপায়া অবীরার জমি বেদখল করার চক্রান্ত ব্যর্থ, ১২৭৪ বঙ্গাব্দে মধ্যম ও তৃতীয় সহোদরের এবং স্বীয় পুত্রের পৃথগান্নের ব্যবস্থা ও প্রত্যেকেব জন্য পৃথক বাড়ি নির্মাণ।

বর্ধমান : বর্ধমানের রাজা মহাতাপচন্দ্র বাহাদুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ, রাজার বিদায় (দান) গ্রহণে অস্বীকার, পথিমধ্যে গাড়ীর দুর্ঘটনায় অগ্রজের সংজ্ঞালোপ, তজ্জনিত কারণে পরবর্তীকালে স্বাস্থ্যভঙ্গ, মাইকেলের চরিত্র সম্বন্ধে সার্টিফিকেট প্রদান, বর্ধমানে প্যারীচরণ মিত্রের বাড়িতে বসবাস, মুসলমান বালক-বালিকাদের অর্থ ও বস্ত্র সাহায্য, মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা, দোকান করার জন্য জনৈক বালককে অর্থ সাহায্য, অসহায়া নারীর প্রতি দুর্বাক্য প্রয়োগের জন্য পাচক হরকালী চৌধুরীর পদচ্যুতি, বর্ধমানে রসিককৃষ্ণ মল্লিকের বাড়িতে বসবাস-কালে নিকটস্থ মুসলমান-পল্লী ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হওয়ায় নিজের বাড়িতে ডিসপেন্সারি স্থাপন, ম্যালেরিয়ার আক্রমণ থেকে বর্ধমানবাসীদের রক্ষাকল্পে সর্বাত্মক প্রয়াস, চিকিৎসা ও পথ্যের ব্যয়ভার বহন, জননীর পরামর্শে বীরসিংহ গ্রামের দরিদ্র গ্রামবাসীদেবকে প্রত্যেক মাসে অর্থ সাহায্য, জ্যেষ্ঠা কন্যা হেমলতার বিবাহ, সংস্কৃত প্রেস ও ডিপোজিটরির স্বত্ব দাবি করায় মধ্যম সহোদরের সঙ্গে বিরোধ, ছোট ব্যবসায়ীদের উপরে আয়কর-অফিসারের অত্যাচার, উৎপীড়ন বন্ধের জন্য অগ্রজ কর্তৃক ছোটলাটের কাছে অভিযোগপত্র পেশ, ছোটলাটের নির্দেশে বর্ধমানের কালেক্টার হ্যারিসন সাহেবের তদন্ত, অগ্রজের বাড়িতে জননীদেবীর উপস্থিতিতে হ্যারিসনের ভোজন, ঘাটাল স্কুল-গৃহ নির্মাণে পাঁচশত টাকা দান, আকস্মিক অগ্নিকাণ্ডে বীরসিংহের পৈত্রিক বাড়ি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত, আশ্রয়প্রার্থী ছাত্রদের স্বার্থে বীরসিংহে থাকার জন্য জননীদেবীর ইচ্ছা প্রকাশ, জননীদেবীর দয়াশীলতা, বিধবাবিবাহসহ নানাবিধ দেশহিতকর কাজের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা ঋণ, অগ্রজের অজ্ঞাতসারে 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকায় অর্থসাহায্যের আবেদন, অগ্রজ ক্রুদ্ধ ও অর্থ সাহায্য না করার জন্য সংবাদপত্রে বিবৃতি প্রকাশ, বিধবাবিবাহ না দেবার জন্য অন্যায় অনুরোধের কাছে নতি স্বীকার, অগ্রজের নির্দেশ অমান্য করে আত্মীয়দের উদ্যোগে মুচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বালবিধবা মনোমোহিনী দেবীর পুনর্বিবাহ, চিরকালের জন্য অগ্রজের বীরসিংহ-ত্যাগ, বৈঁচিগ্রামনিবাসী জমিদার বিহারীলাল মুখোপাধ্যায়কে দত্তক পুত্র গ্রহণের পরিবর্তে দেশের হিতকর কার্যে যাবতীয় সম্পত্তি দানের পরামর্শ ও তদনুযায়ী কার্য, দরিদ্র গ্রামবাসীদের সেবার উদ্দেশ্যে জননীদেবীর কাশীবাসে অনিচ্ছা, বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের সেক্রেটারির পদ-পরিত্যাগ।

নারায়ণের বিধবাবিবাহ : বালবিধবা ভবসুন্দরীর সঙ্গে অগ্রজের পুত্র নারায়ণের বিবাহসংক্রান্ত ঘটনাবলী, পিতৃদেবের অসুস্থতার সংবাদে জননীদেবী, অগ্রজ,

দীনবন্ধু ও শম্ভুচন্দ্রের কাশীযাত্রা, ঈশ্বর-ভক্তি নয়, মাতৃভক্তি, শূন্য হস্তে কাশীর বাঙ্গালী.ব্রাহ্মণদের বিদায়, জননীদেবীর দেহাবসান।

বহুবিবাহ : বহুবিবাহ-নিবারণার্থে সনাতন-ধর্মরক্ষিণী সভার উদ্যোগ, অগ্রজের বহুবিবাহ-নিবারণ-বিষয়ক পুস্তক রচনা, প্রবল আলোড়ন, তারানাথ তর্কবাচস্পতি প্রমুখ কয়েকজন বিখ্যাত পণ্ডিতের বহুবিবাহের সপক্ষে পুস্তক রচনা, বহুবিবাহ-বিরোধী আবেদনপত্রে তারানাথ তর্কবাচস্পতির স্বাক্ষর, পরবর্তীকালে বিরুদ্ধপক্ষে যোগদান, টীকাসহ মেঘদূত, উত্তরচরিত ও অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটকের মুদ্রণ, বীরসিংহে নানাবিধ জনহিতকর কার্য সম্পাদন।

কর্মটার : কলকাতার বাড়িতে সকাল থেকে রাত নয়টা পর্যন্ত নানা ধরনের প্রার্থীর আগমন, উদরাময় রোগে আক্রান্ত, কর্মটার স্টেশনের নিকটবর্তী স্থানে বাড়ি ক্রয়, স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য কর্মটারে গমন, আদিবাসীদের সঙ্গে প্রণয়, প্রত্যেক বছরে শীতের সময়ে গরম চাদর, কম্বল, কমলালেবু ও খেজুর আদিবাসীদের মধ্যে বিতরণ, মধম্যা কন্যা কুমুদিনীর বিবাহ, জ্যেষ্ঠ জামাতা গোপালচন্দ্র সমাজপতির কাশীগমন ও তথায় মৃত্যু, বিধবা কন্যার সঙ্গে কিছুকালের জন্য একাদশী পালন, জ্যেষ্ঠা কন্যা কর্তৃক পিতার সংসারের 'তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব গ্রহণ।

কাশী : পিতৃদেবের অসুস্থতার সংবাদে কাশী গমন, পিতার আরোগ্য লাভ, পিতামহীর একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধোপলক্ষে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ-ভোজন, অগ্রজের অর্থ সাহায্যে মৃত মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জননী বিশ্বেশ্বরী দেবীর কাশীবাস ও কাশীলাভ, কাশীর বিভিন্ন ব্যক্তি ও মহিলাকে অর্থসাহায্য, পদব্রজে দুই ক্রোশ প্রাতঃভ্রমণ, স্বহস্তে রন্ধনাদি কার্য, নিত্য মহাভারত-পাঠ, কলকাতা গমন, উদরাময় ও শিরঃপীড়া রোগে আক্রান্ত, আরোগ্যলাভের জন্য কানপুরের গঙ্গাতীরে ভাড়া বাড়িতে কয়েকমাস বসবাস, সুস্থ হওয়ার পরে লক্ষ্ণৌ, প্রয়াগ ভ্রমণান্তে কাশীতে প্রত্যাগমন, স্বহস্তে বাজারের জিনিসপত্র ক্রয়, জননীদেবীর একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ, মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণদের ভোজনোপলক্ষে ব্রাহ্মণদের পাদপ্রক্ষালন, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি স্যার মর্ডান্ট ওয়েলস বঙ্গবাসীদিগকে জালিয়াৎ বলায় তাঁর বিরুদ্ধে অগ্রজের উদ্যোগে রাজা রাধাকান্ত দেববাহাদুরের বাড়িতে বিশিষ্ট নাগরিকদের সভা, ওয়েলসের মন্তব্যের বিরুদ্ধে পাঁচ হাজার কৃতবিদ্য নাগরিকদের স্বাক্ষরিত দরখাস্ত বিলাতে স্টেট সেক্রেটারির কাছে প্রেরণ, ওয়েলসকে সতর্কবাণী, কাশীর বাঙ্গালী পুরোহিতদের সম্বন্ধে অগ্রজের অভিমত, বহুমূল্য পুস্তকগুলি রক্ষার উদ্দেশ্যে কলকাতায় বাড়ি তৈরি করার জন্য পিতৃদেবের কাছে অনুমতি প্রার্থনা, পুস্তক বিক্রির সংখ্যা হ্রাস হওয়ায় আয় হ্রাস এবং সেকারণে সাহায্যগ্রহণকারী ব্যক্তিদেরকে কিছুকালের জন্য অর্থ সাহায্যের পরিমাণ হ্রাস, কনিষ্ঠ সহোদর ঈশানের জন্য পিতৃদেবের দুঃখবোধ, অগ্রজের তৃতীয়া কন্যা বিনোদিনীর বিবাহ, পুনরায় রোগে

আক্রান্ত, মহেন্দ্রলাল সরকারের সুদীর্ঘ চিকিৎসায় সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ, অগ্রজ কর্তৃক ঈশানের ঋণ পরিশোধ, ঈশান ও তৎপত্নীকে কাশীতে পিতৃদেবের কাছে প্রেরণ, কর্মটারে সাঁওতালদের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ও পথ্যের ব্যয়ভার বহন, ধনীদের তুলনায় সাঁওতালদের সংসর্গ অধিকতর কাম্য, ম্যালেরিয়ার জন্য বীরসিংহ বিদ্যালয় কিছুকাল বন্ধ, পিতৃদেব পুনরায় গুরুতর অসুস্থ, হিন্দু ফ্যামিলি এ্যান্যুয়িটি ফাণ্ডের ট্রাস্টির সদস্য, কিছুকাল পরে ট্রাস্টি থেকে পদত্যাগ, পিতৃদেবের কাশীলাভ, কাশীতে শ্রাদ্ধ করার জন্য পিতৃদেবের অন্তিম ইচ্ছা প্রকাশ, গুরুতর অসুস্থ হওয়ায় অগ্রজকে কাশী থেকে কলকাতায় আনয়ন, ১২৮৩ সালের শীতকালে বাদুর-বাগানের নতুন বাড়িতে প্রবেশ, কনিষ্ঠা কন্যা শরৎকুমারীর বিবাহ, অগ্রজের চুরি-যাওয়া ঘড়ি উদ্ধার, বীরসিংহের দাতব্য চিকিৎসালয় বন্ধ, অগ্রজকে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি প্রদান, 'দয়ার সাগর' উপাধি প্রদান, 'কম্পানিয়ান অব ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার' উপাধি প্রদান।

অশ্বত্থ বৃক্ষ : পিতামহীর প্রতিষ্ঠিত অশ্বত্থ-বৃক্ষ তত্ত্বাবধান ও দেশাচার অনুসারে বৈশাখ মাসে বৃক্ষমূলে জলদানের জন্য শম্ভুচন্দ্রকে নির্দেশ, অগ্রজের অন্নে প্রতি-পালিত নবকুমার কর্তৃক অশ্বত্থ বৃক্ষ নষ্ট করার প্রয়াস, নবকুমার পত্নী কর্তৃক শম্ভুচন্দ্র ও অন্যান্যের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের, মামলা খারিজ, নবকুমার-পত্নী কর্তৃক অগ্রজের কাছে অশ্বত্থ বৃক্ষ প্রার্থনা, প্রার্থনা নামঞ্জুর হওয়ায় দেওয়ানি মামলা, মোকদ্দমায় লিপ্ত থাকতে শম্ভুচন্দ্রের অনিচ্ছা এবং অশ্বত্থ বৃক্ষের স্বত্ব-ত্যাগের পরামর্শ, সোলেন্সুরত নিষ্পত্তি।

মলয়পুর : মলয়পুরের প্রজারা বন্যায় নিঃস্ব, কলকাতায় অগ্রজের বাড়িতে বিপদাপন্ন কয়েকটি পরিবারের আশ্রয় গ্রহণ, অগ্রজের বাড়িতে কিছু ব্যক্তি ও ছাত্রের নিয়মিত ভোজন, ধনী ব্যক্তি অপেক্ষা দরিদ্র ব্যক্তির সংসর্গ অধিকতর কাম্য, অন্য ব্যক্তির কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করে মহাজনের ঋণ পরিশোধের দ্বারা ক্ষেত্রমোহন হালদার, বৈষ্ণবচরণ সরকার প্রমুখের সম্পত্তি রক্ষা, পতনজনিত কারণে যকৃতে আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ায় উদরাময় পীড়া, পীড়া-উপশমেব জন্য চিকিৎ-সকের পরামর্শে আফিং-সেবন, ডাঃ দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ বিলাতের সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, সিভিল সার্ভিসে যোগদান, পদচ্যুতি, মেট্রোপলিটান কলেজে অধ্যাপক-পদে যোগদান, ধর্ম সম্পর্কে অগ্রজের অভিমত ও রসিকতা।

বীরসিংহ ভগবতী বিদ্যালয় : ম্যালেরিয়ার কারণে সুদীর্ঘকাল বন্ধ থাকার পরে পুনরায় স্কুল উদ্বোধন, শম্ভুচন্দ্র কর্তৃক স্কুলের দায়িত্বগ্রহণ, বিনা বেতনে ছাত্রদের অধ্যয়ন, অগ্রজ কর্তৃক স্কুলের নিয়মাবলী প্রণয়ন, বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে চক্রান্ত, ফরাসডাঙ্গায় অবস্থান, শম্ভুচন্দ্র কর্তৃক অগ্রজের সম্মুখে বিদ্যাসাগর-জীবনচরিতের কিছু অংশ পাঠ, অগ্রজের প্রশংসা, অর্ধোদয়-যোগে স্নানের জন্য ফরাসডাঙ্গার ভাড়া

সম্পাদকের নিবেদন

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের (বন্দ্যোপাধ্যায়) তিরোধানের (১৩ শ্রাবণ, ১২৯৮ বঙ্গাব্দ ; ২৯ জুলাই, ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দ) অব্যবহিত পরে বিদ্যাসাগরের তৃতীয় সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন রচিত 'বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত' ১২৯৮ বঙ্গাব্দে (সেপ্টেম্বর, ১৮৯১ খ্রীঃ) প্রকাশিত হয়। বিদ্যাসাগরের জীবিতাবস্থায় শম্ভুচন্দ্র জ্যেষ্ঠাগ্রজের জীবনী-রচনার কাজ আরম্ভ করেছিলেন এবং রচনার কিছু অংশ ১২৯৭ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসের অর্ধোদয় দিবসে তিনি বিদ্যাসাগরকে দেখিয়েছিলেন। 'বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত' গ্রন্থে (চিরায়ত সংস্করণ) তিনি লিখেছেন : "এক দিবস দাদাকে বলিলাম, 'মহাশয়! আমি আপনার জীবনচরিত লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি।' এই কথায় দাদা বলিলেন, 'পড় দেখি শুনি।' তাঁহার আজ্ঞানুসারে জীবনচরিতের উপক্রমণিকা, শিশুচরিত সমগ্র ও স্থানে স্থানে দুই চারি পৃষ্ঠা শুনাইবার পর তিনি বলিলেন, 'লেখা ভাল হইয়াছে, কিন্তু দান ও সাহায্য বিষয়গুলি উঠাইয়া দিও, নতুবা অনেকে কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হইবেন।' কিন্তু আমি এই পুস্তক মুদ্রিত করিবার পূর্বে অনেককে জিজ্ঞাসা করায়, যাঁহারা ঐ বিষয় মুদ্রিত-করণে আপত্তি করিলেন, তাঁহাদের বিষয় উল্লেখ করিলাম না এবং যাঁহারা কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে ও সরলভাবে অনুমতি দিলেন, তাঁহাদের বিষয় মুদ্রিত করিলাম।" (পৃঃ ১৭৮)

'ভ্রমনিবাস' গ্রন্থে (প্রকাশকাল ১৩০২ বঙ্গাব্দ ; ১৮৯৫ খ্রীঃ) শম্ভুচন্দ্র পুনরায় বলেছেন : "পূজ্যপাদ ৺বিদ্যাসাগর মহাশয় পিতৃদেবের শুশ্রূষাদি কার্য সম্পাদনার্থ আমায় দীর্ঘকাল ৺কাশীধামে রাখিয়াছিলেন। তৎকালে অগ্রজ মহাশয় আমাকে অনুমতি করেন যে 'পিতৃদেব আর অধিক দিন জীবিত থাকেন, এ মত বোধ হয় না। অতএব তুমি কথাপ্রসঙ্গে মধ্যে মধ্যে বাবার নিকট পূর্বপুরুষগণের বৃত্তান্ত লিখিয়া লইবে এবং পারত আমার শৈশব কালের বৃত্তান্ত বিশেষরূপ জানিয়া লিখিয়া লইবে।' আমি তদনুসারে ক্রমশ পিতৃদেবের নিকট বৃত্তান্তগুলি লিখিয়া লই। দুই প্রস্থ কাগজের এক প্রস্থ বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দিয়াছিলাম। অপর এক প্রস্থ কাগজ আমার নিকট রাখি। যৎকালে দাদা মহাশয় পীড়িত হইয়া ফরেশডাঙ্গায় অবস্থিতি করেন, তৎকালে ১২৯৭ সালে অর্ধোদয়ের সময় আমার প্রণীত 'বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত' দাদাকে শুনান হয়। তিনি শুনিয়া বলিলেন, আমাকে কাশী হইতে যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছ, তাহাতে স্থানে স্থানে দুই একটা তফাৎ আছে। দেশে যাইয়া ভ্রমগুলির সংশোধন করিয়া লইব। কিন্তু দেশেও যাওয়া হয় নাই এবং সময়ের সুবিধাও হয় নাই ; সুতরাং সংশোধনও হয় নাই। তাহাতে কেবল পূর্বপুরুষের বৃত্তান্ত ও দাদার আট বৎসর বয়স পর্যন্তের বৃত্তান্ত লেখা ছিল।

"ঐ সময়ে অর্থাৎ সন ১২৯৭ সালে অর্ধোদয় দিবসে ফরেশডাঙ্গায় দাদার বাসায় কলিকাতা বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র বসু মহাশয় আমার

কৃত 'বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত' শুনিয়া আমাকে বলেন, 'রচনা উত্তম হইয়াছে, বিশেষত যাঁহার জীবনচরিত তাঁহাকেও জীবিত অবস্থায় শ্রবণ করানো হইল, ইহা ছাপাইতে হইবে।' দাদার দাহকালে নিমতলার ঘাটে শ্মশানভূমে উল্লিখিত গিরিশবাবু উক্ত জীবনচরিত বঙ্গবাসীতে ছাপাইবার জন্য চাহিয়াছিলেন।" (চিরায়ত সংস্করণ ; পৃঃ ১৮৬)

বিদ্যাসাগরের আদেশে শম্ভুচন্দ্র পারিবারিক ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সূত্রে লব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে অগ্রজের জীবনকাহিনী রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। তিনি 'বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত' গ্রন্থের 'উপক্রমণিকা' অংশে লিখেছেন : "আমি বাল্যকাল হইতেই অগ্রজ মহাশয়ের নিতান্ত অনুগত ছিলাম। তাঁহার জন্মভূমির কীর্তি-স্তম্ভস্বরূপ বীরসিংহ বিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয়, রাখাল স্কুল, দাতব্য-চিকিৎসালয় ও বৃত্তিভোগী নিরুপায় দরিদ্র-লোকদিগের মাসহারা বিলি, বিধবাবিবাহাদি কার্যসমূহ, এবং সন ১২৭২।৭৩ সালের বিষম দুর্ভিক্ষসময়ে প্রত্যহ সহস্রাধিক দরিদ্র লোকের প্রাণ রক্ষাদি কার্য আমার তত্ত্বাবধানে ছিল। আমি বাল্যকাল হইতে পিতামহী, মাতামহী ও জননীদেবীর প্রমুখাৎ তাঁহার বাল্যকালের যে সকল আচার-ব্যবহার, রীতি নীতি বিশিষ্টরূপ অবগত হইয়াছি, অদ্যাপি সে সকল কথা আমার স্মৃতিপথে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। অগ্রজ মহাশয় কাশীধামে বৃদ্ধ পিতৃদেবের শেষাবস্থায় তাঁহার শুশ্রূষাদি কার্যে প্রায় ৬।৭ বৎসর আমায় নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। তথায় পিতৃদেবের প্রমুখাৎ এবং যৎকালে সংস্কৃত-কলেজে অধ্যয়ন করি, তৎকালে কলেজের ব্যাকরণের অধ্যাপক পূজ্যপাদ গঙ্গাধর তর্কবাগীশ, সাহিত্যাধ্যাপক জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, অলঙ্কারের অধ্যাপক প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ, বেদান্তের অধ্যাপক শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি, দর্শনের অধ্যাপক নিমচাঁদ শিরোমণি ও জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয়গণের প্রমুখাৎ দাদার বাল্যকালের পাঠ্যাবস্থার যে সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছি, তাহা আমার হৃদয়পটে অঙ্কিত রহিয়াছে।" (পৃঃ ১)

শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নই ছিলেন বিদ্যাসাগরের জীবনী-রচনার একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি, যিনি বিদ্যাসাগরের সমগ্র কর্মকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন, তথ্য সংগ্রহের জন্য তাঁকে অন্যের দ্বারস্থ হতে হয়নি; কখনো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে, আবার কখনো পিতৃদেব, আত্মীয়, অধ্যাপকদের কাছ থেকে তিনি অগ্রজের জীবনকাহিনীর রসদ সংগ্রহ করেছিলেন। সংস্কৃত কলেজ থেকে পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে 'বিদ্যারত্ন' উপাধি পেলেও শম্ভুচন্দ্র জ্যেষ্ঠাগ্রজের আদেশে কোনো স্বাধীন বৃত্তি গ্রহণ করেননি। যৎসামান্য মাসোহারার বিনিময়ে তিনি আজীবন বিদ্যাসাগরের একান্ত অনুগত থেকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সমস্ত আদেশ দ্বিধাহীন চিত্তে শিরোধার্য করেছেন। সেকারণে শম্ভুচন্দ্র প্রণীত 'বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত' একমাত্র প্রামাণ্য গ্রন্থ, যে-গ্রন্থে বিদ্যাসাগর-চরিত্রে বর্ণারোপ করা হয়নি, অতিরঞ্জনের দ্বারা তাঁকে দেবতা-রূপে গড়ে তোলা

হয়নি; কিংবা রক্ষণশীল দৃষ্টিতে তাঁর অবমূল্যায়ন করা হয়নি। পক্ষান্তরে, বিদ্যাসাগর যথার্থ মানুষ-রূপে অঙ্কিত হয়েছেন। শম্ভুচন্দ্রের গ্রন্থে বিদ্যাসাগর মানব-প্রেমের সাধক, মনুষ্যত্ববোধের উপাসক। তাঁর মানব-সাধনায় ছিল না সাম্প্রদায়িক বোধ। বিবর্ণ-বিষণ্ণ-বিপন্ন সমাজজীবনে তিনি ছিলেন তীব্রোজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। অত্যাচারিত-উৎপীড়িত মানুষের কাছে তিনি ছিলেন পরম ভরসার স্থল।

শম্ভুচন্দ্রের সমকালে বিদ্যাসাগরের আরো দুটি জীবনীগ্রন্থ মুদ্রিত হয়। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'বিদ্যাসাগর' ১৩০২ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে এবং বিহারীলাল সরকার প্রণীত 'বিদ্যাসাগর' ১৩০২ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে প্রকাশিত হয়। অবশ্য বিহারীলালের 'বিদ্যাসাগর' রচনা গ্রন্থাকারে মুদ্রণের পূর্বে 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছিল। চণ্ডীচরণ ও বিহারীলাল শম্ভুচন্দ্রের 'বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত' গ্রন্থকে অবলম্বন করে এবং তাঁর গ্রন্থ থেকে বহুবিধ তথ্য সংগ্রহ করে তাঁদের গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। শম্ভুচন্দ্র, চণ্ডীচরণ, বিহারীলাল—এই তিনজনের রচিত বিদ্যাসাগরের জীবনী-গ্রন্থ অবলম্বনে সুবলচন্দ্র মিত্র ইংরেজিতে ১৯০২ খ্রীঃ রচনা করেছেন *The Life of Pundit Iswar Chandra Vidyasagar*। কিন্তু সুবলচন্দ্র তাঁর গ্রন্থে চণ্ডীচরণ, বিহারীলালের নাম উল্লেখ করলেও শম্ভুচন্দ্রের নাম উল্লেখ করেননি।

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাসাগরের 'অত্যন্ত স্নেহবান' ছিলেন বলে দাবি করে 'বিদ্যাসাগর' গ্রন্থের ভূমিকায় গ্রন্থ-রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছেন: "তিনি আমার প্রতি অত্যন্ত স্নেহবান ছিলেন, এবং শত শত ঘটনায় তাহার পরিচয় দিয়াছেন। আমিও সে জন্য আমরণ ভক্তি ভরে তাঁহার পূজা করিব। সেই পূজার আয়োজনেই এই জীবনচরিতের সূচনা এবং তাঁহার সুপবিত্র জীবন-কাহিনী বর্ণন করিবার ইহাই আমার একমাত্র অধিকার। তাঁহার শেষ জীবনের দীর্ঘকাল তাঁহার পবিত্র সহবাসে সুখে আমি নানা প্রকারে উপকৃত।" (পৃঃ ছয়-সাত)

অর্থাৎ চণ্ডীচরণ বিদ্যাসাগরের জীবনের প্রথম ভাগে কিংবা মধ্য ভাগে তাঁর সহচর ছিলেন না। কেবলমাত্র 'তাঁহার শেষ জীবনের দীর্ঘকাল তাঁহার পবিত্র সহবাসে'র সময়ে চণ্ডীচরণ বিদ্যাসাগরের শেষ জীবনের ঘটনাবলীর বহু তথ্য ও উপকরণ 'বহুযত্নে' রেখে দিয়েছিলেন। গ্রন্থ-রচনায় চণ্ডীচরণ অনেকের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছেন: "তাঁহাদের সস্নেহ উৎসাহ ও নানাপ্রকার সাহায্য দান ভিন্ন আমার ন্যায় অযোগ্য ব্যক্তি এরূপ বৃহদানুষ্ঠানে অগ্রসর হইতে সাহস করিত না। যাঁহাদিগের নিকট এই গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য আমি নানা প্রকারে ঋণী, তাঁহাদের সুদীর্ঘ নামাবলীর উল্লেখ করা সম্ভব নহে" বলেই তিনি 'কয়েকজন সদাশয় মহাশয়ের নামোল্লেখ' করেছেন—'মাননীয় জজ শ্রী গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়,' 'নারায়ণ চন্দ্র বিদ্যারত্ন', 'রাজনারায়ণ বসু', 'সুরেশচন্দ্র সমাজপতি' প্রমুখ। কিন্তু

তিনি ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃতীয় পুত্র শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নের নাম কিংবা তাঁর 'বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত' গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেননি, যদিও তিনি শম্ভুচন্দ্রের গ্রন্থ থেকে বিদ্যাসাগরের জীবনের প্রথমভাগ ও মধ্যভাগের নানাবিধ তথ্য গ্রহণ করেছিলেন। তবে তিনি গ্রন্থ-মধ্যে যাঁদের নাম উল্লেখ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন বিদ্যাসাগরের পুত্র নারায়ণ বিদ্যারত্ন। চণ্ডীচরণ 'বিদ্যাসাগর' গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন: "এই জীবনী যদি কোন অংশে বাঙ্গালা সাহিত্যসেবক ও পাঠকদলের সমাদরের জিনিস হয় তবে সে জন্য বিশেষভাবে প্রশংসার পাত্র বিদ্যাসাগর-পুত্র শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন। তিনি যেরূপ আগ্রহ ও আকিঞ্চনের সহিত তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেবের জীবনীবিষয়ক উপকরণাদির দ্বারা আমাকে সাহায্য করিয়াছেন, তাহার বিস্তৃত উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন, কারণ পুস্তক পাঠ করিতে করিতে পাঠক তাহার ভূরি ভূরি পরিচয় পাইবেন। সুতরাং তিনিও আমাকে এইরূপ নানা প্রকারে সাহায্য করিয়া অপরিশোধ্য ঋণ জালে জড়িত করিয়াছেন।" (পৃঃ সাত)

কিন্তু শম্ভুচন্দ্রের মতে নারায়ণের কাছ থেকে সংগৃহীত তথ্যগুলির অধিকাংশই ছিল ভ্রমপূর্ণ। তাঁর কথায় চণ্ডীচরণ বিদ্যাসাগরের অত্যন্ত স্নেহভাজন ছিলেন না এবং পিতা বিদ্যাসাগরের সঙ্গে পুত্র নারায়ণের 'তাদৃশ সদ্ভাব না থাকায়' তাঁর পক্ষে পিতার শেষ জীবনের ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষদর্শী হওয়া সম্ভব ছিল না। সে কারণে চণ্ডীচরণ গ্রন্থ রচনাকালে ভ্রমে পতিত হয়েছেন। শম্ভুচন্দ্র 'ভ্রমনিরাশ' (প্রকাশকাল ১৩০২ বঙ্গাব্দ) গ্রন্থের 'বিজ্ঞাপনে' চণ্ডীচরণের 'বিদ্যাসাগর নামক নূতন জীবনচরিতের ভ্রমনিরাকরণ'-এর উদ্দেশ্যে লিখেছেন: "ঐ গ্রন্থে অনেক-স্থলে অনেকগুলি ভ্রমাত্মক বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। হইবারও সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। চণ্ডীচরণবাবুর সহিত অগ্রজ মহাশয়ের কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল না।...আমি চিরকাল অগ্রজ মহাশয়ের আদেশানুসারে তদীয় নানা দেশহিতকর কার্যে প্রায় ৪২ বৎসর অতিবাহিত করিয়া এক্ষণে বার্ধক্যে উপনীত হইয়াছি। বিদ্যাসাগরের শৈশবকাল হইতে তাঁহার চরিত সম্বন্ধে ঘটনাবলী আমি যাহা যাহা দেখিয়াছি ও জনক জননী পিতামহী ও তাঁহার শিক্ষক মহোদয়গণের নিকট যতদূর অবগত হইয়াছি, অন্যের পক্ষে ততদূর জানা সম্ভব নহে।...আমিই ইতিপূর্বে কতিপয় বন্ধুর উৎসাহে ও কর্তব্যবুদ্ধির বশবর্তী হইয়া বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত সর্বপ্রথম প্রকাশিত করি। সেই কর্তব্য বিবেচনা করিয়া এক্ষণে শ্রীযুত বাবু চণ্ডীচরণের প্রণীত 'বিদ্যাসাগরে' যে রাশি রাশি ভ্রম দেখিয়াছি, তাহার মধ্যে কতকগুলির সংশোধন মানসে এই 'ভ্রমনিরাস' নামক পুস্তকখানি প্রকাশিত করিলাম।

"উপসংহারে একটি কথা বলা আবশ্যক। অগ্রজ মহাশয়ের প্রায় ৩০ বৎসর বয়সে তাঁহার পুত্র নারায়ণবাবু বীরসিংহে ভূমিষ্ঠ হয়েন। ভূমিষ্ঠ কালাবধি প্রায়

ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রম পর্যন্ত বীরসিংহ বিদ্যালয়েই বিদ্যাভ্যাস করেন। পরে কলিকাতায় আসিয়া সংস্কৃত কালেজে বিদ্যাভ্যাসের জন্য প্রবেশ করেন, কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই বিশেষ কারণে কালেজ ছাড়িয়া আবার বীরসিংহে গমন করেন। পিতা পুত্রে তাদৃশ সদ্ভাব না থাকায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শেষ জীবনের ও যাবতীয় ঘটনা নারায়ণবাবুকে পরমুখেই অবগত হইতে হইয়াছে। নূতন জীবনচরিতের উপকরণ বিষয়ে চণ্ডীবাবুকে নারায়ণবাবু বিশেষ সাহায্য করিলেও চণ্ডীবাবুর ভ্রমে পতিত হইবার সম্ভাবনা নিরাকৃত হয় নাই।"

পিতা-পুত্রের সম্বন্ধের বিষয়ে সহোদর শম্ভুচন্দ্র যা বলেছেন, তা সর্বাংশে সত্য। বিদ্যাসাগরের উইল (৩১.৫.১৮৭৫) থেকে জানা যায় যে, পিতা বিদ্যাসাগর পুত্র নারায়ণের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন; যদিও মৃত্যুশয্যায় তিনি অপরাধী পুত্রের প্রতি কিছুটা দুর্বল হয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর উইলে লিখেছেন: "আমার পুত্র বলিয়া পরিচিত শ্রীযুত নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় যারপরনাই যথেচ্ছাচারী ও কুপথগামী এজন্য ও অন্য অন্য গুরুতর কারণ বশতঃ আমি তাঁহার সংশ্রব ও সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়াছি এই হেতু বশতঃ বৃত্তি নির্বন্ধস্থলে তাঁহার নাম পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং এই হেতু বশতঃ তিনি চতুর্বিংশ ধারা নির্দিষ্ট ঋণ পরিশোধ কালে বিদ্যমান থাকিলেও আমার উত্তরাধিকারী বলিয়া পরিগণিত অথবা দ্বাবিংশ ও ত্রয়োবিংশ ধারা অনুসারে এই বিনিয়োগ পত্রের কার্যদর্শী নিযুক্ত হইতে পারিবেন না।" ('ভ্রমনিরাস', পৃঃ ২৪২)

শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন যে বিদ্যাসাগরের বিশেষ প্রিয়পাত্র ও সহকারী ছিলেন, তা চণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায় অস্বীকার করেননি—"কিন্তু তৃতীয় সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন, এবং একথা বিদ্যাসাগর মহাশয় ও বিদ্যারত্ন মহাশয় উভয়েই সর্বদা সর্বসমক্ষে স্বীকার করিয়াছেন। বিদ্যারত্ন মহাশয় অনুরাগভরে দীর্ঘকালের জন্য তাঁহার নানাবিধ কার্যে সহকারিতা করিয়া আসিয়া এবং তাঁহার জীবনী-বিষয়ক নানা ঘটনা আশৈশব অবগত" ('বিদ্যাসাগর'; পৃঃ ২৯৮) ছিলেন।

শম্ভুচন্দ্র 'ভ্রমনিরাস' গ্রন্থে বিহারীলাল সরকারের 'বিদ্যাসাগর' গ্রন্থ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, "আমার প্রণীত পুস্তক সর্বাগ্রে মুদ্রিত হয়। তদনন্তর শ্রীযুক্ত বাবু নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বিদ্যাসাগর চরিত, স্বরচিত' নাম দিয়া অসম্পূর্ণ এক ক্ষুদ্র পুস্তক মুদ্রিত করেন। ইহার পর জন্মভূমিতেও (বিহারীলাল সরকার প্রণীত 'বিদ্যাসাগর'—সম্পাদক) যাহা যাহা ছাপা হইয়াছে, তাহা চণ্ডীবাবুর কৃত জীবনচরিতের ন্যায় আমার কৃত পুস্তকের কোন কোন স্থান অবিকল, কোন কোন স্থান ফেরফার করিয়া এবং কতকগুলি স্বকপোলকল্পিত করিয়া লিখিয়াছেন।" (পৃঃ ১৮৭)

বিহারীলাল সরকার 'বিদ্যাসাগর' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় শম্ভুচন্দ্রের

গ্রন্থের নাম উল্লেখ করলেও দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশকালে প্রথম সংস্করণের ভূমিকা বর্জন করায় বর্তমানকালে জানার কোনো উপায় নেই যে, বিহারীলাল শম্ভুচন্দ্রের গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন। বিহারীলাল রচিত গ্রন্থের চতুর্থ সংস্করণ অবলম্বনে মুদ্রিত বর্তমান সংস্করণের (প্রথম ওরিয়েণ্ট সংস্করণ, ১৯৮৬) ভূমিকায় ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় চণ্ডীচরণের নাম উল্লেখ করলেও শম্ভুচন্দ্রের গ্রন্থের নাম কখনও উল্লেখ করেননি। তিনি লিখেছেন: "চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৫৮-১৯১৬) এবং বিহারীলাল সরকার (১৮৫৫-১৯২১)—দু'জনেই বিদ্যাসাগরের দু'খানি জীবনচরিত লিখেছেন। কিন্তু দু'জনের রচনা বৈশিষ্ট্য ও মনোভঙ্গী দু'রকম। চণ্ডীচরণ বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠ অনুচর ছিলেন। মহাপুরুষ বিদ্যাসাগরের চরিত্রটি তিনি নিকট থেকে লক্ষ্য করেছিলেন। তাই তাঁর লেখা জীবনচরিত প্রশংসার বিল্বদলে পূজার মতো নম্রনত আত্মনিবেদনে পূর্ণ। তাঁর রচনা থেকে সচন্দন পুষ্পের পবিত্র সুরভি লাভ করা যায়। অপরদিকে বিহারীলাল বিদ্যাসাগরের অনন্যসাধারণ জীবনকথার প্রতি শ্রদ্ধা রেখেও কোথাও কোথাও তাঁর আচার-আচরণ ও ক্রিয়াকর্মের কিছু সমালোচনাও করেছেন। তা মৃদু ভাষায় লেখা হলেও তীক্ষ্ণ ও তীব্র।" ('বিদ্যাসাগর', পৃঃ এগারো)

ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় উক্ত ভূমিকায় আরও লিখেছেন: "বিহারীলালেব 'বিদ্যাসাগর' গ্রন্থে মাঝে মাঝে অযৌক্তিক হিন্দুয়ানি প্রবল হলেও এটি যে একটি তথ্যসমৃদ্ধ জীবনী তাতে সন্দেহ নেই।...বিহারীলাল অত্যন্ত পরিশ্রম করে বিদ্যাসাগরের জীবন সম্বন্ধে বহু তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন।" (পৃঃ পনেরো)

তথ্য সংগ্রহকালে শম্ভুচন্দ্র যে বিহারীলালের পরিশ্রমের কিছুটা লাঘব কবেছিলেন, তা ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় উক্ত ভূমিকার কোথাও উল্লেখ কবেননি। একালের পাঠকেরা জানেন না যে শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নই হলেন বিদ্যাসাগরের জীবনী-রচনার প্রথম পথ-প্রদর্শক। শম্ভুচন্দ্রকে অবলম্বন কবে চণ্ডীচবণ, বিহারীলাল, সুবলচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনীগ্রন্থ রচনা কবলেও সকলের হিসাব থেকে প্রথম পথিকৃৎ শম্ভুচন্দ্র বাদ পড়েছেন। বিদ্যাসাগরের জীবনী-রচনায় শম্ভুচন্দ্রেব অবদানকে অস্বীকারের ঘটনা নিঃসন্দেহে বেদনাদায়ক ও দুঃখবহ। অথচ শম্ভুচন্দ্রের গ্রন্থে যে সমস্ত তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে, চণ্ডীচরণ ও বিহারীলালের গ্রন্থ দুটিতে তদরিক্ত নতুন নতুন তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে। ফলে, তাঁদের দুটি গ্রন্থই শম্ভুচন্দ্রের গ্রন্থের মতো মূল্যবান হয়ে উঠেছে। অথচ ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী চণ্ডীচরণ ব্রাহ্মোচিত বিনয় প্রকাশ না করে শম্ভুচন্দ্রের কৃতিত্বকে অস্বীকার করে যে-ভাবে শম্ভুচন্দ্রের প্রতি কটূক্তি-ব্যঙ্গোক্তি করেছেন, গ্রাম্য কোন্দলে লিপ্ত হয়েছেন, তাতে তীব্র ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বের কোলাহলে চণ্ডীচরণের গ্রন্থের ঐতিহাসিক গুরুত্ব চাপা পড়েছে। কিন্তু বিহারীলাল শম্ভুচন্দ্রের কৃতিত্বকে স্বীকৃতি না দিলেও তাঁর গ্রন্থে শম্ভুচন্দ্র প্রদত্ত তথ্য ব্যবহারকালে কোনো কোনো স্থলে তাঁর নাম উল্লেখ করেছেন। অনেক সময়ে চণ্ডীচরণ-বিহারীলাল

তথ্য-নির্ভরতার পরিবর্তে কল্পনা-শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। তাতে সত্যের প্রতি আনুগত্য লঙ্ঘিত হয়েছে, ইতিহাসের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

বিধবাবিবাহ বিষয়ে পুস্তক-রচনার প্রেরণা ও পরাশর-সংহিতা থেকে শ্লোক পাওয়ার বিষয়ে শম্ভুচন্দ্র যেখানে বিশ্বাসযোগ্য বর্ণনা দিয়েছেন, সেখানে চণ্ডীচরণ ও বিহারীলাল অতি নাটকীয় ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

শম্ভুচন্দ্র লিখেছেন, একদিন বীরসিংহের বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে বিদ্যাসাগর যখন পিতৃদেবের সঙ্গে স্থানীয় বিদ্যালয়গুলির অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন, তখন "জননীদেবী রোদন করিতে করিতে চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া, একটি বালিকার বৈধব্য-সংঘটনের উল্লেখকরতঃ দাদাকে বলিলেন, 'তুই এত দিন যে শাস্ত্র পড়িলি, তাহাতে বিধবাদের কোন উপায় আছে কিনা?' ইহা শুনিয়া পিতৃদেব বলিলেন, 'ঈশ্বর! ধর্মশাস্ত্রে বিধবাদের প্রতি শাস্ত্রকারেরা কি কি ব্যবস্থা করিয়াছেন?' দাদা উত্তর করিলেন, 'শাস্ত্রে বিধবাদিগের প্রথমতঃ ব্রহ্মচর্য, ব্রহ্মচর্যে অপারক হইলে, সহমরণ বা বিবাহ।' ইহা শুনিয়া পিতৃদেব বলিলেন, রাজা রামমোহন রায়, কালীনারায়ণ চৌধুরী ও দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতির যোগাড়ে ও পরামর্শে, গবর্ণর জেনেরেল লর্ড বেণ্টিঙ্ক সহমরণ-প্রথা নিবারণ করিয়াছেন। আর কলিতে ব্রহ্মচর্যে অপারক; সুতরাং বিধবাদিগের পক্ষে বিবাহই একমাত্র উপায়।' ইহা শুনিয়া দাদা বলিলেন, 'বেদ, স্মৃতি, পুরাণ পাঠ করিয়া অনেক দিন হইতে আমার ধারণা হইয়াছে যে, বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ; ইহাতে আমার অনুমাত্র সন্দেহ নাই এবং ইহা সাধারণের হৃদয়ঙ্গম হইবে।'" (পৃঃ ৮০)

চণ্ডীচরণের মতে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতির বালিকা বধূর অকাল বৈধব্য বিদ্যাসাগরকে বিধবাবিবাহ-রূপ মহৎ কর্মে ব্রতী হওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করেছিল। তিনি লিখেছেন, "৺শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ করিয়া অচিরকাল মধ্যে যে ব্রহ্মচর্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং প্রবলের আত্মসুখের অনুরোধে দুর্বলের প্রতি যে সর্বদাই ঐরূপ ব্রহ্মচর্যের ব্যবস্থা হইয়া আসিতেছে, তাহাকেই কি ব্রহ্মচর্য বলে? ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পাঠ্যাবস্থা অতিক্রম করিতে না করিতে এই নীতি-বৈষম্য, এই আচার-বিভ্রাট দেখিয়া হৃদয়ে গভীর বেদনা অনুভব করিয়াছিলেন, তাই বৃদ্ধ বাচস্পতির বালিকা স্ত্রীকে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে বাহির বাটীতে আসিয়াছিলেন; জলযোগ করিতে বলিলে পর, দারুণ মনস্তাপের সহিত বলিয়াছিলেন, 'এ ভিটায় আর জলস্পর্শ করিব না।' তাই বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবাজীবনের নানাপ্রকার দুরবস্থা অবগত হইয়া, এই বিধবাজীবনে ব্রহ্মচর্যের একটানা স্রোতের মধ্যে একটু পরিবর্তন আনিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।" ('বিদ্যাসাগর'; পৃঃ ১৮৬)

বিহারীলাল লিখেছেন: "বীরসিংহ গ্রামে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একটি বাল্য-সহচরী ছিল। এই সহচরী তাঁহার কোন প্রতিবেশীর কন্যা। বিদ্যাসাগর মহাশয়

তাহাকে বড় ভালবাসিতেন.। বালিকাটি বাল্যকালে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট সর্বদা থাকিত। বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন কলিকাতায় পড়িতে আসেন, তখন বালিকার বিবাহ হয়; কিন্তু বিবাহের কয়েক মাস পরে তাহার বৈধব্য ঘটে। বালিকাটি বিধবা হইবার পর বিদ্যাসাগর মহাশয় কলেজের ছুটিতে বাড়িতে গিয়াছিলেন। বাড়ি যাইলে তিনি প্রত্যেক প্রতিবেশীর ঘরে ঘরে গিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন, কে কি খাইল? ইহাই তাঁহার স্বভাব ছিল। এবার গিয়া জানিতে পারিলেন, তাঁহার বাল্যসহচরী কিছু খায় নাই; সেদিন তাহার একাদশী; বিধবাকে খাইতে নাই। একথা শুনিয়া বিদ্যাসাগর কাঁদিয়া ফেলিলেন। সেইদিন হইতে তাঁহার সংকল্প হইল, বিধবার এ দুঃখ মোচন করিব; যদি বাঁচি, তবে যাহা হয়, একটা করিব। তখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বয়স ১৩।১৪ বৎসর মাত্র হইবে।" ('বিদ্যাসাগর'; পৃঃ ১৭১-১৭২)

বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহের মতো মহত্তর কর্তব্য-কর্মে ব্রতী হওয়ার পশ্চাতে তিনজন জীবনীকার তিনটি পৃথক ঘটনা উল্লেখ করেছেন। তবে চণ্ডীচরণ ও বিহারীলাল বর্ণিত দুটি ঘটনা ঘটেছে বিদ্যাসাগরের ছাত্রজীবনে। কিন্তু শম্ভুচন্দ্রের বর্ণিত ঘটনাটি বিদ্যাসাগরের চাকরি-জীবনের শেষ দিকে ঘটেছিল। সমকালীন ঘটনাবলীর সাক্ষ্যে মনে হয় যে, পিতামাতার সঙ্গে বিধবাবিবাহ বিষয় নিয়ে বিদ্যাসাগরের আলোচনা ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দে ঘটেছিল। তারপরে তিনি কঠোর পরিশ্রমে কীটদষ্ট অপরিচ্ছন্ন হস্তলিখিত শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করে রচনা করেছেন 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা' এবং উক্ত প্রবন্ধটি ১৭৭৬ শকাব্দের ফাল্গুন মাসের (ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৪ খ্রীঃ) 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়। বিদ্যাসাগরের প্রবন্ধের সমর্থনে অক্ষয়কুমার দত্ত উক্ত পত্রিকার চৈত্র সংখ্যায় 'বিধবাবিবাহ' প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বিদ্যাসাগরের 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' পুস্তক প্রকাশিত হয়। এই পুস্তক প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র দেশে প্রবল আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছে। আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে ১২৬৩ বঙ্গাব্দের ১২ শ্রাবণ (২৬ জুলাই, ১৮৫৬ খ্রীঃ) তারিখে ব্যবস্থাপক সভায় বিধবাবিবাহ আইন গৃহীত হয়। তারপরে তিনি ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দের ৩ নভেম্বর তারিখে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ ও স্কুল-ইন্সপেক্টরের পদ পরিত্যাগ করেছেন। সুতরাং একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ পুস্তক রচনার পশ্চাতে আশু কারণ ছিল পিতামাতার সঙ্গে তাঁর আলোচনা এবং পিতৃ-আদেশ। তবে বাল্য-বিধবাদের কান্না তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল। ছাত্রজীবনে ও কর্মজীবনে গ্রামে ও শহরে তিনি দেখেছেন নারীর উপরে অত্যাচার-উৎপীড়ন। তাই বিশেষ কোনো নারী নয়, সামগ্রিকভাবে সমগ্র নারীসমাজ বিদ্যাসাগরকে বিধবাবিবাহ প্রবর্তনে প্রেরণা দিয়েছিল। বিধবাবিবাহ প্রচলনে বিদ্যাসাগরের অক্লান্ত প্রয়াসের পশ্চাতে ছিল নারীজাতির প্রতি তাঁর আত্যন্তিক মমতা, স্নেহ, করুণা।

বিধবাবিবাহের সমর্থনে বিদ্যাসাগর কর্তৃক পরাশরের শ্লোক উদ্ধারে চণ্ডীচরণ 'যে-ভাবে নাটকীয় বর্ণনা দিয়েছেন, বাস্তবের সঙ্গে তার মিল নেই। এমন কি চণ্ডীচরণের গল্পের সঙ্গে বিহারীলালের গল্পের যোগসূত্র নেই। চণ্ডীচরণ যেখানে বলেছেন, বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাগারে পরাশরের শ্লোকটি পেয়েছিলেন; বিহারীলাল সেখানে বলেছেন, বিদ্যাসাগর রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহে অধ্যয়ন-কালে উক্ত শ্লোকটি সংগ্রহ করেছিলেন। চণ্ডীচরণ লিখেছেন, "কালেজের কার্য শেষ করিয়া অপরাহ্ন হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত রাত্রি সংস্কৃত কালেজের পুস্তকাগারে পুস্তকরাশির মধ্যে মগ্ন থাকিতেন এবং গ্রন্থ-কীটের ন্যায় পুঁথির পত্রে পত্রে বিচরণ করিতেন। সন্ধ্যার পর কালেজের নিকটস্থ তাঁহার পরম বন্ধু শ্যামবাবুর বাটী হইতে যৎকিঞ্চিৎ জলখাবার আসিত, কোনোদিন বা ক্ষণকালের জন্য নিজে গিয়া শ্যামবাবুর বাটীতে জলযোগ করিয়া আসিতেন। এইরূপে বহুদিন কাটিয়াছে। শাস্ত্রালোচনায় এইরূপে নিয়ত নিযুক্ত থাকার সময়ে একদিন রাত্রি শেষে একটা বিষয়ে শাস্ত্রার্থের সঙ্গতি নির্ণয় করিতে না পারিয়া ক্ষুণ্ণ মনে বাসায় যাইতেছিলেন, পথে সহসা প্রজ্ঞা দেবীর কৃপা হইল, দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া বুঝিতে পারিলেন, ঐ শ্লোকের অর্থ কিরূপ হইবে। তৎক্ষণাৎ তাড়িত প্রবাহের ন্যায় সেই পরিশ্রান্ত শরীরে ও ক্লিষ্ট মনে নূতন শক্তির সঞ্চার হইল। তিনি গৃহে না গিয়া সংস্কৃত কালেজে আবার ফিরিয়া আসিয়া পরিত্যক্ত শ্লোকের অর্থ লিখিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে শাস্ত্র চর্চা করিতে করিতে রজনী শেষ হইল। প্রভাত সমীরণ মৃদুমন্দ প্রবাহিত হইয়া যখন তাঁহার অঙ্গস্পর্শ করিল, প্রাতঃসূর্যের কোমল কিরণ রেখা সকল যখন গোপন পথে তাঁহার পাঠাগারে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল, তখন তিনি গাত্রোত্থান করিলেন। এতাদৃশী ঐকান্তিকতা না থাকিলে 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন' এইরূপ প্রতিজ্ঞা সহকারে জীবন উৎসর্গ না করিলে কি কেহ কখন কোন কার্যে সিদ্ধমনোরথ হইতে পারে? বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবাজীবনের অবসাদ সন্দর্শনে মর্মাহত হইয়া তাঁহাদের কল্যাণার্থে শরীর ও মনপ্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবন উৎসর্গের অমৃতময় ফল ত্বরায় ফলিল, তিনি শাস্ত্রার্থ সংগ্রহ করিতে করিতে পরাশর সংহিতায় :

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥

মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী ব্রহ্মচর্যে ব্যবস্থিতা।
সা মৃতা লভতে স্বর্গং যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ॥

তিস্রঃ কোট্যোঽর্দ্ধকোটি চ যানি লোমানি মানবে।
তাবৎ কালং বসেৎ স্বর্গং ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি॥

এই শ্লোক তিনটি দেখিতে পাইলেন। এই শ্লোক দেখার সঙ্গে সঙ্গে—ইহার অর্থ সঙ্গতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হৃদয়ে ও মনে এক বিচিত্র উল্লাস প্রকাশ পাইল। আনন্দে দিশাহারা হইলেন, গ্রন্থ ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, 'পাইয়াছি পাইয়াছি' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, তখন তাঁহার বন্ধুদের কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিলেন 'কি পাইয়াছ?' বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রস্ফুটিত কমলসদৃশ মুখ-ভঙ্গিমায় উত্তর দিলেন, 'যাহার জন্য এতদিন এত ক্লেশ ভোগ করিতেছিলাম আজ তাহা পাইয়াছি—পাইয়াছি।'" ('বিদ্যাসাগর'; পৃঃ ১৯৪-১৯৫)

অর্থাৎ একদিন তিনি সংস্কৃত কলেজের লাইব্রেরীতে সারারাত একাকী বসে শাস্ত্র-অধ্যয়ন করছিলেন। ভোরবেলায় তিনি হঠাৎ পরাশর সংহিতায় উক্ত শ্লোকটি দেখতে পেয়ে 'পাইয়াছি' বলে চীৎকার করে উঠেছিলেন। তাঁর চীৎকার শুনে তাঁর বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করেছিলেন তিনি কি পেয়েছেন? বিদ্যাসাগর উত্তর দিয়েছিলেন, এতদিন ধরে তিনি যা পাওয়ার জন্য পরিশ্রম করছিলেন, তিনি তা পেয়েছেন। কিন্তু চণ্ডীচরণের এই গল্প দুটি কারণে বিশ্বাসযোগ্য নয়। প্রথমত, তিনি সংস্কৃত কলেজের লাইব্রেরীতে যখন সারারাত একাকী বসে শাস্ত্র অধ্যয়ন করছিলেন, তখন তাঁর কোনো বন্ধু তাঁর পাশে ছিল না। কিন্তু শ্লোকটি পাওয়ার পরে ভোরবেলায় তাঁর বন্ধুরা কোথা থেকে ঐ সময়ে সংস্কৃত কলেজের লাইব্রেরীতে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন? দ্বিতীয়ত, পরাশরের উক্ত শ্লোকটি তিনি ১৮৪২ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসের 'বেঙ্গল স্পেক্‌টেটর' পত্রিকায় দেখে-ছিলেন। সুতরাং বারো বছর পরে হঠাৎ উক্ত শ্লোকটিকে আবিষ্কারের প্রশ্ন ওঠে না।

বিহারীলালের কাহিনীতে গল্পের গরু গাছে ওঠেনি, কাহিনী-রচনাকালে তিনি যুক্তি-পরম্পরা বজায় রেখেছেন। তিনি লিখেছেন, "রাজকৃষ্ণবাবু বলেন: '১২৬০ সালের বা ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দের শেষভাগে একদিন রাত্রিকালে বিদ্যাসাগর মহাশয় ও আমি একত্র বাসায় ছিলাম। আমি পড়িতেছিলাম। তিনি একখানি পুঁথির পাতা উল্টাইতেছিলেন। এই পুঁথিখানি পরাশর সংহিতা। পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে হঠাৎ তিনি আনন্দবেগে উঠিয়া পড়িয়া বলিলেন,—'পাইয়াছি, পাইয়াছি।' আমি জিজ্ঞাসিলাম,—'কি পাইয়াছ?' তিনি তখনই পরাশর সংহিতার সেই শ্লোকটি আওড়াইলেন,—

'নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধিয়তে॥'

'বিধবাবিবাহের ইহাই অকাট্য প্রমাণ ভাবিয়া, তিনি তখন লিখিতে বসিয়া ছিলেন। সারা রাত্রি লিখিয়াছিলেন। তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা পরে মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করেন।'" ('বিদ্যাসাগর'; পৃঃ ১৭২-১৭৩)

বিধবাবিবাহ বিষয়ক পুস্তক রচনার ক্ষেত্রে বিহারীলাল কিংবা চণ্ডীচরণ—কারোর বর্ণনাই তথ্যানুগ নয়। পক্ষান্তরে শম্ভুচন্দ্রের বর্ণনা ইতিহাস-সম্মত।

তাঁর গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, পিতামাতার সঙ্গে আলোচনাকালে বিদ্যাসাগর বলেছিলেন যে, বেদ, স্মৃতি, পুরাণ পাঠ করে তাঁর ধারণা হয়েছে যে, বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ। অবশ্য এই আলোচনার পূর্বে সমকালীন সমাজ-জীবনে বিধবাবিবাহের অনুকূলে জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা চলছিল এবং ডিরোজিওপন্থীদের মুখপত্র 'বেঙ্গল স্পেক্‌টেটর' পত্রিকা বিধবাবিবাহ-আন্দোলনে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। বিদ্যাসাগর তাঁর বিধবাবিবাহ বিষয়ক গ্রন্থে পরাশরের যে-শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন, তা বারো বছর পূর্বে, 'বেঙ্গল স্পেক্‌টেটর' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। সুতরাং বিধবাবিবাহ প্রবর্তনে 'বেঙ্গল স্পেক্‌টেটর' পত্রিকার অবদান স্মরণ করলে বিধবাবিবাহ-আন্দোলনে বিদ্যাসাগরের সঠিক অবস্থান নির্ণয় করা সম্ভব হবে।

'বেঙ্গল স্পেক্‌টেটর' পত্রিকার ১৮৪২ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল সংখ্যায় বিধবাবিবাহের সমর্থনে একটি চিঠি প্রকাশিত হয়। চিঠিতে বলা হয়েছে, "যে সকল বিষয়ের সাধারণে সর্ব্বদা আন্দোলন হয় তন্মধ্যে হিন্দু জাতীয় বিধবার পুনর্ব্বিবাহেরও বাদানুবাদ হইয়া থাকে বোধহয় যে উক্ত বিবাহের প্রতিবন্ধক যে সকল শাস্ত্র আছে তাহা অত্যন্ত যুক্তিবিরুদ্ধ, কারণ পুরুষ যদি স্ত্রীর মরণান্তর পুনর্ব্বিবাহ করিতে পারে তবে স্ত্রী কেন স্বীয় স্বামীর পরলোক হইলে বিবাহকরণে সক্ষমা না হয় এবং উক্ত প্রতিবন্ধকের সবলতায় কেবল পাপ ও ক্লেশের বৃদ্ধি মাত্র। এতদ্বিষয়ের প্রস্তাব বহু বৎসরাবধি হইতেছে কিন্তু সূচনাবধি এতাবৎকাল পর্যন্ত অস্মদ্দেশীয় লোকের দ্বারা তৎপ্রতিবন্ধকের পোষকতায় কিঞ্চিন্মাত্র প্রকাশিত হয় নাই অতএব বোধহয় যে তৎপ্রতি তাঁহারদিগের দ্বেষের ক্রমশঃ শেষ হইতেছে এবং কিঞ্চিৎ কালাতীতে নিঃশেষ হইতে পারে কিন্তু যে পর্যন্ত উক্ত প্রতিবন্ধকে সম্পূর্ণরূপে অনাস্থা হইয়া নূতন রীতির সংস্থাপন না হয় তদবধি আমরা তদাবশ্যকতার নিমিত্তে বারম্বার অনুশীলন করিতে নিবৃত্ত হইব না। ..."

'বেঙ্গল স্পেক্‌টেটর' পত্রিকা ১৮৪২ সালের জুলাই মাসে লিখেছে : "...What other *Shastrical* objections can there be to the commencement of the re-marriage of Hindu widows ? It has been shown by our correspondent that it obtained in ancient times and is still prevalent among the lower orders of our countrymen in some parts of India.

"The *impropriety* and *mischievousness* of the prohibitions against the continuance of the practice in the Coli Yug have already been demonstrated, and we are now rejoiced to find that their *legality* is questionable.

"In 1756 Rajah Rajbullub Roy Bahadoor of Dacca, wishing to have his daughter, who had become a widow, married again,

applied to the learned Pundits of Dravira, Telinga, Benares, Mithila. etc. to communicate to him their opinion on the subject, which they unanimously expressed in the following words :

'গতে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎস্থ নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥'

"Women are at liberty to marry again if their husbands be not heard of, die, retire from the world, prove to be eunuchs or become *patitas*..."

১৮৪২ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে 'বেঙ্গল স্পেক্‌টেটর' পত্রিকা হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহের নিষেধ খণ্ডন করে লিখেছে : "হিন্দু জাতীয় বিধবার পুনর্ব্বিবাহের নিষেধ এইরূপে খণ্ডিত হওয়াতে এক্ষণে কেহ এমত প্রস্তাব করিতে পারেন যে কলিযুগে ঔরস ও দত্তক পুত্র ভিন্ন অন্য কোন পুত্রের ধনাধিকার নাই অতএব পুনর্ভূ বিবাহ পুনঃস্থাপিত হইলে তৎপুত্রের ধনাধিকারার্থ গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রার্থনীয়, তাহাতে আমারদিগের বিবেচনায় এই বোধ হয় যে এতদ্রূপ প্রার্থনা অস্মদাদির পক্ষে শ্রেয়স্করী নহে যেহেতু তাহা হইলে আমাদিগের ধর্ম্মাধর্ম্ম বিষয়ে যে যৎকিঞ্চিৎ স্বাধীনতা আছে তাহাও এই দৃষ্টান্ত বলে ক্রমশ গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক উচ্ছিন্ন হইবেক।..."

১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দের ১৫ জানুয়ারির 'বেঙ্গল স্পেক্‌টেটর' পত্রিকায় প্রকাশিত অন্য একটি চিঠিতে বলা হয়েছে : "হিন্দু বিধবাদিগের পুনর্ব্বিবাহের কল্পনা ধর্ম্ম সংক্রান্ত ব্যাপার এ নিমিত্তে কেহ ২ কহেন যে গবর্ণমেণ্ট তৎপ্রতি হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না কিন্তু আমার বিবেচনায় এ আপত্তি করা ভাল বোধ হয় না কারণ উক্ত বিবাহের বিধায়ক শাস্ত্র ঝটিতি পাওয়া যায় না যদি মিলে তথাপি বিচারস্থলে তাহা গ্রাহ্য হওয়া ভার অতএব এ বিষয়ে দেশাধিপের সহায়তা ব্যতিরেকে আমাদিগের দ্বারা কি কার্য্য হইতে পারে? আমাদিগের ভাল করণের সমস্ত ক্ষমতা দেশাধিপতি মহাশয়েরা হস্তগত করিয়াছেন তদ্বিষয়ে আমাদিগের কোন ক্ষমতা নাই অতএব আমাদিগের সুখবৃদ্ধির প্রার্থনা কেন আমরা তাঁহাদিগের নিকট না করিব?

"এতদ্দেশীয়দিগের ধর্ম্ম বা জনপদীয় বিষয়ের প্রতি গবর্ণমেণ্ট যে হস্তক্ষেপণ করিবেন না এমত কোন লিখিত বা বাচনিক প্রতিজ্ঞা নাই, এবং আমাদিগের পৈতৃকাধিকার যে রূপে রক্ষণাবেক্ষণ হইয়া আসিতেছে তদ্দ্বারাও উক্ত প্রকার প্রতিজ্ঞার কোন সোপান পাওয়া যায় না। অনেক২ প্রাচীন রীতিধর্ম্ম পরিবর্ত্ত করিয়াছি ঐ সকল এইক্ষণে আর চলিত হইবার সম্ভাবনা নাই। জ্ঞান ও সভ্যতার যত বৃদ্ধি হয় ততই লোকেরদের সংস্কারের এবং চরিত্রের ও ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে এবং তৎসমভিব্যাহারে প্রাচীন নিয়মেরও অন্যথা হয়।

"অতএব আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এই উদয় হয় যে যদবধি গবর্ণমেণ্ট উক্ত বিষয়ে আমাদিগের মনোভীষ্ট সিদ্ধ না করেন তদবধি তাহার নিকট প্রার্থনাদি করণে আমাদিগের ক্ষান্ত থাকা অনুচিত।"

ব্রাহ্ম সমাজের প্রথম আচার্য ও বিখ্যাত স্মার্ত পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ বিদ্যাসাগরের পূর্বেই বিধবাবিবাহেব সপক্ষে ব্যবস্থাপত্র দিয়েছিলেন। পণ্ডিত বিদ্যাবাগীশের মৃত্যুর পরে ১৮৪৫ খ্রীস্টাব্দের ১১ মার্চ তারিখের 'Bengal Harkaru and India Gazette' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি চিঠি থেকে জানা যায়: "The liberal *viavustha* which he (রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ—সম্পাদক) recently gave regarding the remarriage of Hindoo widows, on the application of the Bengal British India Society, should rank him at the head of Hindoo reformers." (ইন্দ্র মিত্র : 'করুণাসাগর বিদ্যাসাগর', পৃ: ২৭১) পত্রলেখক পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশকে হিন্দু সমাজ-সংস্কারকদের পুরোভাগে স্থান দিতে চেয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগরের পূর্বে বিধবাবিবাহের পক্ষে যেমন চিঠিপত্র, রচনা ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি বিরুদ্ধবাদীরাও নীরব থাকেননি, তাঁরাও লেখনী ধারণ করেছেন। রামজয় শর্মা ও এগারো জন পণ্ডিতের স্বাক্ষরিত বিধবাবিবাহের বিরোধী পুস্তক 'বিধবাবিবাহ নিষেধ বিষয়ক ব্যবস্থা' ১২৫৩ বঙ্গাব্দে (১৮৪৬ খ্রী:) প্রকাশিত হয়েছে। বিধবাবিবাহের বিরোধিতা করতে গিয়ে তাঁরা উক্ত পুস্তকে লিখেছেন: "স্ত্রীলোকের পুনর্ব্বিবাহে পাতিত্য জন্মে ও দৈবপিতৃ কর্ম্মে অধিকার থাকে না, বধার্হা হয়, বিবাহ সিদ্ধি হয় না, কুল অধম হয়, কুল বিনাশ পায়, সাধুদিগের অনাচরণীয় কর্ম্ম করা হয়, এবং তাহা অনাদি ধর্ম্ম নয়, ও বিদ্বানের দিগের অনাদরণীয়, এজন্য তাহা সর্ব্বদেশ সর্ব্বজাতি সর্ব্বকুলের বিরুদ্ধ ও বেশ্যার ন্যায় ধর্ম্ম সেই হেতুক সাধুরা স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বিবাহ বিষয়ে কখন পোষকতা করিবেন না এই ব্যবস্থাই অতি সাধু ও সৎসম্মত ইতি।" (ইন্দ্র মিত্র : 'করুণাসাগর বিদ্যাসাগর', পৃ: ২৭২)

বিধবাবিবাহের সমর্থনে বিদ্যাসাগরের পুস্তক প্রকাশের পূর্বে বিধবাবিবাহের সপক্ষে শাস্ত্রীয় যুক্তি প্রদর্শিত হয়েছিল এবং বিরুদ্ধবাদীরা তাতে আতঙ্কিত হয়েছিলেন। এ সময়কার ইতিহাস লিখেছেন শিবনাথ শাস্ত্রী। তিনি বলেছেন, "অনেকের সংস্কার আছে, পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ই সর্ব্বপ্রথমে বঙ্গসমাজে বিধবা বিবাহের বিচার উপস্থিত করেন। কিন্তু বোধ হয় তাহা ঠিক নহে। ১৮৪২ সাল হইতে রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ ডিরোজিও শিষ্যগণ যে 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' নামক কাগজ বাহির করিতে আরম্ভ করেন, তাহাতে তাঁহারা বিধবা বিবাহের বৈধতা বিষয়ে বিচার উপস্থিত করেন। কয়েক মাস ধরিয়া ঐ পত্রে উক্ত বিচার চলিয়াছিল। এমন কি 'নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে' ইত্যাদি যে পরাশর

বচনের উপরে ভিত্তি স্থাপন করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় বঙ্গীয় পণ্ডিত-মণ্ডলীর সহিত তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা সর্বপ্রথমে উক্ত পত্রে বিচারের মধ্যে উদ্ধৃত করা হয়।” (শিবনাথ শাস্ত্রী : ‘রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ’, পৃঃ ১৬৬)

‘বেঙ্গল স্পেক্‌টেটর’ পত্রিকায় যখন বিধবাবিবাহের অনুকূলে জনমত গঠনের চেষ্টা হচ্ছে, তখন বিদ্যাসাগর ছাত্র নন ; শিক্ষা গ্রহণের শেষে তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে চাকরি করছেন। ১৮৪১ খ্রীস্টাব্দের ২৯ ডিসেম্বর তারিখে তিনি এই কলেজের প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হয়েছেন। উদারনৈতিক ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছে এবং তাঁদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে। স্বাভাবিক-ভাবেই তিনি বিধবাবিবাহের পক্ষে ও বিপক্ষের লেখাগুলি পড়েছেন এবং ‘বেঙ্গল স্পেক্‌টেটর’ পত্রিকায় উদ্ধৃত ‘গতে মৃতে প্রব্রজিতে…’ শ্লোকটির প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। এখানে অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে তিনি এই শ্লোকটির সম্পর্কেও বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। সুতরাং চণ্ডীচরণ ও বিহারীলাল যেভাবে বিদ্যাসাগর কর্তৃক পরাশর সংহিতা থেকে উক্ত শ্লোকটি উদ্ধারের গল্প বলেছেন, তা সত্য নয়। সম্ভবত সেকারণেই শম্ভুচন্দ্র তাঁর গ্রন্থে পরাশরের শ্লোক সম্পর্কে কোনো গল্প-কথা শোনাননি। তিনি লিখেছেন : “অগ্রজ মহাশয়, সবিশেষ যত্ন সহকারে এ বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এবং কয়েক মাস দিবারাত্র পরিশ্রম সহকারে সমস্ত ধর্মশাস্ত্র আদ্যোপান্ত অবলোকন করিয়া, যথাসাধ্য চেষ্টা করতঃ সাধারণের গোচরার্থে খৃঃ ১৮৫৫ সালে বা সম্বৎ ১৯১২ সালের কার্তিক মাসে বঙ্গভাষায় অনুবাদসহ বিধবাবিবাহের ব্যবস্থা-পুস্তক প্রচার করেন।” (পৃঃ ৮২) শম্ভুচন্দ্রের এই উক্তি অতিরঞ্জিত নয়। পিতামাতার সঙ্গে আলোচনার পূর্বেই বিদ্যা-সাগর বেদ, স্মৃতি, পুরাণ সহ তৎকালীন পত্র-পত্রিকা পাঠ করে জেনেছিলেন যে, বিধবাবিবাহ শাস্ত্রানুমোদিত এবং সেই বিষয়ে ‘বেঙ্গল স্পেক্‌টেটর’ পত্রিকা ছিল তাঁর কাছে আলোক-দিশারী। কিন্তু পিতৃ-আদেশের পরে তিনি সমগ্র শাস্ত্র অধ্যয়ন করে জানতে চেয়েছিলেন যে, বিধবাবিবাহ নিষেধ বিষয়ক শ্লোক কোনো শাস্ত্রে আছে কিনা এবং বিধবাবিবাহের সমর্থনে পরাশরের উক্ত শ্লোক ছাড়া আর কোনো শ্লোক পাওয়া যায় কিনা। এই বিষয়ে দৃঢ় নিশ্চিত হয়ে বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহের সমর্থনে পুস্তক রচনায় অগ্রসর হয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগরের চিরকালের জন্য জন্মভূমি বীরসিংহ ত্যাগ করার মর্মান্তিক দুঃখ-দায়ক ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে চণ্ডীচরণ যেভাবে রণংদেহি মনোভাব নিয়ে শম্ভুচন্দ্রের সঙ্গে মসীযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছেন, তাতে তাঁর গ্রন্থে জন্মভূমি ত্যাগ করার জন্য বিদ্যাসাগরের ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ের রক্তক্ষরণ অনুভব করা যায় না। অথচ যে-বিধবাবিবাহের (ক্ষীরপাই-নিবাসী মুচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিধবাবিবাহ) জন্য বিদ্যাসাগর জন্মভূমি ত্যাগ করেছিলেন, সেই বিধবাবিবাহে কেন কি কারণে

বিদ্যাসাগর আপত্তি করেছিলেন, বিধবাবিবাহ-প্রবর্তনে বলিষ্ঠ ও দৃঢ় মানসিকতার পরিচয় দিয়ে এক্ষেত্রে তিনি কেন পিছু হঠেছিলেন, নারীর দুঃখ-দুর্দশা দেখে যাঁর হৃদয় কেঁদে আকুল হতো, তিনি কেন অসহায়া বিধবা কন্যা মনোমোহিনী দেবীর প্রতি নির্দয়তার পরিচয় দিয়েছিলেন, তাঁর আপত্তি করা কি যুক্তিসঙ্গত কাজ হয়েছিল, গ্রাম্যসমাজের ভয়ে কি তিনি দেশাচারের কাছে নতি স্বীকার করেছিলেন, অর্থাভাবের জন্যই কি তিনি বালবিধবা মনোমোহিনীর বিবাহ দিতে অক্ষম হয়েছিলেন, বিদ্যাসাগরের নির্দেশে কেন আশ্রিতা বিধবা জননী ও বাল বিধবা কন্যাকে বাড়ি থেকে বহিষ্কৃত করা হয়েছিল, বিদ্যাসাগরের তীব্র আপত্তি সত্ত্বেও বিধবাবিবাহের অনুষ্ঠান করা কি অমানবিক কাজ হয়েছিল, কেন তাঁর ভাই অথবা ভাইয়েরা এবং আত্মীয়েরা বিদ্যাসাগরের অজ্ঞাতসারে মনোমোহিনীর পুনর্বিবাহ দিয়েছিলেন—এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর না খুঁজে কোন্ ভাই বিদ্যাসাগরের তীব্র আপত্তি সত্ত্বেও উক্ত বিধবাবিবাহ দিয়ে বিদ্যাসাগরের অসম্মান ঘটিয়েছিলেন, দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন অথবা শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন এককভাবে অথবা সম্মিলিতভাবে এই বিধবাবিবাহের জন্য দায়ী ছিলেন এবং এই বিধবাবিবাহের সূত্র ধরে বিদ্যাসাগরের পুত্র নারায়ণ বিদ্যারত্নের বিধবাবিবাহের বিষয়ে কেন শম্ভুচন্দ্র আপত্তি করেছিলেন—এই সমস্ত প্রশ্ন তুলে চণ্ডীচরণ শম্ভুচন্দ্রের সঙ্গে দ্বৈরথ সমরে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

মুচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিধবাবিবাহের সঙ্গে নারায়ণ বিদ্যারত্নের বিধবাবিবাহের কোনো সম্পর্ক ছিল না। বিদ্যাসাগর মুচিরামের বিধবাবিবাহে বিরোধিতা করেছিলেন এবং জন্মভূমি ত্যাগ করেছিলেন; পুত্র নারায়ণের বিধবাবিবাহে তিনি সোৎসাহে সমর্থন করেছিলেন এবং স্বয়ং বিবাহানুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি দুষ্কর্মের জন্য পুত্রকে ত্যাগ করলেও পুনর্বিবাহিতা পুত্রবধূ ভবসুন্দরীকে ত্যাগ করেননি, তাঁর জন্য আজীবন মাসিক বৃত্তির বন্দোবস্ত করেছিলেন। মুচিরাম ও নারায়ণের বিবাহ একই সময়ে ঘটেনি; ভিন্ন সময়ে ঘটেছিল এবং এই দু'টি ঘটনার মধ্যে কোনো সম্পর্কও নেই, তাসত্ত্বেও বিদ্যাসাগরের জীবন-কাহিনী লিখতে গিয়ে নারায়ণের বিধবাবিবাহ প্রসঙ্গে শম্ভুচন্দ্রকে অকারণে আক্রমণ করার জন্য ব্যক্তিবিদ্বেষ প্রকাশিত হওয়ায় চণ্ডীচরণের গ্রন্থের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

কিন্তু বিহারীলাল বিধবাবিবাহ-প্রবর্তনের বিরোধী এবং বিদ্যাসাগরের রক্ষণশীল সমালোচক হলেও একটি বিশেষ বিধবাবিবাহের কারণে বিদ্যাসাগরের চিরকালের জন্য জন্মভূমি বীরসিংহ ত্যাগের ঘটনায় উল্লসিত হননি, কিংবা এই দুঃখজনক ঘটনার জন্য কে বা কারা দায়ী তা নিয়ে কাদা ছোঁড়াছুঁড়িতে লিপ্ত হননি; উপরন্তু, নারায়ণের বিধবাবিবাহের প্রস্তাবে বিরোধিতার জন্য শম্ভুচন্দ্রকে সমর্থন করেননি। তিনি এই দুটি ঘটনাই সংযত ভাষায় তাঁর গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে গ্রন্থের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। সুতরাং একশো বাইশ বছরের পূর্ববর্তী মুচিরামের

বিধবাবিবাহের ঘটনায় বিদ্যাসাগরের ভূমিকার সঠিক ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করতে হলে শম্ভুচন্দ্র, চণ্ডীচরণ ও বিহারীলাল তাঁদের গ্রন্থে এই বিষয়টি কিভাবে উপস্থিত করেছেন, তা জানা প্রয়োজন।

শম্ভুচন্দ্র ১২৯৮ বঙ্গাব্দে লিখেছেন: "সন ১২৭৬ সালের আষাঢ় মাসে বীরসিংহায় একটি বিধবা ব্রাহ্মণকন্যার পাণিগ্রহণ-কার্য সমাধা হয়। বর শ্রীমুচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, নিবাস ক্ষীরপাই; তৎকালে বর কেঁচ্‌কাপুর স্কুলের হেড্‌ পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত ছিলেন। কন্যা শ্রীমতী মনোমোহিনী দেবী, নিবাস কাশীগঞ্জ। অগ্রজমহাশয় বাটী আগমন করিলে পর, ক্ষীরপাই গ্রামের সম্ভ্রান্ত লোক হালদার মহাশয়েরা অগ্রজের নিকট আসিয়া বলেন যে, 'মুচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের ভিক্ষাপুত্র, ইনি বিধবাবিবাহ করিলে আমরা অতিশয় দুঃখিত হইব।' হালদার বাবুরা অতি কাতরতা পূর্বক বলিলে, দাদা তাঁহাদিগকে উত্তর করেন, 'আপনাদের অনুরোধে আমি এই বিবাহের কোন সংস্রবে থাকিব না। আপনারা উভয়কে উপদেশপ্রদান-পূর্বক সমভিব্যাহারে লইয়া যান। উঁহারা উভয়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কলিকাতা গিয়াছিলেন; তথা হইতে আসিয়া এখানে যে রহিয়াছেন, তাহা আমি জানিতাম না; শম্ভুর নিকট শুনিলাম, ইঁহারা কলিকাতায় গিয়া নারায়ণের পত্র লইয়া এখানে আসিয়া, শম্ভুকে ঐ পত্র দিয়াছেন। তাহাতেই সে ইহাদিগকে বাটিতে রাখিয়া, ইহাদের বিবাহের উদ্যোগ পাইতেছে। অদ্য আপনাদের সম্মুখেই বিদায় করা হইবে।' কিয়ৎক্ষণ পরে উহারা বাটী হইতে বহিষ্কৃত হইল বটে, কিন্তু উহারা হালদারদের অবাধ্য হইল। বীরসিংহাস্থ কয়েকজন প্রাচীন লোক, মধ্যমাগ্রজ দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন, রাধানগরনিবাসী কৈলাসচন্দ্র মিশ্র প্রভৃতি উহাদিগকে আশ্রয় দিয়া, বাটীর অতি সন্নিহিত অপর এক ব্যক্তির বাটীতে রাখিয়া, উহাদের বিবাহ-কার্য সমাধা করেন। এই বিবাহে অগ্রজ, আন্তরিক কষ্টানুভব করেন এবং প্রকাশ করেন, 'গতকল্য ক্ষীরপাই গ্রামের হালদারদিগকে বলিয়াছিলাম যে, আমি এই বিবাহের কোনও সংস্রবে থাকিব না। কিন্তু তোমরা তাঁহাদের নিকট আমাকে মিথ্যাবাদী করিয়া দিবার জন্য, এই গ্রামে এবং আমার সম্মুখস্থ ভবনে বিবাহ দিলে। ইহাতে আমার যতদূর মনঃকষ্ট দিতে হয়, তাহা তোমরা দিয়াছ। যদিও তোমাদের একান্ত বিবাহ দিবার অভিপ্রায় ছিল, তাহা হইলে ভিন্ন গ্রামে লইয়া গিয়া বিবাহ দিলে, এরূপ মনঃকষ্ট হইত না। যাহা হউক, আমি তাহাদের নিকট মিথ্যাবাদী হইলাম।' কনিষ্ঠ সহোদর ঈশানচন্দ্র উত্তর করিলেন, 'উক্ত হালদার বাবুদের সমক্ষে আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, শাস্ত্রানুসারে এই

বিবাহ দেওয়া বিধেয় কি না ? তাহাতে আপনি উত্তর করিলেন, 'ইহা শাস্ত্রসম্মত ও ন্যায়ানুগত বলিয়া আমি স্বীকার করি ; কিন্তু হালদার বাবুদের মনে দুঃখ হইবে।' ইহাতে ঈশান-ভায়া উত্তর করিলেন, 'লোকের খাতিরে, এই সকল বিষয়ে পরাঙ্মুখ হওয়া ভবাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে দূষণীয়।' ইহা শুনিয়া অগ্রজ মহাশয় ক্রোধভরে বলিলেন, 'অদ্য হইতে আমি দেশ পরিত্যাগ করিলাম।' তিনি কয়েকদিবস দেশে অবস্থিতি করিয়া বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, রাখাল-স্কুল, বালিকা-বিদ্যালয়, দেশস্থ ও বিদেশস্থ লোকের ও বিধবাবিবাহকারীদের মাসহারা প্রভৃতির বন্দোবস্ত করিয়া, কলিকাতা প্রস্থান করিলেন।" ('বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত' ; পৃঃ ১৪৭-১৪৮)

চণ্ডীচরণ ১৩০২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত ক্ষীরপাই গ্রামনিবাসী মুচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিধবাবিবাহের প্রসঙ্গ লিখতে গিয়ে শম্ভুচন্দ্রের ভূমিকা সম্পর্কে মন্তব্য করায় শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন ১৩০২ বঙ্গাব্দে লিখেছেন 'ভ্রমনিরাস' অর্থাৎ "শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'বিদ্যা-সাগর' নামক নূতন জীবনচরিত্রের ভ্রমনিরাকরণ। শ্রী শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত ও প্রকাশিত।" চণ্ডীচরণ তাঁর গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে শম্ভুচন্দ্রের 'ভ্রমনিরাকরণ' প্রচেষ্টার উত্তর দিয়েছেন। মুচিরামের বিধবাবিবাহ সম্পর্কে চণ্ডীচরণের বক্তব্যসহ শম্ভুচন্দ্রের 'ভ্রমনিরাকরণ' প্রয়াস সম্পর্কে তাঁর উত্তর এখানে উদ্ধৃত হোল : "ক্ষীরপাইনিবাসী মুচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তি, মনোমোহিনী নাম্নী একটি বিধবা কন্যার পাণিগ্রহণেচ্ছু হইয়া কলিকাতায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শরণা-পন্ন হন। (১৬) তদনুসারে বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই বিবাহ সমাপন মানসে বাটী গমন করেন। তিনি বাটী পৌছিলে ক্ষীরপাইবাসী হালদার মহাশয়েরা এবং অন্যান্য অনেক সম্ভ্রান্ত লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মুচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবাহ বিষয়ে নিরপেক্ষ থাকিতে অনুরোধ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় সহজে এরূপ ভাবে এক ব্যক্তিকে সহায়তা হইতে বঞ্চিত করিতে সম্মত হইবার লোক ছিলেন না। কিন্তু যাঁহারা ইতিপূর্বে বহুবার বিধবাবিবাহের অনুষ্ঠানে সহায়তা করিয়াছেন, এরূপ বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত লোক বহুবিধ কারণ দর্শাইয়া এই কার্যের সহায়তায় বিরত থাকিতে বহু সাধ্য সাধনা করায়, অগত্যা বিদ্যাসাগর মহাশয় ঐ বিবাহে কোনো সংস্রব রাখিবেন না বলিয়া অঙ্গীকার করেন। সমাগত ভদ্রমণ্ডলী হৃষ্টচিত্তে স্ব-স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। এই সম্বন্ধে সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখিয়াছেন : 'বীরসিংহের কয়েক জন প্রাচীন, দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন মধ্যমাগ্রজ, রাধানগর নিবাসী কৈলাসচন্দ্র মিশ্র প্রভৃতি উহাদিগকে (বর কন্যাকে) আশ্রয় দিয়া (বিদ্যাসাগরের) বাটীর অতি সন্নিহিত অপর এক ব্যক্তির বাটীতে রাখিয়া উহাদের বিবাহ কার্য

১৬ ১২৭৬ সালের আষাঢ়ে এইটি ঘটিয়াছিল।

সমাধা করেন।' (১৭) আমাদের বক্তব্য এই যে, 'বীরসিংহের কয়েকজন প্রাচীন' কি এক দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন? আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি যে, সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন উক্ত প্রাচীন মণ্ডলীর একজন প্রধান ছিলেন। এমন কি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনভিমতে ও অজ্ঞাতসারে। তাঁহার বাটীর সম্মুখস্থ বাটীতে মুচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবাহ দিবার সাহস বিদ্যারত্ন ভিন্ন অন্য কাহারও সম্ভবপর ছিল না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এতদূর অগ্রসর হইতে সাহসী হওয়া যেমন তেমন লোকের পক্ষে সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। আর অগ্রজানুগত বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সহায়তা না থাকিলে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনভিপ্রেত কার্য বীরসিংহে সহজে সম্পন্ন হইতে পারিত না। আমরা বীরসিংহ হইতে যে সংবাদ আনিয়াছি, তাহাতে প্রকাশ যে, শম্ভুচন্দ্রই উদ্যোগী হইয়া বিবাহ দিয়াছিলেন। (১৮) উদ্যোগকর্তাদের অগ্রণী হইয়া, মৃত মধ্যমাগ্রজের স্কন্ধে সমগ্র দোষভাগ অর্পণ করা বিদ্যাসাগর-সহোদরের পক্ষে ভাল হয় নাই। বিদ্যারত্ন মহাশয় স্বরচিত বিদ্যাসাগর-চরিতে বলিতেছেন: 'এই বিবাহে অগ্রজ আন্তরিক কষ্টানুভব করেন, তোমরা তাঁহাদেরই নিকট আমাকে মিথ্যাবাদী করিয়া দিবার জন্য এই গ্রামে এবং আমার সম্মুখস্থ ভবনে বিবাহ দিলে।' (১৯) বিদ্যাসাগর মহাশয় এই ঘটনায় এরূপ দারুণ মর্মবেদনা পাইয়াছিলেন যে, সে রাত্রিতে অনাহারে থাকিয়া বিবাহের পরদিন প্রাতঃকালে অনাহারে ক্ষুব্ধচিত্তে প্রিয় জন্মভূমি, সাধের বাড়ি-ঘর চিরদিনের জন্য ত্যাগ করিয়া কলিকাতা যাত্রা করিলেন। আসিবার সময়ে সহোদরদিগকে ও সম্ভ্রান্ত গ্রামবাসীদিগকে বলিয়া আসিলেন, 'তোমরা আমাকে দেশত্যাগী করাইলে।' গদাধর পাল, গোপীনাথ সিংহ প্রভৃতি শম্ভুচন্দ্র কর্তৃক বিশেষ ভাবে অনুরুদ্ধ হইয়াও বিবাহে উপস্থিত হন নাই, বিদ্যাসাগর মহাশয় এ সংবাদে কিঞ্চিৎ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। (২০) স্বদেশবৎসল ও জন্মভূমির সুসন্তান ঈশ্বরচন্দ্রকে গৃহ-বহিষ্কৃত ও চিরনির্বাসিত করিয়া বিদ্যারত্ন মহাশয় প্রভৃতি

---

১৭ সহোদর শম্ভুচন্দ্র নিজ প্রণীত জীবন চরিতের ২০৪ পৃষ্ঠায় মৃত দীনবন্ধুর স্কন্ধে ঐ অপ্রিয় ব্যাপারের সমগ্র দোষ ভাগ অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। বর্তমান গ্রন্থে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দেশ ত্যাগের প্রকৃত কারণ ও তাহাতে তাঁহার তাঁহার নিজের পূর্ণ সংস্রব প্রকাশিত হওয়ায় প্রতিবাদ পুস্তকের (৫১ পৃঃ) দীনবন্ধুকে ত্যাগ করিয়া তাঁহার পুত্র গোপলচন্দ্র ও কনিষ্ঠ সহোদর ঈশানচন্দ্রের উপর সমগ্র ভার চাপাইয়া নিজে দূরে থাকিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

১৮ পাথরা নিবাসী শ্রীযুক্ত গোপীনাথ সিংহ মহাশয়ের উক্তি। তিনি নিজে বর্তমান এবং নিজে আমার নিকট সাক্ষ্য দিয়াছেন।

১৯ শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত জীবনচরিত, ২০৪ পৃঃ।

২০ শম্ভুচন্দ্র প্রতিবাদ পুস্তকের ৫৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন: 'আমি বিদ্যাসাগর

বীরসিংহের যে কি অনিষ্ট সাধনই করিয়াছিলেন তাহা বর্ণনায় শেষ হইবার নহে। যে দিন তিনি ম্লানবদনে ও অশ্রুপ্লাবিতবক্ষে জননী জন্মভূমির ক্রোড় শূন্য করিয়া প্রান্তর-প্রান্তে অদৃশ্য হইয়াছিলেন, সেইদিনই বীরসিংহের সর্বনাশ সাধন হইয়াছিল। এই অপকর্মের অনুষ্ঠাতৃগণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হৃদয়ে যে কি তীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহা বুঝাইবার নহে। তাহার কিঞ্চিন্মাত্র তাঁহারই উক্তিতে প্রকাশ পাইবে। শেষ দশায় কলিকাতায় অবস্থান কালে যখন ক্ষুদ্র পল্লী বীরসিংহের গ্রাম্য চিত্র সকল তাঁহার স্মৃতি-পথে উদিত হইত, তখন প্রাণটি দেহ ত্যাগ করিয়া স্মৃতি-শিবিকারোহণে বীরসিংহ অভিমুখে ছুটিত, তখন অজস্রধারে অশ্রু বর্ষণ করিতেন, এরূপ অশ্রুজল আমরা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি। অশ্রুপাত করিয়া দারুণ মনঃক্ষোভের পরিচায়ক দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিতেন, 'আর সব শেষ হইয়াছে।' এই সময়ে একবার 'বীরসিংহ-জননীর পত্র' বলিয়া একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা তাঁহার হস্তগত হয়। সেই পুস্তকান্তর্গত কাতরতার ভাবে তাঁহার কোমল হৃদয় আর্দ্র হয়; বহুক্ষণ ক্রন্দন করিয়া বাটী যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। তদনুসারে বাটীর মেরামত কার্যও আরম্ভ হয়, কিন্তু ক্রমে পীড়ার বৃদ্ধি হওয়ায় আর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের ও জন্মভূমি দর্শনের অবকাশ হয় নাই।" ('বিদ্যাসাগর'; পৃঃ ৩৫৫-৩৫৭)

শম্ভুচন্দ্র চণ্ডীচরণের ভ্রমনিরাকরণার্থে 'ভ্রমনিরাস' (চিরায়ত সংস্করণ) গ্রন্থে লিখেছেন: "মুচিরামের বিবাহে বিদ্যাসাগরের দেশ পরিত্যাগ সম্বন্ধে পাথরা গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত গোপীনাথ সিংহের প্রমুখাৎ অবগত হইয়া চণ্ডীবাবু যাহা লিখিয়াছেন তাহা ভ্রান্ত। বক্তা পাথরা নিবাসী গোপীনাথ সিংহের কথাগুলি কতদূর গ্রহণীয় তাহা চণ্ডীবাবুর বিবেচনা করা উচিত ছিল। এস্থলে গোপীনাথ সিংহের পরিচয় দেওয়া উচিত, ইনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্টেটের একজিকিউটার শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষীরোদনাথ সিংহের পিতা।

"বীরসিংহা হইতে সংবাদ লইয়া চণ্ডীবাবু যে সকল লিখিয়াছেন, সে সমস্ত নিম্নে সমালোচিত হইল।

"চণ্ডীবাবু লিখিয়াছেন, যে ক্ষীরপাই গ্রামের হালদার বাবুরা 'বহুবার বিধবা-বিবাহের অনুষ্ঠানে সহায়তা করিয়াছেন।' ক্ষীরপাই নিবাসী ৺হারাধন চট্টোপাধ্যায়ের বিধবা কন্যার বিবাহসভায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শ্বশুর ৺শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্য মহাশয় গ্রামের প্রধান লোক বলিয়া মালা গ্রহণ করেন এই অপরাধে,

---

মহাশয়ের একান্ত বশীভূত।...অগ্রজ মহাশয়ের অসন্তোষের ভয়ে আমি ঐ বিষয়ে লিপ্ত রহিলাম না এবং বিবাহে যাই নাই।' এসম্বন্ধে আমাদের অধিক বলিবার নাই। গোপীনাথ সিংহ মহাশয় এখনও বর্তমান। তিনি নিজে আমাদিগকে ঐ কথা বলিয়াছেন।

ঐ গ্রামের সম্ভ্রান্ত হালদার বাবুরা দলের আঁটাআঁটি করিয়া ঐ মালা লওয়া অপরাধে উক্ত শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্যকে প্রায়শ্চিত্ত করান। সুতরাং হালদার বাবুদিগকে বিধবাবিবাহের সহায় বলিয়া সাধারণকে বঞ্চনা করিয়াছেন।

"আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একান্ত বশীভূত। তাঁহার আদেশের বশবর্তী হইয়া পাত্রী মনোমোহিনী দেবীকে নিজ বাটী হইতে বহিষ্কৃতা করিয়া দিলে কনিষ্ঠ সহোদর ঈশানচন্দ্রের ও রাধানগর নিবাসী ৺কৈলাসচন্দ্র মিশ্র মহাশয়ের উপদেশানুসারে দীনবন্ধু ন্যায়রত্নের পুত্র ৺গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পাত্রী মনোমোহিনীকে আমার বাটীর সম্মুখে দুই চারি বিঘা ভূমি তফাতে ৺সনাতন বিশ্বাসের বাটীতে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া রাখেন। অগ্রজ মহাশয়ের অসন্তোষের ভয়ে আমি আর ঐ বিষয়ে লিপ্ত রহিলাম না এবং ঐ বিবাহে যাই নাই। আমি ও রাধানগরের চৌধুরী বাবুদের নায়েব উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বক্ষণ বিদ্যাসাগর অগ্রজের নিকট ছিলাম। আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অভিপ্রায় অনুসারে লোক দ্বারা সনাতন বিশ্বাসকে ডাকাইয়া আনি। সনাতন বিশ্বাস উক্ত মনোমোহিনীকে বাটী হইতে বহিষ্কৃতা করিতে স্বীকার না পাওয়ায় উমেশচন্দ্র সনাতন বিশ্বাসকে বলিলেন, 'তোমরা ইঁহার মাসহারা খাও, একটা কথা শুনিলে না।' তাহাতে সে উত্তর করিল, 'আমরা পুরুষানুক্রমে কৈলাস মিশ্রের বাটীতে চাকরি করিয়া আসিতেছি। তিনি নিজে আমাকে এইমাত্র বলিলেন, তুমি মেয়েটিকে বাটীতে রাখ, কাহারও কথায় বহিষ্কৃত করিও না। আমি কল্য সন্ধ্যার পূর্বে আসিয়া এই বিধবার বিবাহ দিব। আমি কোন মতে তাঁহার কথার অবাধ্য হইতে পারিব না। বরং যে কয়েক টাকা মাসহারা দিয়াছেন তাহা ফেরত দিতে প্রস্তুত আছি।' এই বলিয়া সনাতন বিশ্বাস চলিয়া গেল। ঈশান ও গোপাল চাঁদা করিয়া বিবাহের সমস্ত আয়োজন করিয়া, কৈলাস মিশ্র বিশ্বাসদের বাটীতে উপস্থিত হইলে, দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন প্রভৃতিকে ও গ্রামবাসীদিগকে এবং স্কুলের শিক্ষকদিগকে সন্ধ্যার সময় বিবাহের নিমন্ত্রণ করেন। গদাধর পাল ও অন্যান্য জনকয়েক গ্রামবাসী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অসন্তোষের ভয়ে বিবাহ স্থলে যান নাই। বাকী সকলেই বিবাহ স্থলে গিয়া বিবাহ কার্য সমাধার পর স্ব স্ব আলয়ে প্রতিগমন করেন।

"পরদিন প্রাতঃকালে ঈশানচন্দ্র দাদার নিকট উপস্থিত হইলে দাদা বলিলেন, 'ঈশান তুমি কেন বিবাহ দেওয়াইলে, ইহাতে আমার বড় অপমান হইয়াছে।' ঈশান উত্তর করিল, 'কৈলাস মিশ্র ও আমি গতপরশ্ব আপনাকে যখন জিজ্ঞাসা করিলাম যে, এই বিধবা বিবাহ ন্যায্য কি না?' তাহাতে আপনি উত্তর করিলেন, 'ইহা শাস্ত্রসম্মত ও ন্যায়ানুগত বলিয়া আমি স্বীকার করি, কিন্তু হালদার বাবুদের মনে দুঃখ হইবে।' ইহাতে কনিষ্ঠ সহোদর ঈশানচন্দ্র উত্তর করিলেন, 'লোকের খাতিরে এই সকল বিষয়ে পরাঙ্মুখ হওয়া ভবাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে দূষণীয়।' ইহা

শুনিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় ক্রোধভরে বলিলেন, 'তুই কি এখনও সেইরূপ দুর্মুখ আছিস্ এবং এইরূপই কি চিরকাল থাকিবি?' আরও এইরূপ দুই চারি কথার পর বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, আমি আর দেশে আসিব না।

"বিদ্যাসাগর মহাশয় কয়েক দিবস দেশে অবস্থিতি করিয়া বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, রাখাল স্কুল, বালিকা বিদ্যালয়, দেশস্থ, বিদেশস্থ, সম্পর্কীয় লোকের ও বিধবা-বিবাহকারীদের মাসহারা প্রভৃতির বন্দোবস্ত করিয়া আমার প্রতি পূর্ববৎ ভারার্পণ করিয়া কলিকাতায় আসিলেন। চণ্ডীবাবু! কিরূপে, অনাহারে থাকিয়া ঐ বিবাহের পরদিনেই কলিকাতায় যাইবার কথা লিখিলেন? দাদা যে কয়েক দিন বীরসিংহায় আমার বাটীতে অবস্থিতি করিয়া সকল বিষয়ের বন্দোবস্ত করেন, সে কয়েক দিনের মধ্যে গোপীনাথ সিংহ এক দিনও আমার বাটিতে দাদার নিকট উপস্থিত থাকেন নাই। বিশেষতঃ বহুকাল হইতে ঐ গোপীনাথ সিংহের সহিত আমার সদ্ভাব নাই। তাঁহার নিকট জ্ঞাতি প্রতাপচন্দ্র সিংহ আমার নিকট বিধবা-বিবাহাদি কার্যের পরিচারক ছিল, উহার সহিত গোপীনাথ সিংহের তৎকালে নানা কারণে মনান্তর থাকে। এই জন্যও গোপীনাথ সিংহ আমার বাটীতে আসিতেন না। উহাকে কর্মচ্যুত করিবার জন্য লোক দ্বারা আমাকে বলান, কিন্তু আমি বিনা দোষে বিদ্যাসাগরের রক্ষিত লোককে কর্মচ্যুত করি না। তৎকালীন গোপীনাথ সিংহের প্রতিপক্ষ তাঁহার জ্ঞাতি ৺জুড়ান সিংহ মহাশয়ের দৌহিত্র ৺ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ প্রথম বিধবাবিবাহ সময় হইতে যাবজ্জীবন বিধবাবিবাহ স্থলে উপস্থিত হইতেন, এবং অনেক বিষয়ে অধ্যক্ষতা করিয়া আমাদের শ্রমের যথেষ্ট লাঘব করিতেন। দেশে বিধবাবিবাহ স্থলে ৺জুড়ান সিংহের পৌত্র শ্যামাচরণ সিংহকেও সঙ্গে লইয়া যাইতেন। আমাদের দেশে ঐ সময় পর্যন্ত কখনও কোনও বিবাহস্থলে গোপীনাথ সিংহ উপস্থিত হন নাই। এমন কি বীরসিংহায় রামব্রহ্ম পাঠকের বিবাহস্থলেও উপস্থিত হন নাই। কিন্তু কোন কারণ বশতঃ আপনাকে বিধবাবিবাহের দলভুক্ত বলিয়া মুখে পরিচয় দিতেন। মুচিরামের বিবাহের পর আমার সহিত বিদ্যাসাগর অগ্রজ মহাশয়ের কিরূপ ব্যবহার ছিল, পাঠকবর্গ উদ্ধৃত পত্র সকল পাঠ করিয়া বুঝিতে পারিবেন।

"এস্থলে ইহাও প্রকাশ থাকে যে, মুচিরামের সহিত বিধবা মনোমোহিনী দেবীর পরিণয় কার্য উপলক্ষে অগ্রজ মহাশয় অসন্তোষ প্রকাশ করেন, ঐ বিবাহের সংঘটন কার্য প্রথমতঃ শ্রীযুত নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারা হয়। নারায়ণ এই উপলক্ষে কলিকাতা হইতে আমাকে যে পত্র লেখেন, তাহার মর্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"ক্ষীরপাই-নিবাসী মুচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায় মনোমোহিনী নাম্নী একটি বিধবা কন্যা সঙ্গে করিয়া এখানে বিবাহ করিবার মানসে আসিয়াছিলেন। পিতৃদেব মহাশয় আপাততঃ ইহাদিগকে বাটী যাইতে বলিলেন। পিতৃদেব ত্বরায় বীরসিংহায়

বাটীতে যাইবেন, তথায় যাইয়া যাহা হয় করিবেন। ইহারা ক্ষীরপাই যাইতে ভয় পায়, যেহেতু তথায় অনেকেই বিধবাবিবাহের দ্বেষ্টা। কিন্তু ইহারা আপনাকে না জানাইয়া এখানে আসিয়াছিলেন, এজন্য আমার পত্র সহ আপনার নিকট যাইতেছেন। পিতৃদেব যে পর্যন্ত বাটী না যান, সেই পর্যন্ত যাহাতে ইহারা নিরাপদে থাকিতে পায়, তদ্বিষয়ে ব্যবস্থা করিবেন।" ('ভ্রমনিরাস'; পৃঃ ২২৪ ২২৭)

শম্ভুচন্দ্র উক্ত গ্রন্থে পুনবায় লিখেছেন: "চণ্ডীবাবু আমার ও দীনবন্ধু ন্যায়রত্নের লিখিত পত্রের কোনও কোনও অংশ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার কৃত 'বিদ্যাসাগর' পুস্তকে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তজ্জন্য সাতিশয় দুঃখিত হইলাম। এইরূপে উদ্ধৃত করা ন্যায়সঙ্গত হয় নাই। পাঠকবর্গ সমগ্র পত্র দেখিতে পাইলে সদসদ্বিচার করিতে সমর্থ হইতেন।

"দ্বিতীয়তঃ বিদ্যাসাগর জ্যেষ্ঠাগ্রজ মহাশয় জনকজননী ও সোদরগণ প্রভৃতিকে পত্র লিখিয়াছেন যে, 'নানাকারণে আমার মনে সম্পূর্ণ বৈরাগ্য জন্মিয়াছে। আর আমার ক্ষণকালের জন্যেও সাংসারিক কোন বিষয়ে থাকিতে বা কাহারও সহিত কোন সংস্রব রাখিতে ইচ্ছা নাই।' চণ্ডীবাবু ও তাঁহার লিখিত বীরসিংহার বিশ্বস্ত সাক্ষিগণকে জিজ্ঞাসা করা যায় যে, কেবল ক্ষীরপাই নিবাসী মুচিরামের বিবাহ দরুণ বা অন্য কারণে বিদ্যাসাগরের মনে বৈরাগ্য জন্মিল। যদি কেবল মুচিরামের বিবাহ দরুণ বৈরাগ্যোদয় হইয়া থাকে তাহা হইলে 'নানা কারণে' না লিখিয়া কেবল মুচিরামের বিবাহ দরুণ আমার মনে বৈরাগ্যোদয় হইয়াছে লিখিলেই পর্যাপ্ত হইত।

"চণ্ডীবাবুর বিচারে আমিই যদি মুচিরামের বিবাহ দিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেশত্যাগী করিয়াছি, তাহা হইলে, বিদ্যাসাগর মহাশয় দেশের তাঁহার যাবতীয় কার্যভার আমার হস্তে কেন ন্যস্ত করেন? এবং মুচিরামের বিবাহের পর আমাকেই কেন নানা বিষয়ে পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিতেন? বিবাহ সম্পাদনার্থ কন্যা পাঠাইবার জন্য আমাকেই কেন পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিতেন। প্রকৃত কথা এই যে, মধ্যম সহোদর মকদ্দমায় ফারখৎ করিয়া মাসিক ব্যয় নির্বাহার্থ মাসহারার টাকা গ্রহণ না করায় তাঁহার মনে বড় কষ্ট হইয়াছিল এবং মকদ্দমা দরুণ লোকে নানা কথা কহিত তজ্জন্যই তাঁহার মনে ঐরূপ ভাবের উদয় হইয়াছিল। পরে পিতৃদেব মহাশয়ের ও আমার অনুরোধের বশবর্তী হইয়া মধ্যম সহোদর টাকা লইতে আরম্ভ করিলে পর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মানসিক কষ্ট নিবারণ হয় এবং দেশে যাইবার ইচ্ছা করেন।" ('ভ্রমনিরাস'; পৃঃ ২৩৩-২৩৪)

মুচিরামের বিধবাবিবাহ সম্পর্কে বিহারীলাল 'বিদ্যাসাগর' গ্রন্থে লিখেছেন: "এইবার বড় হৃদয়বিদারক কথা। এই সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় জন্মের মত বীরসিংহ গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসেন। পশ্চাল্লিখিত ঘটনাটি তাঁহার দেশ পরিত্যাগের অন্যতম কারণ।

"ক্ষীরপাইনিবাসী মুচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায় নামে কৈঁচকাপুর স্কুলের হেড পণ্ডিত কাশীগঞ্জবাসিনী মনোমোহিনী নাম্নী এক ব্রাহ্মণ-বিধবাকে বিবাহ করিতে উদ্যোগ করেন। পাত্র-পাত্রী উভয়কেই বীরসিংহ গ্রামে আনয়ন করা হইয়াছিল। সেই সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় বীরসিংহ গ্রামে উপস্থিত ছিলেন। মুচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষীরপাই গ্রামের হালদার-পরিবারের ভিক্ষাপুত্র। হালদারবাবুরা আসিয়া বিদ্যা-সাগর মহাশয়কে বলিলেন,—'মহাশয়! যাহাতে এ বিবাহ না হয়, আপনাকে তাহাই করিতে হইবে।' বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাদের কাতরতা দেখিয়া তাঁহাদিগকে অভয় দিলেন এবং বলিলেন,—'বিবাহ হইবে না, আপনারা উহা-দিগকে লইয়া যাউন।' তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইলেন, কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মধ্যম ভ্রাতা দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন ও গ্রামের অন্যান্য কয়েকজন রজনীযোগে তাঁহাদের বিবাহ-কার্য সম্পাদন করিয়া দেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিতেন না। তিনি প্রাতঃকালে উঠিয়া বাড়ির বারান্দায় বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে অকস্মাৎ শঙ্খধ্বনি শুনিতে পাইলেন; কিন্তু ইহার কিছু ভাব গ্রহণ করিতে পারিলেন না। সেই সময় প্রতিবেশী গোপীনাথ সিংহ তথায় আসিয়া উপস্থিত হন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'শাঁক বাজিতেছে কেন?' সিংহ মহাশয় বলিলেন,—'আপনি জানেন না? মুচিবাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবাহ হইয়া গেল।' শুনিয়া ক্রোধে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বদনমণ্ডল রক্তিমা বর্ণ ধারণ করিল। তিনি আর কোন কথা না কহিয়া, কেবল তামাক টানিতে টানিতে ধূমত্যাগ করিতে লাগিলেন; রাগ হইলে তিনি প্রায়ই এইরূপ করিতেন। রাগ হইলে তিনি অনেক সময় চুপ করিয়া থাকিতেন; বড় একটা কথা কহিতেন না। যদি কোন স্নেহাস্পদ বয়ঃকনিষ্ঠকে 'ইনি', 'উনি', 'বাবু' প্রভৃতি বাক্য প্রয়োগ করিতেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইত, তাঁহার অন্তরে দাবানল প্রধূমিত। যাহাই হউক, বিদ্যাসাগর মহাশয় সিংহ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তুই ইহার কিছুই জানিস্ না?' সিংহ মহাশয় উত্তর দিলেন,—'আপনার দিব্য করিয়া বলিতেছি, আমি ইহার কিছুই জানি না।' তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন,—'আমি ভদ্র-লোকদিগকে কথা দিয়া সত্য রক্ষা করিতে পারিলাম না; অতএব বীরসিংহ পরিত্যাগ করিলাম, আর আসিব না।' বিধবা-বিবাহের সৃষ্টিকর্তা সত্যপ্রিয় বিদ্যাসাগর সত্যভঙ্গ হইল বলিয়া জন্মের মত প্রিয়জন্মভূমি পরিত্যাগ করিলেন। আর তিনি বীরসিংহ গ্রামে গমন করেন নাই; কিন্তু যাহার যেরূপ বৃত্তি বা মাস-হারার বন্দোবস্ত ছিল, তাহা বন্ধ হয় নাই।" ('বিদ্যাসাগর'; পৃঃ ২৯২)

মুচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিধবাবিবাহকে কেন্দ্র করে বিদ্যাসাগরের জন্মভূমি পরিত্যাগ করার মতো দুঃখদায়ক পরিণতি কেন ঘটেছিল এবং বিদ্যাসাগর কেন মুচিরামের বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে হালদারবাবুদের অনুরোধে সম্মতি জ্ঞাপন করেছিলেন, তার যথার্থ উত্তর পেতে হলে জননী ভগবতী দেবী, বিদ্যাসাগর ও

তাঁর সহোদর-আত্মীয়দের ভূমিকা এবং এসময়ে বিদ্যাসাগরের মানসিক ও পারিবারিক অবস্থা কি রকম ছিল, তা জানা প্রয়োজন।

বিদ্যাসাগরের জীবনীগ্রন্থগুলি থেকে জানা যায় যে, "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কর্মত্যাগে (নভেম্বর, ১৮৫৮ খ্রীঃ) তাঁহার পিতামাতা ও পরিবারস্থ অন্যান্য আত্মীয়গণ সকলেই সমধিক চিন্তাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন।" (চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বিদ্যাসাগর' ; পৃঃ ১১৮)। বহুসংখ্যক বিধবার বিবাহানুষ্ঠানের বিপুল ব্যয়ভার বহনের জন্য বিদ্যাসাগর ঋণভারে জর্জরিত হয়ে উঠেছিলেন। ঋণ-পরিশোধের জন্য তিনি সংস্কৃত প্রেস বিক্রি করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন এবং ১২৭৬ সনের ২৬ শ্রাবণ (৯ আগস্ট, ১৮৬৯ খ্রীঃ) তারিখে প্রেসের দুই-তৃতীয়াংশ বিক্রি করে তিনি ঋণের কিছু টাকা পরিশোধ করেছেন। অবশ্য তার পূর্বে মধ্যম সহোদর দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন ১২৭৫ সনের ভাদ্র মাসে সংস্কৃত ছাপাখানা ও সংস্কৃত পুস্তকালয় দাবি করে জ্যেষ্ঠাগ্রজ বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে অসত্য মামলা দায়ের করার জন্য আদালতের সাহায্য নিতে অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁর এই অসত্য দাবিকে কেন্দ্র করে সহোদরদের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয় ; পারিবারিক শান্তি নষ্ট হয়। এসময়ে অর্থাৎ ১২৭৫ বঙ্গাব্দের চৈত্রমাসে (মার্চ, ১৮৬৯ খ্রীঃ) বীরসিংহের বাড়ি অগ্নিকাণ্ডে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হওয়ার সংবাদ শুনে বিদ্যাসাগর কলকাতা থেকে বীরসিংহ গ্রামে এসে কয়েকদিন ছিলেন এবং জননী ও সহোদরদের সুখ ও স্বাচ্ছন্দের দিকে লক্ষ্য রেখে সমস্ত রকমের ব্যবস্থা গ্রহণ করে কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন। ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দে বিদ্যাসাগর মল্লিনাথের টীকা সহ 'মেঘদূত' প্রকাশ করেছিলেন। এসময়ে কলকাতার বাড়িতে থেকে তিনি বিধবাবিবাহ প্রদান, বহুবিবাহ বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদান, বিপুল ঋণভারের অসহ্য যন্ত্রণা, পুস্তক-রচনা, মুদ্রণ, প্রকাশ ও সমাজের নানাবিধ হিতকর কাজে যেমন ব্যস্ত ছিলেন, অন্যদিকে তিনি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ছিলেন। অর্থাৎ ১২৭৬ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে বিদ্যাসাগর স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে কলকাতায় থাকলেও নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করছেন—যদিও তাঁর বাড়িতে মানুষ-জনের আসা-যাওয়ার বিরাম ছিল না। নানাবিধ উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁরা বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। তাঁরা ঐ খর্বকায় মানুষটির কাছ থেকে দয়ার প্রত্যাশী ছিলেন, কিন্তু কেউই তাঁর অন্তর্ঘাতনার সংবাদ রাখেননি ; বাহিরের মানুষদের মতো তাঁর স্ত্রী-পুত্র-সহোদররা কেউই তাঁর অন্তর্বেদনার শরিক হননি। আত্মীয়-পরিজনদের ব্যবহার বিদ্যাসাগরকে মনের দিক থেকে বহুদূরে ঠেলে দিয়েছে।

এসময়ে মুচিরাম বিধবাবিবাহ করার উদ্দেশ্যে বালবিধবা মনোমোহিনীকে সঙ্গে নিয়ে ক্ষীরপাই গ্রাম থেকে কলকাতায় বিদ্যাসাগরের বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়েছেন। বিদ্যাসাগর কলকাতার বাড়িতে আছেন। তাঁর সঙ্গে সম্ভবত মুচিরাম-মনোমোহিনীর সাক্ষাৎ হয়নি ; কারণ বীরসিংহে হালদারবাবুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ-

কালে বিদ্যাসাগর বলেছেন, 'উহারা উভয়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কলিকাতা গিয়াছিলেন; তথা হইতে আসিয়া এখানে যে রহিয়াছেন, তাহা আমি জানিতাম না; শম্ভুর নিকট শুনিলাম, ইহারা কলিকাতায় গিয়া নারায়ণের পত্র লইয়া এখানে আসিয়া, শম্ভুকে ঐ পত্র দিয়াছেন।'

কলকাতায় বিদ্যাসাগরের বাড়িতে পুত্র নারায়ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায় মুচিরাম তাঁকে বিধবাবিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করে সমস্ত ঘটনা বলেছিলেন। তাঁর কথা শুনে নারায়ণ তাঁকে আশ্বস্ত করেন এবং পিতাকে না জানিয়ে তিনি পিতৃব্য শম্ভুচন্দ্রকে এমনভাবে চিঠি লিখেছেন, যাতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, বিদ্যাসাগরের নির্দেশে নারায়ণ মুচিরামেব বিধবাবিবাহের বিষয়ে চিঠি লিখেছেন; সত্য-মিথ্যা মিশিয়ে তিনি চিঠি লিখেছেন, যা চণ্ডীচরণ শম্ভুচন্দ্রের প্রতি বিদ্বেষ ও নারায়ণের প্রতি প্রীতিবশত উপেক্ষা করেছেন। মনোমোহিনীকে সঙ্গে নিয়ে মুচিরাম বীরসিংহ গ্রামে ফিবে শম্ভুচন্দ্রকে নারায়ণের চিঠি দিয়েছেন।

পরবর্তী ঘটনাবলী অনুমান-নির্ভব হলেও তা যুক্তিসিদ্ধ। মুচিরাম কলকাতা ত্যাগ করার পরে নারায়ণ বিদ্যাসাগরকে মুচিরামের বিধবাবিবাহ সম্পর্কিত সমস্ত ঘটনা বলেছিলেন। বিদ্যাসাগর তা শুনে নারায়ণের উপরে প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। কারণ তিনি ভাবতেই পারেননি যে, তাঁর সম্মতি ব্যতিরেকে তাঁর সংসারে কেউ কোনো কাজ করতে সাহসী হতে পারেন কিংবা তাঁর অজ্ঞাতসারে তাঁর নাম ব্যবহার করতে পাবেন। বিদ্যাসাগর আর কলকাতায় থাকেননি, তিনি তাড়াতাড়ি চলে গিয়েছেন জন্মভূমি বীরসিংহ গ্রামে। এসময়ে বিদ্যাসাগবের বীরসিংহে যাওয়ার কোনো কারণ ছিল না। কিন্তু তিনি নারায়ণের আচরণের মধ্যে পিতাকে অস্বীকারের চেষ্টা বলে মনে করেছিলেন। বিদ্যাসাগর কখনো পিতামাতাকে অস্বীকার করেননি। বিধবাবিবাহের সমর্থনে আন্দোলন গড়ে তোলার পূর্বে তিনি পিতামাতার সম্মতি নিয়েছিলেন। তিনি নিজেই বলেছিলেন যে, পিতামাতা অসম্মত হলে তিনি তাঁদের জীবদ্দশায় বিধবাবিবাহ প্রবর্তনে সচেষ্ট হতেন না।

শম্ভুচন্দ্র নারায়ণের চিঠি পাঠ করে সমস্ত বিষয় অবগত হয়ে মুচিরাম-মনোমোহিনীকে ক্ষীরপাই গ্রামে ফেরত না পাঠিয়ে নিজেদের বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছেন; কারণ তাঁরা 'ক্ষীরপাই যাইতে ভয় পায়।' তাঁদের মৃত্যুভয় অমূলক ছিল না। তখন বিধবাবিবাহেচ্ছুক ব্যক্তিরা বিরুদ্ধপক্ষের হাতে প্রহৃত-আহত হতেন। বিদ্যাসাগর বলেছেন যে, 'মফঃস্বলে যাঁহারা এ সংস্কারের জন্য—বিধবা-বিবাহের জন্য—চেষ্টা করিতেছিলেন, তাঁহাদিগকে নানারূপ অস্ত্র বিপদে পড়িতে হইয়াছে; নানারূপ দেওয়ানি-ফৌজদারি মামলায় তাঁহাদিগকে জড়িত হইতে হইতেছে; আহত-প্রহৃত হইতে হইতেছে; কোথাও কোথাও দাঙ্গাহাঙ্গামাদিতেও লিপ্ত হইতে হইতেছে; ইহার প্রতিবিধান আদালত হইতেই করিতে হইতেছে।"
(বিহারীলাল সরকার: 'বিদ্যাসাগর'; পৃঃ ২৭১)

বীরসিংহের নিকটবর্তী চন্দ্রকোণা থানার অন্তর্গত কুমারগঞ্জের বিধবাবিবাহের সমর্থকদের উপরে সশস্ত্র আক্রমণের ঘটনা উল্লেখ করেছেন বিহারীলাল—"মফঃস্বলে বিধবাবিবাহের পক্ষপাতীদিগের তাড়না ও লাঞ্ছনার সীমা ছিল না। জাহানাবাদ মহকুমার চন্দ্রকোণা থানার অন্তবর্তী কুমারগঞ্জে বিধবাবিবাহের পক্ষ ও বিপক্ষের মধ্যে এক সময় খুব সংঘর্ষণ চলিয়াছিল। এতৎসম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বহস্তে ইংরেজিতে এক বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়াছিলেন। তাহার মর্ম এই,—

"কুমারগঞ্জে বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতী দলকে চড়ক পূজায় শিবের মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই। এতৎ সম্বন্ধে পক্ষপাতীদের পক্ষ হইতে জাহানাবাদের ডেপুটী মাজিস্টরকে আবেদন করা হইয়াছিল। তিনি তদন্তের হুকুম দেন। তদন্ত হইয়াছিল উৎসব সাঙ্গ হইবার পর। জমিদার বিধবা-বিবাহে পক্ষপাতীদিগকে প্রহার করিয়া জরিমানা আদায় করিয়াছিলেন। অনেকেই সপরিবারে গ্রাম ত্যাগ করে। পুলিসে সংবাদ দিলেও, পুলিস তদন্তে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতেন।

"এই ঘটনায় বিদ্যাসাগর মহাশয় স্পষ্টতঃই লিখিয়াছিলেন,—

"যদি উৎপীড়ন নিবারণ না হয়, যদি অত্যাচারী দণ্ডিত না হয়, তাহা হইলে আমার এ পৃথিবীতে থাকিবার প্রয়োজন নাই। তাহা হইলে আমার জীবন-ব্রতের উদ্‌যাপন হইবে কিসে? এ ব্রতসাধনেই তো আমি আত্মসমর্পণ করিয়াছি। যদি ব্রত সিদ্ধ না হইল, তাহা হইলে জীবন বৃথা।" ('বিদ্যাসাগর'; পৃঃ ২৮২)

তৎকালীন সামাজিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায় বিদ্যাসাগরের পূর্বোক্ত উক্তিতে। এই অবস্থায় সনাতনপন্থী-রক্ষণশীলদের হিংস্র রক্তলোলুপ থাবার আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করে বিধবাবিবাহের সমর্থনকারীরা বাংলার গ্রামে গ্রামে বিধবাদের পুনর্বিবাহ দিচ্ছিলেন। সুতরাং দীনবন্ধু-শম্ভুচন্দ্র-ঈশানচন্দ্র প্রমুখ বিদ্যাসাগরের সহোদরেরা বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধবাদী ক্ষীরপাইর রক্তপিপাসু হালদারবাবুদের আক্রমণ থেকে প্রাণ বাঁচানোর জন্য মুচিরাম-মনোমোহিনীকে তাঁদের বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিলেন। কিন্তু ক্ষীরপাইর হিংস্র হায়েনারা বীরসিংহের বিদ্যাসাগরের বাড়ির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলেন। তাঁরা বিদ্যাসাগরের বাড়িতে মুচিরাম-মনোমোহিনীর আশ্রয় গ্রহণের সংবাদ যথাসময়ে পেয়েছিলেন। তাঁরা মুচিরাম-মনোমোহিনীকে ধরাধাম থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেবেন বলেই বিদ্যাসাগরের কাছে তাঁদেরকে ফেরত দেবার জন্য আর্জি জানিয়েছিলেন।

অবশ্য উক্ত হালদার মহাশয়দের সম্বন্ধে চণ্ডীচরণ মন্তব্য করেছেন যে, তাঁরা 'বহুবার বিধবাবিবাহের অনুষ্ঠানে সহায়তা করিয়াছেন।' কিন্তু শম্ভুচন্দ্র চণ্ডীচরণের ন্যায় হালদারদের সজ্জন ও বিধবাবিবাহের সমর্থক বলে অভিহিত করেন নি। শম্ভুচন্দ্রের মতের সমর্থন পাওয়া যায় নারায়ণের পূর্বোক্ত চিঠিতে—তাঁরা 'অনেকেই বিধবাবিবাহের দ্বেষ্টা।' হালদারবাবুরা যে বিধবাবিবাহ-বিরোধী

ছিলেন, তা প্রমাণের জন্য শম্ভুচন্দ্র ক্ষীরপাই গ্রামের একটি বিধবাবিবাহের ঘটনা উল্লেখ করেছেন। ক্ষীরপাই নিবাসী হারাধন চট্টোপাধ্যায়ের বিধবা কন্যার বিবাহসভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য হালদারবাবুরা বিদ্যাসাগরের শ্বশুর ও উক্ত গ্রামের প্রধান শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্যকে প্রায়শ্চিত্ত করতে বাধ্য করেছিলেন। হালদার-বাবুরা যে যথার্থ সজ্জন ছিলেন না, গ্রামের নানাবিধ অত্যাচার-উৎপীড়নের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, তা বিহারীলালের গ্রন্থ থেকে জানা যায়। প্রত্যেক বছরে ক্ষীরপাই গ্রামের গাজনের মিছিলে অধিনায়কত্ব করতেন শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্য। সেই মিছিল বন্ধ করার জন্য হালদারবাবুরা শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্যের উপরে আক্রমণ করেছিলেন। 'প্রতিপক্ষের দলপতি হালদার' ও 'দলপতির লোকেরা তাঁহাকে এমনই স্থানে ভয়ঙ্কর রূপে ইষ্টকাঘাত করেন যে, তাহাতে ভট্টাচার্য বড় কাতর হইয়া পড়েন। তখন তাঁহার আত্মীয়েরা তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া বাড়িতে লইয়া আসেন।'—বিহারীলাল সরকার : ('বিদ্যাসাগর' ; পৃঃ ৪৮)

শম্ভুচন্দ্র-চণ্ডীচরণ-বিহারীলালের গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত রচনাংশ থেকে জানা যায় না যে, জননী ভগবতী দেবী উক্ত সময়ে কোথায় ছিলেন—বীরসিংহ গ্রামে অথবা কলকাতায় কিংবা কাশীতে? কিন্তু উক্ত তিনটি গ্রন্থে বর্ণিত সমসাময়িক ঘটনাবলী থেকে জানা যায় যে, ভগবতী দেবী ১২৭৬ সনের আষাঢ় মাসে (জুলাই, ১৮৭০ খ্রীঃ) বীরসিংহে নিজের বাড়িতে ছিলেন। চণ্ডীচরণের গ্রন্থে বলা হয়েছে, "১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দ ১২৭৫ সালের চৈত্র মাসে রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় অগ্নি লাগিয়া বীরসিংহের পৈত্রিক বাসভবন ভস্মীভূত হয়। সেই অগ্নিকাণ্ডের সংবাদ কলিকাতায় পৌঁছিবা-মাত্র বিদ্যাসাগর মহাশয় গৃহে গমন করেন। সকলের সকল প্রকার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া জননীকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় আসিতে চাহিলেন। প্রবীণা গৃহিণী দরিদ্র, নিরাশ্রয়, বিদ্যার্থী বালকগণের বিপদ ও ক্লেশের উল্লেখ করিয়া প্রতিবেশী-দিগের দুঃখ কষ্টের দোহাই দিয়া, অতিথি-অভ্যাগতের পরিচর্যার প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়া কলিকাতায় আসিতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন।" ('বিদ্যাসাগর' ; পৃঃ ৩৪৯) অর্থাৎ ১২৭৫ সনের চৈত্রমাসে বিদ্যাসাগরের পৈত্রিক ভবন অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয় এবং অগ্নিকাণ্ডের তিন মাস পরে ১২৭৬ সনের আষাঢ় মাসে মুচি-রামের বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। পুত্র নারায়ণের বিধবাবিবাহের (২৭ শ্রাবণ, ১২৭৭ বঙ্গাব্দ ; ১১ আগস্ট, ১৮৭০ খ্রীঃ) পরে ১২৭৭ সালের ভাদ্র মাসে (আগস্ট, ১৮৭০ খ্রীঃ) ভগবতী দেবী কাশী ও অন্যান্য তীর্থ পর্যটনে বেরিয়েছিলেন। সুতরাং বিদ্যাসাগরের আরাধ্যা দেবী জননী ভগবতী দেবী ১২৭৫ বঙ্গাব্দ থেকে ১২৭৭ সনের শ্রাবণ মাস পর্যন্ত বীরসিংহ গ্রামে ছিলেন। তাঁদের বাড়িতে মুচিরাম-মনো-মোহিনীর আশ্রয় গ্রহণ, বিবাহের ব্যবস্থাপনায় পুত্রদের উদ্যোগ, রুদ্র মূর্তিতে বিদ্যাসাগরের বীরসিংহে আগমন, হালদারদের অনুরোধ রক্ষা—তাঁদের কাছে মুচিরামের সঙ্গে বালবিধবা মনোমোহিনীর পুনর্বিবাহে অসম্মতি-জ্ঞাপন, বিদ্যা-

সাগরের আদেশে মুচিরাম ও মনোমোহিনীকে বাড়ি থেকে বহিষ্কার এবং অন্যান্য পুত্রদের সাহায্যে সনাতন বিশ্বাসের গৃহে তাঁদের আশ্রয় লাভ, দীনবন্ধু-শম্ভুচন্দ্র-ঈশানচন্দ্র প্রমুখদের উদ্যোগে ও ব্যবস্থাপনায় মুচিরাম-মনোমোহিনীর বিবাহ ইত্যাদি ঘটনাগুলি যখন ঘটছিল, তখন জননী ভগবতী কি করছিলেন? বিদ্যাসাগরেব জীবনীকারেরা এই প্রশ্নের উত্তর দেননি। সুতরাং আমাদেরকেই সমগ্র ঘটনা বিশ্লেষণ করে যুক্তিসিদ্ধ অনুমান করতে হবে।

বিধবাবিবাহের সপক্ষে লেখনী-ধারণ, আন্দোলন এবং অমানুষিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তিদানের জন্য স্বীয় অর্থব্যয়ের দ্বারা বালবিধবাদের পুনর্বিবাহ প্রদান ইত্যাদির সংবাদে বালবিধবা মনোমোহিনীর বুকে ভবিষ্যতেব স্বপ্ন-রঙ্গীন আশা গুঞ্জরিত হচ্ছিল; দুরু দুরু বক্ষে আশায় আশায় প্রহর গুণছিল শুভ মুহূর্তের—নিশাবসানের শেষে রাঙ্গা প্রভাতের। এমন সময়ে ক্রুদ্ধ উত্তেজিত অবস্থায় বিদ্যাসাগর বীরসিংহ গ্রামে এসেছেন। পুত্রেব রুদ্র-চণ্ড মূর্তি দেখে জননী ভগবতী অমঙ্গলেব আশঙ্কায় শঙ্কিত, পরিবারের সকলেই ভীত-সন্ত্রস্ত। বিদ্যাসাগর শম্ভুচন্দ্রকে মুচিবাম-মনোমোহিনী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছেন এবং শম্ভুচন্দ্র তাঁকে বিধবাবিবাহের উদ্যোগ-আয়োজনের কথা বলেছেন। বিদ্যাসাগর নীরবে শুনেছেন, কোনো কথা বলেননি। বিদ্যাসাগরের নির্দেশ ব্যতিরেকে মুচিরামের বিধবাবিবাহের বন্দোবস্ত করায় তিনি ভাইদের উপরে আরো ক্রুদ্ধ হয়েছেন। বালবিধবাব বৈধব্যদশা তাঁকে বেদনার্ত করেনি।

বিদ্যাসাগবের রাগ ছিল অসংযত প্রকৃতির। বামুনের রাগ চণ্ডালের রাগ কথাটি তাঁর সম্বন্ধে ব্যবহার করা যায়। পিতা-পিতামহের কাছ থেকে তিনি সাহসিকতা ও বলিষ্ঠতার সঙ্গে রাগও পেয়েছিলেন। একবার তিনি ক্রোধের বশে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে সেই সিদ্ধান্ত থেকে তিনি কখনোই সরে আসতেন না; তাতে সমূহ ক্ষতি হলেও সেই সিদ্ধান্তকে তিনি কার্যকবী করতেন। তিনি লাভ-ক্ষতির কথা কখনো চিন্তা করতেন না। তাই পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনাবলী অনুমান-নির্ভর হলেও বিদ্যাসাগরের চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। কারণ ছাড়া কাজ হয় না। পরদিন সকালে বিদ্যাসাগর হালদার-বাবুদের যা বলেছিলেন, তা তাঁর আকস্মিক উক্তি কিংবা তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নয়। তিনি অনেক ভেবে-চিন্তে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। তাঁর সিদ্ধান্তের পশ্চাতের কারণ ছিল তাঁর পুত্র ও সহোদরদের দুর্বিনীত আচরণ, যাঁরা তাঁর অর্থ-সাহায্যের উপরে নির্ভরশীল ছিলেন।

মুচিরামের সঙ্গে মনোমোহিনীর বিবাহ যাতে না দেওয়া হয়, সেজন্য ক্ষীরপাইর হালদারবাবুরা বিদ্যাসাগরের কাছে অনুরোধ জানাতে এসেছেন। কিন্তু কি কারণে মনোমোহিনীর পুনর্বিবাহ দেওয়া হবে না? চণ্ডীচরণ কোনো সুস্পষ্ট কারণ দর্শাননি। তাঁর ভাষায় হালদারবাবুরা 'বহুবিধ কারণ দর্শাইয়া এই কার্যের

সহায়তায় বিরত থাকিতে' বিদ্যাসাগরকে অনুরোধ করেছিলেন। অবশ্য শম্ভুচন্দ্র ও বিহারীলাল একটি কারণ উপস্থিত করেছেন—মুচিরাম "হালদার-পরিবারের ভিক্ষাপুত্র"। কিন্তু এই যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয় এবং লক্ষণীয় বিষয় হোল, শম্ভুচন্দ্রের এই হাস্যকর যুক্তিকে চণ্ডীচরণ খণ্ডন করেননি এবং বিহারীলাল তাঁর গ্রন্থে শম্ভুচন্দ্রের উক্তির পুনরাবৃত্তি করেছেন। বিদ্যাসাগরের মতো একজন যুক্তিবাদী ও মানব-বন্ধুর কাছে 'ভিক্ষাপুত্র' যুক্তিটিকে নিশ্চয়ই হাস্যকর বলে মনে হয়েছিল। তাসত্ত্বেও এই হাস্যকর কারণটিকে স্বীকার করে নিয়ে তিনি হালদারবাবুদের জানিয়েছিলেন যে, 'আপনাদের অনুরোধে আমি এই বিবাহের কোন সংস্রবে থাকিব না। আপনারা উভয়কে উপদেশ প্রদান-পূর্বক সমভিব্যাহারে লইয়া যান।' বিদ্যাসাগর জানতেন যে, তাঁর সম্মতি না নিয়ে তাঁর অনুপস্থিতিতে মুচিরাম-মনোমোহিনীর বিবাহের বন্দোবস্ত হচ্ছে। তিনি কথোপকথনকালে হালদারবাবুদের আরো বলেছেন যে, 'সে (শম্ভুচন্দ্র—সম্পাদক) ইহাদিগকে বাটীতে রাখিয়া, ইহাদের বিবাহের উদ্যোগ পাইতেছে। অদ্য আপনাদের সম্মুখেই বিদায় করা হইবে।' অর্থাৎ ক্রোধ বিধবাবিবাহে তাঁর সহানুভূতি, সমবেদনা, আন্তরিকতা, নিষ্ঠা সবকিছুকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছিল। হালদার-বাবুদের কাছে একটি নিরাপরাধা অসহায়া বালবিধবার পুনর্বিবাহে অসম্মতি জ্ঞাপন করে তিনি পরবর্তী প্রজন্মের কাছে সত্যভঙ্গের ('এ ব্রতসাধনেই তো আমি আত্মসমর্পণ করিয়াছি। যদি ব্রত সিদ্ধ না হইল, তাহা হইলে জীবন বৃথা।') জন্য দায়ী হলেন।

অথচ সত্য রক্ষার জন্য বিদ্যাসাগর রিক্ত-নিঃস্ব হয়েছেন। সত্যান্বেষণই ছিল তাঁর একমাত্র সাধনা। সত্যবোধই ছিল তাঁর জীবনের ধ্রুবতারা। সত্য-চেতনাই ছিল তাঁর জীবনের ভিত্তিমূল। যা সত্য বলে জেনেছেন, বুঝেছেন, তা রক্ষার জন্য তিনি সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন, রিক্ত-নিঃস্ব হলেও বিদ্যাসাগর সত্যকে বিসর্জন দেননি; নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করেছেন, আত্মীয়-বন্ধুদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন, তবুও তিনি সত্য-সাধনা ত্যাগ করেননি, সত্যান্বেষণের পথ থেকে সরে আসেননি। তাঁর কাছে সত্য ছিল অবিভাজ্য—"Truth is Truth if properly perceived." (Vidyasagar: 'Notes on Sanskrit College'; dated 7. 9. 1853)। যে-বিধবাবিবাহ প্রচলনের জন্য বিদ্যাসাগর সর্বস্ব ত্যাগ করছেন, সত্য-রক্ষার জন্য ঋণ করেও বিধবাদের পুনর্বিবাহ দিচ্ছেন, ক্রোধের বশে তিনি হালদারবাবুদের অন্যায় অনুরোধ মেনে নেবেন, তা ছিল বিদ্যাসাগরের সহোদরদের কাছে কল্পনার অতীত। কিন্তু তাঁরা পড়েছিলেন উভয় সঙ্কটে। মুচিরাম-মনোমোহিনীর বিবাহ না দিলে বিদ্যাসাগর তাঁদের কাছে অপরাধী হন, দেশের মানুষের কাছে সত্যভ্রষ্ট হন; অথচ তাঁদের বিবাহ দিলে বিদ্যাসাগর প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গের দায়ে হালদারদের কাছে দোষী হন। দ্বিতীয় পথ অবলম্বন করলে

বিদ্যাসাগর শান্ত না হওয়া পর্যন্ত তাঁর প্রতিক্রিয়া তীব্রতর হবে, একথা জেনেও তাঁর সহোদরেরা দ্বিতীয় পথ গ্রহণ করেছিলেন। তবে সামনে থেকে নয়, অন্তরালে থেকে তাঁরা বিবাহকার্য সম্পন্ন করেছিলেন ; কারণ বিদ্যাসাগরের অর্থ সাহায্যে তাঁদের সংসার চলত। তাঁরা ছিলেন অগ্রজ নির্ভরশীল।

বিদ্যাসাগরের আদেশে মুচিরাম মনোমোহিনী বাড়ি থেকে বহিষ্কৃত হলেও দীনবন্ধু, শম্ভুচন্দ্র, ঈশানচন্দ্র, গোপালচন্দ্র (দীনবন্ধুর পুত্র), নারায়ণ (বিদ্যাসাগরের পুত্র), রাধানগর নিবাসী কৈলাসচন্দ্র মিশ্র প্রমুখেরা রক্তলোলুপ হায়েনাদের হাতে সমর্পণ না করে সনাতন বিশ্বাসের বাড়িতে তাঁদেরকে রেখেছিলেন। অবশ্য শম্ভুচন্দ্র এই বিবাহের সঙ্গে কোনোরকম সম্পর্ক রাখার কথা অস্বীকার কবেছেন। তিনি বলেছেন, "অগ্রজ মহাশয়ের অসন্তোষের ভয়ে আমি আর ঐ বিষয়ে লিপ্ত রহিলাম না এবং ঐ বিবাহে যাই নাই।" শম্ভুচন্দ্রের এই উক্তি যে সত্য নয়, তা প্রমাণিত হয় চণ্ডীচরণ কর্তৃক উপস্থাপিত মুচিরামের চিঠিতে,—

"ওঁ নমঃ সর্বমঙ্গলায়ৈ ১৩০২—১৩ই ভাদ্র

সবিনয় নমস্কার নিবেদন মিদং

মহাশয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, 'পূজ্যপাদ আমার পিতৃব্য শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় তোমার বিবাহে লিপ্ত ছিলেন কিনা।' তদুত্তরে আমি ধর্মতঃ অঙ্গীকার করিতেছি যে কেবল উক্ত মহাশয়েরই সম্পূর্ণ যত্ন এবং অনুগ্রহেই উহা নির্বাহিত হইয়াছিল। তিনি যেরূপ ক্লেশ স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা আমার চিরকালেই মনে থাকিবে। ইতি—

বশংবদ
শ্রী মুচিরাম শর্মা"

('বিদ্যাসাগর' ; পৃঃ ৩৫৭)

আর্থিক নিরাপত্তার কারণে শম্ভুচন্দ্র সনাতন বিশ্বাসের বাড়িতে মুচিরাম-মনোমোহিনীর বিবাহের সময়ে উপস্থিত ছিলেন না। ঐ সময়ে বিদ্যাসাগরের বাড়িতে জননী ভগবতী, বিদ্যাসাগর, শম্ভুচন্দ্র এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনেরা রয়েছেন এবং তাঁদের "সম্মুখস্থ ভবনে বিবাহ" অনুষ্ঠিত হলো। নিশুতি রাতে গ্রামের বাড়িতে শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি, স্ত্রী-আচার, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের খাওয়ানো ইত্যাদি সবকিছুই হলো ; অথচ আশ্চর্যের বিষয়, জননী ভগবতী দেবী এবং বিদ্যাসাগর বিবাহানুষ্ঠান সম্পর্কে কিছুই জানলেন না। পরদিন সকালে শঙ্খধ্বনি শুনতে পেয়ে কারণ অনুসন্ধান করলে বিদ্যাসাগর জানতে পেরেছিলেন যে, তাঁর ভাইয়েরা পূর্বরাত্রে মুচিরাম-মনোমোহিনীর বিবাহ দিয়েছেন। বিবাহের সংবাদ 'শুনিয়া ক্রোধে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বদনমণ্ডল রক্তিমা বর্ণ ধারণ করিল। তিনি আর কোন কথা না কহিয়া, কেবল তামাক টানিতে টানিতে ধূমত্যাগ করিতে

লাগিলেন। রাগ হইলে তিনি প্রায়ই এইরূপ করিতেন। রাগ হইলে তিনি অনেক সময় চুপ করিয়া থাকিতেন, বড় একটা কথা কহিতেন না। যদি কোন স্নেহাস্পদ বয়ঃকনিষ্ঠকে 'ইনি', 'উনি', 'বাবু' প্রভৃতি বাক্য প্রয়োগ করিতেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইত, তাঁহার অন্তরে দাবানল প্রধূমিত।'

সহোদরদের দুঃসাহস দেখে বিদ্যাসাগর স্তম্ভিত হয়েছেন। তিনি ভাবতে পারেননি যে, তাঁর সহোদরেরা তাঁর কথা অমান্য করে বিধবাবিবাহ দেবেন। তাঁদের ব্যবহারে 'দারুণ মর্মবেদনা' পেয়ে বিদ্যাসাগর 'ক্রোধভরে বলিলেন, "অদ্য হইতে আমি দেশ পরিত্যাগ করিলাম।"' এই ঘটনায় বিধবাবিবাহের বিরোধী বিহারীলাল মন্তব্য করেছেন, "বিধবাবিবাহের সৃষ্টিকর্তা সত্যপ্রিয় বিদ্যাসাগর সত্যভঙ্গ হইল বলিয়া জন্মের মত প্রিয় জন্মভূমি পবিত্যাগ করিলেন।" কিন্তু প্রশ্ন হলো, কোন্ সত্য পালিত হলে সত্যধর্মেব মর্যাদা রক্ষিত হতো? হালদারদের কাছে নারীকে বলি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি পালনের তুলনায় হিংস্র দেশাচার থেকে নারীকে রক্ষা করা কি সত্যধর্ম পালন কবা নয়? হালদারদের হাতে মুচিরাম-মনোমোহিনীর সমর্পণেব কথা বলে কি 'সত্যপ্রিয় বিদ্যাসাগর সত্যভঙ্গ' করেননি?

বিবাহের সংবাদে বিদ্যাসাগরের মুখমণ্ডল যখন ক্রোধে বক্তবর্ণ ধারণ করেছিল, তখন বিদ্যাসাগরের জননী ভগবতী দেবী কি করেছিলেন? মাতৃভক্ত বিদ্যাসাগর, মাতৃআজ্ঞা পালনের জন্য ঝোড়ো বর্ষণমুখর রাতে নিজের প্রাণকে তুচ্ছ করে যিনি অবলীলাক্রমে উত্তাল দামোদর নদ অতিক্রম করেছিলেন! মাতৃআজ্ঞা বিদ্যাসাগরের কাছে শিরোধার্য। ভগবতী দেবী কি হালদারদের সঙ্গে কথোপ-কথনের পূর্বে মুচিরাম-মনোমোহিনীর বিবাহ দেবার জন্য বিদ্যাসাগরকে আদেশ দিয়েছিলেন? পুত্রের ক্রোধ প্রশমিত করার জন্য তিনি কি তাঁকে শান্ত করার চেষ্টা করেছিলেন? হালদারদের কাছে মুচিরাম-মনোমোহিনীর বিবাহ না দেবার জন্য বিদ্যাসাগরের প্রতিশ্রুতির সংবাদ পেয়ে ভগবতী দেবী কি দুঃখিত-ব্যথিত হয়েছিলেন? তিনি কি মনোমোহিনীর পুনর্বিবাহে সুখী হয়ে অন্য পুত্রদের আশীর্বাদ করেছিলেন? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর জীবনীকাররা দেননি। ইতিহাস নীরব। শম্ভুচন্দ্র থেকে বিনয় ঘোষ পর্যন্ত কেউই এই বিষয়ে আলোকপাত করেননি। ইতিহাস নীরব হলেও একথা সত্য যে, বালবিধবা মনোমোহিনী বিদ্যাসাগরের আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। মনোমোহিনীর দুর্ভাগ্য যে, তাঁর বৈধব্য দশা দেখে করুণাসাগর বিদ্যাসাগরের উত্তপ্ত হৃদয়ে স্নেহ-মায়া-মমতার প্লাবন সৃষ্টি হয়নি। তাঁর কান্নায় বিদ্যাসাগরের পরিবারের সকলে বেদনার্ত হলেও (সম্ভবত ভগবতী দেবী কন্যাসমা মনোমোহিনীর দুঃখে গোপনে অশ্রু বিসর্জন করেছিলেন) ক্রুদ্ধ বিদ্যাসাগর ব্যথিত হননি। বাংলায় দুর্ভাগ্য যে, বিধবাবিবাহের প্রশ্নে বিদ্যাসাগর তাঁর সমগ্র জীবনে এইবারই সর্বপ্রথম (এবং সর্বশেষ) মুচিরামের

সঙ্গে বালবিধবা মনোমোহিনীর পুনর্বিবাহ দিতে অস্বীকার করে পশ্চাদ্‌পসরণ করেছিলেন এবং সত্যভ্রষ্ট হয়েছিলেন।

১২৭৬ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসের সংখ্যায় 'বামাবোধিনী পত্রিকা' লিখেছে: "সম্প্রতি জাহানাবাদে একটি বিধবাবিবাহ হইয়াছে। বর কেচকাপুর স্কুলের প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুত মুচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, নিবাস ক্ষীরপাই। পাত্রী কাশীগঞ্জ নিবাসী শ্রী কাশীনাথ পালধির কন্যা শ্রীমতী মনোমোহিনী দেবী।"

বিদ্যাসাগরের একান্ত অনুগত ও বিশ্বাসভাজন শম্ভুচবণ, চণ্ডীচরণের দ্বারা উত্তেজিত হয়ে পুত্র নারায়ণের বিধবাবিবাহ প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর সম্পর্কে অসংযত ও কুরুচিকর মন্তব্য করেছেন,

"নারায়ণবাবুর বিবাহের পূর্বে মুচীরামের বিবাহের সময় উক্ত বিবাহ ন্যায্য ও শাস্ত্রসম্মত স্বীকার করিয়াও বিধবাবিবাহ-বিদ্বেষী ক্ষীরপাই নিবাসী হালদার-বাবুদের অনুরোধে পশ্চাৎপদতাব ও কাপুরুষতাব পরিচয় দিয়া ক্ষান্ত হয়েন নাই বরং ঐ সময়ে তিনি ঐ বিবাহের প্রতি যারপরনাই বিদ্বেষভাব প্রদর্শন কবিয়াছেন।" ('ভ্রমনিরাস' ; পৃঃ ২০৪)

মুচীরামের বিধবাবিবাহ-বিষয়ে বিদ্যাসাগবের অস্বীকৃতির পশ্চাতে তাঁর 'কাপুরুষতার পরিচয়' ছিল না। তবে মুচীরাম-মনোমোহিনীর বিবাহ না দিয়ে তাঁর 'পশ্চাৎপদতার' ও 'যারপরনাই বিদ্বেষভাব'-এর কারণ ছিল তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভুত্ব ও তাঁর বিদ্যার আভিজাত্য থেকে উদ্ভূত হিতাহিতজ্ঞানশূন্য প্রচণ্ড ক্রোধ। বিদ্যাসাগরের সমগ্র জীবনের ঘটনাবলী থেকে এই সত্য উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। সমগ্র জীবনে বিদ্যাসাগর কেবলমাত্র একবারই উত্তেজিত হয়ে স্বাভাবিক বিচারশক্তি হারিয়ে পশ্চাদপসরণ করে বালবিধবা মনোমোহিনীর পুনর্বিবাহ দিতে অস্বীকার করেছিলেন, যা ছিল বাংলার উদারনৈতিক চেতনাসম্পন্ন মানুষের কাছে দুর্ভাগ্য-জনক। এই ঘটনার পরে তাঁর জীবনে পশ্চাদপসরণের কোনো ঘটনা আর ঘটেনি, বিধবাবিবাহ দিতে তিনি দ্বিধার পরিচয় দেননি। রক্ষণশীল গ্রাম্যসমাজকে অস্বীকার করে পুত্র নারায়ণের বিধবাবিবাহ দিয়ে তিনি অসীম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন।

নারায়ণের বিধবাবিবাহ বর্ণনাকালে বিহারীলাল শম্ভুচন্দ্র প্রদত্ত তথ্যকে অস্বীকার করেননি। কিন্তু চণ্ডীচরণ সেই একই কাহিনী লিখতে গিয়ে শম্ভুচন্দ্রের ভূমিকা সম্পর্কে অকারণে বিরূপ মন্তব্য করে তাঁর বিদ্বেষপরায়ণ মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। এক বছর পরে নারায়ণের বিধবাবিবাহ (২৭ শ্রাবণ, ১২৭৭ বঙ্গাব্দ) প্রসঙ্গে চণ্ডীচরণ লিখেছেন: "পুত্র নারায়ণচন্দ্র ১২৭৭ সালের ২৭শে শ্রাবণ একবিংশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে খানাকুল-কৃষ্ণনগরনিবাসী শম্ভুচন্দ্র মুখো-পাধ্যায়ের একাদশবর্ষীয়া বিধবা কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। এই বিবাহের প্রস্তাব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ জামাতা ৺গোপালচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়

বিদ্যাসাগর সমীপে জ্ঞাপন করেন। তিনি পুত্রের এই সাধু সঙ্কল্পের প্রস্তাব শুনিয়া জামাতা গোপালবাবুকে বলিয়াছিলেন: 'ইহা অপেক্ষা অধিক সৌভাগ্যের বিষয় আমার আর কিছুই হইতে পারে না। তখন আমার মতের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন?' " চণ্ডীচরণ কোথাও উল্লেখ করেননি যে, নারায়ণ গোপালচন্দ্রের কাছে বিধবা ভবসুন্দরীকে বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, অথচ 'পুত্রের এই সাধু সংকল্পের প্রস্তাব' শুনে বিদ্যাসাগর খুশী হয়েছিলেন। তাছাড়া কন্যা কোথায় ও কার কাছে ছিল, কন্যার সঙ্গে নারায়ণের কোথায় সাক্ষাৎ ঘটেছিল— এই সমস্ত বিষয় উল্লেখ না করে চণ্ডীচরণ হঠাৎ শম্ভুচন্দ্রকে আক্রমণ করে লিখেছেন, "কোন্ সাহসে বিধবাবিবাহের অনুষ্ঠান হইতে নারায়ণবাবুকে বিরত করিবার জন্য তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন?" ('বিদ্যাসাগর' ; পৃঃ ২৫৫) অথচ শম্ভুচন্দ্রের আপত্তির প্রসঙ্গটি ছিল এখানে অপ্রাসঙ্গিক। প্রকৃতপক্ষে, শম্ভুচন্দ্রের বিরুদ্ধে তীব্র ব্যক্তিগত বিদ্বেষের জন্য চণ্ডীচরণ স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছিলেন। সেকারণেই পুনর্বিবাহের পূর্বে কন্যা ও কন্যার মাতা বীরসিংহে গিয়ে শম্ভুচন্দ্রের আশ্রয়ে ছিলেন এবং সেখানে নারায়ণ কন্যাকে দেখেছিলেন —এই সত্য চণ্ডীচরণ ইচ্ছাপূর্বক গোপন করেছেন। সুতরাং শম্ভুচন্দ্র ও চণ্ডীচরণের বিবৃতি অনুসরণ করে নারায়ণের বিবাহ-বিষয়ে আলোকপাত করলে সমগ্র বিষয়টি জানা যাবে।

বালবিধবা কন্যা ভবসুন্দরীর পিতৃ পরিচয়—খানাকুল-কৃষ্ণনগর নিবাসী নিকষ-কুলীন শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও সারদা দেবী ভবসুন্দরীর পিতা ও মাতা। কন্যার মাতুল চন্দ্রকোণানিবাসী নীলরতন চট্টোপাধ্যায়। 'কন্যার প্রথম বিবাহ কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দের বাটীতে হইয়াছিল।'—এই তথ্য শম্ভুচন্দ্র উপস্থিত করেছেন এবং চণ্ডীচরণ কিছু বলেননি।

শম্ভুচন্দ্র লিখেছেন, "ঐ পাত্রীর জননী সারদা দেবী অতিশয় বুদ্ধিমতী। স্বীয় কন্যার পুনর্বার বিবাহ দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া কাশীবাস করিবার মানসে, প্রথমতঃ আমার নিকট আগমন করেন।" এবং "উক্ত সারদা দেবী, তনয়াসহ বীরসিংহায় আমার বাটীতে আগমন করিয়া, আমাকে উহার বিবাহের কথা ব্যক্ত করেন।" (পৃঃ ১৫০-১৫১) শম্ভুচন্দ্র কন্যা ভবসুন্দরী ও মাতা সারদা দেবীকে গৃহে আশ্রয় দিয়া জ্যেষ্ঠাগ্রজের অভিমত জানার জন্য চিঠি দেওয়ায় বিদ্যাসাগর "অন্য এক পাত্র স্থির করিয়া, কিছুদিন পরে আমায় পত্র লিখেন, 'তুমি ঐ পাত্রীসহ পাত্রীর মাতাকে প্রেরণ করিবে।' ইতিমধ্যে নারায়ণ বাবাজী, কোন কার্যোপলক্ষে বীরসিংহায় আসিয়া কথাবার্তাতে পরম প্রীতিলাভ করিয়া, আমার নিকট নিজের বিবাহের অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। কিন্তু জ্যেষ্ঠা-বধূদেবী প্রভৃতি এবিষয়ে অসম্মতি প্রকাশ করায়, উভয়পক্ষের মন্তব্য-পত্র-সহ ঐ পাত্রী ও উহার মাতাকে কলিকাতায় অগ্রজের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। কয়েক দিন পরে নারায়ণও কলিকাতায়

গমন করে।" (পৃঃ ১৫১) অর্থাৎ বীরসিংহের বাড়ি থেকে নারায়ণের বিধবাবিবাহ বিষয়টি স্থানান্তরিত হলো কলকাতার বাড়িতে এবং বিদ্যাসাগর হলেন বিচার-কর্তা।

কি কি কারণে শম্ভুচন্দ্র নারায়ণের সঙ্গে বিধবা কন্যা ভবসুন্দরীর পুনর্বিবাহে আপত্তি জ্ঞাপন করেছিলেন, তা তিনি 'ভ্রমনিরাস' গ্রন্থে লিখেছেন, "ঐ কন্যার সম্বন্ধ, অগ্রজ মহাশয় অন্য এক পাত্রের সহিত স্থির করিয়াছিলেন, সে ব্যক্তি অতি ভদ্র লোক, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে সম্ভ্রমের সহিত কর্ম করিতেন। তিনি ঐ কন্যার সহিত বিবাহকার্য সম্পাদনার্থ অলঙ্কারাদি প্রস্তুত করাইতে ছিলেন। তাঁহাকে বঞ্চনা করিয়া নারায়ণের সহিত বিবাহ দিলে সে ব্যক্তি কি মনে করিবেক।

"তৃতীয়তঃ পূজ্যপাদ জ্যেষ্ঠা বধূ দেবী অত বড় মেয়ের সহিত বিবাহ দিতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং নারায়ণের বিবাহ পক্ষে অভিপ্রায় অর্থাৎ উভয় পক্ষের অভিপ্রায় লেখা হইয়াছিল।

"চতুর্থতঃ অপরাপর আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের কথাও একই পত্রে লিখিয়াছিলাম। দাদার নিকটে কোন বিষয়ের গোপন করি নাই।" ('ভ্রমনিরাস'; পৃঃ ২০৪)

চণ্ডীচরণ তাঁর গ্রন্থে স্বীয় মন্তব্য সহ শম্ভুচন্দ্রের নিম্নলিখিত দুটি চিঠি প্রকাশ করেছেন :

"শ্রীশ্রীদুর্গা শরণম্—

শ্রীচরণেষু—

প্রণতিপূর্বকং নিবেদনম্

৬৫০ ছয় শত পঞ্চাশ টাকার নোট পঁহুছিল, আদেশানুসারে বিলি করিব। অনুগ্রহপূর্বক ভৈরবের মাং মাসহারার খাতা প্রেরণ করিবেন। সাবেক মাসহারার ৩ খানা খাতা চূড়ামণির হস্তে পাঠাইয়াছি, বোধ করি পাইয়া থাকিবেন। কৃষ্ণ-নগরের কন্যা ভবসুন্দরীকে গত রবিবার কলিকাতা পাঠাইয়াছি; বোধ করি তাঁহারা পঁহুছিয়া থাকিবেন। পরম্পরায় শুনিতেছি, নারায়ণ বাবাজীউ কৃষ্ণনগরের কন্যা ভবসুন্দরীর পাণিগ্রহণ করিবেন, ইহা আমি বিশেষরূপে অবগত নহি। আমি কন্যাকে মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়াছি; মহাশয় কর্তা, আপনি কন্যাকে যে পাত্রে দিবেন তাহাতে আমার কোনো আপত্তি নাই। আর নারায়ণের মাতা আমাকে বৃথা দোষ দেন; নারায়ণ ছেলে মানুষ নয় যে আমি ভুলাইয়াছি(২)। কৃষ্ণনগরের কন্যার বিষয়ে মহাশয়ের যেরূপ অভিলাষ হয়, তাহাই করিবেন তদ্বিষয়ে আমার কোনো কথা বলিবার নাই। যদি নারায়ণের বিবাহ হয় তাহা হইলে জননী

---

২ নারায়ণবাবুর জননী চিরদিন এই পুত্রবধূ লইয়া পরম সুখে সংসার করিয়া গিয়াছেন।

দেবীকে যেন পত্র পাঠাইয়া লইয়া যান। জননী দেবীর বিধবাবিবাহে বিশেষ যত্ন আছে। আর ৩টি বিধবা ব্রাহ্মণ কন্যা উপস্থিত ছিলেন তাহাদিগকে এক্ষণে বিদায় করিয়াছি। আগামী অগ্রহায়ণ মাসে মহাশয়ের নিকট পাঠাইব। গোপাল বাবাজীউ বিধবা বিবাহ করিতে চান, অপর ১টি কন্যাও উপস্থিত ; ফলে মধ্যম দাদার বিনা মতে গোপালের বিবাহ হইতে পারে না। ঈশান ভায়া বাটী আসিয়াছেন। গোপাল মূর্খ ও মাতাল, তাহাকে বিবাহ করিতে সহসা কেহ রাজী হয় নাই। ইতি ২৪ আষাঢ়।

ভৃত্য

শ্রীশম্ভুচন্দ্র শর্ম্মণঃ

পুঃ—নারায়ণ বাবাজীউ অদ্য কলিকাতা গমন করিবেন।

পুঃ—রাধানগরের ৺শ্রীরাম ন্যায়বাগীশের পুত্রকে পুস্তক ও বস্ত্র দিবার জন্য উমেশ নায়েবকে বরাত কবিয়াছিলেন, নায়েব এখানে উপস্থিত নাই। পুস্তক ও বস্ত্রাভাবে পাঠ বন্ধ হয় ; এ বিষয়ে যেরূপ আদেশ হয় তাহা লিখিবেন।

শম্ভু"

"শ্রী দুর্গা শরণম্

শ্রীচরণেষু—

প্রণতিপূর্ব্বকং নিবেদনম্

শ্রীমতী জননী দেবী প্রভৃতি নির্বিঘ্নে বাটী পৌঁছিয়াছেন। নারায়ণ বাবাজীউ বিধবাবিবাহ করিবেন দেশে প্রচার হইয়াছে। এই নিমিত্ত আত্মীয় বন্ধুবান্ধব ও কুটুম্বগণ আমাকে বিশেষ অনুবোধ করায় মহাশয়কে লিখিতেছি. ইহারা বলেন আরও ২।৪ বৎসর নারায়ণ বিধবাবিবাহ করিতে ক্ষান্ত থাকুক, পরে যদি বিধবা-বিবাহ করাই শ্রেয়ঃকল্প হয় তাহা হইলে ৭।৮ বৎসরের অর্থাৎ অক্ষতযোনি কন্যার সহিত বিবাহ হইলে ভাল দেখায় ও শাস্ত্রসম্মত হয়। আর ইহারা আমাকে বলেন বিদ্যাসাগর মহাশয় পরের বিবাহ দিউন তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই, নারায়ণের বিবাহ দিলে আমরা আর তোমাদের সহিত আহার ব্যবহার করিতে পারি এমত বোধ হয় না ; কারণ তোমাদের সহিত আমরা আহার ব্যবহার করিলে সমাজে রহিত হইব আর নানা গোলযোগ উপস্থিত হইবে অর্থাৎ আমাদের পুত্র কন্যার বিবাহ দেওয়া দুষ্কর হইবে। এই কারণেই নারায়ণের বিবাহ দিতে ক্ষান্ত হইতে বলিতেছি। এতাবৎকাল মহাশয়দের অনুগত ও আশ্রিত থাকিয়া অতঃপর আমাদের কি দশা ঘটিবে, স্থানান্তরে যাইলে আমাদিগকে কেহ হুঁকো দিবে না ও উপহাস করিবেক (৩)। ইহারা নারয়ায়ণকে ক্ষান্ত করিবার জন্য আমাকে

---

৩ অন্যান্য আত্মীয়বর্গের ধুয়া ধরিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে পুত্রের বিধবা বিবাহ অনুষ্ঠান হইতে বিরত করিতে প্রয়াস পাওয়া কতদূর সুবিবেচনার কার্য

কলিকাতা যাইতে বলেন আমি তাহাদিগকে বলিলাম অগ্রে অগ্রজ মহাশয়কে পত্র লিখি, তিনি যেরূপ আদেশ করেন পরে আপনাদিগকে জানাইব। এমত স্থলে যাহা কর্তব্য হয় করিবেন ও নারায়ণ বাবাজীউকে আমার প্রণয় সম্ভাষণ ও আশীর্বাদ জানাইবেন। এখানকার সকলে ভাল আছেন। ইতি

শ্রীশম্ভুচন্দ্র শর্মণঃ" ('বিদ্যাসাগর', পৃঃ ৫০৬-৫০৮)

৩নং পাদটীকায় চণ্ডীচরণ যে-মন্তব্য করেছেন, তাতে মনে হয়, বিদ্যাসাগরের জীবনকাহিনী নয়, তিনি শম্ভুচন্দ্রের জীবনকথা লিখতে গিয়ে তাঁর দ্বিধা-দ্বন্দ্বের তথ্য উপস্থিত করেছেন।

কলকাতায় এসে নারায়ণ ভগিনীপতি গোপালচন্দ্র সমাজপতির মাধ্যমে পিতা বিদ্যাসাগরের কাছে বালবিধবা ভবসুন্দরীকে বিবাহ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন। গোপালচন্দ্র ছিলেন নারায়ণের বার্তাবহ। এভাবেই বিদ্যাসাগর সর্বপ্রথমে শম্ভুচন্দ্র এবং পরে গোপালচন্দ্রেব কাছ থেকে নারায়ণের বিধবাবিবাহের অভিপ্রায়ের সংবাদ শুনেছেন।

বিদ্যাসাগর স্ত্রী দিনময়ী দেবীর আপত্তি, সহোদর শম্ভুচন্দ্রেব অসমর্থন, আত্মীয়-স্বজনদের বিরুদ্ধ মনোভাব ইত্যাদি বিবেচনা কবেছেন এবং সকলের আপত্তি ও বিরোধিতাকে অস্বীকার করে পুত্র নারায়ণের সঙ্গে বিধবা ভবসুন্দরীর পুনর্বিবাহ দিয়েছেন। বিবাহের সময়ে যাতে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না হয়, সেজন্য তিনি পত্নী দিনময়ী দেবীকে কলকাতার বিবাহ-বাসরে আনেননি। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে গ্রামে বসবাস করতে হয় বলে একঘরে হওয়ার ভয়ে দীনবন্ধু, শম্ভুচন্দ্র প্রমুখ বিদ্যাসাগরের সহোদরেরা নাবায়ণেব বিবাহেব সময়ে উপস্থিত হননি।

কলকাতায় 'মীর্জাপুর নিবাসী ডিঃ কালেক্টর কালীচরণ ঘোষের বাড়িতে পরিণয়-কার্য সম্পন্ন হইয়াছিল।' (বিহারীলাল সরকার : 'বিদ্যাসাগর' ; পৃঃ ২৯৬) কিন্তু 'আত্মীয় কুটুম্বদের প্রতিকূলে এরূপ কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া সহজ নহে। বিবাহ রাত্রে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কোন স্বজাতীয় আত্মীয় স্ত্রীলোক বর কন্যার বরণ করিতে সম্মত হইলেন না এবং ইহাও প্রকাশ থাকে যে, তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের মত বিদ্বান ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোক আমার নয়ন-গোচর হয় নাই। কারণ

পাঠক তাহার বিচার করিবেন। এখানে কেবল বক্তব্য এই যে, নারায়ণবাবুর বিবাহের পর শম্ভুচন্দ্র নিজ পুত্রের বিবাহের সময় জ্যেষ্ঠের নিকট আনুকূল্য গ্রহণ করিয়াও সে সময় (বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবদ্দশাতেই) তাঁহার ভাবী কুটুম্বের নিকট শপথ করিয়া বলিয়াছিলেন যে জ্যেষ্ঠ ও তাঁহার পরিবারবর্গের সহিত সামাজিক সংস্রব রাখেন না এখনও তাঁহার কুটুম্বগণের পূর্ব সংস্কার সুরক্ষিত কিন্তু এদিকে বিদ্যাসাগর বাটীর সহিত তাঁহার শতপ্রকার সামাজিক সংস্রবের প্রমাণ বিদ্যমান।

নারায়ণের বিবাহ সময়ে বরণ করিবার সময় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কোন আত্মীয় স্ত্রীলোক বরণ করিতে সম্মতা হইলেন না দেখিয়া, বাচস্পতি মহাশয় তৎক্ষণাৎ নিজের বাটী গিয়া আপন পত্নীকে আনয়নপূর্বক বর-কন্যার বরণ-কার্য সমাধা করাইলেন।' (শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন : 'ভ্রমনিরাস' ; পৃঃ ২০৪-২০৫)

এক বছরে দুটি বিধবাবিবাহের ঘটনা ঘটেছে, যে-দুটি বিবাহে বিদ্যাসাগর ও তাঁর সহোদরেরা জড়িত ছিলেন। এই দুটি পুনর্বিবাহে বিদ্যাসাগরের অবস্থান ছিল পরস্পর-বিরোধী। যেহেতু তাঁর সম্মতি না নিয়ে তাঁর সহোদরেরা মুচিরামের বিবাহের আয়োজন করেছিলেন, সেহেতু এই বিবাহে ছিল বিদ্যাসাগরের প্রবল আপত্তি। কিন্তু নারায়ণের বিবাহে যেহেতু সহোদরদের আপত্তি ছিল এবং তাঁর সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপরেই পুত্রের বিধবাবিবাহ নির্ভর করছিল, সেহেতু তিনি সকলের বাধাকে অস্বীকার করে নারায়ণের বিধবাবিবাহ দিয়েছিলেন। রামজয়ের 'এঁড়ে বাছুর' 'ঈশ্বরচন্দ্র শৈশবকাল হইতে আরম্ভ করিয়া জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত প্রত্যেক বিষযে আপনার ইচ্ছার প্রতিষ্ঠা রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন ; কখন কোন বিষয়ে কাহারও অধীন হইয়া চলিতেন না। তাঁহার জীবন-চরিতে প্রত্যেক ঘটনাই তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিবে।' (চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বিদ্যাসাগর' ; পৃঃ ৩৬)

পুত্রের বিবাহের পরে বিদ্যাসাগর ৩১ শ্রাবণ, ১২৭৭ বঙ্গাব্দে সহোদর শম্ভুচন্দ্রকে নারায়ণের বিবাহের সংবাদ দিয়ে নিম্নলিখিত চিঠি লিখেছিলেন। এই চিঠিতে বিধবা-বিবাহানুষ্ঠানের জন্য পুনরায় তাঁর সুদৃঢ় সংকল্প ঘোষিত হয়েছে। বিধবাবিবাহের জন্য তিনি আত্মীয়-কুটুম্ব পরিত্যাগেও রাজী, কারণ বিধবাবিবাহ-প্রবর্তন হলো তাঁর জীবনের মহত্তম-পবিত্রতম কর্তব্য।

"শুভাশিষঃসন্তু,—

২৭শে শ্রাবণ বৃহস্পতিবার নারায়ণ ভবসুন্দরীর পাণিগ্রহণ করিয়াছে। এই সংবাদ মাতৃদেবী প্রভৃতিকে জানাইবে।

ইতিপূর্বে তুমি লিখিয়াছিলে, নারায়ণ বিধবাবিবাহ করিলে আমাদের কুটুম্ব মহাশয়েরা আহার ব্যবহার পরিত্যাগ করিবেন ; অতএব নারায়ণের বিবাহ নিবারণ করা আবশ্যক। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, নারায়ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করিয়াছে, আমার ইচ্ছা বা অনুরোধে করে নাই। যখন শুনিলাম, সে বিধবাবিবাহ করা স্থির করিয়াছে এবং কন্যাও উপস্থিত হইয়াছে, তখন সে বিষয়ে সম্মতি না দিয়া প্রতিবন্ধকতাচরণ করা, আমার পক্ষে কোনও মতেই উচিত কার্য হইত না। আমি বিধবাবিবাহের প্রবর্তক। আমরা উদ্যোগ করিয়া অনেকের বিবাহ দিয়াছি, এমন স্থলে আমার পুত্র বিধবাবিবাহ না করিয়া কুমারী বিবাহ করিলে, আমি লোকের নিকট মুখ দেখাইতে পারিতাম না ; ভদ্রসমাজে নিতান্ত হেয় ও অশ্রদ্ধেয় হইতাম। নারায়ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করিয়া আমার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে এবং লোকের নিকট আমার পুত্র

বলিয়া পরিচয় দিতে পারিবেক, তাহার পথ করিয়াছে। বিধবাবিবাহ-প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম। এজন্মে ইহা অপেক্ষা অধিকতর আর কোনও সৎকর্ম করিতে পারিব, তাহার সম্ভাবনা নাই। এ বিষয়ের জন্য সর্বস্বান্ত হইয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাঙ্মুখ নহি। সে বিবেচনায় কুটুম্ব-বিচ্ছেদ অতি সামান্য কথা। কুটুম্ব মহাশয়েরা আহার-ব্যবহার পরিত্যাগ করিবেন —এই ভয়ে আমি যদি পুত্রকে তাহার অভিপ্রেত বিধবাবিবাহ হইতে বিরত করিতাম, তাহা হইলে, আমা অপেক্ষা নরাধম আর কেহ হইত না। অধিক আর কি বলিব, সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করায় আমি আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিয়াছি। আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি, নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবেক, তাহা করিব, লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে কদাচ সঙ্কুচিত হইব না। অবশেষে আমার বক্তব্য এই যে, সমাজের ভয়ে বা অন্য কোন কারণে নারায়ণের সহিত আহার-ব্যবহার করিতে যাঁহাদের সাহস বা প্রবৃত্তি না হইবেক, তাঁহারা স্বচ্ছন্দে তাহা রহিত করিবেন; সেজন্য নারায়ণ কিছুমাত্র দুঃখিত হইবেক, এরূপ বোধ হয় না এবং আমিও তজ্জন্য বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট হইব না। আমার বিবেচনায় এরূপ বিষয়ে সকলেই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রেচ্ছ, অস্মদীয় ইচ্ছার অনুবর্তী বা অনুরোধের বশবর্তী হইয়া চলা কাহারও উচিত নহে। ইতি ৩১শে শ্রাবণ।

শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ
(স্বাঃ) শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মণঃ”

(বিহারীলাল সরকার : 'বিদ্যাসাগর'; পৃঃ ২৯৬-২৯৭)

বিদ্যাসাগরের এই পৌরুষব্যাঞ্জক চিঠি শম্ভুচন্দ্রের উদ্দেশ্যে লিখিত হলেও গ্রামের সনাতনপন্থী-প্রতিক্রিয়াশীল সমাজ ছিল এই চিঠির মূল লক্ষ্য। নারায়ণ বিধবাবিবাহ করলে যাঁরা তাঁদেরকে একঘরে করবেন বলে শাসিয়েছিলেন, তাঁরা বিদ্যাসাগরের সুদৃঢ় সংকল্পের কথা শুনে আর অধিক দূর অগ্রসর হতে সাহস করেননি। বিদ্যাসাগরের পূর্বোক্ত চিঠির উত্তরে শম্ভুচন্দ্র নিম্নোক্ত চিঠি দিয়েছেন :

“শ্রীশ্রীদুর্গা শরণম্

শ্রীচরণেষু—
প্রণতিপূর্বকং নিবেদনম্

মহাশয়ের পত্র পাইলাম, ২৭শে শ্রাবণ নারায়ণ বাবাজীউ ভবসুন্দরীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন শুনিয়া পরম আহ্লাদিত হইলাম। এতাবৎকাল আমরা অপরের বিবাহের উদ্যোগে প্রবৃত্ত ছিলাম; আপনাদের বাটীর কাহারো বিবাহ দিতে সমর্থ হই না, এই কারণে লোকে বলিত বিদ্যাসাগর মহাশয় পরের মাথায়

কাঁঠাল ভাঙ্গিবেন। অনেকে ভণ্ড ও প্রতারক মনে করিত। নারায়ণ বাবাজীউ আমাদের সেই কলঙ্ক ঘুচাইলেন, নারায়ণের যে এতদূর সাহস হইবে তাহা আমাদের স্বপ্নের অগোচর ; যাহা হউক নারায়ণকে ধন্যবাদ দিতে হয়।

আমি যে ইতিপূর্বে নিবারণকে পত্র লিখিয়াছিলাম, তাহা কেবল আত্মীয়-গণের অনুরোধে পড়িয়া লিখিয়াছিলাম তাহা পত্রেই ব্যক্ত আছে নচেত পত্র লেখা আমার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল না। শ্রীমতী জননী দেবী নারায়ণের বিবাহ সম্বাদ শুনিয়া পরম আহ্লাদিত হইলেন, ইতিমধ্যে কলিকাতা যাইয়া সাক্ষাৎ করিবার সম্পূর্ণ মানস আছে। ৺কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় পিতৃব্য মহাশয়ের শ্রাদ্ধোপলক্ষে অগত্যা ২।৪ দিন অবস্থিতি করিতে হইল, নারায়ণ বাবাজীউ ও বধূ মাতাকে অনুগ্রহ পূর্বক আমার আশীর্বাদ জানাইবেন। দুর্ভাগ্য প্রযুক্ত বিবাহের সময় যাইতে পাবি নাই। সমাচার পাইলে অবশ্য উপস্থিত হইতাম। নারায়ণের জননী দেবী বাটী পঁহুছিয়াছেন। ইতি ৪ ভাদ্র।

ভৃত্য

শ্রীশম্ভুচন্দ্রশর্মণঃ”

(চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : ‘বিদ্যাসাগর’ ; পৃঃ ৫০৮)

চণ্ডীচরণ ‘ভক্তি ভরে’ ‘পূজা’ করার জন্য বিদ্যাসাগরের জীবন-কাহিনী রচনায় অগ্রসর হযেছেন, ‘প্রাণের আবেগে’ তিনি বিদ্যাসাগর ‘পূজার আয়োজনে’ ব্রতী হয়েছেন। চণ্ডীচরণের ভাষায়—“আমি তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ, সে কৃতজ্ঞতা-ঋণ অপরিশোধ্য ; সেই অপরিশোধ্য ঋণ স্বীকার মানসে এই সুবৃহৎ গ্রন্থ রচনা।” সুতরাং তথ্য-নির্ভর বিদ্যাসাগর-জীবনী লিখতে গিয়ে তিনি অনেক সময়ে তথ্য পরিবেশনের তুলনায় বর্ণারোপ বেশি পছন্দ করেছেন ; তথ্যের সঙ্গে কল্পনার মিশ্রণে গড়ে তুলেছেন বিদ্যাসাগরকে মহামানব-রূপে। মাটির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে তিনি আকাশে উড়েছেন। বিদ্যাসাগর-চরিত্র-চিত্রণে সত্য-অসত্যের ভেদরেখা মুছে গিয়েছে, ভক্তির জোয়ারে যুক্তি ভেসে গিয়েছে। ফুলে-ফেঁপে ওঠা দামোদরের জলে অতিরঞ্জন ও অতিকল্পনার সঙ্গে বাস্তবতা মিলে-মিশে একাকার।

চণ্ডীচরণ বিদ্যাসাগরের মাতৃভক্তির উদাহরণ দিতে গিয়ে ঝঞ্ঝা-ক্ষুব্ধ বাত্যা-বিক্ষোভিত দামোদর নদের উত্তাল তরঙ্গ সাঁতার দিয়ে পার হওয়ার কাহিনী শুনিয়েছেন। চণ্ডীচরণ তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন, “তাঁহার তৃতীয় সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নের বিবাহ উপলক্ষে তাঁহার জননী তাঁহাকে বাটী যাইতে আদেশ করিয়া পাঠান। বিদ্যাসাগর মহাশয় কালেজের অধ্যক্ষ মার্শেল সাহেবের নিকট ছুটি চাহিলেন।” (‘বিদ্যাসাগর’ ; পৃঃ ৭১) কিন্তু মার্শেল তাঁকে ছুটি দিতে অসম্মত হলে তিনি কর্মপরিত্যাগের হুমকি দেওয়ায় মার্শেল তাঁর ছুটি মঞ্জুর করেন। আষাঢ় মাসে শম্ভুচন্দ্রের বিবাহ —ছুটি পাওয়ার পরেই প্রচণ্ড ঝড় ও মুষলধারে বৃষ্টি মাথায় করে বিদ্যাসাগর মায়ের কাছে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েছেন। বহুকষ্টে কর্দমাক্ত

পথঘাট অতিক্রম করে তিনি সন্ধ্যায় দামোদর নদের পূর্বপাড়ে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। সেরাতে দামোদর পার না হয়ে বিদ্যাসাগর স্থানীয় এক দোকানে আশ্রয় নিয়েছেন।

পরদিন সকালে ঝড়-বৃষ্টির মধ্যেই বিদ্যাসাগর দামোদর নদের তীরে উপস্থিত হলেন। 'ঈশ্বরচন্দ্রকে সে দিন যে কোন উপায়ে হউক বাটী পৌছিতেই হইবে। সেইদিন বিবাহ। তিনি জানিতেন, তিনি বাড়ি না গেলে, জননীর আর দুঃখের সীমা থাকিবে না। এই ভাবনার তাড়নায় তিনি ত্বরিতগমনে পথ চলিতে লাগিলেন। ক্রমে সেই ভীষণকলেবর দামোদর-তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দামোদরে বর্ষার ঢল নামিয়াছে, একগাছি তৃণ পড়িলে শত খণ্ড হইয়া যায়। পূর্ণকলেবর দামোদর, প্রবল তরঙ্গ তুলিয়া নৃত্য করিতে করিতে তীরবেগে ছুটিয়াছে।' ('বিদ্যাসাগর' ; পৃঃ ৭২)

কিন্তু নৌকা অপর পারে। নৌকার জন্য অপেক্ষা করলে সেদিন তিনি বীরসিংহে পৌছুতে পারবেন না। সুতবাং 'বিদ্যাসাগর মহাশয় আবদারে মায়ের আদেশ পালনের জন্য বর্ষার ভরা-দামোদরের জলোচ্ছ্বাসে অঙ্গ ঢালিয়া দিলেন। যাহারা পারে যাইবে বলিয়া বসিয়াছিল, তাহারা অনেকে নিষেধ করিল। কেহ কেহ বাধাও দিল, কিন্তু মাতৃআজ্ঞা পালনে বদ্ধপরিকর ঈশ্বরচন্দ্র কোন বাধাই মানিলেন না ; সবলদেহ বীরপুরুষ দামোদরের তরঙ্গ-সংগ্রামে জয়ী হইয়া পরপারে উঠিলেন।' ('বিদ্যাসাগর' ; পৃঃ ৭২)

অপরাহ্নে দারকেশ্বর নদও সাঁতরে পার হলেন। এবং 'প্রায় প্রহরার্ধ রাত্রি অতীত হইয়াছে, এমন সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় গৃহে পৌছিলেন। সেই সিক্ত বস্ত্রে ও ক্লান্ত শরীরে গৃহে প্রবেশ করিয়া, 'মা—মা, আমি আসিয়াছি' বলিয়া মাকে ডাকিতে লাগিলেন।' ('বিদ্যাসাগর' ; পৃঃ ৭৩)

চণ্ডীচরণকে অনুসরণ করায় বিহারীলালের 'বিদ্যাসাগর' গ্রন্থে অলঙ্কার-সমৃদ্ধ ভাষায় পূর্বোক্ত কাহিনী পরিবেষিত হয়েছে। কিন্তু চণ্ডীচরণ দামোদর-কাহিনী কার কাছ থেকে সংগ্রহ করেছেন, তা উল্লেখ করেননি। তবে যাঁর বিবাহ অর্থাৎ 'তৃতীয় সহোদর' শম্ভুচন্দ্রের কাছ থেকে পূর্বোক্ত কাহিনী তিনি সংগ্রহ করেননি। এমনকি বিদ্যাসাগরের কাছেও তিনি উক্ত কাহিনী শোনেননি। যে-সমস্ত ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের কাছে তিনি বিভিন্ন কাহিনী শুনেছেন, সেগুলির ক্ষেত্রে তিনি প্রসঙ্গ-সূত্র উল্লেখ করেছেন। প্রকাশের পূর্বে উক্ত কাহিনীর সত্যাসত্য তিনি যদি শম্ভুচন্দ্রের কাছ থেকে যাচাই করে নিতেন, তাহলে তাঁর ভ্রম নিরসনের জন্য শম্ভুচন্দ্রকে 'ভ্রমনিরাস' গ্রন্থ রচনা করতে হতো না।

চণ্ডীচরণ তাঁর গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে লিখেছিলেন, "সেদিন তারকেশ্বরের নিকট রাত্রিযাপন করিতে হইল।" ('বিদ্যাসাগর' ; পৃঃ ৮৭) কিন্তু শম্ভুচন্দ্র 'ভ্রমনিরাস' গ্রন্থে চণ্ডীচরণের ভ্রম সংশোধন করে লিখেছেন, "তৎকালে আমরা

কলিকাতা হইতে পদব্রজে বাটী যাইতাম। হাটখোলার ঘাটে পার হইয়া শালিখার বাঁধা রাস্তায় মোসাট নামক গ্রাম পর্যন্ত যাইয়া, ঐ বাঁধা রাস্তা ত্যাগ করিয়া মাঠের পথে বরাবর পশ্চিম মুখে রাজবলহাট নামক গ্রামে উপস্থিত হইতাম। পরে দামোদর পার হইয়া প্রায় পাঁচ ক্রোশ পথ যাইলে পর পাতুল নামক গ্রামে উপস্থিত হইতাম। তথা হইতে বীরসিংহা ছয় বা সাত ক্রোশ পশ্চিম।" সুতরাং "চণ্ডীবাবু যাহা লিখিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। কারণ তারকেশ্বরের নিকট দিয়া আমাদের বাটী যাইবার পথ নহে।" তারফলে চণ্ডীচরণ ভ্রম সংশোধন করে তাঁর গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে লিখেছেন, "সেদিন দামোদরের পূর্ব পারেই রাত্রি যাপন করিতে হইল।" কিন্তু চণ্ডীচরণ গ্রন্থের কোথাও এই ভুলের জন্য দুঃখ-প্রকাশ করেননি কিংবা ভ্রম সংশোধনের জন্য তিনি শম্ভুচন্দ্রের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেননি।

বিদ্যাসাগরের দামোদর নদ সাঁতরে পার হওয়ার প্রসঙ্গে শম্ভুচন্দ্র লিখেছেন, "চণ্ডীবাবু বর্ষাকালে ভরা দামোদর সাঁতরাইয়া পার হওয়ার কথা যে লিখিয়াছেন, তাহা নিতান্ত অসঙ্গত। বোধ করি, চণ্ডীবাবু বর্ষাকালে রাজবলহাট গ্রামের সন্নিকটে দামোদর নদের অতি ভীষণমূর্তি কখনও স্বচক্ষে দেখেন নাই; তজ্জন্যই এরূপ অসম্ভব কথা লিখিয়াছেন। এরূপ মিথ্যা ও অসঙ্গত কথা লিখিয়া পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করার আবশ্যক কি? বন্যার সময় দামোদরের এত জল বৃদ্ধি হয় যে, ঐ নদের পশ্চিম প্রায় চারি ক্রোশ পর্যন্ত মাঠ জলমগ্ন থাকে।"

কেবলমাত্র বর্ষাকালে দামোদর নদ সাঁতরে পার হওয়ার অবাস্তব গল্প নয়, কিংবা 'তারকেশ্বরে রাত্রি যাপন করা নয়, চণ্ডীচরণ শম্ভুচন্দ্রের বিবাহোপলক্ষে বীরসিংহে যাওয়ার বিষয়ে আরো যে-সমস্ত সংবাদ দিয়েছেন, শম্ভুচন্দ্র সেগুলিকে মিথ্যা, অলীক বলে অভিহিত করেছেন। শম্ভুচন্দ্রের মতে মার্শেল সাহেবের কাছ থেকে ছুটির অনুমতি নিয়ে কর্মস্থল থেকে বাড়িতে এসে খাওয়া-দাওয়া করে সেদিনেই 'সতের-আঠার ক্রোশ পথ' অতিক্রম করা কারোর পক্ষেই, এমনকি বিদ্যাসাগরের পক্ষেও সম্ভব নয়। 'প্রকৃত কথা এই যে, সাহেবের নিকট বিদায় লইয়া চারটার পর কলিকাতা হইতে জনাই গ্রামের নিকট চণ্ডীতলা নামক গ্রামে সরাইতে রাত্রিযাপন করিয়াছিলেন।'

বিদ্যাসাগর-চরিত্রে অলৌকিক ক্ষমতা আরোপ করা পছন্দ নয় বলেই শম্ভুচন্দ্র 'বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত' গ্রন্থে তাঁর নিজের বিবাহোপলক্ষে বর্ষাকালে বিদ্যা-সাগরের দামোদর নদ সাঁতরে পার হওয়ার অবাস্তব গল্প লেখেননি। তাছাড়া নগেন্দ্রনাথ বসু রচিত ও বিদ্যাসাগরের জীবদ্দশায় প্রকাশিত (১২৯৮ বঙ্গাব্দ) 'বিশ্বকোষ' (২য় খণ্ড) নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ বিদ্যাসাগরের সংক্ষিপ্ত জীবন-কাহিনীতে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী উল্লেখ করা হলেও দামোদর নদ পার হওয়ার কোনো গল্প নেই। প্রকৃতপক্ষে চণ্ডীচরণের উক্ত রোমান্টিক গল্প প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে অন্য কেউ এই কাহিনী প্রকাশ করেননি।

শম্ভুচন্দ্র চণ্ডীচরণের ভ্রমনিরসন করা সত্ত্বেও চণ্ডীচরণ এই ভুল সংশোধন না করে উক্ত অবাস্তব গল্পের সমর্থনে তাঁর গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে লিখেছেন, "সেকালের দামোদরে আর একালের দামোদরে অনেক প্রভেদ। ১৮৫৬ খ্রীঃ ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে খোলা হইলে পর, সহসা দামোদরের অত্যধিক জল বৃদ্ধির আশঙ্কাজনিত বিপদ নিবারণের জন্য পূর্ব্ব পারে বাঁধ দেওয়া হইয়াছে। সেইজন্য পশ্চিম পারে ৪।৫ ক্রোশ ভাসিয়া যায়। ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে বন্যার জল দৈবাৎ নদের কূল অতিক্রম করিত। আমার বর্ণিত ঘটনা রেলওয়ে হইবার অনেক পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল।" ('বিদ্যাসাগর' ; পৃঃ ৯১)

কিন্তু ইন্দ্র মিত্র সরকারি দলিল-পত্র উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন যে "চণ্ডীচরণের এ-উক্তি সম্পূর্ণ অসত্য। ১৮৫৬ সালের আগেও বন্যার জল দামোদরের কূল অতিক্রম করত, এবং সে-ঘটনা নিতান্ত দৈবাৎ নয়। ১৮৫৬ সালের আগে থেকেই দামোদরের দক্ষিণ পাড়ে বাঁধ ছিল। ১৮৫১ সাল থেকে দামোদরের বাঁ-পাড়ে বাঁধ দেবার কাজ আরম্ভ হয়। কিন্তু বাঁধের সঙ্গে রেলওয়ের কোনো সম্পর্ক নেই। ১৮৫২ সাল থেকে আরম্ভ হয়েছে দামোদরের বন্যা ও বাঁধ সম্পর্কে রীতিমতো সরকারী অনুসন্ধান। প্রমাণের জন্য দ্রষ্টব্য : Selections from the records of the Bengal Govt. containing papers from 23rd January, 1852 to 18th May, 1863 relating to the Damoder floods and embankments, vol. 1, Calcutta, 1916.

"১৮৪০ সালে দামোদরের যে বন্যা হয় তাতে হুগলী জেলায়—'a discharge of about 6 lakhs cubic feet per second was recorded.'

"১৮৫৬ সালে প্রকাশিত Beadle সাহেবের মানচিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে দামোদর গড়ে আধমাইল চওড়া, তীরভূমি গড়ে দশ ফুট উঁচু, 'The floods rise from 14 to 16 feet above the level of dry weather stream.'

"১৮৬৫ সালে দামোদরের বদলে মুণ্ডেশ্বরী নদী মুখ্যপ্রবাহমুখ হওয়ার ফলে দামোদরের চরিত্র অনেক শান্ত হয়ে যায়। তার আগে অন্ততপক্ষে শ-খানেক বছরের মধ্যে দামোদরের চরিত্রে বিশেষ কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। এবং সেই চরিত্রের পরিচয় আছে Beadle সাহেবের ম্যাপে।" (ইন্দ্র মিত্র : 'করুণাসাগর বিদ্যাসাগর' ; পৃঃ ১১৯)

এই জাতীয় অসংখ্য ভুল চণ্ডীচরণ-বিহারীলালের গ্রন্থে ছড়িয়ে রয়েছে। বিদ্যাসাগরের বংশাবলী, কলকাতায় ঠাকুরদাসের দিনযাপন, বাল্যজীবনে বিদ্যাসাগরের দুরন্তপনা, বিদ্যাসাগরের বিবাহ, সংস্কৃত কলেজের শিক্ষক রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, সংস্কৃত কলেজ নির্মাণ, ইংরেজিশিক্ষা গ্রহণ, ঠাকুরদাসের বেতন, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ছাত্রাবাসে অন্নগ্রহণ, পথিমধ্যে দুর্ঘটনা ইত্যাদি বিষয়ে বহু ভুল তথ্যে পূর্ণ চণ্ডীচরণের 'বিদ্যাসাগর' গ্রন্থ। চণ্ডীচরণের ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ গ্রন্থ অধ্যয়ন করে

পাঠকেরা যাতে বিভ্রান্ত না হন, 'চণ্ডীচরণের প্রণীত "বিদ্যাসাগরে" যে রাশি রাশি ভ্রম' আছে, শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন সেই ভুলগুলির মধ্যে 'কতকগুলির সংশোধন মানসে এই "ভ্রমনিরাস" নামক পুস্তকখানি' রচনা করেছেন।

ভক্তি ভরে পূজা নিবেদন করতে গিয়ে চণ্ডীচরণ বিদ্যাসাগরকে দেবতা বানিয়েছেন, মানুষ করেননি। মর্তের মানুষের জীবন-কাহিনী নয়, তিনি রচনা করেছেন দেব কাহিনী। ধূলি-ধূসরিত মর্ত-জীবনের চিহ্নগুলি ধুয়ে-মুছে তিনি বিদ্যাসাগরের যে-জীবনকাহিনী রচনা করেছেন, তাতে তথ্য-আর কল্পনার মিশ্রণে মানুষ বিদ্যাসাগরের পরিবর্তে গড়ে উঠেছে বিদ্যাসাগরের দেব-মূর্তি। চণ্ডীচরণ বর্ণিত কাল্পনিক কাহিনীগুলিকে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করায় বিহারীলাল রচিত জীবনী-গ্রন্থ 'বিদ্যাসাগর' তথ্যনিষ্ঠ হয়নি। বিহারীলাল বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহের তীব্র সমালোচক হলেও বিদ্যাসাগর-চরিত্রের মর্যাদা তাঁর গ্রন্থের কোথাও ক্ষুণ্ণ করেননি। পক্ষান্তরে, চণ্ডীচরণের গ্রন্থভুক্ত ভুল তথ্য ও কাল্পনিক ঘটনাবলী তাঁর গ্রন্থে সন্নিবেশিত হওয়ায় তাঁর গ্রন্থও প্রামাণিক হয়নি।

অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে মেরুদণ্ডী প্রাণীর আবির্ভাব যেমন জীব-বিজ্ঞানে ব্যতিক্রম বলে গণ্য হয়, তেমনি বিদ্যাসাগরের জন্মগ্রহণ ও তাঁর কর্মকাণ্ড ছিল এদেশের ইতিহাসে ব্যতিক্রম। 'বিদ্যাসাগর এই অকৃতকীর্তি অকিঞ্চিৎকর বঙ্গসমাজের মধ্যে নিজের চরিত্রকে মনুষ্যত্বের আদর্শরূপে প্রস্ফুট করিয়া যে এক অসামান্য অনন্যতন্ত্রত্ব প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বাংলার ইতিহাসে অতিশয় বিরল।' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'বিদ্যাসাগর-চরিত' ; পৃঃ ১৬)। সেইজন্য তাঁর অনন্যসাধারণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল নিজ গুণে সমুজ্জ্বল, কল্পনার রঙে রাঙিয়ে তাঁর জীবন-কাহিনী রচনার কোনো প্রয়োজন ছিল না। চণ্ডীচরণ-বিহারীলাল অনুভব করতে পারেননি যে, বিদ্যাসাগর-চরিত্রের 'প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় পৌরুষ এবং তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব।' তাঁরা এই সত্য উপলব্ধি করতে পারেননি যে, 'যাঁহাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের পরিমাণ অধিক, চিরাগত প্রথা ও অভ্যাসের জড় আচ্ছাদনে তাঁহাদের সেই প্রবল শক্তিকে চাপা দিয়া রাখিতে পারে না।'—রবীন্দ্রনাথ : ঐ ; পৃঃ ১৬।

'বিদ্যাসাগরের চরিত্রে যাহা সর্বপ্রধান গুণ, যে-গুণে তিনি পল্লী-আচারের ক্ষুদ্রতা, বাঙালিজীবনের জড়ত্ব সবলে ভেদ করিয়া একমাত্র নিজের গতিবেগ-প্রাবল্যে কঠিন প্রতিকূলতার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া—হিন্দুত্বের দিকে নহে, সাম্প্রদায়িকতার দিকে নহে—করুণার অশ্রুজলপূর্ণ উন্মুক্ত অপার মনুষ্যত্বের অভিমুখে আপনার দৃঢ়নিষ্ঠ একাগ্র একক জীবনকে প্রবাহিত করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন' (—রবীন্দ্রনাথ : ঐ ; পৃঃ ১৩), সেই চরিত্রের গুণকীর্তনের জন্য গল্প-কথার প্রয়োজন হয় না, তথ্যনিষ্ঠ বর্ণনাই ছিল বিদ্যাসাগরের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণের সর্বোত্তম উপায়। কিন্তু চণ্ডীচরণ-বিহারীলাল সেই পথ অনুসরণ না করায় তাঁদের

রচিত দুটি গ্রন্থ গল্প-লেখকদের কাছে সমাদৃত হলেও বিজ্ঞানমনস্ক-যুক্তিবাদী পাঠক-গবেষকেরা বিদ্যাসাগর-চরিত্রের মূল্যায়ন-কালে তাঁদের গ্রন্থ অবলম্বন করেননি। বিদ্যাসাগর-চরিত্রের অনন্যসাধারণ গুণাবলীর পরিচয় দেবার জন্য তাঁরা শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত 'বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত' অনুসরণ করেছেন। কালের বিচারে উত্তীর্ণ 'বিদ্যাসাগর-চরিত' প্রবন্ধ রচনাকালে রবীন্দ্রনাথ শম্ভুচন্দ্রের 'বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত'কে অবলম্বন করেছেন ; চণ্ডীচরণ কিংবা বিহারীলাল কারোর গ্রন্থই তিনি অনুসরণ করেননি। কারণ, শম্ভুচন্দ্র মানুষ-বিদ্যাসাগরের জীবনালেখ্য রচনা করতে গিয়ে তাঁর গ্রন্থে কাল্পনিক ঘটনার সমাবেশ ঘটাননি, কিংবা তাঁর গ্রন্থে ভুল তথ্য পরিবেষিত হয়নি। সঠিক তথ্য উপস্থাপনের জন্য তাঁর গ্রন্থ প্রামাণিক হওয়ায় রবীন্দ্রনাথ সহ সচেতন পাঠকদের কাছে একমাত্র প্রামাণ্য জীবনী গ্রন্থ-রূপে সমাদৃত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের 'নির্ভীক বলিষ্ঠতা, সত্যচারিতা, লোকহিতৈষা, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা এবং আত্মনির্ভরতা'র উৎস সন্ধান করতে গিয়ে 'ঈশ্বরচন্দ্রের পূর্ব পুরুষের মধ্যে মহত্ত্বের উপকরণ প্রচুর পরিমাণে' দেখতে পেয়েছেন। সুতরাং বিদ্যাসাগর-চরিত্রে পূর্বপুরুষদের প্রভাব নিরূপণের জন্য বিদ্যাসাগরের পিতৃকুল ও মাতৃকুল বিষয়ে আলোকপাতের প্রয়োজন। অথচ শম্ভুচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পূর্বপুরুষদের যে পরিচয় দিয়েছেন, তাতে পূর্বপুরুষদের মহানুভবতা, বলিষ্ঠতা, অনমনীয় দৃঢ়তা, সাহসিকতা, সহমর্মিতা ইত্যাদি গুণগুলির সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় না। সেজন্য বিনয় ঘোষ 'বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালী সমাজ' গ্রন্থে বিদ্যাসাগর-চরিত্রে পূর্বপুরুষদের প্রভাব সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

জাহানাবাদ পরগণার অন্তর্গত বনমালীপুর গ্রামে বিদ্যাসাগরের 'পিতৃপক্ষীয় পূর্বপুরুষদিগের বহুকালের বাসস্থান' ছিল। পলাশীর যুদ্ধের সময়ে বিদ্যাসাগরের প্রপিতামহ ভুবনেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় (তর্কালঙ্কার) এই গ্রামে বসবাস করতেন। তিনি ছিলেন সংস্কৃত শাস্ত্রে খ্যাতনামা পণ্ডিত। ভুবনেশ্বরের পাঁচ পুত্র—নৃসিংহরাম, গঙ্গাধর, রামজয়, পঞ্চানন ও রামচরণ। তৃতীয় পুত্র রামজয় তর্কভূষণের সঙ্গে আরামবাগ মহকুমার অন্তর্গত বীরসিংহ-নিবাসী ব্যাকরণ-শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত উমাপতি তর্কসিদ্ধান্তের তৃতীয়া কন্যা দুর্গাদেবীর বিবাহ হয়। রামজয়ের দুই পুত্র—ঠাকুরদাস ও কালিদাস এবং চার কন্যা—মঙ্গলা, কমলা, গোবিন্দমণি ও অন্নপূর্ণা।

খানাকুল-কৃষ্ণনগরের নিকটবর্তী পাতুলগ্রাম-নিবাসী স্মৃতিশাস্ত্রে বিখ্যাত পণ্ডিত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় (বিদ্যাবাগীশ) ভুবনেশ্বর ও উমাপতির সমসাময়িক ছিলেন। তাঁর চার পুত্র —রাধামোহন বিদ্যাভূষণ, রামধন ন্যায়রত্ন, গুরুপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায় এবং দুই কন্যা—গঙ্গা দেবী ও তারা দেবী। আরামবাগ থেকে প্রায় তিন ক্রোশ দূরে গোঘাট গ্রাম-নিবাসী তন্ত্রোপাসক রামকান্ত তর্ক-

বাগীশের (চট্টোপাধ্যায়) সঙ্গে গঙ্গা দেবীর বিবাহ হয়। রামকান্তের দুই কন্যা—লক্ষ্মী দেবী ও ভগবতী দেবী। ব্যাকরণ ও স্মৃতিশাস্ত্রে সুগভীর পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি 'তর্কবাগীশ' উপাধি পেয়েছিলেন।

রামজয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে রামকান্ত তর্কবাগীশের কনিষ্ঠা কন্যা ভগবতী দেবীর বিবাহ হয়। ঠাকুরদাসের সাত পুত্র—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন, শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন, হরচন্দ্র, হরিশচন্দ্র, ঈশানচন্দ্র ও শিবচন্দ্র এবং তিন কন্যা—মনোমোহিনী, দিগম্বরী ও মন্দাকিনী। অল্প বয়সে হরচন্দ্র, হরিশচন্দ্র ও শিবচন্দ্রের মৃত্যু হয়।

বিদ্যাসাগরের পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ, পিতামহী দুর্গাদেবী, মাতামহ রামকান্ত তর্কবাগীশ, মাতামহী গঙ্গা দেবী, পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা ভগবতী দেবী। ঠাকুরদাসের মাতুলালয় বীরসিংহ গ্রাম, বিদ্যাসাগরের মাতুলালয় গোঘাট গ্রাম এবং বিদ্যাসাগর-জননী ভগবতী দেবীর মাতামহ পঞ্চানন বিদ্যাবাগীশ ও মাতুলালয় রাধানগরের অদূরবর্তী পাতুল গ্রাম। ভগবতী দেবীর মাতুল-পরিবার বিদ্যাসাগরের জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। বিদ্যাসাগর উচ্ছ্বসিত ভাষায় এই পরিবারের প্রশংসা করেছেন, "অতিথির সেবা ও অভ্যাগতের পরিচর্য্যা, এই পরিবারে, যেরূপ যত্ন ও শ্রদ্ধা সহকারে সম্পাদিত হইত, অন্যত্র প্রায় সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ ঐ অঞ্চলের কোনো পরিবার এবিষয়ে এই পরিবারের ন্যায় প্রতিপত্তিলাভ করিতে পারেন নাই।"

বীরসিংহ গ্রামের অনতিদূরে ক্ষীরপাই গ্রামের অধিবাসী শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্যের কন্যা দিনময়ী দেবীর সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রের বিবাহ হয় এবং তাঁদের এক পুত্র—নারায়ণ ও চার কন্যা —হেমলতা, কুমুদিনী, বিনোদিনী ও শরৎকুমারী।

বনমালীপুর, বীরসিংহ, পাতুল, গোঘাট ও ক্ষীরপাই —এই পাঁচটি গ্রামের পারস্পরিক দূরত্ব খুব বেশি নয় এবং এই গ্রামগুলি খানাকুল-কৃষ্ণনগরের বিদ্বৎ-সমাজের প্রভাবাধীন ছিল এবং পারিবারিক সূত্রে এই পাঁচটি গ্রামের সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। 'বনমালীপুর বিদ্যাসাগরের পূর্বপুরুষদের বাসস্থান, বীরসিংহ বিদ্যাসাগরের পিতার মাতুলালয়, পাতুল বিদ্যাসাগর-জননীর মাতুলালয়, গোঘাট বিদ্যাসাগরের নিজের মাতুলালয়। পরে বিদ্যাসাগর-পরিবার বনমালীপুর ছেড়ে বীরসিংহে বসতি স্থাপন করেন। বনমালীপুর, বীরসিংহ, পাতুল, গোঘাট, প্রত্যেকটি গ্রামে দেখা যায়, বিদ্যাসাগরের প্রপিতামহ ও পিতামহের কালে, বিখ্যাত পণ্ডিতদের বসবাস ছিল। এইসব বিদ্যাসমাজের ঐতিহ্যই কি উত্তরাধিকার-সূত্রে ঈশ্বরচন্দ্র পেয়েছিলেন ?' (বিনয় ঘোষ: 'বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালী সমাজ'; পৃঃ ৮)

ভুবনেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, উমাপতি তর্কসিদ্ধান্ত, পঞ্চানন বিদ্যাবাগীশ, রামকান্ত তর্কবাগীশ প্রমুখ সকলেই সেকালে বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁদের প্রতিষ্ঠিত চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়নের জন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছাত্ররা আসতেন।

ঠাকুরদাস তাই দেখে বীরসিংহ গ্রামে চতুষ্পাঠী স্থাপনের জন্ম পুত্র ঈশ্বরচন্দ্রকে সংস্কৃত-শাস্ত্রে শিক্ষিত করতে চেয়েছিলেন এবং বাল্যকাল থেকে অধ্যয়নের প্রতি প্রবল অনুরাগ বিদ্যাসাগর পেয়েছিলেন পিতৃকুল ও মাতৃকুল থেকে। কেবলমাত্র বিদ্যানুরাগ নয়, স্বাতন্ত্র্যবোধ, মর্যাদাবোধ, মমত্ববোধ ও সমদর্শী চেতনা যা বিদ্যাসাগরকে অত্যন্ত সংবেদনশীল করে গড়ে তুলেছিল, তা তিনি পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার-সূত্রে কিছুটা পেয়েছিলেন। পিতামহ রামজয়, পিতামহী দুর্গা দেবী, মাতামহ রামকান্ত, মাতামহী গঙ্গা দেবী, পিতা ঠাকুরদাস, মাতা ভগবতী দেবী ও জননী ভগবতীর মাতুল রাধামোহন বিদ্যাভূষণের কাছ থেকে ঈশ্বরচন্দ্র পেয়েছিলেন চারিত্রিক বলিষ্ঠতা, অসম সাহসিকতা, রোদন প্রবর্ণতা, ন্যায়বাদীতা, সমদর্শিতা, অনমনীয় মানসিকতা, সেবাপরায়ণতা ইত্যাদি গুণাবলী। রামজয়ের অসম সাহসিকতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা ও আপোষহীন মানসিকতা; দুর্গা দেবীর তেজস্বিতা, প্রবল আত্মমর্যাদা ও কষ্টসহিষ্ণুতা; রামকান্তের সত্যোপলব্ধির জন্য ঐকান্তিকতা; গঙ্গা দেবীর সেবাপরায়ণতা ও সহনশীলতা; ভগবতীর জ্যেষ্ঠ মাতুল রাধামোহনের সমদর্শিতা ও পরোপকারেচ্ছার মানসিকতা, ঠাকুরদাসের প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের মানসিকতা ও ভগবতী দেবীর সহানুভূতিশীলতা, রোদনপ্রবণতা, ন্যায়বাদিতা ও সত্যবাদিতা ইত্যাদির সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে এক অনন্যসাধারণ বিদ্যাসাগর-চরিত্র।

এই অনন্যসাধারণ চরিত্রের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারণ করতে গিয়ে আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলেছেন, "অনুবীক্ষণ নামে এক রকম যন্ত্র আছে; তাহাতে ছোট জিনিষকে বড় করিয়া দেখায়; বড় জিনিষকে ছোট দেখাইবার নিমিত্ত উপায় পদার্থবিদ্যাশাস্ত্রে নির্দিষ্ট থাকিলেও, ঐ উদ্দেশ্যে নির্মিত কোন যন্ত্র আমাদের মধ্যে সর্বদা ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত বড় জিনিষকে ছোট দেখাইবার জন্য নির্ম্মিত যন্ত্রস্বরূপ। আমাদের দেশের মধ্যে যাঁহারা খুব বড় বলিয়া আমাদের নিকট পরিচিত, ঐ গ্রন্থ একখানি সম্মুখে ধরিবামাত্র তাঁহারা সহসা অতি ক্ষুদ্র হইয়া পড়েন; এবং এই যে বাঙ্গালীত্ব লইয়া আমরা অহোরাত্র আস্ফালন করিয়া থাকি, তাহাও অতি ক্ষুদ্র ও শীর্ণ কলেবর ধারণ করে। দুই চতুষ্পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্রতার মধ্যস্থলে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ধবল পর্বতের ন্যায় শীর্ষ তুলিয়া দণ্ডায়মান থাকে; কাহারও সাধ্য নাই যে সেই উচ্চ চূড়া অতিক্রম করে বা স্পর্শ করে।"

কিন্তু এই অভ্রংলিহ চরিত্রের নামোচ্চারণে আমাদের অধিকার কি বর্তমান অবক্ষয়ী সমাজের আছে? তাঁর নামোচ্চারণে আমাদের অধিকার না থাকলেও মানবতাবোধ ও সুস্থ-উন্নত জীবনাদর্শে উদ্বুদ্ধ হওয়ার স্বার্থে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁকে স্মরণের প্রয়োজন। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের ভাষায় বলা যায়, "রত্নাকরের রামনাম উচ্চারণে ক্ষমতা ছিল না। অগত্যা 'মরা' 'মরা' বলিয়া তাঁহাকে উদ্ধার লাভ করিতে হইয়াছিল।

"এই পুরাতন পৌরাণিক নজীরের দোহাই দিয়া আমাদিগকেও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নামকীর্তনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। নতুবা ঐ নাম গ্রহণ করিতে আমাদের কোনরূপ অধিকার আছে কিনা, এ বিষয়ে ঘোর সংশয় আরম্ভেই উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। বস্তুতঃ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এত বড় ও আমরা এত ছোট, তিনি এত সোজা ও আমরা এত বাঁকা যে, তাঁহার নামগ্রহণ আমাদের পক্ষে বিষম আস্পর্দ্ধার কথা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।...

"বিদ্যাসাগরের উপাসনায় এই অধিকার-অনধিকারের কথা আসে বলিয়া, প্রথমেই আমাকে রত্নাকরের নজীর আশ্রয় করিতে হইয়াছে। বিদ্যাসাগরের উপাসনায় আমাদের অধিকার না থাকিতে পারে; এবং বিদ্যাসাগরের জীবনের ও বিদ্যাসাগরের চরিতের সম্পূর্ণ তাৎপর্য আমাদের সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হওয়াও হয়ত অসম্ভব; তথাপি এই সাংবাৎসরিক উপাসনা বর্ষে বর্ষে অনুষ্ঠিত হইয়া আমাদের জাতীয় চরিত্রের কলঙ্ক ক্রমশঃ ধৌত করিবে, এই আমাদের একমাত্র ভরসা। পূজিতের প্রীতি-উৎপাদন বোধ হয় আমাদের শাস্ত্রবিহিত শ্রাদ্ধতর্পণাদি ব্যাপারের উদ্দেশ্য নহে; পূজক আত্মোন্নতি বিধানের জন্য ঐ সকল অনুষ্ঠান-সাধনে বাধ্য। বিদ্যাসাগরের প্রেতপুরুষের প্রীতিজনন আমাদের অসাধ্য হইলেও আমরা স্বার্থের অনুরোধে ঐ কার্যে প্রবৃত্ত হইতে পারি।" এবং সেজন্যই প্রয়োজন শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন রচিত 'বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত' পাঠ ও অনুশীলন।

* * * *

'বিদ্যাসাগর-জীচনচরিত' গ্রন্থে বর্ণিত ঘটনাবলীকে শম্ভুচন্দ্র বিষয়ানুযায়ী বিভিন্ন অধ্যায়ে চিহ্নিত করেননি; যদিও তিনি কয়েকটি শিরোনামে ও উপশিরেনামে সমগ্র কাহিনীকে গ্রথিত করেছেন। কিন্তু এই শিরোনাম ও উপশিরোনাম-গুলিকে তিনি সূচীপত্রে লিপিবদ্ধ করেননি। গ্রন্থের মধ্যে সূচীপত্র না থাকায় পাঠকদের পক্ষে তা অসুবিধার কারণ হয়। অবশ্য তৎকালে বিষয়ানুযায়ী সূচীপত্র রচনার প্রথা গড়ে ওঠেনি। পরবর্তীকালে পাঠকদের সুবিধার্থে গ্রন্থ-মধ্যে বিষয়ানু-সারে সূচী-বিন্যাস করার রীতি অনুসৃত হয়েছে।

তাই পাঠকদের স্বার্থে শম্ভুচন্দ্রের গ্রন্থের শিরোনামগুলিকে বর্তমান 'চিরায়ত সংস্করণ'-এ বিভিন্ন অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে এবং উপশিরোনামগুলিকে যথাযথ স্থানে সন্নিবেশিত হয়েছে; কেবলমাত্র একটি নতুন উপশিরোনাম ('মহাপ্রয়াণ') দেওয়া হযেছে। সর্বোপরি, অধ্যায়ভুক্ত ঘটনাবলীর সূচীপত্র তৈরি করা হয়েছে।

শম্ভুচন্দ্র তাঁর গ্রন্থে বিদ্যাসাগরের বংশলতিকা না দেওয়ায় বিদ্যাসাগরের উর্ধ্বতন ও অধস্তন পুরুষের সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যায় না। চণ্ডীচরণের গ্রন্থে লিখিত বিদ্যাসাগরের বংশলতিকা ভ্রমপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ। সর্বোপরি তাঁর রচিত বংশলতিকায় পুরুষশাসিত দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। তাই বর্তমান গ্রন্থে বিদ্যাসাগরের

ঊর্ধ্বতন তিন পুরুষ ও অধস্তন তিন পুরুষের একটি সম্পূর্ণ বংশলতিকা তৈরি করে দেওয়া হয়েছে, যেখানে নারীরা উপেক্ষিতা হননি।

বক্ষমান গ্রন্থ সম্পাদনে দুর্লভ গ্রন্থ সরবরাহ করে প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করেছেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগারিক অরুণা চট্টোপাধ্যায়, সহকারী গ্রন্থাগারিক প্রশান্তকিশোর রায় ও অরুণ চাঁদ দত্ত, বিশ্বনাথ মুখার্জী, যামিনীমোহন আদক প্রমুখ। অনিয়মিত বেতন-প্রাপ্তি সত্ত্বেও তাঁদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করছি।

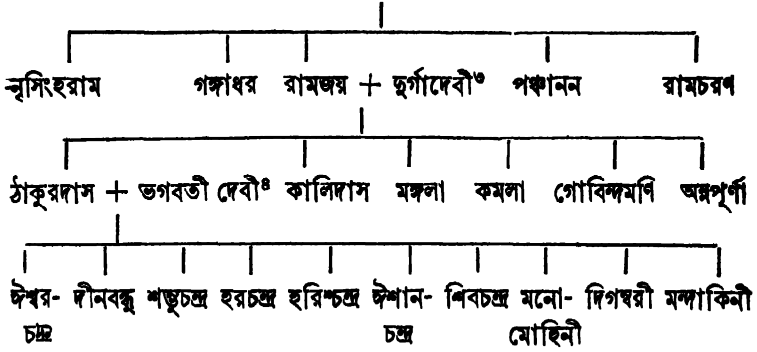
বংশলতিকা প্রণয়নে সাহায্য করেছেন বিদ্যাসাগরের প্রদৌহিত্র সন্তোষকুমার অধিকারী। তাঁর অকৃপণ সহায়তা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি।

আলোচ্য গ্রন্থ মুদ্রণকালে শম্ভুচন্দ্রের অবলম্বিত সাধুরীতির কাঠামো অক্ষুণ্ণ রাখা হলেও পুরোনো বানান-রীতি বজায় রাখা সম্ভব হয়নি। মুদ্রণের সুবিধার্থে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নির্দেশিত বানান-রীতি বর্তমান সংস্করণে অনুসরণ করা হয়েছে। তদুপরি, শম্ভুচন্দ্র অনেক সময়ে একই শব্দের উচ্চারণ বিভিন্ন বানানে লিখেছেন। কিন্তু একই শব্দের বিভিন্ন বানান প্রথম সংস্করণে থাকলেও আলোচ্য গ্রন্থে কেবলমাত্র একটি বানান অনুসৃত হয়েছে। যেমন 'বীরসিংহ', 'বীরসিংহা'— এই দুটি বানানের পরিবর্তে 'বীরসিংহা' সর্বত্র মুদ্রিত হয়েছে।

শম্ভুচন্দ্রের গ্রন্থটি বহুকাল দুষ্প্রাপ্য থাকায় বিদ্যাসাগর-গবেষণার ক্ষেত্রে পাঠক-গবেষকদের প্রবল অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে এবং জীবন-কাহিনীর নামে গল্পকথা প্রচলিত থাকায় তাঁরা বিভ্রান্ত হচ্ছেন। বিদ্যাসাগর-চরিত্র অনুধাবনের জন্য এই দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের অপরিসীম গুরুত্ব উপলব্ধি করে 'চিরায়ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিঃ'-এর পক্ষ থেকে বন্ধুবর শিবব্রত গঙ্গোপাধ্যায় এই গ্রন্থ প্রকাশে উদ্যোগী হয়ে সারস্বত সমাজের কাছে কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

বিদ্যাসাগরের বংশলতিকা[1]

[ঊর্ধ্বতন তিন পুরুষ]



---

১. চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বিদ্যাসাগর' গ্রন্থে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'বংশাবলী' প্রকাশ করে লিখেছিলেন যে, বিদ্যাসাগরেরা ছয় ভাই। কিন্তু শম্ভুচন্দ্র 'ভ্রমনিরাস' গ্রন্থে চণ্ডীচরণকে ভ্রম সংশোধনের পরামর্শ দিয়ে লিখেছিলেন, "বিদ্যা-সাগরেরা সাত ভাই। যথা—জ্যেষ্ঠ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দ্বিতীয় দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন, তৃতীয় শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন, চতুর্থ হরচন্দ্র, পঞ্চম হরিশ্চন্দ্র, ষষ্ঠ ঈশানচন্দ্র, সপ্তম শিবচন্দ্র। সম্ভবতঃ চণ্ডীবাবু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরিবারের বিষয় ভালরূপ জানেন না। এই জন্যই বিদ্যাসাগরের একটি ভ্রাতার নাম লোপ করিয়াছেন। তাঁহার নাম শিবচন্দ্র। ঈশানচন্দ্র, হরচন্দ্র ও হরিশ্চন্দ্রের অনুজ হইলেও ইঁহাকে অগ্রজ ভাবে সাজাইয়াছেন।" তদনুযায়ী চণ্ডীচরণের গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে উক্ত ভ্রম সংশোধিত হয়। তবে দ্বিতীয় সংস্করণেও চণ্ডীচরণ বিদ্যাসাগরের মধ্যম জামাতা অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়েব পরিবর্তে অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন। বিদ্যা-সাগরের প্রদৌহিত্র (ঈশ্বরচন্দ্রের তৃতীয়া কন্যা বিনোদিনীর পৌত্র) শ্রী সন্তোষকুমার অধিকারী তাঁর গ্রন্থে ('বিদ্যাসাগরের শেষ ইচ্ছা') এই ভুল সংশোধন করে লিখেছেন অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়। তদুপরি, চণ্ডীচরণের লিখিত 'বংশাবলী' অসম্পূর্ণ ও পুরুষ-শাসিত সমাজের দৃষ্টিভঙ্গীতে রচিত হয়েছে। কারণ উক্ত 'বংশাবলী'তে বিদ্যাসাগর-পরিবারের পুরুষদের নাম থাকলেও নারী-সদস্যাদের নাম নেই। সেকারণে, বর্তমান গ্রন্থে শ্রী অধিকারীর সাহায্যে ঈশ্বরচন্দ্রের ঊর্ধ্বতন তিন পুরুষ ও অধস্তন তিন পুরুষের সম্পূর্ণ বংশলতিকা তৈরি করে দেওয়া হলো।

২. ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের সময়ে আরামবাগের অনতিদূরস্থ বনমালী-পুর গ্রামে ঈশ্বরচন্দ্রের প্রপিতামহ ভুবনেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় (তর্কালঙ্কার) বাস

করতেন। উক্ত গ্রাম ছিল বিদ্যাসাগরের 'পিতৃপক্ষীয় পূর্বপুরুষদিগের বহুকালের বাসস্থান।'

৩. দুর্গাদেবীর পিতা উমাপতি তর্কসিদ্ধান্ত বীরসিংহে বাস করতেন। তিনি ভুবনেশ্বরের সমসাময়িক ছিলেন। তর্কসিদ্ধান্তের তৃতীয়া কন্যা দুর্গাদেবীর সঙ্গে তর্কালঙ্কারের তৃতীয় পুত্র রামজয়ের বিবাহ হয়। পিতার মৃত্যুর পরে ভ্রাতাদের সঙ্গে মতান্তর হওয়ায় রামজয় সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ কবে হঠাৎ দেশত্যাগী হন এবং দুর্গাদেবী দুই পুত্র ও চার কন্যাকে নিয়ে বনমালীপুর (শ্বশুরবাড়ি) ত্যাগ করে পিতৃগৃহে (বীরসিংহ গ্রাম) আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সেখানেও তিনি আত্মমর্যাদা রক্ষার্থে স্বতন্ত্র কুঁড়ে ঘরে নিজের সংসার পেতেছিলেন।

৪. ভগবতী দেবীর মাতামহ পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় (বিদ্যাবাগীশ) ছিলেন ভুবনেশ্বর-উমাপতির সমসাময়িক। খানাকুল কৃষ্ণনগরের নিকটবর্তী পাতুল গ্রামে ছিল বিদ্যাবাগীশ মশায়ের বাসস্থান। তাঁর চার পুত্র ও দুই কন্যা—রাধামোহন, রামধন, গুরুপ্রসাদ, বিশ্বেশ্বর, গঙ্গা দেবী ও তারা দেবী। বিদ্যাবাগীশ মশায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা গঙ্গাদেবীর সঙ্গে আরামবাগের নিকটবর্তী গোঘাট গ্রামনিবাসী রামকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের (তর্কবাগীশ) বিবাহ হয়। রামকান্তের দুই কন্যা—লক্ষ্মী দেবী ও ভগবতী দেবী। রামকান্ত শবসাধনা করতে গিয়ে উন্মাদগ্রস্ত হওয়ায় পঞ্চানন বিদ্যাবাগীশ মশায় উন্মাদ জামাই, কন্যা ও দৌহিত্রীদের গোঘাট গ্রাম থেকে পাতুল গ্রামে নিয়ে এসেছেন। পাতুল গ্রামেই ভগবতী দেবীর সঙ্গে ঠাকুরদাসের বিবাহ হয় এবং ভগবতী দেবীর মাতুল-পরিবার বিদ্যাসাগর-চরিত্রে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল।

৫. বীরসিংহ গ্রামেব নিকটস্থ ক্ষীরপাই গ্রামনিবাসী শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্যের আট বছবের কন্যা দিনময়ী দেবীর সঙ্গে চৌদ্দ বছবের ঈশ্বরচন্দ্রের বিবাহ হয়। ঠাকুরদাসের আপত্তির জন্য দিনময়ী দেবী লেখাপড়ার সুযোগ পাননি।

৬. বিদ্যাসাগরের একমাত্র পুত্র নাবায়ণ একুশ বছর বয়সে খানাকুল কৃষ্ণনগর-নিবাসী শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ষোল বছর বয়সের বিধবা কন্যা ভবসুন্দরীকে পিতার সম্মতিক্রমে বিবাহ করেন। এই বিবাহে ভগবতী দেবী ও দিনময়ী দেবীর আপত্তি ছিল। কন্যার মাতার নাম সারদা দেবী। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন বলেছেন, "ঐ পাত্রীর জননী সারদা দেবী অতিশয় বুদ্ধিমতী। স্বীয় কন্যার পুনর্বার বিবাহ দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া কাশীবাস করিবার মানসে প্রথমতঃ আমার নিকট আগমন করেন। ইনি নিকষ কুলীনের বংশোদ্ভবা, কন্যার মাতুল, চন্দ্রকোণানিবাসী নীলরতন চট্টোপাধ্যায়।"

কিন্তু সারদা দেবীর কাশীবাস হলো না। বিবাহের দু'বছরের মধ্যেই পিতা ঈশ্বরচন্দ্র পুত্র নারায়ণকে পরিত্যাগ করেন এবং উইল লিখে নারায়ণকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেন। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পরে জামাতার উৎসাহে ও প্ররোচনায় সারদা দেবী ঈশ্বরচন্দ্রের সম্পত্তির অধিকার লাভের উদ্দেশ্যে নাবালক পৌত্র প্যারীমোহনের পক্ষে বিদ্যাসাগরের উইল নাকচ করার জন্য হাইকোর্টে আবেদন করেন এবং হাইকোর্টের আদেশে বিদ্যাসাগরের স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হন। তারপরে, কীভাবে পুত্র নারায়ণ পিতার সম্পত্তি নষ্ট করেন, তার বিস্তৃত ইতিহাস রয়েছে সন্তোষকুমার অধিকারী রচিত 'বিদ্যাসাগরের শেষ ইচ্ছা' গ্রন্থে।

বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত

দুষ্প্রাপ্য

সহোদর

শ্রীশম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত

ও

শ্রীঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা

সংশোধিত।



কলিকাতা,

২ নং নয়াবাদি ওস্তাগরের লেন,

ইংরাজী-সংস্কৃত যন্ত্রে

শ্রী[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।



১২৯৮ সাল।

উপক্রমণিকা

দেশ-বিদেশের অনেক কৃতবিদ্য মহানুভব ব্যক্তি, সাধারণের নিকট যশস্বী হইবার মানসে—বিদ্যোৎসাহী, দেশহিতৈষী, অবলাবন্ধু, দয়াময়, আজন্ম-বিশুদ্ধ-চরিত, পূজ্যপাদ জ্যেষ্ঠাগ্রজ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনচরিত লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন শুনিয়া, স্বল্পমতি আমিও, ঐ সকল যশস্বী লেখকগণের ন্যায় জীবন-চরিত লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এবিষয়ে আমি নিশ্চয়ই সাধারণের নিকট উপহাসাস্পদ হইব। অথবা পাঠকবর্গ আমাকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তৃতীয় সহোদর বলিয়া জানিতে পারিলে, অবজ্ঞা না করিতেও পারেন। আমি বাল্য-কাল হইতেই অগ্রজ মহাশয়ের নিতান্ত অনুগত ছিলাম। তাঁহার জন্মভূমির কীর্তিস্তম্ভস্বরূপ বীরসিংহা বিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয়, রাখাল স্কুল, দাতব্য-চিকিৎসালয় ও বৃত্তিভোগী নিরুপায় দরিদ্র-লোকদিগের মাসহরা বিলি, বিধবা-বিবাহাদি কার্যসমূহ, এবং সন ১২৭২।৭৩ সালের বিষম দুর্ভিক্ষসময়ে প্রত্যহ সহস্রাধিক দরিদ্র লোকের প্রাণরক্ষাদি কার্য আমার তত্ত্বাবধানে ছিল। আমি বাল্যকাল হইতে পিতামহী, মাতামহী ও জননীদেবীর প্রমুখাৎ তাঁহার বাল্য-কালের যে সকল আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি বিশিষ্টরূপ অবগত হইয়াছি, অদ্যাপি সে সকল কথা আমার স্মৃতিপথে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। অগ্রজ মহাশয় কাশী-ধামে বৃদ্ধ পিতৃদেবের শেষাবস্থায় তাঁহার শুশ্রূষাদি কার্যে প্রায় ৬।৭ বৎসর আমায় নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। তথায় পিতৃদেবের প্রমুখাৎ এবং আমি যৎকালে সংস্কৃত-কলেজে অধ্যয়ন করি, তৎকালে কলেজের ব্যাকরণের অধ্যাপক পূজ্যপাদ গঙ্গাধর তর্কবাগীশ, সাহিত্যাধ্যাপক জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, অলঙ্কারের অধ্যাপক প্রেম-চন্দ্র তর্কবাগীশ, বেদান্তের অধ্যাপক শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি, দর্শনের অধ্যাপক নিমচাঁদ শিরোমণি ও জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয়গণের প্রমুখাৎ দাদার বাল্যকালের পাঠ্যাবস্থার যে সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছি, তাহা আমার হৃদয়পটে অঙ্কিত রহিয়াছে। এজন্য আশা করি, পাঠকবর্গ আমার লিখিবার রীতি-নীতি বিষয়ে যে সকল দোষ অবলোকন করিবেন, তাহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুগত ভৃত্য ও সহোদর বলিয়া, আমার সেই সকল দোষ ক্ষমা করিতে পারেন, এই সাহসে প্রোৎসাহিত হইয়া এই দুস্তর কার্যে প্রবৃত্ত হইলাম।

হুগলি-জেলার অন্তঃপাতী তারকেশ্বরের পশ্চিম ও জাহানাবাদ মহকুমার পূর্বে, প্রায় চার ক্রোশ অন্তরস্থিত বনমালিপুর গ্রামে ভুবনেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বাস করিতেন। তিনি সঙ্গতিপন্ন ও সংস্কৃতশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র, সকলেই সংস্কৃতভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। তৃতীয় পুত্রের নাম রামজয় বন্দ্যোপাধ্যায়।

রামজয়, ঘাঁটাল মহকুমার অন্তঃপাতী বীরসিংহাগ্রামবাসী বিখ্যাত পণ্ডিত উমাপতি তর্কসিদ্ধান্তের দুর্গানাম্নী কনিষ্ঠা কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। কালক্রমে রামজয়ের দুইটি পুত্র ও চারিটি কন্যা জন্মিয়াছিল। পুত্রদ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম ঠাকুরদাস, কনিষ্ঠের নাম কালিদাস। কন্যা চারিটির নাম মঙ্গলা, কমলা, গোবিন্দময়ী ও অন্নপূর্ণা। ভুবনেশ্বর, বার্ধক্যনিবন্ধন মানবলীলা সম্বরণ করিলে পর, তাঁহার পুত্র-গণের বিষয়-বিভাগ-উপলক্ষে পরস্পর বিষম মনান্তর ঘটে। রামজয়, ধার্মিক ও উদারস্বভাব ছিলেন। তিনি অকিঞ্চিৎকর বিষয়ের জন্য, প্রাণসম সোদরবর্গের সহিত বিরোধ করা অতি গর্হিত কর্ম বিবেচনা করিয়া, দুইটি পুত্র ও চারিটি কন্যা রাখিয়া, কাহাকেও কোন কথা প্রকাশ না করিয়া, সন্ন্যাসীর বেশে তীর্থ-পর্যটনে প্রস্থান করেন। কিছু দিন পরে, তাঁহার পত্নী দুর্গাদেবীর বনমালিপুরে অবস্থিতি করা নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল; সুতরাং পুত্রদ্বয় ও কন্যা-চতুষ্টয়কে লইয়া, পিতৃভবন বীরসিংহায় আগমন করিলেন। তাঁহার পিতা উমাপতি তর্কসিদ্ধান্ত, সমাদরপূর্বক নিরাশ্রয় দুহিতা ও তাঁহার সন্ততিগণকে স্বীয় সদনে রাখিলেন। তৎকালে তাঁহার জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র ঠাকুরদাসের বয়ঃক্রম দশ বৎসর ও কনিষ্ঠ কালিদাসের বয়ঃক্রম সাত বৎসর। তর্কসিদ্ধান্ত, উভয় দৌহিত্রের লেখাপড়া শিক্ষার নিমিত্ত বীরসিংহানিবাসী গ্রহাচার্য পণ্ডিত কেনারাম বাচস্পতিকে নিযুক্ত করিলেন। আচার্য মহাশয় তৎ-কালে এ প্রদেশের মধ্যে জ্যোতিষ-শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি স্বল্প দিবসের মধ্যে ভ্রাতৃদ্বয়কে বাঙ্গালা ভাষা, শুভঙ্করী অঙ্ক ও জমিদারী সেরেস্তার কাগজ শিক্ষা দিয়া, পরে 'সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ' অধ্যয়ন করাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। উমাপতি তর্কসিদ্ধান্ত নিতান্ত অথর্ব হইলে, সাংসারিক কার্যের ভার পুত্র রামসুন্দর ভট্টাচার্যের হস্তে অর্পণ করেন। উক্ত রামসুন্দর ভট্টাচার্যের পত্নীর সহিত দুর্গা-দেবীর মনান্তর ও বচসা হইতে লাগিল। রামসুন্দর অত্যন্ত স্ত্রৈণ ছিলেন। একদিবস তিনি ও তাঁহার স্ত্রী, দুর্গাদেবীকে বলেন যে, তোমার দুইটি পুত্র ও চারিটি কন্যাকে অতঃপর আমরা প্রতিপালন করিতে পারিব না, তুমি পথ দেখ। স্পষ্টাক্ষরে ইহা বলায়, দুর্গাদেবী নিতান্ত নিরুপায় হইয়া, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, পরিশেষে বৃদ্ধ পিতা তর্কসিদ্ধান্তকে সবিশেষ অবগত করিলেন। তিনি বলিলেন, আমি সকলই বিশেষরূপ অবগত আছি। অতঃপর উহাদের সহিত তোমার একত্র সদ্ভাবে বাস করা চলিবে না। পৃথক স্থানে বাস করা নিতান্ত আবশ্যক। দুর্গাদেবী তাহাতে সম্মতা হইলেন। পরদিন তর্কসিদ্ধান্ত গ্রামস্থ ভদ্রলোকদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন যে, রামসুন্দরের ও বধূমাতার সহিত দুর্গার একগৃহে বাস করা দুষ্কর, অতএব আমি স্বতন্ত্র স্থানে ইহার গৃহ নির্মাণ করিয়া দিব স্থির করিয়াছি। তাহাতে গ্রামস্থ লোকগণও সম্মত হইলেন। অনন্তর বার্ষিক ন' টাকা পাঁচআনা জমায় কিঞ্চিৎ ভূমি লইয়া তাহাতে গৃহ নির্মাণ করিয়া দেন; পরে জমিদারকে বলিয়া ও অনুরোধ করিয়া, নাখরাজ করিয়া দিবার স্থির করেন। ইতিমধ্যে তর্কসিদ্ধান্ত ইহজগৎ

পরিত্যাগ করিয়া লোকান্তরিত হন। সুতরাং ঐ নূতন বাস্ত আর নাখরাজ হইল না। ঐ বাস্তর বার্ষিক কর জমিদারকে দিতে হইল। দুর্গাদেবীব সংসার-নির্বাহের উপায়ান্তব ছিল না। তৎকালে বিলাতি স্তার আমদানি হয় নাই, এ প্রদেশের নিরুপায় অনেক স্ত্রীলোকই স্তা প্রস্তত করিয়া, তাহা বিক্রয করিয়া কষ্টেস্ষ্টে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিত। আত্মীয়বর্গের উপদেশানুসারে দুর্গাদেবীও অগত্যা একটি চবকা ক্রয় কবিয়া স্তা কাটিতেন, কখন কখন আস্নাস্তাও কাটিতেন। স্তা বিক্রয় করিয়া যাহা কিছু উপার্জন হইত, তাহাতেই কষ্টে সংসারযাত্রা নির্বাহ কবিতেন। এক্ষণে ঠাকুবদাসেব বয়ঃক্রম চতুর্দশ বৎসব অতীতপ্রায়; পড়াশুনা অধিক দিন কবিলে সংসার চলা দুষ্কর। আত্মীয়বর্গ এই উপদেশ দেন যে, সংস্কৃত অধ্যয়ন বন্ধ কবিয়া, যাহাতে শীঘ্র উপার্জন করিতে সক্ষম হন, এরূপ বিদ্যাশিক্ষা কবা অত্যাবশ্যক।

এদিকে বামজয়, তীর্থ স্থানে থাকিয়া স্বপ্ন দেখেন যে, তুমি পরিবারবর্গকে কষ্ট দিয়া তীর্থক্ষেত্রে ভ্রমণ করিতেছ, ইহাই তোমার অধর্ম হইতেছে। একারণ পাঁচ বৎসরের পব দেশে আগমনপূর্বক বনমালিপুরে আসিয়া দেখেন যে, সহোদরেরা পৃথক হইয়াছেন, এবং শুনিলেন যে, তাঁহার পত্নী বীরসিংহায় পিত্রালয়ে অবস্থিতি কবিতেছেন, সুতরাং বামজয়, পরিবারবর্গকে আনয়ন করিবার জন্য বীরসিংহায় গমন কবিলেন। গৈরিক বসন পরিধান করিয়া, হিন্দুস্থানী সন্ন্যাসীর বেশে শ্বশুরবাটীতে সমুপস্থিত হইলেন। প্রথমত কাহাকেও আত্মপরিচয় না দিয়া, গ্রামের মধ্যে ইতস্তত পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ কন্যা অন্নপূর্ণাদেবী, পিতাকে চিনিতে পারিয়া, বাবা বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। তখন রামজয় আত্মপরিচয় দেন। কয়েক দিবস বীরসিংহায় অবস্থিতি করিয়া, পরিবার-গণকে বনমালিপুরে লইয়া যাইবার উদযোগ করিলেন। কিন্তু তাঁহার পত্নী বনমালিপুরে যাইতে সম্মতা হইলেন না। যেহেতু তাঁহার ভ্রাতৃবর্গ অসদ্ব্যবহার করিয়াছেন; এতাবৎ কালের মধ্যে তাঁহাদের কোন সংবাদ লয়েন নাই, সুতরাং রামজয় অগত্যা বীরসিংহায় পরিবারগণকে রাখিতে বাধ্য হইলেন।

রামজয় অতি বুদ্ধিমান, বলশালী ও সাহসী পুরুষ ছিলেন। লৌহযষ্টি হস্তে লইয়া সর্বত্র ভ্রমণ করিতেন, কাহাকেও ভয় করিতেন না। এক সময় বীরসিংহা হইতে মেদিনীপুর যাইতেছেন পথিমধ্যে এক ভল্লুক দেখিতে পাইলেন। ভল্লুক দেখিয়া ভয় না পাইয়া, এক বৃক্ষের অন্তরালে দণ্ডায়মান হইলে, ভল্লুক তাঁহাকে আক্রমণ করিবার জন্য বৃক্ষের চতুর্দিকে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘূর্ণ্যমান হওয়ায়, তিনিও অগ্রে অগ্রে ঘুরিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ভল্লুক দুই হস্ত প্রসারণপূর্বক বৃক্ষটি আঁকড়াইয়া তাঁহাকে ধরিবার চেষ্টা করিল; ঐ সময় রামজয়, বৃক্ষের অপর পার্শ্ব হইতে ভল্লুকের দুই হস্ত ধরিয়া বৃক্ষে ঘর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহাতে ভল্লুক মৃতপ্রায় হইলে ছাড়িয়া দিলেন। ভল্লুককে মৃতকল্প ভূপতিত

দেখিয়া, প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন এমন সময় ভল্লুক উঠিয়া দ্রুতবেগে দৌড়িয়া গিয়া, রামজয়ের পৃষ্ঠে নখাঘাত করিল; তখন পৃষ্ঠে শোণিতধারা বিনির্গত দেখিয়া, ক্রোধভরে লৌহদণ্ডপ্রহারে ভল্লুকের প্রাণবিনাশ করিলেন। ভল্লুকের পাঁচটি নখাঘাতের ক্ষতে প্রায় মাসাধিক কষ্ট পাইয়া পরে আরোগ্যলাভ করেন।

বীরসিংহায় বাস্তু-বাটীর ভূস্বামী, রামজয়কে নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর করিয়া দিবেন মানস করিয়াছিলেন; কিন্তু রামজয় দান গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই। গ্রামের অনেকেই নাখরাজ করিবার জন্য তাঁহাকে অনেক উপদেশ দিয়াছিলেন, কিন্তু কাহারও অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। তদবধি বাস্তুভূমির ন' টাকা পাঁচআনা কর আদায় হইয়া আসিতেছে। রামজয়ের মনোগত ভাব এই যে, নিষ্করে বাস করিলে, ভূস্বামী পুণ্যের অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং তিনি আজন্মকাল মনে মনে অহঙ্কার করিতে পারিবেন যে, আমি উহাকে চিরকালের জন্য বাসস্থান দান করিয়াছি; একারণ নিষ্করে বাস করিতে সম্মত হইলেন না।

ঠাকুরদাসের বাঙ্গালা, খাখতি ও জমিদারী কাগজ শিক্ষা দেখিয়া, রামজয়, ঠাকুরদাসকে সমভিব্যাহারে লইয়া কলিকাতা যাত্রা করিলেন। তথায বাগবাজারস্থ সঙ্গতিপন্ন জ্ঞাতি সভারাম বাচস্পতির ভবনে উপস্থিত হইলে, বাচস্পতি মহাশয় ঠাকুরদাসকে ব্যাকরণ শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিলেন, কিন্তু রামজয় আশু অর্থকরী ইংরাজী-বিদ্যা শিক্ষার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন; যেহেতু তিনি পৈতৃক সম্পত্তি ভ্রাতৃবর্গকে প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহার কিছুমাত্র সম্পত্তি ছিল না। একারণ, যাহাতে পুত্রটি শীঘ্র উপায়ক্ষম হইতে পারে, এরূপ বিদ্যাশিক্ষার উপদেশ প্রদান করিলেন। তৎকালে কলিকাতায় কোনও ইংরাজী বিদ্যালয় ছিল না। বাচস্পতি মহাশয়, ইংরাজী শিক্ষা দিবার জন্য একজন দালালকে অনুরোধ করিলেন; দালাল, বাচস্পতি মহাশয়ের অনুরোধের বশবর্তী হইয়া স্বয়ং শিক্ষা না দিয়া, ইংরাজীভাষায় সুশিক্ষিত জাহাজের সীপ্‌সরকার, জনৈক কায়স্থকে শিক্ষা দিবার জন্য অনুরোধ করেন। সীপ্‌সরকার, প্রাতে ও সন্ধ্যার পর রীতিমত ইংরাজী-ভাষা শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অল্পদিনের মধ্যেই ঠাকুরদাস এক প্রকার কাজের লোক হইলেন; তাহা দেখিয়া রামজয়, ঠাকুরদাসকে বলিলেন যে ঈশ্বর তোমার ভাল করিবেন, আমি ঈশ্বরের আরাধনাভিলাষে পুনর্বার তীর্থপর্যটনে যাত্রা করিতেছি। ইহাতে ঠাকুরদাস অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন; তিনি এ সংবাদ বাটীতে লিখিলেন। কিছু দিন পরে শিক্ষক, ঠাকুরদাসকে অতি শীর্ণকায় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি দিন দিন শীর্ণ হইতেছ কেন?' তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, 'মহাশয়! দিবা দুই প্রহরের সময় ভোজন করি, রাত্রিতে ভোজন হয় না।' ইহার কারণ জিজ্ঞাসায় ঠাকুরদাস বলিলেন, 'সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই বাচস্পতি মহাশয়ের ভবনে লোকের ভোজনের ব্যবস্থা শেষ হইয়া যায়। আমি রাত্রি দশটার পর আপনার বাটী হইতে তথায় যাই, সুতরাং আমার ভোজন হয় না। একারণ অনাহারে ক্রমশ দুর্বল হইতেছি।'

তাহাতে শিক্ষক বলিলেন, 'তুমি যদি পাক করিতে পার, তাহা হইলে আমার বাসায় অবস্থিতি কর।' তাহাতে ঠাকুরদাস সম্মত হইয়া, দয়ালু শিক্ষকের বাসায় অবস্থিতি করিয়া ইংরাজী শিখিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে এক এক দিন শিক্ষকের কার্যবাহুল্যপ্রযুক্ত বাসায় আসিতে অধিক রাত্রি হইত। ঠাকুরদাস ক্ষুধায় কাতর হইতেন। হাতে পয়সা একটিও নাই যে, ক্ষুধা পাইলে এক পয়সার জলপান খান; তাঁহার পুঁজির মধ্যে এক পিতলের থাল ও এক পিতলের জলপাত্র ছিল। মনে মনে স্থির করিলেন, ইহা বিক্রয় করিলে কিছু পয়সা হইবে; সময়ে সময়ে ক্ষুধা পাইলে, এক এক পয়সার জলপান ক্রয় করিয়া খাইলেও দিনপাত হইবে। এই স্থির করিয়া জোড়া-সাঁকোর নূতন বাজারে এক কাঁসারীর দোকানে ঐ থালা ও জলপাত্র বিক্রয় করিতে যান। কাঁসারী থালা ও ঘটি ওজন করিয়া ১।০ মূল্য স্থির করেন; কিন্তু অপরিচিত ব্যক্তির নিকট পুরাতন দ্রব্য ক্রয় করিতে ভয় করিযা বলিল যে, ইতিপূর্বে এক ব্যক্তির নিকট পুরাতন দ্রব্য ক্রয় করিয়া, আমরা বিষম বিপদে পড়িয়াছিলাম; তদবধি সকল দোকানদার প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে,অপরিচিত লোকের নিকট কখনও পুরাতন দ্রব্য ক্রয় করিব না। ইহা শুনিয়া ঠাকুরদাস হতাশ হইয়া থালা ও ঘটি লইয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। মধ্যে মধ্যে এক এক দিন শিক্ষক সিপ্‌ সরকারের বাটী আসিতে অধিক রাত্রি হইত, ঠাকুরদাস ক্ষুধায় কাতর হইতেন। একদিন শিক্ষক প্রাতঃকাল হইতে কার্যের বাহুল্যপ্রযুক্ত বাসায় সমাগত না হওয়ায়, ঠাকুরদাস ক্ষুধায় ব্যাকুল হইয়া, সন্নিহিত এক বৃদ্ধার মুড়ির দোকানের সম্মুখে কিয়ৎক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিয়া বলিলেন, 'একটুকু জল দিতে পার, আমার তৃষ্ণা পাইয়াছে।' তাহাতে বৃদ্ধা পিতলের রেকাবে মুড়কি দিয়া পানীয় জল দিল; উহা খাইতে খাইতে ঠাকুরদাসের চক্ষে জল আসিল, তাহাতে বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করিল, 'বাবা ঠাকুর, তুমি কাঁদ কেন?' তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, 'মা! আজ সমস্ত দিন আমার ভোজন হয় নাই।' বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করিল, 'কেন হয় নাই?' তিনি বলিলেন, 'প্রাতঃকাল হইতে সরকার মহাশয় বাসায় আগমন করেন নাই।' ইহা শুনিয়া দয়াময়ী বৃদ্ধা, দধি ও মুড়কি মুড়ি দিয়া ফলাহার করাইল এবং বলিল, যেদিন তোমার ভোজন না হইবে, সেই দিন এখানে আসিয়া ফলাহার করিবে। একদিন সরকার অধিক রাত্রিতে বাটী আসিয়া শুনিলেন যে, ঠাকুরদাসের সমস্ত দিবসের মধ্যে পাকাদি কার্য হয় নাই, ইহাতে অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং বলিলেন, 'তোমার যাহা শিক্ষা হইয়াছে তাহাতে কার্যক্ষম হইয়াছ, অতঃপর আর তোমার এরূপ ক্লেশ-স্বীকারের প্রয়োজন নাই। অদ্য এক্ষণে আহারাদি সমাধা কর, কল্য প্রাতেই তোমার সম্বন্ধে যাহা কিছু বক্তব্য থাকে, তাহা বাচস্পতি মহাশয়কে বলিব।' পরদিন প্রাতে বাচস্পতি মহাশয়ের বাটী যাইয়া তাঁহাকে বলিলেন যে, 'আপনার জ্ঞাতি ঠাকুরদাস কর্মক্ষম হইয়াছেন, বাঙ্গালায় ও ইংরাজীতে হিসাব করিবার ভালরূপ ক্ষমতা হইয়াছে; আপনি কাহাকেও বলিয়া ইহাকে কর্মে নিযুক্ত করিয়া দিন। ইহার চরিত্রও উত্তম।'

বড়িসাগ্রামে বাচস্পতির এক সম্ভ্রান্ত কুটুম্ব ছিলেন। তিনি এক নাবালক পুত্র ও স্ত্রী রাখিয়া পরলোক-গমন করেন। অন্য কেহ অভিভাবক না থাকায়, একজন কার্য-দক্ষ বিশ্বাসী লোক রাখা আবশ্যক হইয়াছিল।

বাচস্পতি মহাশয়, ঠাকুরদাসকে বলিলেন, 'তোমাকে অন্তত এক বৎসরের জন্য তথায় অবস্থিতি করিয়া বিষয় রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে।' ঠাকুরদাস অগত্যা স্বীকার পাইয়া বড়িসায় কিছুদিন থাকিয়া, নাবালকের বিশিষ্টরূপ আদায় ও বন্দোবস্ত করিলেন। তজ্জন্য বাচস্পতি, ঠাকুরদাসের সাংসারিক ব্যয়-নির্বাহার্থে রীতিমত টাকা পাঠাইয়া দিতে কাতর হন নাই। ঠাকুরদাসের জননী মাসে মাসে কিছু পাইতে লাগিলেন; তাহাতে কষ্টের অনেক লাঘব হইয়াছিল। এক বৎসর কাল বড়িসায় অবস্থিতি করিয়া, বাচস্পতি মহাশয়কে বলেন যে, 'মহাশয়, অনেক কষ্টে ইংরাজী শিক্ষা করিয়াছি। আপনি আমাকে ইংরাজীর হিসাবের কার্য নির্বাহ করিবার জন্য কাহাকেও অনুরোধ করিয়া নিযুক্ত করিয়া দিন।' বাচস্পতি মহাশয়, ঠাকুরদাসের কর্মের শৃঙ্খলা ও সৌজন্য দর্শনে সন্তুষ্ট ছিলেন; একারণ বড়বাজার দোয়েহাটা-নিবাসী পরম দয়ালু ভাগবত সিংহের বাটীতে কার্যে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। ভাগবতবাবু পরম ধার্মিক ও দয়ালু ছিলেন; তাঁহার আফিসে ঠাকুরদাসকে দুই টাকা বেতনে নিযুক্ত করিলেন, এবং বাটীতে বাসা দিয়া খোরাক পোশাক দিতেন। ঠাকুরদাস ঐ ২৲ দুই টাকা জননীর সাংসারিক ক্লেশ নিবারণের জন্য বাটীতে পাঠাইয়া দিতেন। এইরূপ মাসে মাসে দুই টাকা পাইয়া দুর্গাদেবীর সাংসারিক ব্যয়নির্বাহের সুবিধা হইল। ভাগবতবাবু, ঠাকুরদাসের কার্যদক্ষতা অবলোকন করিয়া, ক্রমশ রীতিমত বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিতে লাগিলেন। ইহার কিছু দিন পরে ভাগবতবাবু বলেন, 'ঠাকুরদাস, তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কালিদাসকে আনাইয়া কাছে রাখিয়া ইংরাজী শিক্ষা দিলে, তাহাকেও আফিসে নিযুক্ত করা হইবে। দুই সহোদরে কর্ম করিলে সংসারের কষ্ট নিবারণ হইবে।' একারণ, কালিদাসকে আনাইয়া ভাগবতবাবু বাটীতে রাখিলেন। ইহার কিছুদিন পরে ভাগবত সিংহ কালগ্রাসে নিপতিত হইলে, তাহার পুত্র জগদ্দুর্লভ সিংহ ও তৎপরিবারবর্গ ঠাকুরদাসকে পূর্বাপেক্ষা ভাল বাসিতে লাগিলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা কর্মে পরাগ হইলে, কিছুদিন ঠাকুরদাস কাশীজোড়া ও মণ্ডলঘাটে অবস্থিতি করিয়া, রেশমের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন; তৎপরে দেশে অবস্থিতি করিয়া কাঁসার বাসনের ব্যবসা করেন। এইরূপ নানা প্রকার ব্যবসা দ্বারা সাংসারিক কষ্ট নিবারণ ও কিছু সঞ্চয় করিলেন। এদিকে কলিকাতায় তাঁহার ভ্রাতা তাঁহার কর্মে থাকিয়া নানা প্রকার বিশৃঙ্খলা ঘটান; এজন্য জগদ্দুর্লভ সিংহ বলেন, তোমার ভ্রাতার দ্বারা আমার কার্যের বিস্তর ক্ষতি হইতেছে; অতএব তুমি নিজে আসিয়া কার্য কর। বিশেষত পিতা মৃত্যুকালে তোমাকে বিশ্বাস করিয়া আমার বাটীর ও আফিসের সকল ভার দিয়াছেন। একারণ, ঠাকুরদাস ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া, পুনর্বার সিংহমহাশয়ের বাটীতে বিষয়কর্মে নিযুক্ত হইলেন। ১৭৩৫ শকে

খানাকুল কৃষ্ণনগরের পশ্চিম পাতুলগ্রামনিবাসী পঞ্চানন বিদ্যাবাগীশের দৌহিত্রী ও রামকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের দুহিতা ভগবতী দেবীর সহিত ঠাকুরদাসের পাণিগ্রহণ-বিধি সমাধা হইল।

রামকান্ত চট্টোপাধ্যায় জাহানাবাদ মহকুমার পশ্চিম গোবাটগ্রামে বাস করিতেন। ইনি সংস্কৃত-ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। বাটীতেই তাঁহার চতুষ্পাঠী ছিল। ছাত্রগণকে অন্ন দিয়া শিক্ষা দিতেন। তন্ত্রশাস্ত্রে ইঁহার অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল। তিনি রামজীবনপুরের অতি সন্নিহিত করঞ্জীগ্রামে মাতামহাশ্রয়ে অবস্থিতি করিয়া, প্রায় প্রতি অমাবস্যার রাত্রিতে শবসাধনা করিয়া সিদ্ধপুরুষ হন, শেষাবস্থায় কাহারও সহিত কথা কহিতেন না, মধ্যে মধ্যে 'মঞ্জুর' এই শব্দটি বলিতেন। পাতুলগ্রামেব পঞ্চানন বিদ্যাবাগীশ অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। ইঁহার বাটীতে টোল ছিল, বিদ্যাবাগীশ প্রত্যহ অতিথি ও অভ্যাগত লোক সমূহকে ভোজন করাইতেন। দেশের সকল লোকেই বিদ্যাবাগীশকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত। ইঁহার চারিটি পুত্র ছিল ;—জ্যেষ্ঠ রাধামোহন বিদ্যাভূষণ, মধ্যম রামধন তর্কবাগীশ, তৃতীয় গুরুপ্রসাদ শিরোমণি, কনিষ্ঠ বিশ্বেশ্বব তর্কালঙ্কার। সকলেই গুণবান ও দয়ালু ছিলেন। বিদ্যাবাগীশের দুই কন্যা ছিল। জ্যেষ্ঠা গঙ্গামণি দেবী, দ্বিতীয়া তারাসুন্দবী দেবী। জ্যেষ্ঠা গঙ্গামণির গর্ভে দুই কন্যা জন্মে। জ্যেষ্ঠার নাম লক্ষ্মীমণি দেবী, কনিষ্ঠাব নাম ভগবতী দেবী। বামকান্ত প্রায প্রতি বাত্রিতে শ্মশানে বসিয়া জপ করিতেন ও সংসারের সকল বিষয়ে ঔদাস্যাবলম্বন করিয়াছিলেন। জামাতা রামকান্ত শবসাধন করিয়া মৌনাবলম্বন কবিয়াছেন, এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া, তাঁহার শ্বশুর উক্ত পাতুলগ্রামনিবাসী বিদ্যাবাগীশ মহাশয়, করঞ্জীগ্রাম হইতে জামাতা রামকান্ত, কন্যা গঙ্গামণি ও তাঁহার দুইটি কন্যাকে পাতুলগ্রামে আনয়ন করেন। পঞ্চানন বিদ্যাবাগীশ ও রাধামোহন বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি ইঁহাদিগকে আন্তরিক স্নেহ করিতেন, তাঁহাদেরই যত্নে বীরসিংহা নিবাসী ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত ভগবতীদেবীর বিবাহকার্য সম্পন্ন হইয়াছিল। ইতিপূর্বে রামজয়, (পুত্র ঠাকুরদাস লেখাপড়া ভালরূপ শিখিয়াছেন, বিষয়কর্মে লিপ্ত হইয়া পরিবারবর্গের কষ্ট নিবারণ ও ভরণপোষণাদি কার্য নির্বাহ করিতে পারিবেন দেখিয়া) জন্মের মত ঈশ্বরারাধনায় তীর্থক্ষেত্র পর্যটনে প্রস্থান করেন। এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে তাঁহার পরিবারগণের কোন সংবাদ পান নাই। রামজয় একদিবস (কেদার পাহাড়ে) নিশীথসময়ে স্বপ্ন দেখেন যে, 'রামজয়। তুমি বৃথা কেন ভ্রমণ করিতেছ ? স্বদেশে যাও তোমার বংশে এক সুপুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তিনি তোমার বংশের তিলক হইবেন। তিনি সাক্ষাৎ দয়ার সাগর ও অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়া, নিরন্তর বিদ্যাদান ও নিরুপায় লোকদিগের ভরণপোষণাদির ব্যয়-নির্বাহ দ্বারা তোমার বংশের অনন্তকালস্থায়িনী কীর্তি স্থাপন করিবেন।' রামজয়, পাহাড়ের মধ্যে নিশীথসময়ে এরূপ অসম্ভব স্বপ্ন-দর্শন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমি বহুদিন অতীত হইল সংসারাশ্রমে জলাঞ্জলি দিয়া, নিভৃত স্থানে ঈশ্বরারা-

ধনায় মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া কালাতিপাত করিতেছি। এক্ষণে তাহারা কি করিতেছে ও কে আছে না আছে, তাহাও জানি না। এবম্বিধ চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া পুনর্বার নিদ্রাভিভূত হইলে, কে যেন বলিয়া দিল, তুমি পরিবারগণের নিকট প্রস্থান কর, আর বিলম্ব করিও না; তোমার প্রতি ঈশ্বর সদয় হইয়াছেন। নিদ্রাভঙ্গ হইলে, নানাপ্রকার ভাবিয়া চিন্তিয়া, রামজয় স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অনবরত ছয় মাস পদব্রজে গমন করিয়া, বীরসিংহায় সমুপস্থিত হইয়া শুনিলেন, তাঁহার পুত্র ঠাকুরদাস কলিকাতায় বিষয়কর্মে নিযুক্ত থাকিয়া সংসার প্রতিপালন করিতেছেন। জ্যেষ্ঠপুত্র ঠাকুরদাসের ও কনিষ্ঠ কালিদাসের বিবাহকার্য সম্পন্ন হইয়াছে এবং জ্যেষ্ঠপুত্র ঠাকুরদাসের পত্নী গর্ভবতী হইয়া অবধি উন্মাদগ্রস্তা হইয়াছেন। অনন্তর রামজয় দেশে আগমন করিয়াছেন, এ সংবাদ কলিকাতায় পুত্রদ্বয়কে লেখা হইল। সংবাদ-প্রাপ্তিমাত্রেই বহুকালের পর পিতৃসন্দর্শনার্থে ঠাকুর-দাস ও কালিদাস কলিকাতা হইতে বীরসিংহায় আগমন করিলেন।

শিশুচরিত

১৭৪২ শকাব্দা অর্থাৎ সন ১২২৭ সালের ১২ই আশ্বিন মঙ্গলবার দিবা দ্বিপ্রহ-রের সময় জ্যেষ্ঠাগ্রজ ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ভূমিষ্ঠ হন। তীর্থক্ষেত্র হইতে সমাগত পিতামহ রামজয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, নাড়ীচ্ছেদনের পূর্বে আলতায় এই ভূমিষ্ঠ বালকের জিহ্বার নিম্নে কয়েকটি কথা লিখিয়া, তাঁহার পত্নী দুর্গাদেবীকে বলেন, লেখার নিমিত্ত শিশুটি কিয়ৎক্ষণ মাতৃদুগ্ধ পান করিতে পায় নাই; বিশেষত কোমল জিহ্বায় আমার কঠোর হস্ত দেওয়ায়, এই বালক কিছুদিন তোত্‌লা হইবে। এই বালক ক্ষণজন্মা, অদ্বিতীয় পুরুষ ও পরম দয়ালু হইবে এবং ইহার কীর্তি দিগন্তব্যাপিনী হইবে। এই বালক জন্মগ্রহণ করায়, আমার বংশের চিরস্থায়ী কীর্তি থাকিবে। ইাহকে দেখিয়া আমি চরিতার্থ হইলাম। এই বালককে অপর কেহ যেন মন্ত্র না দেয়; অদ্য হইতে আমিই ইহার অভীষ্টদেব হইলাম। এ বালক সাক্ষাৎ ঈশ্বরতুল্য, অতএব ইহার নাম অদ্য হইতে আমি ঈশ্বরচন্দ্র রাখিলাম। আজ রামজয় তীর্থক্ষেত্রের সেই স্বপ্নকে সত্য জ্ঞান করিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র যৎকালে গর্ভে ছিলেন, তৎকালে জননী ভগবতী দেবী দশমাস উন্মত্তার ন্যায় ছিলেন। পিতামহী দুর্গাদেবী, বধূর রোগোপশমের জন্য কতই প্রতিকার করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই উপশম হয় নাই। তৎকালে কোন কোন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক, পিতামহী ও মাতামহীকে বলিতেন, ভূতে পাইয়াছে; আবার কেহ কেহ বলিতেন, ডাইনি পাইয়াছে। এই সকলের রোজা আনাইয়া দেখান হয়, কিন্তু কিছুতেই উপশম হয় নাই। অবশেষে উদয়গঞ্জনিবাসী পণ্ডিতপ্রবর ভবানন্দ শিরোমণি ভট্টাচার্য মহাশয়কে দেখান হয়। তিনি এ প্রদেশের মধ্যে চিকিৎসা ও গণিতশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন; রোগের তথ্যানুসন্ধান বিষয়ে তাঁহার বিশিষ্টরূপ ক্ষমতা ছিল। ইনি রোগ নির্ণয়ের পূর্বে রোগীর কোষ্ঠী গণনা করিতেন। ইনি পিতামহীকে বলেন, আমি তোমার বধূমাতার রোগনির্ণয় করিলাম, এক্ষণে ইহার কোষ্ঠী দেখিতে ইচ্ছা করি। চিকিৎসক ভট্টাচার্য মহাশয় উক্তরূপ কথা বলিলে, দুর্গাদেবী তাঁহার কোষ্ঠী দেখিতে দিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ভবানন্দ গণনা করিয়া বলিলেন, ইহার কোন রোগ নাই; ঈশ্বরানুগৃহীত কোন মহাপুরুষ ইহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার তেজঃপ্রভাবে এরূপ হইতেছে, কোনরূপ ঔষধ সেবন করিবেন না। গর্ভস্থ বালক ভূমিষ্ট হইলেই ইনি রোগমুক্তা হইবেন। ভবানন্দ ভট্টাচার্য মহাশয় যাহা বলিয়াছি-লেন, তাহাই ঘটিল। প্রসবের পরক্ষণেই তাঁহার আর কোন উন্মাদ-চিহ্ন লক্ষিত হইল না। একারণ, পিতামহী সর্বদা ভবানন্দ ভট্টাচার্যের গণনার ভূয়সী প্রশংসা করিতেন।

জ্যেষ্ঠাগ্রজ ভূমিষ্ঠ হইবার কিয়ৎক্ষণ পূর্বে, পিতৃদেব দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার জন্য অতি সন্নিহিত কুমারগঞ্জের হাটে গিয়াছিলেন। তথা হইতে বাটীতে আসিতেছেন

দেখিয়া, পিতামহ রামজয় কিছু অগ্রসর হইয়া বলিলেন, ঠাকুরদাস। অদ্য আমাদের একটি এঁড়ে বাছুর হইয়াছে। তৎকালে আমাদের একটি গাভীও গর্ভিণী হইয়াছিল। পিতৃদেব মনে করিলেন, গর্ভবতী গাভীটি প্রসব হইয়াছে; কিন্তু বাটী প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, গাভী প্রসব হয় নাই। তখন পিতামহ ঈষৎ হাস্যবদনে সূতিকাগৃহে প্রবেশ করিয়া, অগ্রজকে দেখাইয়া বলিলেন, এ ছেলে এঁড়ের মত বড় একগুঁয়ে হইবে, একারণ এঁড়ে বাছুর বলিলাম। ইহাব দ্বারা পরে দেশের বিশেষরূপ উপকার হইবে। তুমি ইহাকে সামান্য এঁড়ে জ্ঞান করিবে না, এ নিজের জিদ বজায় রাখিবে, এবং সর্বত্র জয়ী হইবে, আজ আমার স্বপ্নদর্শন সত্য হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে গ্রহ-বিপ্র-শ্রেষ্ঠ কেনারাম আচার্য আসিয়া, বালকের ঠিকুজী প্রস্তুত করিলেন। আচার্য গণনার দ্বারা ব্যক্ত করিলেন, এই বালক ক্ষণজন্মা উচ্চগ্রহ সকল প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্য-মান হইতেছে, এরূপ ফল কাহারও কোষ্ঠীতে অদ্যাপি দেখিতে পাই নাই। এ বালক জগদ্বিখ্যাত, নৃপতুল্য ও দয়াময় হইবে, এবং দীর্ঘায়ু হইয়া নিরন্তন ধন ও বিদ্যাদান করিয়া, সাধারণের কষ্ট নিবারণ কবিবে। এই বৃত্তান্ত পিতামহী, মাতামহী ও পিতৃ-দেবের প্রমুখাৎ যেরূপ অবগত হইয়াছিলাম, তাহা অবিকল লিখিলাম।

দাদার জন্মগ্রহণের পর অবধি পিতৃদেবের অবস্থার ক্রমশ উন্নতি হইতে লাগিল। পঞ্চমবৎসর বয়সের সময় দাদার বিদ্যারম্ভ হয়। তৎকালে বীরসিংহাগ্রামের সনাতন বিশ্বাস পাঠশালার সরকার ছিলেন। সনাতন, ছোট ছোট বালকগণকে শিক্ষা দিবার সময় বিলক্ষণ প্রহার করিতেন, তজ্জন্য শিশুগণ সর্বদা শঙ্কিত হইগা পাঠশালায় যাইতে ইচ্ছা করিত না; একারণ পিতৃদেব, বীরসিংহানিবাসী কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়কে শিক্ষক মনোনীত করিলেন। কালীকান্ত ভঙ্গকুলীন ছিলেন; সুতরাং বহুবিবাহ করিতে আলস্য করেন নাই। তিনি ভদ্রেশ্বরের নিকট গোরুটি-গ্রামেই প্রায় অবস্থিতি করিতেন, অপরাপর শ্বশুরভবনেও টাকা আদায় করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে পরিভ্রমণ করিতেন। পিতৃদেব, ভদ্রেশ্বর ও শ্রীরামপুর যাইয়া অনু-সন্ধান দ্বারা জানিলেন যে, কালীকান্ত সর্বদা গোরুটিতে থাকেন। তথায় যাইয়া তাঁহাকে অনেক উপদেশ দিয়া, সমভিব্যাহারে করিয়া বীরসিংহায় আনিলেন এবং কায়েক দিন পরে পাঠশালা স্থাপন করিয়া দিলেন। কালীকান্ত অত্যন্ত ভদ্রলোক ছিলেন। শিশুগণকে শিক্ষা দিবার বিশেষরূপ প্রণালী জানিতেন এবং শিশুগণকে আন্তরিক যত্ন ও স্নেহ করিতেন; একারণ, ছোট ছোট বালকগণ তাঁহার নিকট সর্বদা অবস্থিতি করিতে ইচ্ছা করিত। এতদ্ভিন্ন তিনি সকলের সহিত সৌজন্য প্রকাশ করিতেন। স্থানীয় লোকগণ কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়কে আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত, এবং সকলেই তাঁহাকে গুরুমহাশয় বলিত। কালীকান্তের নিকট অগ্রজ মহাশয় কিঞ্চিদূন তিন বৎসর ক্রমাগত শিক্ষা করিয়া, বাঙ্গালা-ভাষা ও স্তাখতি অঙ্ক কবিতে শিখিলেন। ঐ সময়েই তাঁহার হস্তাক্ষর ভাল হইয়াছিল। এই সময়ে অগ্রজ মহাশয় প্লীহা ও উদরাময়ে অত্যন্ত কষ্টভোগ করেন। বীরসিংহায়

কোন প্রকারে আরোগ্য লাভ করিতে পারেন নাই, এজন্য জননীর মাতুল পাতুল-নিবাসী রাধামোহন বিদ্যাভূষণ স্বীয় আবাসে অগ্রজ, মধ্যম ভ্রাতা ও জননীদেবীকে সমভিব্যাহারে লইয়া যান। তথায় খানাকুল কৃষ্ণনগরের সন্নিহিত কোঠরা গ্রামে যে সকল চিকিৎসাব্যবসাযী বৈদ্য বাস করিতেন, তন্মধ্যে উৎকৃষ্ট চিকিৎসককে আনাইয়া শাস্ত্রমত চিকিৎসা করান হয়। রাধামোহন বিদ্যাভূষণের যত্নে ও কবিরাজ রামলোচনের সুচিকিৎসায়, অগ্রজ মহাশয় সে যাত্রা রক্ষা পান। বাল্য-কালে অগ্রজ মহাশয় জননীদেবীর সহিত মধ্যে মধ্যে পাতুলগ্রামে যাইতেন। রাধামোহন বিদ্যাভূষণ ও তাঁহার ভ্রাতৃবর্গ অগ্রজকে আন্তরিক ভালবাসিতেন, তজ্জন্য অগ্রজ মহাশয় যাবজ্জীবন রাধামোহনের পবিবারসমূহকে যথেষ্ট স্নেহ ও শ্রদ্ধা করিয়া, মাসিক-ব্যয় নির্বাহার্থে বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।

প্রায ছয় মাস পাতুলগ্রামে অবস্থিতি করিয়া, সম্পূর্ণরূপ আবোগ্যলাভপূর্বক, বীরসিংহায় আসিযা তিনি পুনর্বার পাঠশালায় অধ্যয়নার্থ নিযুক্ত হন।

বাল্যকালে অগ্রজ অত্যন্ত দুরন্ত ছিলেন। ৫।৬।৭।৮ বৎসর বয়ঃক্রমকালে প্রত্যুষে কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পাঠশালায় যাইবার সময, প্রতিবেশী অনুগত মথুরা-মোহন মণ্ডলের মাতা পার্বতী ও পত্নী সুভদ্রাকে বিরক্ত করিবাব মানসে, প্রায় প্রত্যহ তাহাদেব দ্বাবে মলমূত্র ত্যাগ করিতেন। মথুরের পত্নী সুভদ্রা ও জননী পার্বতী ঐ বিষ্ঠা প্রত্যহ স্বহস্তে পরিষ্কার করিতেন। যদি কোন দিন মথুরের পত্নী সুভদ্রা বিরক্ত হইয়া বলিত, দুষ্ট বামুন প্রত্যহই তুমি পাঠশালা যাইবার সময় আমার দ্বারে মল ত্যাগ কবিবে? অতঃপব এরূপ গর্হিত কার্য করিলে গুরুমহাশয় ও তোমার পিতামহীকে বলিয়া তোমাকে শাসন করাইব। ইহা শুনিয়া সুভদ্রার শ্বশ্রূ, বৌকে এই বলিয়া উপদেশ দিতেন যে, এই ছেলেটি সহজ নহে; ইহার পিতামহ বার বৎসর বিবাগী হইয়া তীর্থক্ষেত্রে জপ তপ করিয়া দিনপাত করিতেন। তিনি সাক্ষাৎ ঋষিতুল্য ছিলেন। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি, এই বালক অদ্বিতীয়-শক্তিসম্পন্ন হইবে। অতএব তুমি বিরক্ত হইও না; আমি স্বয়ং ইহার মলমূত্র পরিষ্কার করিব। ভবিষ্যতে ঐ বালক যে কে, তাহা জানিতে পারিবে।

বাল্যকালে অগ্রজ মহাশয় শস্যক্ষেত্রের নিকট দিয়া যাইবার সময়, ধানের শীষ লইয়া চর্বণ করিতে করিতে যাইতেন। একবার যবের ক্ষেত্রের এক শীষ লইয়া, চর্বণ করিতে করিতে যবের সুঁড়া গলায় লাগিয়া মৃতকল্প হন। পিতামহী অনেক কষ্টে গলায় অঙ্গুলি দিয়া, যবের শীষ নির্গত করেন, তাহাতেই রক্ষা পান।

কালীকান্ত নানাপ্রকার কৌশল ও স্নেহ করিয়া শিখাইতে কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। তিনি আপন সন্তান অপেক্ষাও অগ্রজ মহাশয়কে ভালবাসিতেন। গুরু-মহাশয় অপরাহ্নে অপরাপর ছাত্রগণকে অবকাশ দিতেন; কেবল অগ্রজ মহাশয়-কে তাঁহার নিকটে রাখিয়া, সন্ধ্যার পর নামতা ও ধারাপাতাদি শিক্ষা দিতেন। অধিক রাত্রি হইলে, প্রত্যহ স্বয়ং ক্রোড়ে করিয়া বাটীতে আনিয়া, পিতামহীর

নিকট পৌঁছাইয়া দিতেন। গুরুমহাশয় একদিবস সন্ধ্যার সময় পিতৃদেবকে বলিলেন, 'আপনার পুত্র অদ্বিতীয় বুদ্ধিমান, শ্রুতিধর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পাঠশালায় যাহা শিখিতে হয়, তৎসমস্তই ইহার শিক্ষা হইয়াছে। ঈশ্বরকে এখান হইতে কলিকাতায় লইয়া যাওয়া অত্যন্ত আবশ্যক হইয়াছে। আপনি নিকটে রাখিয়া ইংরাজী শিক্ষা দিলে ভাল হয়। এ ছেলে সামান্য ছেলে নয়, বড় বড় ছেলেদের অপেক্ষা ইহার শিক্ষা অতি উত্তম হইয়াছে। আর হস্তাক্ষর যেরূপ হইয়াছে, তাহাতে পুঁথি লিখিতে পারিবে।' তৎকালে বাঙ্গালা ছাপাখানা প্রায় ছিল না। যাদের হস্তাক্ষর ভাল হইত, তাহারা সংস্কৃত পুস্তক হাতে লিখিত। হস্তাক্ষর ভাল হইলে, তাহারা সাধারণের নিকট সম্মানিত হইত। একারণ অনেকে হস্তাক্ষর ভাল করিবার জন্য বিশেষ যত্ন পাইত। তৎকালে এপ্রদেশে সম্বন্ধ করিতে আসিলে, অগ্রে পাত্রের হস্তাক্ষর দেখিত, তৎপরে সম্বন্ধের স্থিরীকরণের ইচ্ছা করিত। অগ্রজকে কলিকাতা লইয়া যাইবার নাম শুনিয়া, জননীদেবী উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তৎকালে এপ্রদেশের কাহারও লেখাপড়া শিক্ষার জন্য কলিকাতা যাইবার রীতি ছিল না। ব্রাহ্মণতনয়গণ কেহ কেহ বাল্যকালে টোলে পড়িত। অধিক বয়স হইলে বিদেশের টোলে অধ্যয়নার্থে যাত্রা করিত, কেহ কেহ জমিদারী সেরেস্তায় কাগজপত্র লিখিতে শিক্ষা করিত।

পিতৃদেব ইং ১৮২৯ ও বাঙ্গালা ১২৩৫ সালের কার্তিকমাসে গুরুমহাশয় কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় ও অগ্রজকে সমভিব্যাহারে লইয়া, কলিকাতা যাত্রা করিলেন।

কলিকাতা, বীরসিংহা হইতে প্রায় ছাব্বিশ ক্রোশ পূর্বে। তৎকালে এখান হইতে কলিকাতা যাইবার ভাল পথ ছিল না; বিশেষত পথে অত্যন্ত দস্যুভয় ছিল। প্রায় মধ্যে মধ্যে অনেকেই ঠেঙ্গাড়ের হাতে পড়িয়া প্রাণ হারাইত—বিশেষ সতর্কতাপূর্বক যাইতে হইত। ঘাঁটাল হইয়া রূপনারায়ণ নদী দিয়া জলপথে নৌকারোহণে কলিকাতা যাইবার উপায় ছিল বটে, কিন্তু দস্যুভয়প্রযুক্ত নৌকায় যাইতে কেহ সাধ্যমতে ইচ্ছা করিত না; সুতরাং পদব্রজেই যাইতে হইল। অগ্রজ মহাশয় সমস্ত পথ চলিতে পারিবেন না বলিয়া, আনন্দরাম গুটিকে সমভিব্যাহারে লইলেন। যখন চলিতে অক্ষম হইবেন, তখন মধ্যে মধ্যে ঐ বাহক, ক্রোড়ে বা স্কন্ধে করিয়া লইয়া যাইবে। প্রথম দিবস বাটী হইতে ছয় ক্রোশ অন্তর পাতুলগ্রামে রাধামোহন বিদ্যাভূষণের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। পরদিবস সমস্ত দিনের পর সন্ধ্যার সময়, তথা হইতে দশ ক্রোশ অন্তর সন্ধিপুর গ্রামে রাজচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাটীতে পৌঁছিলেন। পরদিবস প্রাতে জাথালা-গ্রামের প্রান্তভাগে যে বাঁধা রাজপথ শালিকা পর্যন্ত গিয়াছে, সেই পথ দিয়া গমনকালে অগ্রজমহাশয় পথে মাইলস্টোন দেখিয়া বলিলেন, 'বাবা! এখানে হলুদ বাটিবার শিল মাটিতে পোঁতা রহিয়াছে কেন? আর ইহাতে কি লেখার মত চিহ্ন রহিয়াছে?' তাহাতে পিতৃদেব বলিলেন, 'ইহাকে মাইল-স্টোন বলে। ইহাতে ইংরাজী-ভাষায় নম্বর লেখা

আছে। এক মাইল (বাঙ্গালা অর্দ্ধ-ক্রোশ) অন্তর এক একটি এইরূপ পাথর পোতা আছে।' শ্যাখালা হইতে শালিকার ঘাট পর্য্যন্ত ঐরূপ পাথরে ইংরাজী অঙ্ক দেখিয়া, অগ্রজ মহাশয় ইংরাজী এক সংখ্যা হইতে দশ পর্য্যন্ত চিনিলেন। কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় ও পিতৃদেব, মধ্যে, জগদীশপুরে যে স্থানে মাইল-স্টোন ছিল, সেইস্থান দেখান নাই; ইহার কারণ, অক্ষর চিনিতে পারিয়াছেন কি না, জানিবার অভিপ্রায়ে উভয়ে যুক্তি করিয়াছিলেন। অগ্রজ বলিলেন, 'ইহার পূর্ব্বে তবে একটা পাথর আমরা দেখিতে বিস্মৃত হইয়াছি।' তখন কালীকান্ত বলিলেন, 'ঈশ্বর! তোমাকে ঠকাইবার জন্য আমরা এরূপ করিয়াছি। তুমি যে বলিতে পারিলে, তাহাতে আমরা পরম আহ্লাদিত হইলাম।' শ্যাখালা গ্রাম হইতে শালিকার গঙ্গার ঘাট দশ ক্রোশ। সন্ধ্যার সময় তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং গঙ্গা পার হইয়া বড়বাজারের বাবু জগদ্দুর্লভ সিংহের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। পরদিন প্রাতে পিতৃদেব, জগদ্দুর্লভবাবুর এক ইংরাজী বিল ঠিক দিতেছিলেন; তথায় অগ্রজ মহাশয় বসিয়া বলিলেন, 'বাবা, আমি ইহা ঠিক দিতে পারি। তাহা শুনিয়া উক্ত সিংহ মহাশয় বলিলেন, 'ঈশ্বর! তুমি ইংরাজী অঙ্ক কেমন করিয়া জানিলে?' তাহাতে তিনি বলিলেন, 'কেন, বাবা ও কালীকান্ত খুড়া শ্যাখালা হইতে শালিকার ঘাট পর্য্যন্ত পাথরে অঙ্কিত মাইল-স্টোন দেখাইয়াছেন। তাহাতেই ইংরাজী অঙ্কের এক সংখ্যা হইতে ১০ সংখ্যা পর্য্যন্ত শিখিয়াছি। সেই জন্য ঠিক দিতে পারিব সাহস করিয়াছি।' সিংহ মহাশয়, কয়েকটা বিল ঠিক দিবার জন্য দাদাকে দিলেন। ঐ বিলে দাদার ঠিক দেওয়া নির্ভুল হইয়াছে দেখিয়া, কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া মুখচুম্বনপূর্ব্বক বলিলেন, 'তুমি চিরজীবী হও, আমি যে তোমার প্রতি আন্তরিক যত্নের সহিত পরিশ্রম করিয়াছি, তাহা অদ্য আমার সার্থক হইল।' উপস্থিত সকলে বলিলেন, 'বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়! আপনার এই বুদ্ধিমান পুত্রটিকে ভালরূপ লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক।' তাহাতে পিতৃদেব বলিলেন, 'ইহাকে হিন্দু-কলেজে পড়িতে দিব মনে মনে স্থির করিয়াছি।' তাহা শুনিয়া, উপস্থিত সকলে বলিলেন, 'আপনি মাসিক ১০৲ টাকা বেতন পাইয়া থাকেন, তাহাতে হিন্দু-কলেজে কেমন করিয়া অধ্যয়ন করাইবেন?' এই কথা শুনিয়া, তিনি তাঁহাদিগকে উত্তর করিলেন, 'ছেলের কলেজের মাসিক বেতন ৫৲ টাকা দিব, আর বাটীর খরচ ৫৲ টাকা পাঠাইব।' ইহা শুনিয়া কেহ কেহ বলিলেন, 'চোরবাগানের ইংরাজী স্কুলে নিযুক্ত করিলে, সামান্য বেতন লাগিবে।' এই বিষয়ে মাসাবধি আন্দোলন চলিতে লাগিল। জগদ্দুর্লভ সিংহের ভগিনী রাইমণি দাসী ও তাঁহার পরিবারগণ জ্যেষ্ঠাগ্রজ মহাশয়কে অতি শিশু দেখিয়া, অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। পিতৃদেব চাকরি উপলক্ষে প্রাতঃকাল হইতে বেলা নয়টা পর্য্যন্ত কার্য সমাধা করিয়া বাসায় আসিয়া, পাকাদিকার্য সম্পন্ন করিয়া, উভয়ে ভোজন করিতেন। আফিস হইতে বাসায়

আসিয়া রাত্রি দশটার সময় পুনর্বার পাকাদিকার্য সমাধা করিয়া, উভয়ে নিদ্রা যাইতেন। প্রাতঃকাল হইলে অষ্টমবর্ষীয় বালক অগ্রজ মহাশয়, প্রায় সমস্ত দিন ঐ দয়াময়ী স্ত্রীলোকদ্বয়ের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া, বিদেশে অবস্থিতি করিতেন। তাঁহারা স্নেহপূর্বক খাবার দিতেন ও কথাবার্তায় ভুলাইয়া রাখিতেন। দাদা যখন জননী প্রভৃতির জন্য ভাবনা করিতেন, তখন ঐ স্ত্রীলোকদ্বয়, ভুলাইয়া ও কত প্রকার গল্প করিয়া সান্ত্বনা করিতেন এবং দেশের জন্য বা জননীর জন্য ভাবিতে দিতেন না। উক্ত রাইমণি দাসী ও জগদ্দুর্লভ সিংহের পত্নীর দয়াগুণেই শৈশবকালে অগ্রজ মহাশয় বিস্তর উপকার পাইয়াছিলেন। তাঁহারা এরূপ দয়াদাক্ষিণ্য প্রকাশ না করিলে, দাদা কলিকাতায় অবস্থিতি করিতে পারিতেন না। অদ্যাপি ঐ দয়াময়ীদের নাম স্মরণ হইলে, দাদার চক্ষে জল আসিত।

জগদ্দুর্লভবাবুর বাটীর সন্নিহিত বাবু শিবচন্দ্র মল্লিকের বাটীতে এক পাঠশালা ছিল। তথায় রামলোচন সরকারের নিকট শিক্ষা করিবার জন্য দাদাকে নিযুক্ত করেন। কার্তিক, অগ্রহায়ণ দুইমাস কাল তাঁহার নিকট লেখাপড়া শিক্ষা করেন। দাদা প্রত্যহ পিতৃদেবকে বলিতেন, 'বীরসিংহায় কালীকান্ত খুড়ার পাঠশালে যেরূপ উপদেশ ও শিক্ষা পাইয়াছি, তদপেক্ষা ইঁহার নিকট অতিরিক্ত কিছুই শিক্ষা করিবার আশা নাই। এই পাঠশালে যাইয়া কেবল বসিয়া থাকিতে হয়। এখানে সরকার মহাশয় আমায় নূতন কিছুই শিখান নাই, যাহা দেশে শিখিয়াছি, এখানেও সেই সেই বিষয় বলিয়া দিয়া থাকেন। অতএব যাঁহার নিকট নূতন বিষয় শিখিতে পারি, আমাকে সেইরূপ গুরুমহাশয়ের নিকট নিযুক্ত করুন, নচেৎ বিদেশে থাকিবার আবশ্যক কি?' ইহার কয়েক দিন পরে, অগ্রজ মহাশয় উদরাময়ে আক্রান্ত হইয়া, সর্বদা অসাবধান হইয়া শয্যায় মলমূত্র ত্যাগ করিতে লাগিলেন। অন্য কেহ অভিভাবক না থাকায়, পিতৃদেবকেই ঐ বিষ্ঠা স্বহস্তে পরিষ্কার করিতে হইত। এক এক দিন এরূপ হইত যে, সিঁড়িতে মলত্যাগ করিলে, সমস্ত সিঁড়িতে তরল মল গড়াইয়া পড়িত। পিতৃদেব স্বহস্তে ঐ বিষ্ঠা পরিষ্কার করিতেন। তৎকালে যদিও অগ্রজ মহাশয় বালক ছিলেন, তথাপি মনে করিতেন যে, বাবা এত কেন করেন। কয়েক দিন পরে পিতামহী, পৌত্রের এরূপ পীড়ার সংবাদ পাইয়া, অনতিবিলম্বে কলিকাতায় যাইয়া, তথা হইতে পৌত্রকে দেশে আনয়ন করিলেন। দেশে তিন চারি মাস অবস্থিতি করিয়া, রোগ হইতে মুক্ত হইলেন। পুনর্বার জ্যৈষ্ঠমাসে পিতৃদেব দেশে আসিয়া, দাদাকে সমভিব্যাহারে লইয়া কলিকাতা যাত্রা করিলেন। ঐ সময় অগ্রজকে পিতৃদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেমন ঈশ্বর! এবার বরাবর বাটী হইতে কলিকাতায় চলিয়া যাইতে পারিবে কি না? যদি চলিতে না পার, তাহা হইলে একজন লোক সঙ্গে লইব। সে মধ্যে মধ্যে তোমাকে কোলে করিবে।' তাহাতে দাদা উত্তর করিলেন যে, 'এবার চলিয়া যাইতে পারিব; সঙ্গে লোক লইবার আবশ্যক নাই।' পরদিন রবিবার

গ্রাতে ভোজনান্তে পিতার সহিত ছয় ক্রোশ পথ গমন করিয়া, পাতুলগ্রামে রাধামোহন বিদ্যাভূষণের ভবনে অবস্থিতি করিলেন। তৎপরদিবস তথা হইতে প্রায় আট ক্রোশ অন্তরস্থিত তারকেশ্বরের সন্নিহিত রামনগর গ্রামে কনিষ্ঠা পিতৃস্বসার বাটী যাত্রা করিলেন। রাজবলহাটের দোকানে উপস্থিত হইয়া উভয়ে ফলাহার করিলেন। তথা হইতে উঠিবার সময় দাদা বলিলেন, 'বাবা, আমি আর চলিতে পারিব না।' পিতা কতই বুঝাইলেন; তাহাতে দাদা বলিলেন, 'দেখুন পা ফুলিয়া গিয়াছে, আর পা ফেলিতে পারিব না।' পিতা বলিলেন, 'খানিক চল, আগে যাইয়া তরমুজ কিনিয়া দিব', এই বলিয়া ভুলাইতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই এক পাও চলিলেন না। পিতৃদেব বলিলেন, 'যদি চলিতে না পারিবে, তবে লোক সঙ্গে লইতে কেন নিবারণ করিলে?' এই বলিয়া প্রহার করিলেন। প্রহার খাইয়া দাদা রোদন করিতে লাগিলেন। 'তবে তুই এখানে থাক, আমি চলিলাম', এই বলিয়া পিতা কিয়দ্দূর যাইয়া দেখিলেন, দাদা সেই স্থানেই বসিয়া আছেন, এক পাও চলেন নাই, কি করেন অগত্যা ফিরিয়া আসিয়া দাদাকে স্কন্ধে লইয়া চলিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন, 'এবার খানিক চল, আগের দোকানে তরমুজ কিনিয়া দিব।' পিতৃদেব অতি খর্বকায় ও ক্ষীণজীবী ছিলেন, সুতরাং অষ্টমবর্ষীয় বালককে স্কন্ধে করিয়া অধিক দূর গমন করা সহজ ব্যাপার নহে, একারণ কিয়দ্দূর যাইয়া স্কন্ধ হইতে নামাইলেন। তথায় তরমুজ খাওয়াইলেও চলিতে অসমর্থ হইলেন। সুতরাং পিতা কখন কাঁধে, কখন ক্রোড়ে করিয়া চলিলেন। অনন্তর তাঁহারা সন্ধ্যার সময় রামনগরের রামতারক মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। দাদার পদদ্বয়ের বেদনা ভাল হইবার জন্য পিতৃস্বসা অন্নপূর্ণা দেবী উষ্ণ তৈল দিয়া, পদদ্বয় মর্দন করিয়া দিলেন। পরদিন তথায় অবস্থিতি করিলেন। একদিবস তথায় থাকায়, পায়ের বেদনার হ্রাস হইল। সুতরাং অক্লেশে পরদিন বৈদ্যবাটীর পথে গমন করিলেন, এবং তথা হইতে নৌকারোহণে সন্ধ্যার সময় কলিকাতায় বড়বাজারের বাসায় উপস্থিত হইলেন।

কয়েকদিন পরে পিতা স্থির করিলেন যে, আমাদের বংশের পূর্ব-পুরুষগণ সকলেই সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়া বিদ্যাদান করিয়াছেন, কেবল আমাকে দুর্ভাগ্য-প্রযুক্ত বাল্যকাল হইতে সংসার-প্রতিপালন-জন্য আশু অর্থকরী ইংরাজী বিদ্যা শিক্ষা করিতে হইয়াছে। ঈশ্বর সংস্কৃত অধ্যয়ন করিলে, দেশে টোল করিয়া দিব। জগদ্দুর্লভ সিংহের বাটীতে অনেক পণ্ডিত বার্ষিক আদায় করিতে আসিতেন; তন্মধ্যে পটলডাঙ্গাস্থ গবর্নমেন্ট সংস্কৃত-কলেজের ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীর পণ্ডিত গঙ্গাধর তর্কবাগীশ মহাশয়ের সহিত পিতৃদেবের আলাপ ছিল। তাঁহাকে পরামর্শ জিজ্ঞাসায় তিনি উপদেশ দিলেন যে, কলেজে প্রবিষ্ট করিয়া দিলে পাঁচ-ছয় মাস পরে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, আপাতত মাসে মাসে পাঁচ টাকা বৃত্তি পাইবে, দেশের টোলে পড়িতে গেলে সংক্ষিপ্তসার অধ্যয়ন করিতে দীর্ঘকাল লাগিবে। কলেজে

'মুগ্ধবোধ' ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়া, তিন বৎসরের মধ্যে ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি জন্মিলে, কাব্যের শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইতে পারিবে। দ্বিতীয়ত তৎকালে পাতুলগ্রামনিবাসী রাধামোহন বিদ্যাভূষণের পিতৃব্যপুত্র মধুসূদন বাচস্পতি, সংস্কৃত-কলেজে অধ্যয়ন করিতেন এবং বৃত্তি পাইতেন। পিতৃদেব উক্ত বাচস্পতিকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনিও পরামর্শ দেন যে, ঈশ্বরকে সংস্কৃত-কলেজে ভর্তি করিয়া দাও। পিতৃদেব তাঁহাদের উপদেশের অনুবর্তী হইয়া, দাদাকে ইংরাজী বিদ্যালয়ে নিযুক্ত না করিয়া, সংস্কৃত-কলেজেই প্রবেশ করাইয়া দেওয়া সর্বতোভাবে শ্রেয়োজ্ঞান করিলেন।

বিদ্যাসাগরচরিত

ইংরাজী ১৮২৯ সালের জুন মাসের প্রথম দিবসেই পিতৃদেব, অগ্রজ মহাশয়কে কলিকাতাস্থ পটলডাঙ্গা গবর্নমেণ্ট সংস্কৃত-কলেজে ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে প্রবিষ্ট করাইয়া দিলেন। তৎকালে তাঁহার বয়স নয় বৎসর মাত্র। ইহার পূর্বে তাঁহার সংস্কৃত-শিক্ষা আরম্ভ হয় নাই। হালিশহরের নিকটস্থ কুমারহট্টনিবাসী গঙ্গাধর তর্কবাগীশ ঐ শ্রেণীর পণ্ডিত ছিলেন। ইনি শিশুগণকে শিক্ষা দিবার ভালরূপ রীতি-নীতি জানিতেন। বিশেষত অল্পবয়স্ক বালকদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য তর্কবাগীশ মহাশয় বিলক্ষণ পরিশ্রম করিতেন; একারণ, কলেজের মধ্যে ব্যাকরণের অন্যান্য শিক্ষক অপেক্ষা তর্কবাগীশ মহাশয় বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। অনেকেরই সংস্কার ছিল যে, তর্কবাগীশের নিকট অধ্যয়ন করিলে, ছাত্রগণের ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি জন্মে। পিতৃদেব প্রত্যহ প্রাতে নয়টার মধ্যে দাদাকে ভোজন করাইয়া, পটলডাঙ্গার কলেজে ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে বসাইয়া, তর্কবাগীশ মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ-পূর্বক পুনর্বার প্রায় দুই মাইল অন্তরস্থিত বড়বাজারের বাসায় যাইয়া ভোজনান্তে আফিসে যাইতেন। পুনর্বার বৈকালে চারিটার সময় আফিস হইতে কলেজে যাইয়া, অগ্রজকে সঙ্গে করিয়া বাসায় রাখিয়া তৎপরে আপনার কার্যে যাইতেন। এইরূপে ছয় মাস গত হইলে পর, জ্যেষ্ঠ মহাশয় পথ চিনিতে পারিলেন ও ক্রমশ সাহস হইল। তৎপরে আর পিতৃদেব সঙ্গে যাইতেন না। কলেজে প্রবিষ্ট হইবার ছয় মাস পরে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া, মাসিক পাঁচ টাকা বৃত্তি পাইলেন। মধুসূদন বাচস্পতি মহাশয়, শৈশবকালে পাঠদ্দশায় সর্বদা দাদার তত্ত্বাবধান করিতেন; একারণ, তিনি বাচস্পতিকে কখনও বিস্মৃত হন নাই; অদ্যাপি তাঁহার পুত্র সুরেন্দ্রকে প্রতিপালন করিয়া থাকেন। বড়বাজার হইতে পটলডাঙ্গার কলেজে অধ্যয়ন করিতে যাইবার সময় যখন পথে ছাতা মাথায় দিয়া যাইতেন, তখন লোকে মনে করিত যে, একটা ছাতা চলিয়া যাইতেছে। দাদা বাল্যকালে অত্যন্ত খর্ব ছিলেন। অন্যান্য লোকের মস্তক অপেক্ষা জ্যেষ্ঠের মস্তক অপেক্ষাকৃত স্থূল ছিল; তদ্রূপ প্রায় দৃষ্টিগোচর হইত না। একারণ, বাল্যকালে উঁহাকে কলেজের অনেকে 'যশোরে কৈ' (যশোহর জেলার কৈমাছ নৌকায় আসিয়া, কলিকাতায় গামলায় কিছুদিন থাকিত; এজন্য ঐ মাছের মাথা মোটা এবং অপর অংশ সরু হইত) বলিত এবং কেহ কেহ যশোরে কৈ না বলিয়া, 'কসুরে জৈ' বলিত। ইহা শুনিয়া অগ্রজ মহাশয় রাগ করিতেন। ক্রোধোদয় হইলে, তখন তিনি সহসা কথা কহিতে পারিতেন না; যেহেতু, বাল্যকালে তিনি তোত্‌লা ছিলেন।

অগ্রজ, কলেজে ব্যাকরণের শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইয়া, তর্কবাগীশ মহাশয়ের নিকট প্রত্যহ যাহা পড়িয়া আসিতেন, প্রত্যহ রাত্রিতে তাঁহাকে পিতার নিকট তাহা বলিতে হইত। পিতা, পুত্রের প্রমুখাৎ প্রত্যহ ব্যাকরণের পাঠ শ্রবণ করিতেন।

দশ-পনের দিন পরে তিনি যাহা বিস্মৃত হইতেন, তাহা পিতা অক্লেশে অবিকল বলিয়া দিতেন। পুত্রের নিকট প্রত্যহ শ্রবণ করিয়া, পিতার বিলক্ষণ ব্যাকরণে জ্ঞান জন্মিয়াছিল। দাদা মনে করিতেন যে, পিতৃদেব ব্যাকরণ ভালরূপ জানেন। কারণ, কলেজে তর্কবাগীশ মহাশয় যেরূপ বলিয়া দিতেন, পিতাও সেইরূপ বলিয়া দেন। বস্তুত পিতৃদেব সংস্কৃত-ব্যাকরণ পূর্বে কিছুমাত্র অবগত ছিলেন না। পিতা, প্রত্যহ রাত্রি নয়টার পর কর্মস্থান হইতে বাসায় আসিতেন। যে দিবস রাত্রিতে পড়িতে দেখিতেন, সে দিন পরম আহ্লাদিত হইতেন; যে দিন আসিয়া দেখিতেন যে, প্রদীপ জ্বলিতেছে, আর তিনি নিদ্রা যাইতেছেন, সেই দিন ক্রোধান্ধ হইয়া তাঁহাকে অত্যন্ত প্রহার করিতেন। মধ্যে মধ্যে এরূপ প্রহার করায়, জগদ্দুর্লভ সিংহের ভগিনী ও তাঁহার পত্নী বলিতেন, এরূপ ছোট ছেলেকে যদি অতঃপর এরূপ অন্যায়রূপে প্রহার করেন, তাহা হইলে আপনার এ বাটীতে অবস্থিতি করা হইবে না। কোন্ দিন প্রহারে ছেলেটা মরিয়া যাইবে; আমাদের সকলকেই বিপদে পড়িতে হইবে। গৃহস্থ এইরূপ ধমক দেওয়ায়, প্রহারের কথঞ্চিৎ লাঘব হইয়াছিল। রাত্রিতে পড়িবার সময় নিদ্রাকর্ষণ হইলে, তিনি প্রদীপের সর্ষপ-তৈল চক্ষে লাগাইতেন। চক্ষে তৈল লাগিলে চক্ষু জ্বালা করিত; সুতরাং নিদ্রাকর্ষণ হইত না। পিতা, রাত্রি নয়টার সময় বাসায় আসিয়া পাক করিয়া উভয়ে ভোজন করিয়া শয়ন করিতেন। শেষ রাত্রিতে পিতার নিদ্রাভঙ্গ হইলে, প্রত্যহ দাদাকে উদ্ভট-কবিতা মুখে মুখে শিখাইতেন। এইরূপে তিনি, পিতার নিকট প্রায় দুই শত সংস্কৃত-শ্লোক শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিলেন; সুতরাং অন্যান্য বালক অপেক্ষা ভাল পাঠ বলিতে, শব্দ রূপ করিতে, সন্ধি বলিতে ও ধাতু রূপ করিতে পারিতেন; একারণ, অধ্যাপক তর্কবাগীশ মহাশয় সকল ছাত্র অপেক্ষা তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তর্কবাগীশ মহাশয় তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া, প্রত্যহ একটি করিয়া উদ্ভট-কবিতা শিখাইতেন এবং ঐ কবিতার অন্বয় ও অর্থ বলিয়া দিতেন। তর্কবাগীশ মহাশয়ের নিকটেও দাদা প্রায় দুই শত সংস্কৃত-শ্লোক শিক্ষা করিয়াছিলেন। ব্যাকরণ-শ্রেণীতে তিন বৎসরের মধ্যে দুই বৎসর পরীক্ষায় উত্তমরূপে পারিতোষিক পাইয়াছিলেন। এক বৎসর অপর একটি মন্দ বালক ভাল প্রাইজ পাইল দেখিয়া, তাঁহার মনে এত ক্ষোভ জন্মিয়াছিল যে, 'কলেজে আর অধ্যয়ন করিব না, দেশে যাইয়া দণ্ডিপুরে বিশ্বনাথ সার্বভৌম পিসামহাশয়ের টোলে অধ্যয়ন করিব', এই স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু পিতৃদেব, তর্কবাগীশ মহাশয় ও মধুসূদন বাচস্পতির অনুরোধের বশবর্তী হইয়া, কলেজ পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। ঐ বৎসর ভালরূপ প্রাইজ না পাইবার কারণ এই যে, ঐ বৎসরে প্রাইস সাহেব পরীক্ষক ছিলেন। সাহেব ভাল বুঝিতে পারিতেন না। দাদা যাহা উত্তর করিতেন, তাহা ভালরূপ বিবেচনাপূর্বক করিতেন, তাহা নির্ভুল

হইত। যে বালক বিবেচনা না করিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়াছিল, তাহা ভালই হউক আর মন্দই হউক, সাহেব তাহাকে বুদ্ধিমান জানিয়া প্রাইজ দিয়াছিলেন।

দাদা, বাল্যকালে অত্যন্ত একগুঁয়ে ছিলেন। নিজে যাহা ভাল বোধ করিতেন, তাহাই করিতেন; অপরের উপদেশ গ্রাহ্য করিতেন না। গুরুতর লোক উপদেশ দিলেও ঘাড় বাঁকাইয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতেন। তজ্জন্য পিতা প্রহার করিলেও শুনিতেন না। আপনার জিদ বজায় রাখিবার জন্য শৈশবকাল হইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। ঘাড় সোজা করিতেন না বলিয়া, পিতা বলিতেন, 'আমার পিতা তোমাকে যে ঘাড়বাঁকা এঁড়ে গরুর সহিত তুলনা করিয়াছিলেন, তাহা সত্য।' পিতা তাঁহার স্বভাব বুঝিয়া চলিতেন। যে দিন সাদা বস্ত্র না থাকিত সে দিন বলিতেন, আজ ভাল কাপড় পরিয়া কলেজে যাইতে হইবে। তিনি হঠাৎ বলিতেন, না, আজ ময়লা কাপড় পরিয়া যাইব। যে দিন বলিতেন আজ স্নান করিতে হইবে, শ্রবণমাত্র দাদা বলিতেন যে, আজ স্নান করিব না; পিতা প্রহার করিয়াও স্নান করাইতে পারিতেন না। সঙ্গে করিয়া টাঁকশালের ঘাটে নামাইয়া দিলেও দাঁড়াইয়া থাকিতেন। পিতা, চড় চাপড় মারিয়া জোর করিয়া স্নান করাইতেন। অগ্রজের যাহা ইচ্ছা হইত, শৈশবকাল হইতে একাল পর্যন্ত তাহাই করিয়াছেন। তিনি বাল্যকাল হইতে এ পর্যন্ত নিজের প্রতিজ্ঞা বজায় রাখিয়াছেন এবং অসাধারণ উন্নতি লাভ করিয়াছেন। পিতা ইঁহাকে ঘাড় কেঁদো নাম দিয়াছিলেন, অর্থাৎ ঘাড় বাঁকাইলে সোজা হইবার নহে।

আমা হইতে ক্লাসে আর কেহ ভাল শিক্ষা করিতে না পারে, এরূপ জিদের উপর লেখাপড়া শিখিতে দাদা চিরকাল আন্তরিক যত্ন পাইয়াছিলেন। এমন কি, শৈশবকালেও প্রায় সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া অভ্যাস করিতেন। প্রায়ই পিতাকে বলিতেন, 'রাত্রি দশটার সময় আহার করিয়া শয়ন করিব, আপনি রাত্রি বারটা বাজিলে আমায় তুলিয়া দিবেন, নচেৎ আমার পাঠাভ্যাস হইবে না।' পিতা, আহারের পর দুই ঘণ্টা বসিয়া থাকিতেন, নিকটে আরমানি গির্জার ঘণ্টারব শুনিয়া, তাঁহার নিদ্রা ভাঙাইয়া দিতেন; তিনি উঠিয়া সমস্ত রাত্রি পাঠাভ্যাস করিতেন। এইরূপ অত্যধিক পরিশ্রম করিয়া, মধ্যে মধ্যে তিনি অত্যন্ত কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইতেন। ব্যাকরণ-শ্রেণীতে তিন বৎসর ছয় মাস ছিলেন; কিন্তু তিন বৎসরের মধ্যেই ব্যাকরণ সমাপ্ত করেন। শেষ ছয় মাস কাল 'অমরকোষ'-এর মনুষ্যবর্গ ও 'ভট্টিকাব্য'-এর পঞ্চম সর্গ পর্যন্ত পাঠ করিয়াছিলেন।

একাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে অগ্রজ মহাশয়ের উপনয়ন সংস্কার হয়। দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমসময়ে অগ্রজ মহাশয় সাহিত্যশ্রেণীতে প্রবিষ্ট হন। তৎকালে জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয় সাহিত্যশাস্ত্রের শ্রেণীতে অধ্যাপক ছিলেন। শুনিয়াছি, তর্কালঙ্কার মহাশয় কাশীধামে বাল্যকাল হইতে সাহিত্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া,

বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। গদ্য-পদ্য-রচনা-বিষয়ে তাঁহার তুল্য লোক প্রায় কেহ তৎকালে জন্মগ্রহণ করেন নাই। একারণ, সংস্কৃত-কলেজ স্থাপনসময়ে উইলসন সাহেব, তাঁহাকে কাশীধাম হইতে আনাইয়া এই পদে নিযুক্ত করেন। উইলসন সাহেব প্রথমত বেনারসের টাঁকশালে কর্ম করিতেন। তদনন্তর কলিকাতায় সংস্কৃত-কলেজে অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। কাশীধামে সাহেবের সহিত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের বিশেষরূপ আলাপ হইয়াছিল; এজন্য সংস্কৃত-কলেজের সাহিত্যশ্রেণীর শিক্ষকতাপদে নিযুক্ত করিবার জন্য তাঁহাকে আনয়ন করিয়া ছিলেন। বাঙ্গালাদেশে কাব্যশাস্ত্রে ইঁহার তুল্য পণ্ডিত আর কেহই ছিলেন না। দাদার সাহিত্যশ্রেণীতে প্রবেশকালে মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ, মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রভৃতি অনেক বিদ্যার্থী এই সাহিত্যশ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে তিনি সকল ছাত্র অপেক্ষা অল্পবয়স্ক ছিলেন; এজন্য প্রথমত তর্কালঙ্কার মহাশয় বলেন যে, 'ঈশ্বর এত ছোট ছেলে, কাব্য বুঝিতে পারিবে কি?' এজন্য তিনি ভট্টির কয়েকটি কবিতার অর্থ করিতে বলেন। অগ্রজ যেরূপ অর্থ ও অন্বয় করিলেন, অন্য কোন ছাত্র সেরূপ অন্বয়ার্থ করিতে পারিলেন না, তজ্জন্য তর্কালঙ্কার মহাশয় তাঁহার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তর্কালঙ্কার মহাশয়, বাঙ্গালা দেশের পণ্ডিত অপেক্ষা কাব্যশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন সত্য বটে; কিন্তু ছাত্রগণকে পড়াইবার সময়, যে কবিতার অন্বয় করিতেন, তাহার অর্থ বলিতেন না, যাহার অর্থ ও ভাব বলিতেন, তাহার অন্বয় করিতেন না; সুতরাং যে সকল ছাত্র ব্যাকরণে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারে নাই, তাঁহাদের পক্ষে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন করিয়া কিছুমাত্র ফলোদয় হইত না। অগ্রজ মহাশয়ের ব্যাকরণে বিশিষ্টরূপ ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল। বিশেষত 'ভট্টিকাব্য'-এর প্রথম হইতে পঞ্চম সর্গ ও প্রায় ৫০০ শত উদ্ভট-কবিতা ভালরূপ কণ্ঠস্থ ছিল, এজন্য তাঁহার নিকট শিক্ষা-বিষয়ে ইঁহার কোন অসুবিধা ঘটে নাই। প্রথম বৎসর 'রঘুবংশ', 'কুমারসম্ভব', 'রাঘবপাণ্ডবীয়' প্রভৃতি সাহিত্য গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া, বার্ষিক-পরীক্ষায় সর্বোৎকৃষ্ট হইয়া প্রধান পারিতোষিক প্রাপ্ত হন। তৎকালে পুস্তক-পারিতোষিকেরই ব্যবস্থা ছিল। দ্বিতীয় বৎসর 'মাঘ', 'ভারবি', 'মেঘদূত', 'শকুন্তলা', 'উত্তরচরিত', 'বিক্রমোর্বশী', 'মুদ্রারাক্ষস', 'কাদম্বরী', 'দশকুমারচরিত' প্রভৃতি মুখস্থ করিয়া, সাহিত্যশাস্ত্রে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তৎকালে রবিবারে কলেজ বন্ধ হইত না। অষ্টমী ও প্রতিপদে সংস্কৃত অনুশীলন নিষেধ ছিল; এজন্য উক্ত দিবসদ্বয় কলেজ বন্ধ থাকিত। দ্বাদশী, ত্রয়োদশী, চতুর্দশী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় নূতন পাঠ বন্ধ থাকিত; একারণ, ঐ কয়েক দিবস সংস্কৃত-রচনা-শিক্ষার অনুশীলন হইত। কোন দিন সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা অনুবাদ, কোন দিন বাঙ্গালা হইতে সংস্কৃত অনুবাদ হইত। অগ্রজ মহাশয়, সকল ছাত্র অপেক্ষা ভাল অনুবাদ করিতে পারিতেন। বিশেষত তাঁহার ব্যাকরণভুল বা বর্ণাশুদ্ধি আদৌ হইত না। একারণ,

অধ্যাপক তর্কালঙ্কার মহাশয়, তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তিনি কাব্য বা নাটক যাহা অধ্যয়ন করিতেন, তাহাই প্রায় কণ্ঠস্থ করিতেন। তাঁহার ন্যায় স্মরণশক্তি কোন ছাত্রেরই ছিল না। নাটকের প্রাকৃত-ভাষা প্রায় তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। একারণ, যেমন সংস্কৃত কথা কহিতে সমর্থ ছিলেন, সেইরূপ অনর্গল প্রাকৃতভাষাও কহিতে পারিতেন। এই অসাধারণ ক্ষমতা দেখিয়া, তৎকালের পণ্ডিতব্যক্তিরা বলিতেন যে, ঈশ্বর শ্রুতিধর ; এই বালক দীর্ঘজীবী হইলে অদ্বিতীয় লোক হইবে। সাহিত্যশ্রেণীতে দ্বিতীয় বৎসরের পরীক্ষায় সর্বোৎকৃষ্ট হইয়া, অগ্রজ সর্বপ্রধান পারিতোষিক পাইয়াছিলেন। তৎকালে নিয়ম ছিল, যে ছাত্রের হস্তাক্ষর ভাল হইত, সে লেখার জন্য স্বতন্ত্র একটি পারিতোষিক পাইত। ক্লাসের মধ্যে দাদার হস্তাক্ষর ভাল ছিল ; এজন্য তিনি প্রতি বৎসরেই লেখার প্রাইজ পাইতেন। সেই সময়ে অনেক সংস্কৃত পুস্তক মুদ্রিত ছিল না ; অগ্রজ মহাশয় সুবিধা অনুসারে অনেক সংস্কৃত-পুস্তক স্বহস্তে লিখিয়াছিলেন।

এই সময় পিতৃদেব তাঁহার মধ্যমপুত্র অষ্টমবর্ষীয় দীনবন্ধুকে লেখাপড়া শিক্ষার মানসে কলিকাতায় আনয়ন করিলেন। ঐ সময় হইতে অগ্রজকে দুই বেলা সকলের পাকাদি-কার্য সম্পন্ন করিতে হইত। বাসায় কোন দাসদাসী ছিল না। প্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গ হইলে, কিয়ৎক্ষণ পুস্তক আবৃত্তি করিয়া, বড়বাজার টাঁকশালের গঙ্গার ঘাটে স্নান করিয়া আসিবার সময়, বড়বাজার কাশীনাথ বাবুর বাজারে যাইতেন। তথা হইতে মৎস্য ও আলু পটল প্রভৃতি তরকারী ক্রয় করিয়া আনিতেন। বাসায় পৌছিয়া, প্রথমত হরিদ্রাদি ঝাল-মশলা বাটিয়া, উনন ধরাইয়া মুগের দাউল পাক করিয়া, মৎস্যের ঝোল রন্ধন করিতেন। তখন বাসায় চারিজন লোক ভোজন করিতেন। ভোজনের পর সমুদয় উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার ও বাসনাদি ধৌত করিতে হইত। হাঁড়ি মাজিয়া, বাসন ধৌত করিয়া ও স্থান পরিষ্কার করিয়া দাদার অঙ্গুলির অগ্রভাগ ও নখগুলি ক্ষয় হইয়া যাইত। হরিদ্রা বাটার জন্য হস্তে হরিদ্রার চিহ্ন থাকিত। ভোজন করিতে করিতে যদি একটি ভাত ছড়ান হইত বা পাতে কিছু উচ্ছিষ্ট পড়িয়া থাকিত, তাহা হইলে পিতৃদেব তৎক্ষণাৎ চড় মারিতেন, তজ্জন্য ভোজনের সময় পাত পরিষ্কার করিয়া খাইতে হইত। তিনি বাল্যকালে পিতার নিকট এই সকল রীতি শিক্ষা পাইয়াছিলেন এবং বরাবর ভোজনের পাত্র পরিষ্কার করিয়া আহার করিতেন। একারণ, তাঁহার উচ্ছিষ্ট-পাত্রে অনেকে শ্রদ্ধাপূর্বক ভোজন করিতে ইচ্ছা করিত। অগ্রজ মহাশয়, মধ্যম সোদর দীনবন্ধুকে সংস্কৃত-কলেজের দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রবিষ্ট করাইয়া দেন। তৎকালে হরিপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন উক্ত শ্রেণীর অধ্যাপক ছিলেন। দীনবন্ধু, বাল্যকালে লেখা-পড়া শিক্ষাবিষয়ে ঔদাস্য অবলম্বন করিতেন বটে, কিন্তু অদ্বিতীয় বুদ্ধিমান ছিলেন। অনেকে দীনবন্ধুকে শ্রুতিধর বলিত। অধিক কি, সংস্কৃত-কবিতা একবারমাত্র শ্রবণ করিলেই দীনবন্ধুর কণ্ঠস্থ হইত। পিতৃদেব স্বীয় কার্য সমাধা করিয়া, রাত্রি নয়টার

সময় বাসায় আসিতেন। জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম পুত্র উভয়ে মনোযোগপূর্বক পাঠাভ্যাস করিতেছেন দেখিলে, তিনি পরমাহ্লাদিত হইতেন। প্রদীপ জ্বলিতেছে, পুস্তক খোলা রহিয়াছে, অথচ উভয়েই নিদ্রা যাইতেছে দেখিবামাত্র, ক্রোধান্ধ হইয়া অত্যন্ত প্রহার করিতেন। প্রহারে উভয়ে অত্যন্ত চীৎকার করিয়া রোদন করিতেন, ইহাদের রোদন শুনিয়া গৃহস্বামী সিংহ মহাশয়ের পরিবারগণ অত্যন্ত দুঃখিত হইতেন এবং তাঁহারা স্পষ্টাক্ষরে বলিতেন, ছোট ছোট প্রাণসম সন্তানগণকে এরূপ প্রহার করা উচিত নহে। এরূপ প্রহারে কোনদিন মরিয়া যাইতে পারে, তজ্জন্য আপনাকে পুনঃপুনঃ বলিয়া থাকি যে, ছোট ছোট ছেলেকে এরূপ নির্দয়ভাবে যদি প্রহার করেন, তাহা হইলে আপনার এখানে থাকা হইবে না। ইহাতে প্রহারের অনেকটা লাঘব হইয়াছিল। পিতৃদেব রাত্রি নয় ঘটিকার সময় বাসায় আগমন করিয়া পাকারম্ভ করিতেন; পাক ও আহার করিয়া রাত্রি একাদশ ঘটিকার পর সকলে শয়ন করিতেন। পুনর্বার শেষরাত্রিতে নিদ্রাভঙ্গ হইলে, পিতার নিকট যে সকল উদ্ভট-কবিতা শিক্ষা করিয়াছিলেন, সেইগুলি আবৃত্তি করিতেন। সূর্যোদয় হইলে পর, কলেজের পাঠ্যপুস্তক মুখস্থ করিতেন; তৎপরে গঙ্গাস্নান করিয়া প্রাতঃসন্ধ্যা করিতেন এবং পাকাদিকার্য সমাধানান্তে ভোজন করিয়া বিদ্যালয়ে যাইতেন। অগ্রজ মহাশয় সন্ধ্যার ক্রমগুলি প্রকাশ্যরূপে দেখাইতেন। লোকে জানিত যে, অগ্রজ মহাশয়ের সন্ধ্যাভ্যাস আছে; কিন্তু সন্ধ্যা সমস্তই বিস্মৃত হইয়াছিলেন। সন্দেহপ্রযুক্ত একদিবস কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পিতৃব্য মহাশয় তাঁহাকে বলিলেন, 'আমরা সন্ধ্যা ভুলিয়া গিয়াছি, বিশেষত আমরা বিষয়ী লোক, তুমি সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়াছ, তোমার শুদ্ধ হইবে, অতএব একবার সন্ধ্যাটি তুমি আবৃত্তি কর, আমি শুনিতে ইচ্ছা করি।' তিনি সন্ধ্যা ভুলিয়া গিয়াছিলেন, কিছুই বলিতে পারিলেন না। পিতৃব্য, পিতৃদেবকে বলিলেন যে, 'ঈশ্বর সন্ধ্যা সমস্ত ভুলিয়া গিয়াছে, মিথ্যা কেবল হাতনাড়াদি কার্য করিয়া থাকে।' পিতৃদেব তাহা শুনিয়া বিলক্ষণ প্রহার করেন। সন্ধ্যা শিক্ষা না হইলে জল খাইতে দিব না বলায়, অগ্রজ মহাশয় সন্ধ্যার পুঁথি দেখিয়া পুনর্বার সন্ধ্যা মুখস্থ করেন।

বীরসিংহা হইতে জননীদেবী চরখায় সূতা কাটিয়া, উভয় পুত্রের জন্য বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া কলিকাতায় পাঠাইতেন। উভয় ভ্রাতা সেই মোটা বস্ত্র পরিয়া, অধ্যয়নার্থ পটলডাঙ্গার কলেজে যাইতেন। এক্ষণে সেইরূপ চরখাকাটা সূতায় প্রস্তুত মোটা বস্ত্র উড়িষ্যাদেশীয় বেহারা বা জঙ্গলবাসী ধাঙড়গণকে পরিধান করিতে দেখা যায়। অগ্রজ মহাশয়কে বরাবর মোটা বস্ত্র পরিধান করিতে দেখা গিয়াছে, তিনি কখনই সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করেন নাই। অগ্রজ মহাশয়, কলেজে মাসিক বৃত্তি যাহা পাইতেন, তাহা পিতাকে দিতেন।

এইরূপে তাঁহার উন্নতি হওয়াতে পিতৃদেব বলেন যে, 'তোমার এই টাকায়

জমি ক্রয় করিব ; কলেজের অধ্যয়ন শেষ হইলে, দেশে টোল করিয়া দিব। দেশস্থ লোক যাহাতে লেখাপড়া শিক্ষা করিতে পারে, তাহা তুমি করিবে। তোমার বৃত্তির টাকায় যে জমি ক্রয় করা হইবে, তাহার উপস্বত্বের দ্বারা বিদেশীয় ছাত্রগণের ব্যয়নির্বাহের কিছু সাহায্য হইতে পারিবে।' ইহা স্থির করিয়া, কাঁচিয়াগ্রাম প্রভৃতিতে কয়েক বিঘা জমি ক্রয় করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে বলেন, 'তোমার টাকায় তোমার আবশ্যক পুস্তকাদি ক্রয় করিবে।' তাহাতে দাদা অনেকগুলি হস্তাক্ষরিত পুঁথি ক্রয় করিয়াছিলেন। সেই সমস্ত পুঁথি অদ্যাপি তাঁহার প্রসিদ্ধ লাইব্রেরীতে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। অগ্রজ মহাশয়, ব্যাকরণ ও কাব্য-শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়াছিলেন। যখন দেশে (বীরসিংহায়) আসিতেন, তৎকালে কাহারও বাটীতে আদ্যশ্রাদ্ধ হইলে, কৃতী, নিমন্ত্রণার্থ অগ্রজের নিকট কবিতা রচনা করাইতেন ; সমাগত সভাস্থ পণ্ডিতগণ ঐ কবিতা দেখিয়া বলিতেন যে, 'এ কবিতা কাহার রচনা ?' তাহা শুনিয়া কৃতী বলিতেন, এই বালক রচনা করিয়াছে। সমাগত পণ্ডিতগণ তাঁহার সহিত ব্যাকরণের বিচার করিতেন; বিচারসময়ে তিনি সংস্কৃত-ভাষায় কথা কহিতেন। তজ্জন্য দেশস্থ পণ্ডিতগণ আশ্চর্য হইতেন। ক্রমশ দেশে প্রচার হইল যে, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়াছেন , যেহেতু তিনি বিচারসময়ে সংস্কৃতভাষা অবলম্বন করিয়া কথা কহিয়া থাকেন। তৎকালে দেশীয় পণ্ডিতগণ সংস্কৃতভাষায় কথা কহিতে সম্পূর্ণরূপ সক্ষম ছিলেন না।

দেশে অনেকে অগ্রজকে কন্যাদান করিবার জন্য বিশিষ্টরূপ যত্ন পাইয়াছিলেন। প্রথমত রামজীবনপুরের আনন্দচন্দ্র অধিকারী সম্বন্ধ স্থির করিয়া যান। তাঁহাদের যাত্রার সম্প্রদায় ছিল। একারণ, তাঁহাদিগকে অধিকারী বলিত ; তজ্জন্য অগ্রজ মহাশয় তাঁহাদের বাটীতে বিবাহ করিতে অসম্মতি প্রকাশ করেন ; এবং তাঁহারা ধনশালী লোক ছিলেন, আমাদের ইষ্টকনির্মিত বাটী নয় দেখিয়া, তাঁহারাও সম্বন্ধ ভাঙিয়া দেন। পরে জগন্নাথপুরে চৌধুরীদের বাটীতে সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল। নানা কারণে সেই স্থানেও বিবাহ ঘটিল না। অবশেষে ক্ষীরপাইনিবাসী শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্য মহাশয় আসিয়া বলিলেন, 'ঈশ্বর বিদ্বান হইয়াছেন ; সৎপাত্রে কন্যাদান করিতে আমি বাসনা করিয়াছি।' এ প্রদেশের মধ্যে তৎকালে ক্ষীরপাই সর্বপ্রধান গ্রাম ছিল। তখন কলের কাপড় ছিল না। উক্ত গ্রামে নানা দেশের লোক আসিয়া, কাপড়ের ব্যবসা করিত। পশ্চিম হইতে হিন্দুস্থানী মহাজনেরা আসিয়া, তথায় রেশম ও কাপড়ের ব্যবসার জন্য কুঠী প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ভট্টাচার্য মহাশয়, ক্ষীরপাই গ্রামের মধ্যে ক্ষমতায়, মান্যে ও সদ্ব্যয়ে সর্বপ্রধান লোক ছিলেন। বিশেষত কন্যাটি অতি সুলক্ষণা ও দর্শনীয়া ছিলেন এবং কোষ্ঠীর ফলও ভাল ছিল। ভট্টাচার্য মহাশয় বলিলেন, 'আমার এই কন্যা পাদুকা। কোষ্ঠী-গণনার ফলে জানিবেন যে, এই কন্যা যাহাকে দান করা যাইবে, সর্বপ্রকারে তাঁহার অচলা লক্ষ্মী

হইবে।' পুনরায় ভট্টাচার্য মহাশয় পিতৃদেবকে বলিলেন, 'বন্দ্যোপাধ্যায়! তোমার ধন নাই, কেবল তোমার পুত্র বিদ্বান হইয়াছেন, এই কারণে আমার প্রাণসমা তনয়া দিনময়ীকে তোমার পুত্রের করে সমর্পণ করিলাম।' বিবাহ করিতে অগ্রজের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল না। যাবজ্জীবন লেখাপড়া শিখিব, সাধ্যানুসারে দেশের উপকার করিব, তাঁহার এই আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। কেবল পিতার ভয়ে অগত্যা বিবাহ করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। ক্ষীরপাইনিবাসী শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্য মহাশয়ের দিনময়ীনাম্নী অষ্টমবর্ষীয়া সুলক্ষণা ও দর্শনীয়া দুহিতার সহিত অগ্রজের পাণিগ্রহণ-বিধি সমাধা হইল।

পঞ্চদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে অগ্রজ মহাশয় অলঙ্কারশাস্ত্রের শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইলেন। তৎকালে প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহাশয় অলঙ্কারের অধ্যাপক ছিলেন। তর্কবাগীশ মহাশয় ব্যাকরণ, সাহিত্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রে বিশিষ্টরূপ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। সংস্কৃত গদ্য-পদ্য-রচনাবিষয়ে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। অলঙ্কারশ্রেণীতে প্রবিষ্ট ছাত্রগণ, তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিয়া, সংস্কৃত-ভাষায় সম্যক ব্যুৎপত্তি লাভ করিত। ইনি পরিশ্রমশালী ছিলেন, এজন্য সকলে ইঁহার প্রশংসা করিত। তৎকালে অগ্রজই অলঙ্কার-শ্রেণীতে সকল বালক অপেক্ষা অল্পবয়স্ক ও খর্বাকৃতি ছিলেন। অলঙ্কার-শ্রেণীতে এরূপ ছোট বালক অধ্যয়ন করিতেছে দেখিয়া, অন্যান্য লোক আশ্চর্যান্বিত হইত। ইনি এক বৎসরের মধ্যে 'সাহিত্যদর্পণ', 'কাব্যপ্রকাশ', 'রসগঙ্গাধর' প্রভৃতি অলঙ্কার গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন, এবং বাৎসরিক পরীক্ষায় সর্বোৎকৃষ্ট হইয়া, সর্বপ্রধান পারিতোষিক প্রাপ্ত হন। তর্কবাগীশ মহাশয় অনধ্যায়দিবসে ছাত্রগণকে গদ্য-পদ্য-রচনা ও কবিতার টীকা প্রস্তুত করিতে উপদেশ দিতেন।

সংস্কৃত-রচনায় অগ্রজের বিশিষ্টরূপ ক্ষমতা জন্মিয়াছিল, একারণ, তর্কবাগীশ মহাশয় সকল ছাত্র অপেক্ষা তাঁহাকে আন্তরিক ভালবাসিতেন। এই সময়ে তাঁহাকে প্রত্যহ দুই বেলা পাকাদিকার্য সমাধা করিতে হইত। পাক করিতে করিতে ইনি নিজের পাঠ্য-পুস্তক লইয়া পাঠানুশীলন করিতেন। অগ্রজ মহাশয় ও মধ্যমাগ্রজ মহাশয়, বেলা দশটার সময় বড়বাজার হইতে পটলডাঙ্গাস্থ কলেজে যাইবার সময়ে, পথে বহি দেখিতে দেখিতে গমন করিতেন। বাসায় প্রায় সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া অধ্যয়ন করিতেন। জ্যেষ্ঠাগ্রজ অত্যধিক পরিশ্রম করিয়া, উৎকট রোগে আক্রান্ত হইলেন; প্রত্যহ রক্তভেদ হইতে লাগিল। কলিকাতায় থাকিয়া ঔষধাদি দ্বারা রোগ হইতে অব্যাহতি পাইলেন না, অগত্যা দেশে আসিতে হইল। দেশে আসিয়াও নানাবিধ ঔষধ সেবনে রোগের উপশম হইল না। অবশেষে প্রতিবাসী কাশীনাথ পালের অভিষ্টদেব, তক্রমিশ্রিত করিয়া সিদ্ধ ওল ভোজন করিবার ব্যবস্থা করেন। এই ঔষধ কতিপয় দিবস ব্যবহার করায়, সম্পূর্ণরূপ আরোগ্যলাভ করিয়াছিলেন।

অনন্তর পুনর্বার কলিকাতায় যাইয়া রীতিমত অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং

পূর্বের ন্যায় স্বয়ং পাকাদিকার্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। একদিন মধ্যম সহোদর দীনবন্ধুকে সন্ধ্যার সময় বাজার করিতে পাঠাইয়াছিলেন। রাত্রি একাদশ ঘটিকা অতীত হইল, তথাপি দীনবন্ধু বাসায় উপস্থিত না হওয়াতে, তাঁহার অত্যন্ত দুর্ভাবনা হইল। ভ্রাতার জন্য উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। অবশেষে অন্যান্য লোকের উপদেশানুসারে প্রথমত বড়বাজারে কাশীনাথবাবুর বাজারে অনুসন্ধান করিলেন। তথায় অনুসন্ধান না পাওয়ায়, পরিশেষে জোড়াসাঁকো নূতন বাজারে অনুসন্ধান করিতে করিতে দেখিলেন, দীনবন্ধু বাজারে দেওয়াল ঠেস দিয়া নিদ্রা যাইতেছেন। তখন নিদ্রা ভাঙ্গাইয়া তাঁহাকে বাসায় লইয়া গেলেন। অগ্রজ মহাশয় ছোট ছোট ভাই ও ভগিনীদিগকে আন্তরিক স্নেহ করিতেন। এরূপ ভ্রাতৃস্নেহ অপর কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

অগ্রজ মহাশয় শৈশবকাল হইতে কাল্পনিক দেবতার প্রতি কখনই ভক্তি বা শ্রদ্ধা করিতেন না। জগতের মধ্যে কেবল হিন্দুগণ দেবদেবী প্রতিমার প্রতি যেরূপ হৃদয়ের সহিত ভক্তি প্রকাশ করেন, তিনি জনক-জননীকে বাল্যকাল হইতে তদ্রূপ আন্তরিক শ্রদ্ধা ও দেবতাস্বরূপ জ্ঞান করিতেন। অগ্রজ মহাশয় দেশে আগমন করিলে, আদিশিক্ষক কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে আন্তরিক ভক্তি-সহকারে প্রণাম করিবার নিমিত্ত তাঁহার বাটীতে যাইতেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও তাঁহাকে সন্তানসদৃশ স্নেহ করিতেন। অগ্রজ মহাশয়, দেশের কি ইতর কি ভদ্র সকল সম্প্রদায়ের লোকের প্রতি সৌজন্য-প্রকাশ করিতেন। ছোট ছোট ছেলের সহিত তিনি কপাটি খেলিতেন, এতদ্ব্যতীত কখনও তাস, শতরঞ্চ প্রভৃতি ক্রীড়া করিতেন না ও জানিতেন না।

অলঙ্কার-শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে অপরাহ্ণ চারি ঘটিকার সময় বিদ্যালয়ের ছুটি হইলে, ঠনঠনিয়ার চৌরাস্তার কিয়দ্দূর পূর্বে তারাকান্ত বিদ্যাসাগর, তারানাথ তর্কবাচস্পতি ও মধুসূদন বাচস্পতি মহাশয়দের বাসায় যাইতেন। ঐ সময় তাঁহাদের কলেজের অধ্যয়ন শেষ হইয়াছিল। উঁহারা অগ্রজকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন; একারণ, তিনি প্রত্যহ ছুটির পর তাঁহাদের বাসায় যাইতেন। সন্ধ্যা পর্যন্ত তথায় অবস্থিতি করিয়া, 'সাহিত্যদর্পণ' দেখিতেন। একদিবস বিখ্যাত দর্শনশাস্ত্রবেত্তা জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয়, জজ পণ্ডিতের পদ প্রাপ্ত্যভিলাষে ল-কমিটির পরীক্ষা দিবেন বলিয়া, তারানাথ তর্কবাচস্পতির সহিত যুক্তি করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি তথায় অগ্রজ মহাশয়কে 'সাহিত্যদর্পণ' আবৃত্তি করিতেছেন দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন, এবং বাচস্পতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এরূপ অল্পবয়স্ক বালক 'সাহিত্যদর্পণ' বুঝিতে পারে কি?' ইহা শ্রবণ করিয়া বাচস্পতি মহাশয় বলিলেন, 'কেমন শিখিয়াছে ও সংস্কৃতে ইহার কীদৃশী ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছে, প্রশ্ন করিয়া অবগত হউন।' 'সাহিত্যদর্পণ'-এর রসের বিচারস্থল জিজ্ঞাসা করিলে, অগ্রজ মহাশয় যেরূপ ব্যাখ্যা করিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া তর্কপঞ্চানন মহাশয় আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিলেন,

'এই বালকের বয়োবৃদ্ধি হইলে, বাঙ্গালা দেশের মধ্যে অদ্বিতীয় লোক হইবে। এত অল্পবয়সে এরূপ সংস্কৃত-ভাষায় ব্যুৎপন্ন লোক আমার কখনও দৃষ্টিগোচর হয় নাই।' ইহা শুনিয়া তারানাথ তর্কবাচস্পতি বলিলেন, 'আমরা এই বালককে কলেজের মহামূল্য অলঙ্কার-স্বরূপ জ্ঞান কবিয়া থাকি।'

তর্কপঞ্চানন মহাশয় শেষাবস্থায় কাশীবাস করিয়াছিলেন। তথায় সোনারপুর মহল্লাতে বহুসংখ্যক হিন্দুস্থানী, বাঙ্গালী, মহারাষ্ট্রীয়, দণ্ডী, পরমহংস ও ব্রহ্মচারীকে 'ন্যায়', 'বৈশেষিক', 'সাঙ্খ্য', 'পাতঞ্জল', 'বেদান্ত', 'মীমাংসা'—এই ষড়দর্শন ও অন্যান্য দর্শনশাস্ত্রের গ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করাইতেন। তর্কপঞ্চানন মহাশয় মধ্যে মধ্যে ঐ সকল দণ্ডী প্রভৃতি ছাত্রগণের নিকট অগ্রজের বিষয় গল্প করিতেন। আমি কাশীতে তর্কপঞ্চাননের প্রমুখাৎ জ্যেষ্ঠের বাল্যকালের বহুতর গল্প শ্রবণ করিয়াছি।

এই সময় দাদা কলেজে মাসিক আট টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন। তৎকালীন কলেজের নিয়মানুসারে অলঙ্কার, ন্যায়, বেদান্ত ও তৎপরে স্মৃতিশাস্ত্র পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন, ছাত্রগণ প্রথমে ন্যায়দর্শন-শাস্ত্রেব শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইয়া অধ্যয়ন করিত; তাহাব পর বেদান্ত-শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইয়া বেদান্ত অধ্যয়ন করিত, তদনন্তর স্মৃতির শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইয়া 'মনুসংহিতা', 'মিতাক্ষরা', জীমূতবাহন-কৃত 'দায়ভাগ' প্রভৃতি অধ্যয়ন করিয়া, জজ-পণ্ডিতের পদ-প্রার্থনায় ল-কমিটির পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইত। অগ্রজ মহাশয়, কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট আবেদন করিয়া, অলঙ্কার-শ্রেণী হইতে অগ্রে স্মৃতি-শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইলেন। ঐ সময় রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্রের উপযুক্ত অধ্যাপকগণ, নানা কারণে পদচ্যুত হইয়াছিলেন। তৎকালীন বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণ, দর্শন-শাস্ত্রজ্ঞ হরনাথ তর্কভূষণ মহাশয়কে স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তর্কভূষণ মহাশয়, দর্শন-শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন বটে; কিন্তু প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রে তাঁহার তৎপূর্বে বিশেষ দৃষ্টি ছিল না, সুতরাং স্মৃতির ব্যবহারাধ্যায়ে ভালরূপ ব্যবস্থা স্থির করিতে অক্ষম ছিলেন। যদিও অগ্রজ স্মৃতির শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, তথাপি ঐ পণ্ডিতের নিকট অধ্যয়ন করিয়া মনের তৃপ্তি জন্মাইত না; একারণ, অদ্বিতীয় ধীশক্তিসম্পন্ন হরচন্দ্র ভট্টাচার্যের নিকট যাইয়া স্মৃতি অধ্যয়ন করিতেন। সাধারণ পণ্ডিতগণ দুই তিন বৎসরে যে সমস্ত প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্র শিক্ষা করিয়া পরীক্ষা দিতেন, তিনি স্মৃতির সেই সকল গ্রন্থ ছয় মাসে মুখস্থ করিয়া, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার মানসে পিতৃদেবকে বলিলেন, 'আমি ছয় মাস পাকাদিকার্য সম্পাদন করিতে পারিব না।' সুতরাং তাঁহার অনুজ দীনবন্ধুকে দুইবেলা পাকাদিকার্য সমাধা করিতে হইত। তখন মধ্যমাগ্রজ দীনবন্ধুর বয়ঃক্রম দশ বৎসর মাত্র। জ্যেষ্ঠাগ্রজ প্রাতঃকাল হইতে বেলা নয় ঘটিকা পর্যন্ত অনন্যকর্মা ও অনন্যমনা হইয়া, সমগ্র 'মনুসংহিতা', 'মিতাক্ষরা' প্রভৃতি স্মৃতিগ্রন্থ আবৃত্তি করিতেন এবং ভোজনান্তে বড়বাজার হইতে পটলডাঙ্গাস্থ বিদ্যালয়ে যাইবার সময় পথে আবৃত্তি করিতে করিতে গমন করিতেন। কলেজে উপস্থিত

হইয়া পড়া বন্ধ করিতেন। পুনরায় চারিটার পর বাসায় আসিবার সময়, পথে আবৃত্তি করিতে করিতে বাসায় আসিতেন। রাত্রি দশটার সময় ভোজন করিয়া, দুই ঘণ্টা নিদ্রা যাইতেন। নিকটস্থ আরমানি গির্জ্জার ঘড়িতে রাত্রি বারটা বাজিলে, পুনর্বার নিদ্রা হইতে উঠিয়া, সমস্ত রাত্রি স্মৃতি আবৃত্তি করিতেন। এইরূপ অনবরত ছয় মাস কাল সমস্ত রাত্রি পরিশ্রম করিয়া, ল-কমিটির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন।

অদ্যাপি যাহার শ্মশ্রুরেখারও উদয় হয় নাই, সেই সতের-আঠার বৎসরের বালক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, ল-কমিটির সার্টিফিকেট পাইলেন। এত অল্পবয়সে, ছয় মাসের মধ্যে তিনি সমগ্র প্রাচীন স্মৃতিগ্রন্থ কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন; ইহাতে অধ্যাপক মহাশয়েরা তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতা দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন। ল-কমিটির সার্টিফিকেট প্রাপ্তির কিয়দ্দিবস পরে, ত্রিপুরা জেলার জজ-পণ্ডিতের পদ শূন্য হইলে অগ্রজ ঐ পদ-প্রাপ্তির প্রার্থনায় আবেদন করেন। অগ্রজকে ঐ কার্যে নিযুক্ত করিবার জন্য গবর্নমেণ্ট এই নিয়োগপত্র দেন যে, তুমি ত্বরায় ত্রিপুরায় আসিয়া কার্যে প্রবৃত্ত হও। কিন্তু পিতৃদেবের অসম্মতি-নিবন্ধন তাঁহার ঐ কার্যে যাওয়া ঘটিল না।

এখনকার মত তৎকালে থিয়েটার বা হাপ আখড়াই প্রভৃতি ছিল না। তৎকালে কলিকাতায় কবি ও কৃষ্ণযাত্রা হইত। দাদার কবি শুনিবার অত্যন্ত শখ ছিল, কোথাও কবি হইলে তিনি শুনিতে যাইতেন। যখন দেশে যাইতেন, তখন সমবয়স্ক ভাই বন্ধু লইয়া কবি গান করিতেন।

আত্মীয় লোকের পীড়া হইলে, মাতৃদেবীর অনুকরণে তিনিও তাহাদের বাটীতে যাইয়া, শুশ্রূষাদি-কার্যে প্রবৃত্ত হইতেন, এরূপ কার্যে তাঁহার কিছুমাত্র ঘৃণা ছিল না। নিঃসম্পর্কীয় অর্থাৎ কোনরূপ সংস্রব না থাকিলেও, পীড়িত-লোকের মলমূত্র স্বহস্তে পরিষ্কার করিতেন। পীড়িত-লোকের শুশ্রূষাদি-কার্যে ব্যাপৃত থাকিয়া, সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিতেন। যে সকল সংক্রামক-রোগাক্রান্ত রোগীকে অপরে স্পর্শ করিতেও ভীত হইত, তিনি নির্ভয়ে ও অসঙ্কুচিতচিত্তে সেই সকল রোগীর শুশ্রূষাদি-কার্যে লিপ্ত থাকিতেন। তিনি বাল্যকাল হইতেই পরম দয়ালু ছিলেন। তাঁহার এবম্বিধ গুণ থাকায়, তৎকালে তিনি কলেজের সকল শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দের পরম প্রিয়পাত্র ছিলেন।

বৈকালে, কলেজের নিকট ঠনঠনিয়ার চৌমাথার কিছু পূর্বে, বিপ্রদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মিঠাইয়ের দোকান ছিল। তথায় কলেজের ছুটির পর জল খাইতেন। কলেজের যে কোন ছাত্র সম্মুখে থাকিত, সকলকেই মিষ্টান্ন খাওয়াইতেন। তিনি মাসিক যে আট টাকা বৃত্তি পাইতেন, তাহা অপরাপর বালককে বৈকালে জল খাওয়ানতেই খরচ হইত। এতদ্ভিন্ন কলেজের দ্বারবানদের নিকটও যথেষ্ট টাকা ধার করিতেন। যে সকল বালকের বস্ত্র জীর্ণ দেখিতেন, ঐ ধার করা টাকায় সেই

সকল বালকের বস্ত্র ক্রয় করিয়া দিতেন। বড়বাজারের বাসায় যে সকল সহাধ্যায়ী যাইতেন, তাহাদিগকে জল খাওয়াইতেন; একারণ, অনেকে মনে করিতেন যে, ঈশ্বর ধনশালী লোক। পূজার অবকাশে দেশে আগমন করিলে, যে যে প্রতিবাসিগণ পীড়িত হইয়াছেন শুনিতেন, তাহাদের বাটীতে সর্বদা যাইতেন এবং তাহাদের শুশ্রূষাদি-কার্যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইতেন। অপর লোকে রোগীর শুশ্রূষাদি-কার্যে নিযুক্ত থাকিতে ঘৃণা প্রকাশ বা ক্লেশ বোধ করিত, কিন্তু অগ্রজ মহাশয় যে কোন জাতীয় লোকের পীড়া হইলে, সন্তুষ্ট-চিত্তে তাহাদের সেবা করিতে অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করিতেন। একারণ, তৎকালে দেশস্থ লোকগণ দাদাকে দয়াময় বলিত। অনেকেই দেখিয়াছেন যে, সামান্য বিড়াল বা কুকুর মরিলেও তাহা দেখিয়া দাদার চক্ষে জল আসিত; কোন লোক রোদন করিলে, তিনিও তাহাদের সহিত রোদনে প্রবৃত্ত হইতেন।

পূজার অবকাশে গ্রামের গদাধর পাল, ব্রজমোহন চক্রবর্তী ও ছোট ছোট ভ্রাতৃগণের সহিত কপাটি খেলিতেন। অন্য কোনরূপ ক্রীড়ায় কখনও তাঁহাকে আসক্ত হইতে দেখি নাই। কপাটি খেলিলে অত্যন্ত শ্রম হয়, তাহাতে উদরাময় প্রভৃতি রোগ আরোগ্য হয়, এতদভিপ্রায়ে কপাটি খেলায় প্রবৃত্ত হইতেন। এতদ্ব্যতীত কখন কখন মদনমোহন মণ্ডলের সহিত লাঠি খেলিতেন।

দেশস্থ যে সকল লোকের দিনপাত হওয়া দুষ্কর দেখিতেন, তাহাদিগকে যথা-সাধ্য সাহায্য করিতে ক্ষান্ত থাকিতেন না। অন্যান্য লোকের পরিধেয় বস্ত্র না থাকিলে, গামছা পরিধান করিয়া, নিজের বস্ত্রগুলি তাহাদিগকে বিতরণ করিতেন। বাল্যকালে দেশে যাইয়া, কৃষকগণের সহিত মাঠে কাস্তিয়া লইয়া ধান্য কাটিতেন। ভ্রাতৃগণকে বলিতেন, সকলে মাঠে চল্, মাঠ হইতে ধান বহিয়া আনিতে হইবে। মজুরদের সহিত ধান বহিয়া তিনি পরম আহ্লাদিত হইতেন।

অগ্রজ মহাশয় উনিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে, বেদান্ত-শাস্ত্রের শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইলেন। পূজ্যপাদ শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি মহাশয়, ঐ সময় বেদান্ত-শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি দাদাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। বাচস্পতি মহাশয়ের যাহা কিছু যুক্তি বা পরামর্শ, তৎসমস্তই দাদার সহিত হইত। 'বেদান্ত', 'পাতঞ্জল' কি 'সাঙ্খ্য' গ্রন্থের যে যে স্থলে পাঠের সন্দেহ হইত বা অসংলগ্ন বোধ হইত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ-ভঞ্জনার্থ তাঁহার সহিত বাদানুবাদ করিতেন। তাহাতে তিনি আন্তরিক সন্তুষ্ট হইয়া বলিতেন যে, তুমি ঈশ্বর। ঐ সময়ে পিতৃদেব, অষ্টমবর্ষবয়ঃক্রমকালে বিদ্যা-শিক্ষার মানসে আমায় কলিকাতায় লইয়া আইসেন। কয়েকদিন পরে, দাদা আমাকে সংস্কৃত-কলেজের ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন। তৎকালে ঐ শ্রেণীতে গঙ্গাধর তর্কবাগীশ মহাশয় অধ্যাপক ছিলেন। আমি ঈশ্বরের তৃতীয় সহোদর, একারণ, তিনি আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। তিন ভ্রাতা ও পিতা এবং দয়ালচাঁদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সকলের দুই বেলার পাকাদিকার্য অগ্রজ

মহাশয়ই সম্পন্ন করিতেন। যে গৃহে পাক করিতেন, তাহার অতি সন্নিহিত স্থানে অপরের পাইখানা ছিল ; সুতরাং পাকশালায় বসিলেই অত্যন্ত দুর্গন্ধ বোধ হইত। এক্ষণে মিউনিসিপালিটির বন্দোবস্তে পাইখানায় আর সেরূপ দুর্গন্ধ থাকে না। তৎকালে কলিকাতায় মিউনিসিপালিটি ছিল না, পথে ময়লা ফেলিলেও কেহ কোন কথা বলিতেন না। পাকগৃহটি অত্যন্ত অন্ধকার ছিল, একটি মাত্র দ্বার ব্যতীত জানালা ছিল না। পাকশালা অত্যন্ত ছোট ছিল এবং উহা তৈলপায়ী অর্থাৎ আরসুলায় পরিপূর্ণ থাকিত। প্রায় মধ্যে মধ্যে দুই চারিটা আরসুলা ব্যঞ্জনে পতিত হইত। দৈবাৎ একদিন অগ্রজের ব্যঞ্জনে একটা আরসুলা পড়িয়াছিল। প্রকাশ করিলে বা পাতের নিকট ফেলিয়া রাখিলে, ভ্রাতৃগণ বা পিতা মহাশয় ঘৃণাপ্রযুক্ত আর ভোজন করিবে না, এই আশঙ্কায় তিনি সমস্ত আরসুলা, ব্যঞ্জনসহিত উদরস্থ কবিলেন। ভোজনের কিয়ৎক্ষণ পরে, আরসুলা খাইবার কথা ব্যক্ত করিলেন। তাহা শুনিয়া উপস্থিত সকলেই আশ্চর্যান্বিত হইলেন।

যে স্থানে আহার করিতে বসিতেন, তাহার নিকটস্থ নর্দমা হইতে কেঁচো ও অন্যান্য কৃমি উঠিয়া ভোজনপাত্রের নিকটে আসিত, এজন্য তিনি এক ঘটী জল ঢালিয়া দিয়া, কৃমিগুলিকে সরাইয়া দিতেন। ঐ সময় জগদ্দুর্লভ সিংহেব বাটীর সম্মুখে তিলকচন্দ্র ঘোষের সোনারূপার খোদাইখানাব গৃহ ছিল। তিলকচন্দ্র ঘোষ ও উহাব পুত্র রামকুমাব ঘোষ অতি ভদ্র লোক ছিলেন। তাঁহারা দাদাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। ঐ বাটীব উপবেব গৃহে পিতৃব্য কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বাত্রিতে শয়ন করিতেন; উহার নিম্নস্থ গৃহে অগ্রজ মহাশয় রাত্রিতে পাঠ্যপুস্তক পাঠ করিয়া অধিক রাত্রিতে শয়ন করিতেন। সন্ধ্যার সময় হইতে তাঁহার শয্যায় আমিও শয়ন করিতাম। এক দিবস আমার উদরাময় হওয়ায়, সন্ধ্যার সময় অসাবধানতাপ্রযুক্ত বস্ত্রেই মলত্যাগ করিয়াছিলাম; তজ্জন্য যদি ভোজন করিতে না দেন, এই আশঙ্কায় উহা প্রকাশ করি নাই। অগ্রজ মহাশয় অধিক রাত্রিতে শয়ন করিয়া, তৎক্ষণাৎ নিদ্রাভিভূত হইলেন। প্রাতে নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখিলেন যে, তাঁহার পীঠ, বুক ও হস্ত প্রভৃতিতে বিষ্ঠা লাগিয়া রহিয়াছে। আমায় কোন কথা না বলিয়া, গাত্র ধৌত করিয়া সমস্ত শয্যা স্বহস্তে কূপোদক দ্বারা প্রক্ষালিত করিলেন। তিনি বাল্যকাল হইতেই পিতামাতার প্রতি ভক্তি এবং ভ্রাতা ও ভগিনীদিগকে যথেষ্ট স্নেহ করিয়া আসিতেছেন। এরূপ পিতৃমাতৃভক্তি ও ভ্রাতৃস্নেহ অন্য কেহ করিতে পারেন না। জননীরও সকল পুত্র অপেক্ষা অগ্রজ মহাশয়ের প্রতি আন্তরিক স্নেহ ছিল।

বেদান্তের শ্রেণীতে যখন অধ্যয়ন করিতেন, তখন প্রত্যহ ক্লাসের পড়া শেষ করিয়া, শেষবেলায় আমাকে ও মধ্যমাগ্রজ দীনবন্ধুকে ব্যাকরণের শ্রেণী হইতে আনিয়া, নিজের নিকটে বসাইয়া রাখিতেন। একদিন বাচস্পতি মহাশয় আমাকে বলিলেন, 'শম্ভু, তুমি আমার নামটি চুরি করিয়াছ কেন ?' তাহা শুনিয়া আমি উত্তর

করিলাম, 'মহাশয়! আমি চুরি করি নাই, বাবা চুরি করিয়াছেন।' ইহা শ্রবণ করিয়া বাচস্পতি মহাশয় পরম আহ্লাদিত হইয়াছিলেন, এবং তদবধি প্রত্যহ শেষবেলায় ব্যাকরণ-শ্রেণী হইতে আমায় আহ্বান করিতেন। বাচস্পতি মহাশয়, অগ্রজকে আন্তরিক ভালবাসিতেন ও অদ্বিতীয় বুদ্ধিমান ছাত্র বলিয়া শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি সন্তুষ্ট হইবেন বলিয়া, বাচস্পতি মহাশয়, আমাদিগকে প্রত্যহ কাছে বসাইয়া সন্ধি জিজ্ঞাসা করিতেন। বাচস্পতি মহাশয়ের পত্নী কালগ্রাসে নিপতিতা হইলে, কিয়দ্দিবস পরে তিনি বৃদ্ধ-বয়সে পুনর্বার বিবাহ করিবার জন্য বিলক্ষণ যত্ন পাইতে লাগিলেন। বিবাহ করা উচিত কি না, এই বিষয়ে একদিন নির্জনে অগ্রজের সহিত পরামর্শ করেন। তিনি বলিলেন, 'এরূপ বয়সে মহাশয়ের বিবাহ করা পরামর্শসিদ্ধ নয়!' বাচস্পতি মহাশয় তাঁহার পরামর্শ কোনরূপে শুনিলেন না। একারণ, তিনি রাগ করিয়া, বাচস্পতি মহাশয়ের বাটী যাইতেন না। বাচস্পতি মহাশয়, তৎকালে কলিকাতার অদ্বিতীয় ধনশালী ও সম্ভ্রান্ত রামদুলাল সরকারের পুত্র ছাতুবাবু ও লাটুবাবুর দলের সভাপণ্ডিত ছিলেন। নড়ালের রামরতনবাবুও বাচস্পতি মহাশয়কে অতিশয় মান্য করিতেন। ইঁহারা উভয়ে ঐক্য হইয়া সম্বন্ধ স্থির করিয়া, এক পরমাসুন্দরী কন্যার সহিত বাচস্পতি মহাশয়ের বিবাহকার্য সমাধা করান। বাচস্পতি মহাশয়, অগ্রজকে সুতনির্বিশেষে স্নেহ করিতেন, এজন্য এক দিবস বলেন, 'ঈশ্বর! তোমার মাকে এক দিনও দেখিতে গেলে না।' ইহা শুনিয়া তিনি রোদন করিতে লাগিলেন। পরে এক দিন জোর করিয়া, দাদাকে তাঁহার বাটীতে লইয়া যান। বাচস্পতি মহাশয়ের নূতন বিবাহিতা পত্নীকে দেখিবামাত্র অগ্রজ রোদন করিতে লাগিলেন। বাচস্পতি মহাশয় তাঁহাকে অনেক উপদেশ দিয়া সান্ত্বনা করেন। ইহার কিছু দিন পরেই বাচস্পতি মহাশয় পরলোকগমন করেন। অগ্রজ, শম্ভুনাথ বাচস্পতির দেশস্থ কোন লোককে দেখিলেই তাহাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন।

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে এই নিয়ম হইয়াছিল যে, স্মৃতি, ন্যায়, বেদান্ত এই তিন প্রধান শ্রেণীর ছাত্রদিগকে বাৎসরিক পরীক্ষার সময়ে সংস্কৃত গদ্য ও পদ্য রচনা করিতে হইবে। যাহার রচনা সর্বাপেক্ষা ভাল হইবে, সে গদ্য-রচনায় একশত টাকা ও কবিতা-রচনায় একশত টাকা পারিতোষিক পাইবে। এক দিনেই উভয় প্রকার রচনার সময় নির্ধারিত হয়। দশটা হইতে একটা পর্যন্ত গদ্য-রচনা এবং একটা হইতে চারিটা পর্যন্ত কবিতা-রচনার সময় ছিল। গদ্য-পদ্য পরীক্ষার দিবসে, বেলা দশটার সময়ে, সকল ছাত্র পরীক্ষাস্থলে উপস্থিত হইয়া লিখিতে আরম্ভ করিল। অলঙ্কার-শাস্ত্রের অধ্যাপক প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয়, অগ্রজকে পরীক্ষাস্থলে অনুপস্থিত দেখিয়া, বিদ্যালয়ের তৎকালীন অধ্যক্ষ মার্শেল সাহেব মহোদয়কে বলিয়া, অগ্রজকে বলপূর্বক তথায় লইয়া গিয়া একস্থানে বসাইয়া দিলেন। অগ্রজ বলিলেন, 'মহাশয়! আমার রচনা ভাল হইবে না, আমি লিখিতে পারিব না।' তর্কবাগীশ

মহাশয় তাহা শুনিয়া অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া বলিলেন, 'যা পার লিখ, নচেৎ অধ্যক্ষ মার্শেল সাহেব রাগ করিবেন।' অগ্রজ বলিলেন, 'কি লিখিব?' তিনি বলিলেন, 'সতং হি নাম আরম্ভ করিয়া লিখ।' তদনুসারে তিনি লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সত্য-কথনের মহিমা, গদ্য-রচনার বিষয় ছিল। তিনি উক্ত বিষয় যেরূপ লিখিয়াছিলেন, তাহা সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, আমার লেখা বোধ হয় ভাল হয় নাই; কিন্তু পরীক্ষক মহাশয়েরা সকল ছাত্রের রচনা অপেক্ষা তাঁহার রচনাকে সর্বোৎকৃষ্ট স্থির করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি গদ্য-রচনার পারিতোষিক এক শত টাকা প্রাপ্ত হইলেন।

ইহার অব্যবহিত পরে পিতৃদেব, মধ্যমাগ্রজের বিবাহকার্য সমাধা করেন, এতদুপলক্ষে পিতৃদেবের বিলক্ষণ ঋণ হইয়াছিল। বীরসিংহাস্থ ভবনের ব্যয়ের কিছুমাত্র লাঘব করিতে পারিলেন না, সুতরাং অগত্যা কলিকাতাস্থ বাসার ব্যয়ের হ্রাস কবেন। দুগ্ধ, মৎস্যাদি কিছুকালের জন্য রহিত হয়। বৈকালে জল খাইবার জন্য আধ পয়সার ছোলা আনিয়া ভিজান হইত, আধ পয়সার বাতাসা আসিত; ইহাই বৈকালে সকলের জলখাবার ব্যবস্থা ছিল। ঐ আর্দ্র ছোলাব কিয়দংশ আবার রাত্রে কুমড়ার ব্যঞ্জনের সহিত পাক হইত। ঐ সময় কষ্টের পবিসীমা ছিল না। প্রাতে ও রাত্রিতে ছোলা-মিশ্রিত কুমড়ার ডালনা ও পোস্তভাজা ব্যঞ্জন হইত। তৎকালে এরূপ কষ্ট স্বীকার করিয়া, স্বহস্তে পাকাদি সম্পন্ন করিয়া, অগ্রজ যেরূপ লেখাপড়া শিক্ষা করিয়াছিলেন, এক্ষণকার ছেলেরা ভাল ভাল দ্রব্য খাইয়া এবং উত্তম বসন পরিধান করিয়াও সেরূপ যত্নপূর্বক লেখাপড়া শিক্ষা করে না।

এই বৎসর কার্তিক মাসে কলিকাতা বড়বাজারের বাবু জগদ্দুর্লভ সিংহের যে বাটীতে বাসা ছিল, অগত্যা ঐ বাটী প্রায় তিন-চার মাসের জন্য পরিত্যাগ করিতে হয়। ইহার কারণ এই যে, উক্ত সিংহ ভ্রমক্রমে চোরাই কোম্পানির কাগজ ক্রয় করিয়া, রাজদ্বারে দণ্ডার্হ হন। তাঁহার বাটী কিছু দিনের জন্য পুলিশকর্মচারী দ্বারা বেষ্টিত হয়। সুতরাং অগ্রজ মহাশয়ের সহিত আমরা দুই মাসকাল পাতুলগ্রামনিবাসী গুরুপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পিসামহাশয়ের বাসায় অবস্থিতি করিয়া, কলেজে অধ্যয়ন করি। ঐ সময় অগ্রজ, কলেজের সকল ছাত্র অপেক্ষা পদ্যে অত্যুৎকৃষ্ট সংস্কৃত-কবিতা রচনা করেন; তজ্জন্য শিক্ষা-সমাজ তাঁহাকে পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার প্রদান করেন। উপরি উক্ত জগদ্দুর্লভ সিংহ মকদ্দমা করিয়া ঋণগ্রস্ত হন। আমরা তাঁহার বাটীতে ভাড়া না দিয়া দীর্ঘকাল অবস্থিতি করিতাম। তিনি অত্যন্ত দুরবস্থা-প্রযুক্ত তেতালায় যে গৃহে আমাদের বাসা ছিল, তাহা তনসুকদাস নামক হিন্দুস্থানীকে ভাড়ায় বিলি করেন। ঐ ভাড়ার টাকায় ঐ সিংহের সংসার চলিতে লাগিল। সুতরাং আমাদিগকে ঐ বাটীর নিম্নগৃহে অগত্যা বাস করিতে হইল।

বড়বাজারের নিম্নতলস্থ গৃহ অত্যন্ত আর্দ্র; তাহাতে শয়ন করিয়া অগ্রজ মহাশয় বিষম রোগাক্রান্ত হইয়া, অনেক কষ্টভোগ করেন। সর্বদা আমবাতের মত

হইত। অনেক প্রতিকার দ্বারা পরে প্রকৃতিস্থ হন। ঐ সময়ে অগ্রজ মহাশয়, বেদান্তের শ্রেণী হইতে ন্যায়শাস্ত্রের শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হন। তৎকালে নিমচাঁদ শিরোমণি মহাশয় কলেজের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত ছিলেন। সে সময়ে তিনি বঙ্গদেশের মধ্যে অদ্বিতীয় দর্শনশাস্ত্রবেত্তা ছিলেন। তাঁহার সহিত বিচারে সকল দর্শনবেত্তাদিগকে পরাস্ত হইতে হইয়াছিল। তাঁহার নিকট দাদা এক বৎসর 'ভাষাপরিচ্ছেদ', 'সিদ্ধান্তমুক্তাবলী', 'কুসুমাঞ্জলি', 'শব্দশক্তিপ্রকাশিকা' প্রভৃতি প্রাচীন ন্যায়গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। দ্বিতীয় বার্ষিক পরীক্ষার সময় দর্শনশাস্ত্রে সকল ছাত্র অপেক্ষা সর্বোৎকৃষ্ট হন; একারণ, দর্শনের প্রাইজ একশত টাকা পান, এবং সংস্কৃত কবিতা-রচনায় সর্বাপেক্ষা ভাল কবিতা লিখিয়া একশত টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হন।

নিমচাঁদ শিরোমণি মহাশয়, ঐ সময় ইহজগৎ পরিত্যাগ করেন। ইঁহার মৃত্যুতে অগ্রজ মহাশয়, কিছু দিন দুর্ভাবনায় ম্লান হইয়াছিলেন। কয়েক মাস সর্বানন্দ ন্যায়বাগীশ দর্শনশ্রেণীর ছাত্রগণকে শিক্ষা দেন; কিন্তু তিনি ভালরূপ ন্যায় পড়াইতে পারিতেন না। অগ্রজ মহাশয় উদ্‌যোগী হইয়া অধ্যক্ষ মার্শেল সাহেব মহোদয়ের নিকট এই বিষয়ে আবেদন করেন। তজ্জন্য বিদ্যালয়ের সেক্রেটারি সাহেবের আদেশ হয় যে, কর্মপ্রার্থী দর্শনশাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিতগণ আবেদন করুন। পরীক্ষায় যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ হইবেন, তিনিই দর্শনশ্রেণীর অধ্যাপক হইবেন। নানাস্থানের পণ্ডিতগণ এই পদ-প্রার্থনায় দরখাস্ত করেন। কিন্তু জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন প্রথমত আবেদন করেন নাই। অগ্রজ মহাশয়, শালিকায় তর্কপঞ্চাননের টোলে কয়েকবার যাইয়া, তাঁহার স্বাক্ষর করাইয়া, আবেদনপত্র স্বয়ং অধ্যক্ষ সাহেবের হস্তে অর্পণ করেন। তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের প্রতি তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল। বিশেষত যৎকালে অলঙ্কারশ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন, ঐ সময়ে তাঁহার সহিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের বাসায় শাস্ত্রালাপ হইয়া, পরস্পরের সহিত হৃদ্যতা জন্মিয়াছিল। আর যে বৎসর তিনি ল-কমিটির পরীক্ষা দেন, সেই বৎসর তর্কপঞ্চানন মহাশয়ও ঐ পরীক্ষা দিয়াছিলেন। কর্ম-প্রার্থী দর্শনশাস্ত্রবেত্তাগণের মধ্যে জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয় পরীক্ষায় উৎকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তজ্জন্য পরীক্ষক মহাশয়েরা জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননকে কলেজের দর্শনশাস্ত্রের যোগ্য অধ্যাপক স্থির করিয়াছিলেন। কর্তৃপক্ষেরা তাঁহাকে ঐ পদে নিযুক্ত করিলেন। অগ্রজ ইঁহার নিকট তিন বৎসর, এবং নিমচাঁদ শিরোমণির নিকট এক বৎসর এই চারি বৎসর রীতিমত পরিশ্রম করিয়া, প্রায় সমগ্র দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ইহাতে অন্যান্য পণ্ডিতগণ অবাক হইয়াছিলেন। কারণ, অপরে দশ-বার বৎসরে যে শাস্ত্র শেষ করিতে পারে না, ঈশ্বর এত স্বল্প সময়ের মধ্যে কেমন করিয়া তাহা শেষ করিল।

যৎকালে দর্শন-শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন, তখন দেশে যাইলে অনেকের সহিত তাঁহার বিচার হইত। সকলেই তাঁহার সহিত বিচারে সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে

আশীর্বাদ করিতেন। একদা বীরসিংহা গ্রামের কৃষ্ণচন্দ্র বিশ্বাস সমারোহপূর্বক মাতৃশ্রাদ্ধ করেন। তিনি দাদার নিকট শ্রাদ্ধে ভট্টাচার্য-নিমন্ত্রণ-জন্য সংস্কৃত-কবিতা প্রস্তুত করাইয়া লন। শ্রাদ্ধের দিন নানাস্থান হইতে পণ্ডিতমণ্ডলী আসিয়াছিলেন। কে এরূপ কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহা জানিবার জন্য পণ্ডিতগণ ব্যগ্র হইলেন। পরে অগ্রজকে ঐ কবিতা-রচয়িতা জানিয়া, সকলে তাঁহার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া পরাস্ত হন। অবশেষে কুরাণগ্রামনিবাসী সুবিখ্যাত দর্শনশাস্ত্রবেত্তা রামমোহন তর্কসিদ্ধান্তের সহিত প্রাচীন ন্যায়গ্রন্থের বিচার হয়; বিচারে তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের পরাজয় হয় শুনিয়া, পিতৃদেব, তর্কসিদ্ধান্তের পদরজঃ লইয়া দাদার মস্তকে দেন। পিতৃদেব অনেক স্তবস্তুতি করিয়া তর্কসিদ্ধান্তকে সান্ত্বনা করেন। তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় বিচারে পরাজিত হইয়া, পিতৃদেবকে বলেন যে, 'তোমার পুত্র ঈশ্বর যেরূপ কাব্য, অলঙ্কার, স্মৃতি ও ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছে, এরূপ বঙ্গদেশের মধ্যে কেহই শিক্ষা করিতে পারেন না, উত্তরকালেও যে, অপর কেহ শিক্ষা করিতে পারিবেন, এরূপ আশা করা যাইতে পারে না। ঈশ্বরের প্রতি সরস্বতীর কৃপাদৃষ্টি হইয়াছে, নচেৎ এই অল্পবয়সে এত শাস্ত্র কেমন করিয়া শিক্ষা করিয়াছে।' কোন কোন পণ্ডিত সর্বসমক্ষে ব্যক্ত করিলেন যে, 'ঈশ্বরের পিতামহ বহুকাল তীর্থক্ষেত্রে তপস্যা করিতেছিলেন, স্বপ্ন দেখিয়া দেশে আসিয়া ঈশ্বর ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র, জিহ্বায় কি মন্ত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন; তজ্জন্য দৈবশক্তিবলে সমস্ত শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়াছে।' কোন কোন পণ্ডিত বলিতেন যে, 'ঈশ্বরের মাতামহ শবসাধন করেন, তাঁহারই আশীর্বাদ-প্রভাবে এত অল্প বয়সে এরূপ পণ্ডিত হইয়াছে।'

যৎকালে অগ্রজ, ন্যায়শাস্ত্রের শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন, তৎকালে ব্যাকরণের দ্বিতীয় শ্রেণীর অধ্যাপক হরিপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন পীড়িত হইয়াছিলেন। কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয়, অগ্রজকে উপযুক্ত পণ্ডিত বিবেচনা করিয়া, দুই মাসের জন্য প্রতিনিধি পদে নিযুক্ত করেন। তিনি প্রতিনিধি পদে নিযুক্ত থাকিয়া চল্লিশ টাকা প্রাপ্ত হন এবং সেই টাকা পিতৃদেবের হস্তে অর্পণ করিয়া বলেন, 'এই টাকায় পিতৃকৃত্য-সম্পাদনার্থ গয়াধাম প্রভৃতি তীর্থ-পর্যটনে যাত্রা করুন।' ছেলেমানুষ, পিতাকে তীর্থক্ষেত্রে যাইতে উপদেশ দিতেছেন, এই কথায় আত্মীয় বন্ধুবান্ধব সকলেই পরম আহ্লাদিত হইলেন।

পিতৃদেব তৎকালে কলিকাতা জোড়াশাঁকোনিবাসী বাবু রামসুন্দর মল্লিকের আফিসে চাকরি করিতেন। রামসুন্দর মল্লিক যদিও অতি ধার্মিক লোক ছিলেন, তথাপি তিনি পিতৃদেবকে ঐ সময় তীর্থ-পর্যটনে যাইতে নিষেধ করেন; সেই জন্য পিতা, তাঁহার অবাধ্য হইয়া যাইতে সাহস করেন নাই। এজন্য দাদা, বাবু রামসুন্দর মল্লিকের বাটিতে যাইয়া, যাহাতে পিতা গয়া যাইতে পারেন, রামসুন্দর-বাবুকে এরূপ ধর্মবিষয়ক উপদেশ প্রদান করেন। বৃদ্ধ রামসুন্দরবাবু, ছেলেমানুষের প্রমুখাৎ নানাপ্রকার হিতগর্ভ উপদেশ শুনিয়া পরম আহ্লাদিত হইলেন এবং

পিতৃদেবের গয়াযাত্রার বিষয়ে আর নিবারণ করিতে পারিলেন না। তখন রেলের পথ হয় নাই ; তজ্জন্য পিতৃদেব পদব্রজেই প্রস্থান করেন।

ঐ সময় মার্শেল সাহেব, সংস্কৃত-কলেজের সেক্রেটারির পদ পরিত্যাগ করিলেন। ঐ পদে কলিকাতার ছোট আদালতের জজ বাবু রসময় দত্ত মহাশয় নিযুক্ত হইলেন। তৎকালে বাঙ্গালীর মধ্যে ইঁহার তুল্য আর কাহারও অধিক বেতন ছিল না। দত্তবাবু যদিও সংস্কৃত-ভাষায় অনভিজ্ঞ, তথাপি রাজকীয় ব্যক্তিগণ ইঁহার হস্তেই সংস্কৃত-বিদ্যালয়ের গুরুতর ভার ন্যস্ত করিয়াছিলেন। মধুসূদন তর্কালঙ্কার ইঁহার আসিস্টাণ্ট সেক্রেটারি ছিলেন। কলেজের তৃতীয় বার্ষিক পরীক্ষার সময়, দত্ত মহাশয়, অগ্নীধ্র রাজার তপস্যা-সংক্রান্ত কতিপয় কথা লিখিয়া, পরীক্ষার্থী ছাত্রগণকে এই বিষয়ের শ্লোক রচনা করিতে বলেন। অগ্রজের উক্ত বিষয়ের রচনা উদ্ধৃত করিলাম না। যেহেতু তাঁহার 'সংস্কৃত-রচনা' নামক পুস্তকে সেই সমস্ত মুদ্রিত হইয়াছে।

ঐ সময়ে কলেজে নিম্ন-শ্রেণীর বালকগণকে একঘণ্টা কাল ভূগোল ও অঙ্ক শিক্ষা দেওয়া হইত, আর উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রগণকেও একঘণ্টা কাল আইন শিক্ষা দেওয়া হইত। ঐ বিষয় শিক্ষা দিবার জন্য বাবু নবগোপাল চক্রবর্তী মহাশয় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। দাদা, তৃতীয় বার্ষিক পরীক্ষায় দর্শনশাস্ত্রে সর্বপ্রধান হইয়াছিলেন, তজ্জন্য ন্যায়ে একশত টাকা, কবিতা-রচনায় একশত টাকা, ক্লাসের মধ্যে হস্তাক্ষর সর্বোৎকৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়া লেখার পুরস্কার আট টাকা, আইনের পরীক্ষায় সর্বপ্রধান হইয়াছিলেন বলিয়া পঁচিশ টাকা, একুনে দুইশত তেত্রিশ টাকা পারিতোষিক পাইয়াছিলেন। পরে পিতৃদেব তীর্থপর্যটন করিয়া জলপথে কলিকাতায় সমুপস্থিত হইলে, পুরস্কারের সমস্ত টাকা পাইয়া পরম আহ্লাদিত হইলেন।

কাব্যশাস্ত্রের অধ্যাপক জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয়, ন্যায় ও স্মৃতির শ্রেণীর ছাত্রদিগকে মধ্যে মধ্যে কবিতা রচনা করিতে দিতেন। অনেকেই তাঁহার সমক্ষে বসিয়া কবিতা রচনা করিতেন ; কিন্তু অগ্রজ মহাশয় তদনুসারে কবিতা-রচনায় কদাচ প্রবৃত্ত হইতেন না। বার্ষিক পরীক্ষায় রচনার পারিতোষিক পাইবার পর, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার বলিলেন, 'আর আমি তোমার কোন ওজর শুনিব না। অদ্য তোমায় কবিতা রচনা করিতেই হইবে।' এই বলিয়া, তিনি পীড়াপীড়ি করাতে, নিতান্ত অনিচ্ছাপূর্বক কবিতা-রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

'গোপালায় নমোঽস্তু মে', এই চতুর্থ চরণ নির্দিষ্ট করিয়া তর্কালঙ্কার মহাশয়, সকলকে শ্লোক-রচনায় নিযুক্ত করিলেন। দাদা, পরিহাস করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহাশয়! কোন্ গোপালের বিষয় বর্ণনা করিব? এক গোপাল আমাদের সম্মুখে উপস্থিত রহিয়াছেন ; আর এক গোপাল বহুকাল পূর্বে বৃন্দাবনে লীলা করিয়া অন্তর্হিত হইয়াছেন। এ উভয়ের মধ্যে কাহার বর্ণনা আপনার অভিপ্রেত,

স্পষ্ট করিয়া বলুন।' পূজ্যপাদ তর্কালঙ্কার মহাশয়, অগ্রজ মহাশয়ের এই কৌতুক-কর জিজ্ঞাসা-বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, 'বৃন্দাবনের গোপালের বর্ণনা কর।' অগ্রজ মহাশয় ঐ বিষয়ে পাঁচটি শ্লোক লিখিয়াছিলেন। জয়গোপাল তর্কালঙ্কার শ্লোক পাঁচটি দেখিয়া পরম আহ্লাদিত হইয়াছিলেন। সেই পাঁচটি শ্লোক এই—

'যশোদানন্দকন্দায় নীলোৎপলদলশ্রিয়ে।
নন্দগোপালবালায় গোপালায় নমোঽস্তু মে॥ ১॥
বেণুরক্ষণদক্ষায় কালিন্দীকূলচারিণে।
বেণুবাদনশীলায় গোপালায় নমোঽস্তু মে॥ ২॥
ধৃতপীতদুকূলায় বনমালাবিলাসিনে।
গোপস্ত্রীপ্রেমলোলায় গোপালায় নমোঽস্তু মে॥ ৩॥
বৃষ্ণিবংশাবতংসায় কংসধ্বংসবিধায়িনে।
দৈতেয়কুলকালায় গোপালায় নমোঽস্তু মে॥ ৪॥
নবনীতৈকচৌরায় চতুর্বর্গৈকদায়িনে।
জগদ্ভাণ্ডকুলালায় গোপালায় নমোঽস্তু মে॥ ৫॥

অগ্রজ চারি বৎসর দর্শনশাস্ত্রের শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিয়া ষড়্দর্শনে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয়, মধ্যে মধ্যে বলিতেন, 'ঈশ্বরের ন্যায় বুদ্ধিমান ছাত্র আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। ইহাকে পড়াইবার জন্য দর্শনশাস্ত্রে আমায় বিশেষরূপ দৃষ্টি রাখিতে হইয়াছিল, তজ্জন্য দর্শনশাস্ত্রে যে আমার বিশেষরূপ অধিকার জন্মিয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। পড়াইবার সময় এরূপ বোধ হইত, যেন কতকাল পূর্বে ঈশ্বরের ঐ সকল শাস্ত্রে বিশিষ্টরূপ অধিকার ছিল। নচেৎ চারি বৎসরের মধ্যে দর্শনশাস্ত্রে এরূপ কাহারও অধিকার হইতে পারে না।'

ঐ সময় বড়বাজারের বাবু জগদ্দুর্লভ সিংহের যে বাটীতে আমাদের বাসা ছিল, তাহার অবস্থা অত্যন্ত হীন হওয়ায়, ঐ বাটীর সদরের সমস্ত গৃহ তনসুকদাস হিন্দুস্থানীকে ভাড়া বিলি করা হইয়াছিল। অন্তঃপুরস্থ নিম্ন-গৃহে সিংহবাবু আমাদের বাসা অবধারিত করিয়া দেন। নিম্ন-গৃহে অবস্থিতি-প্রযুক্ত অগ্রজ মহাশয় পীড়িত হইলেন। চিকিৎসকগণ পিতৃদেবকে বলিলেন, 'কলিকাতায় নিম্ন-গৃহে—বিশেষত বড়বাজারে অবস্থিতি করা রোগীর পক্ষে কদাপি উচিত হয় না। নিম্ন-গৃহে শয়ন-প্রযুক্ত ইতঃপূর্বে ইনি একবার বিষম রোগাক্রান্ত হইয়া, অনেক কষ্টে আরোগ্যলাভ করেন। তথাপি আপনারা ওরূপ গৃহ পরিত্যাগ করেন না। ওরূপ গৃহে শয়ন করিলে, নিশ্চয়ই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইবেন। রাত্রিতে সমস্ত শয্যা যেন জলসিক্ত বোধ হইয়া থাকে; অতএব যত শীঘ্র পারেন, আপনারা এই গৃহ পরিত্যাগ করুন।' এই সকল নানা কারণে বড়বাজারের বাসা পরিত্যাগপূর্বক, বহুবাজারের পঞ্চাননতলায় আনন্দচন্দ্র সেনের বাটীতে বাসা স্থির হইল। সেই বাটীর মধ্যে

স্বতন্ত্র গৃহে দেশস্থ বিশ্বম্ভর ঘোষ ও যশোদানন্দন ঘোষ প্রভৃতি অবস্থিতি করিতেন। দেশস্থ লোকসহ একত্র এক বাটীতে অবস্থিতি করায়, বিশেষ সুবিধা বোধ হইয়াছিল।

ইহার কিয়দ্দিবস পরে, আশ্বিন মাসে, অগ্রজ মহাশয় অসুস্থতা-নিবন্ধন দেশে প্রস্থান করেন। মধুসূদন তর্কালঙ্কার সংস্কৃত কলেজের এসিস্টাণ্ট সেক্রেটারি ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেরেস্তাদার পণ্ডিত অর্থাৎ প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত ছিলেন। কার্তিক মাসে তর্কালঙ্কারের মৃত্যু হইলে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ঐ পদ প্রাপ্ত্যভিলাষে অনেকেই মার্শেল সাহেবের নিকট আবেদন করিতে লাগিলেন। বহুবাজারের মলঙ্গা-নিবাসী বাবু কালিদাস দত্ত মহাশয়, অপর এক পণ্ডিতকে ঐ পদ দেওয়াইবার আশয়ে, মার্শেল সাহেবকে অনুরোধ করিতে যান। সাহেব বলেন, 'ঈশ্বরচন্দ্র নামে সংস্কৃত-কলেজের এক ছাত্র আছে, তাহাকে এই কর্ম দিবার মানস করিয়াছি। আমি যৎকালে সংস্কৃত-কলেজের অধ্যক্ষতা-কার্যে নিযুক্ত ছিলাম, সেই সময় হইতে বিশিষ্টরূপ অবগত আছি যে, ঈশ্বর অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও সংস্কৃত-ভাষায় বিশেষরূপ ব্যুৎপন্ন।' সাহেবের প্রমুখাৎ ইহা শ্রবণ করিয়া, কালিদাসবাবু বলেন, 'তিনিও আমার আত্মীয় লোক, তিনি এ পদ পাইলে, আমি পরম আহ্লাদিত হইব।' এই বলিয়া কালিদাসবাবু প্রস্থান করেন। অনন্তর, মার্শেল সাহেব, জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননকে ডাকাইয়া বলেন, 'তোমার ক্লাসের ছাত্র ঈশ্বর কোথায়? আমি তাহাকে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান পণ্ডিতের কর্ম দিব মানস করিয়াছি। কিন্তু ঈশ্বর নিতান্ত ছেলেমানুষ। গবর্নমেণ্ট ছেলেমানুষ দেখিলে, এ পদ তাহাকে দেন কি না সন্দেহ।' ইহা শুনিয়া তর্ক-পঞ্চানন মহাশয় বলেন, 'ঈশ্বর, ২২ বৎসর বয়সে সংস্কৃত-কলেজের ল-কমিটির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর, এক বৎসর বেদান্ত-শাস্ত্রের শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিয়াছে, তৎপরে দর্শন-শ্রেণীতে প্রায় চারি বৎসর সমগ্র দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছে। অতএব ঈশ্বরের বয়স এক্ষণে সাতাশ বৎসর অতীত হইয়াছে।' সুতরাং সাহেব আর কম বয়সের আপত্তি করিতে পারিলেন না। নচেৎ কম বয়সে এ পদ পাইবার কোন আশা ছিল না। সাহেব, যৎকালে সংস্কৃত-কলেজের অধ্যক্ষ-পদে নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময় হইতেই অগ্রজের প্রতি তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। তজ্জন্য তিনি বহুবাজার মলঙ্গা-নিবাসী বাবু রাজেন্দ্র দত্ত মহাশয় দ্বারা আমাদের বাসায় ঐ সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন। ঐ সময়ে অগ্রজ দেশে অবস্থিতি করিতেছিলেন। পিতৃদেব, রাজেন্দ্রবাবুর প্রমুখাৎ এ সংবাদ-প্রাপ্তিমাত্রেই দেশে গমনপূর্বক অগ্রজকে সমভিব্যাহারে লইয়া কলিকাতায় পৌঁছিলেন। পরদিন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান পণ্ডিতের পদপ্রাপ্ত্যভিলাষে, মার্শেল সাহেবের নিকট আবেদন-পত্র প্রেরিত হইল এবং গবর্নমেণ্ট, মার্শেল সাহেবের রিপোর্টে সম্মতি দান করিলেন।

চাকরি

ইং ১৮৪১ খৃঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে অগ্রজ মহাশয়, মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হইলেন। সিবিলিয়ানগণ বিলাত হইতে কলিকাতায় আসিয়া, প্রথমত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাঙ্গালা, হিন্দী প্রভৃতি শিক্ষা করিয়া পরীক্ষোত্তীর্ণ হইলে, জেলায় জেলায় বিচাব কার্যে নিযুক্ত হইতেন। যিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিতেন, তিনি পুনর্বার পবীক্ষা দিতেন, তাহাতেও উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে, স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে হইত। সিবিলিয়ানদেব মাসিক পবীক্ষার কাগজ অগ্রজকেই সংশোধন করিতে হইত। অধ্যক্ষ মার্শেল সাহেব, যখন সংস্কৃত-কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন, সেই সময়ে দাদাকে অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন এবং ব্যাকরণ, কাব্য ও অলঙ্কার-শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলিযা বিশিষ্টরূপ পরিচয় পাইয়াছিলেন ; তজ্জন্য অগ্রজের নিকট 'মুগ্ধবোধ ব্যাকবণ', 'রঘুবংশ', 'কুমাবসম্ভব', 'শকুন্তলা', 'উত্তবচরিত', 'বিক্রমোর্বশী' প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ সকল অধ্যয়ন কবিতে প্রবৃত্ত হন। তৎকালে অগ্রজ সামান্যরূপ ইংরাজী জানিতেন। একারণ, মার্শেল সাহেব বলেন, 'ঈশ্বরচন্দ্র। তোমাকে রীতিমত ইংরাজী ও হিন্দীভাষা শিখিতে হইবে। যেহেতু, মাসে মাসে সিবিলিয়ান-বিদ্যার্থী ছাত্রদের পরীক্ষার কাগজ দেখিয়া, দোষগুণ বিবেচনা করিতে হইবে।' সুতরাং অগ্রজ মহাশয কযেক মাস প্রাতে নয়টা পর্যন্ত, এক হিন্দুস্থানী পণ্ডিতকে মাসিক দশ টাকা বেতন দিয়া, হিন্দীভাষা শিক্ষা করেন। তাহাতে হিন্দী পরীক্ষার কার্য তাঁহার দ্বারা সুচারুরূপে নির্বাহ হইতে লাগিল।

তৎকালে তালতলানিবাসী বাবু দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় হেয়ার সাহেবের স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক ছিলেন। তিনি প্রায়ই বৈকালে দুই-তিন ঘণ্টা আমাদের বাসায় অবস্থিতি করিয়া, নানা বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক ও হিতগর্ভ গল্প করিতেন। ঐ সময় দুর্গাচরণবাবুর মত সুবিজ্ঞ লোক অতি বিরল ছিল। তিনি অগ্রজের পরম বন্ধু ছিলেন। প্রথমত দুর্গাচরণবাবুই স্বয়ং দাদাকে ইংরাজী-ভাষা শিখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিছু দিন পরে, তাঁহার ছাত্র বাবু নীলমাধব মুখোপাধ্যায়ের উপর ইংরাজী পড়াইবার ভারার্পণ করেন। নীলমাধববাবু সামান্য দিন শিক্ষা দেন। অনন্তর তৎকালীন হিন্দু কলেজের ছাত্র বাবু রাজনারায়ণ গুপ্তকে মাসিক পনের টাকা বেতন দিয়া, অগ্রজ মহাশয় প্রত্যহ প্রাতঃকাল হইতে বেলা নয়টা পর্যন্ত ইংরাজী-ভাষা অধ্যয়ন করিতেন। এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে, সিবিলিয়ানগণের পরীক্ষার কাগজ দেখিতে যেরূপ ইংরাজী ভাষা অবগত হওয়া আবশ্যক, সেইরূপ শিক্ষা হইল।

পিতৃদেব তৎকাল পর্যন্ত সামান্য বেতনের কর্ম করিতেন। অগ্রজ মহাশয় অনেক অনুনয় ও বিনয় করিয়া, পিতৃদেবকে কর্ম হইতে অবসর লইয়া দেশে

অবস্থিতি করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু পিতৃদেব কর্ম ত্যাগ করিয়া পুত্রের অধীনে থাকিয়া সংসারের ও অপর পুত্রগণের লেখাপড়ার ব্যয় নির্বাহ করায়, অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। অনেক বাদানুবাদের পর জ্যেষ্ঠাগ্রজের সবিশেষ অনুরোধে সম্মত হইলেন। কর্ম-পরিত্যাগ-সময়ে তাঁহার প্রভু, পিতৃদেবকে উপদেশ দেন যে, 'ছেলেমানুষের কথায় উপস্থিত কর্ম ত্যাগ করিয়া, পরাধীন হওয়া উচিত নয়; যখন অসমর্থ হইবে, তখন ঐ ছেলে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যদি তোমার সাহায্য না করে, তখন কি পুনরায় চাকরি করিতে আসিবে?' পিতৃদেব তাঁহাকে বলেন যে, 'আমার পুত্র সাক্ষাৎ যুধিষ্ঠিরের মত ধর্মশীল এবং আমায় দেবতুল্য-জ্ঞানে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। তাহার কথা অবহেলন করিতে পারিব না। যদি তাহাকে অধার্মিক ও দুশ্চরিত্র জানিতাম, তাহা হইলে কখনই কর্ম ত্যাগ করিতাম না।' তদবধি অগ্রজ মাসিক-ব্যয-নির্বাহার্থ, পিতৃদেবকে প্রতি মাসের প্রথমেই কুড়ি টাকা প্রেরণ করিতেন। অবশিষ্ট ত্রিশ টাকায় কষ্টেসৃষ্টে বাসার ব্যয় নির্বাহ করিতেন। তৎকালে বাসায় আমরা তিন সহোদর, দুই জন পিতৃব্যপুত্র, দুই জন পিতৃষস্রেয়, একজন মাতৃষস্রেয় ও পৈতৃক অনুগত ভৃত্য শ্রীরাম নাপিত, এই নয় জন অবস্থিতি করিতাম। বাসায় পাচক-ব্রাহ্মণ ছিল না, সকলকেই পর্যায়ক্রমে পাকাদিকার্য সম্পন্ন করিতে হইত। অগ্রজও পর্যায়ক্রমে পাকাদিকার্য নির্বাহ করিতেন। যে বাটীতে বাসা ছিল, তাহাতে সকলের স্থান সংকুলান না হওয়ায়, বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দের পঞ্চাননতলাস্থ বৈঠকখানা-বাটীতে বাসা হইল।

ঐ বৎসর ভাদ্রমাসে মার্শেল সাহেব, সংস্কৃত-কলেজের জুনিয়র ও সিনিয়র ডিপার্টমেণ্টের এস্‌কলার্শিপের পরীক্ষক নিযুক্ত হন। এই বৎসর হইতে এই নূতন পরীক্ষায় এডুকেশন কোউন্‌সেল হইতে নূতন প্রথার আদেশ হয়। সাহেব, স্বয়ং ভালরূপ সংস্কৃত জানিতেন না; সুতরাং তাঁহার পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রকেই সমস্ত প্রশ্ন প্রস্তুত করিতে হইত। কাব্য ও অলঙ্কারের ক্লাস জুনিয়র ছিল; ঐ দুই ক্লাসের জন্য কাব্য, বাঙ্গালা হইতে সংস্কৃত ও সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা অনুবাদ, ব্যাকরণ ও লীলাবতীর প্রশ্ন প্রস্তুত করিতেন। সিনিয়র ক্লাসের জন্য দর্শন, বেদান্ত, স্মৃতি, সংস্কৃত গদ্য ও পদ্য রচনা, বীজগণিতের অঙ্ক প্রভৃতির প্রশ্ন প্রস্তুত করিয়া, গোপনে মুদ্রিত করাইতেন; তদ্ভিন্ন কোন কোন বিষয়ের প্রশ্ন স্বহস্তেও লিখিয়া দিতেন। পরীক্ষার কার্যপ্রণালী দেখিয়া, সকলেই মার্শেল সাহেব ও অগ্রজের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ববৎসর উপযুক্ত পরীক্ষকের অভাবে সকলই অসঙ্গত প্রশ্ন হইয়াছিল; তজ্জন্য কোন ছাত্রই এস্‌কলার্শিপ প্রাপ্ত হন নাই।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে নিযুক্ত হইবার পর, ইংরাজী-ভাষায় কৃতবিদ্য অনেক লোক অর্থাৎ বাবু শ্যামাচরণ সরকার, বাবু রামরতন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অগ্রজের নিকট সংস্কৃত অধ্যয়ন-মানসে বাসায় আসিতেন। তৎকালে 'উপক্রমণিকা' ব্যাকরণের সৃষ্টি হয় নাই। সংস্কৃত-ভাষা শিখিতে হইলে, অগ্রে 'মুগ্ধবোধ' বা অন্য কোন ব্যাকরণ

পড়িতে হইত ; সুতরাং অগ্রেই 'মুগ্ধবোধ' ব্যাকরণ পড়াইতেন। ব্যাকরণ শিখাইবার এমন কৌশল জানিতেন যে, একবৎসরের মধ্যেই অনেকে ব্যাকরণ সমাপ্ত করিয়া, কাব্য অধ্যয়ন করিতে সক্ষম হইতেন। একারণ, ক্রমশ প্রাতে ও সায়ংকালে অনেক বিষয়ী-লোক, সংস্কৃত শিখিবার মানসে আমাদের বাসায় উপস্থিত হইয়া, প্রত্যহ সংস্কৃত শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ক্রমশ বাসায় ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। নিজে ইংরাজী পড়িতেন, তথাপি অপর যে সমস্ত লোক সংস্কৃত শিক্ষা করিতে আসিতেন, তাহাদের প্রতি কখনও ক্ষণকালের জন্য বিরক্তিভাব প্রকাশ করিতেন না। তিনি বাল্যকাল হইতে জ্ঞানদানকার্যে কখনও পরাঙ্মুখ ছিলেন না। যে সকল লোক সর্বদা বাসায় আসিতেন, তাঁহারা পরস্পর মনে করিতেন যে, ঈশ্বরের আমরাই পরম বন্ধু ও আত্মীয়। কিন্তু আমরা দেখিতাম, কি আত্মীয় কি শত্রু সকলের প্রতি তিনি সমভাব প্রকাশ করিতেন।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে নিযুক্ত হইবার অব্যবহিত পরে, তত্ত্ববোধিনী সভার বিখ্যাত লেখক বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত, প্রত্যহ সন্ধ্যার পর উক্ত সভায় যে সকল প্রবন্ধ প্রচার হইবে, তাহা অগ্রজ মহাশয়ের নিকট পাঠ করিয়া শুনাইতেন। অগ্রজ মহাশয়ের অভিপ্রায় অনুসারে অনেক স্থল পরিবর্তিত ও পরিত্যক্ত হইত। তাঁহার রচিত 'বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার', নামক পুস্তক যৎ-কালে ইংরাজী হইতে বঙ্গভাষায় অনূদিত হয়, তৎকালে তিনি ঐ পুস্তক অগ্রজ মহাশয়ের নিকট আদ্যোপান্ত দেখাইয়া লইয়াছিলেন, এবং যে সকল দুরূহ শব্দ বাঙ্গালায় লিখিতে অক্ষম হইয়াছিলেন, তাহা নূতন প্রণালীতে তাঁহার দ্বারা রচনা করাইয়া লইয়াছিলেন। ফলত 'বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' পুস্তক যে, সকলের আদরের বস্তু হইয়াছে, তাহা অগ্রজ মহাশয়ের সংশোধন-প্রণালীর ফল, ইহা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। তিনি আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়া না দিলে, অক্ষয়বাবুর ঐ পুস্তক সহজে সাধারণের বোধগম্য হইত না। এতদ্ব্যতীত, অক্ষয়বাবুর অন্যান্য কয়েকখানি পুস্তকও তিনি দেখিয়া দিয়াছিলেন। অগ্রজ মহাশয়, সর্বাগ্রে তত্ত্ববোধিনীতে মহাভারতের বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশ করেন। তৎকালে 'তত্ত্ববোধিনী'র সভ্যগণের অনুরোধবশবর্তী হইয়া, তিনি তথাকার তত্ত্বাবধায়ক হইয়াছিলেন। কিন্তু কিছু দিন পরেই কোন বিশেষ কারণে, 'তত্ত্ববোধিনী'-র সংস্রব একেবারে পরিত্যাগ করেন।

আমাদের তৎকালীন বাসার সম্মুখে হৃদয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটী ছিল। ইঁহার পৌত্র বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দু-কলেজে অধ্যয়ন করিতেন। তিনি অল্পবয়সেই ইংরাজী পড়া পরিত্যাগপূর্বক নিরর্থক বাটীতে বসিয়া থাকিতেন। তিনি নিত্যই দেখিতেন যে, অনেকে ইংরাজী শিক্ষা করিয়া, বিষয়-কর্মে লিপ্ত থাকিয়াও অগ্রজের নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করিতেছেন ; এজন্য তিনিও, তাঁহার নিকট 'মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ' শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হন। ইতিপূর্বে রাজকৃষ্ণবাবু কিছুমাত্র ব্যাকরণ অবগত

ছিলেন না। তিনি দিবারাত্র পরিশ্রম-সহকারে অগ্রজের নিকট অধ্যয়ন করিয়া, ছয় মাসের মধ্যে 'মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ' সমাপ্ত করেন। এজন্য সংস্কৃত-কলেজের পণ্ডিত ও ছাত্রগণ আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিয়াছিলেন যে, ঈশ্বর কি প্রণালী অবলম্বন করিয়া, এত শীঘ্র ব্যাকরণ সমাপ্ত করাইলেন। পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, কলেজের অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া চাকরি না হওয়া প্রযুক্ত, অগ্রজ মহাশয়ের বাসায় মধ্যে মধ্যে অবস্থিতি করিতেন। দাদাও তাঁহাকে সহোদরের ন্যায় স্নেহ করিতেন। ঐ সময়ে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সিবিল পড়াইবার জন্য চল্লিশ টাকা বেতনের একটি পণ্ডিতের পদ শূন্য হইলে, অগ্রজ মহাশয় মার্শেল সাহেবকে বলিয়া, তাঁহার বাল্য-কালের পরমবন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে নিযুক্ত করিয়া দেন। ইতঃপূর্বে মদন-মোহন তর্কালঙ্কার, কলিকাতায় বাঙ্গালা পাঠশালায় মাসিক পনের টাকা বেতনের শিক্ষকতা-কার্যে নিযুক্ত ছিলেন; তৎপরে বারাসতে মাসিক কুড়ি টাকা বেতনের কর্ম করিতেন। ইহাব কিছু দিন পরে মাদ্রাসা-কলেজের চল্লিশ টাকা বেতনের একটি পণ্ডিতের পদ শূন্য হইলে, অগ্রজ মহাশয়, সাহেবকে অনুরোধ করিয়া, তাঁহার সহাধ্যায়ী মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশকে ঐ পদে নিযুক্ত করিয়া দেন।

এই সময়ে লর্ড হার্ডিঞ্জ বাহাদুর ভারতবর্ষের গবর্নর জেনারেলের পদ প্রাপ্ত হইয়া এদেশে আইসেন। উক্ত মহাত্মা এক সময় কলেজ পরিদর্শনজন্য আগমন করিয়া, কথা-প্রসঙ্গে অবগত হইলেন যে, সংস্কৃত-কলেজের ছাত্রগণ ইংরাজী অধ্যয়ন করে না; একারণ, তাহারা ভাল কর্ম পায় না। প্রতি জেলায় যে একজন করিয়া জজ পণ্ডিত ছিল, তাহাও সম্প্রতি উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে, তজ্জন্য সংস্কৃত-কলেজের ছাত্রসংখ্যা অতি অল্প হইয়াছে। সাহেব, সংস্কৃত-কলেজের বিদ্যার্থীগণের উৎসাহ-বর্ধনার্থ বঙ্গদেশে একশত একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। গবর্নমেণ্ট, সকল বিদ্যালয়ের পণ্ডিতের পরীক্ষার ভার, মার্শেল সাহেবের প্রতি অর্পণ করেন। অগ্রজ মহাশয় উক্ত সাহেবের পণ্ডিত ছিলেন; সাহেব বাঙ্গালা ভাষা ভাল জানিতেন না, তজ্জন্য দাদাই উঁহাদের পরীক্ষা করিয়া, পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত করিয়া দিতেন। তৎকালে অন্য কোন বাঙ্গালা পুস্তক ছিল না। 'পুরুষ-পরীক্ষা', 'জ্ঞান-প্রদীপ, 'হিতোপদেশ'-এর বাঙ্গালা, 'অন্নদামঙ্গল' প্রভৃতি পুস্তকের পরীক্ষা হইত। লীলাবতীর অঙ্ক ও ভূগোল পরীক্ষায় যাহারা উত্তীর্ণ হইবে, সেই সকল পণ্ডিতকেই নিযুক্ত করা আবশ্যক; একারণ, তিনি তৎকালে ভাল ভাল পণ্ডিত নির্বাচন করিয়া দিতেন। তজ্জন্য কত পণ্ডিত যে বাসায় আসিতেন, তাহা বলা বাহুল্য। সংস্কৃত-কলেজে অনেক মহামান্য পণ্ডিত থাকাতেও, সাহেব তাঁহাকে যে পরীক্ষক নির্বাচন করিয়াছিলেন, ইহাতে সাধারণ লোকে সাহেবের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন। কিন্তু পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকে মনে মনে ঈর্ষা করিয়া বলিতেন যে, আমরা বিদ্যমান থাকিতে, সাহেব, ঈশ্বরকে বহুসংখ্যক পণ্ডিতের পরীক্ষক নিযুক্ত করিলেন। অগ্রজ মহাশয় নিরপেক্ষ-ভাবে লোক-নির্বাচন করায়, তাঁহার বিশিষ্টরূপ সুখ্যাতি হইয়াছিল। অদ্যাপি

হার্ডিঞ্জ বাহাদুরের কীর্তিস্তম্ভস্বরূপ বাঙ্গালা স্কুল, কোন কোন স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়।

সংস্কৃত-কলেজের ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীর অধ্যাপক গঙ্গাধর তর্কবাগীশ মহাশয়, তাঁহার পুত্র গোবিন্দচন্দ্র শিরোমণি অপেক্ষা অগ্রজ মহাশয়কে ভালবাসিতেন। · যখন যাহা আবশ্যক হইত, তিনি তাহা দাদাকেই বলিতেন। দাদা শ্রবণমাত্রেই তাঁহার আজ্ঞানুবর্তী হইয়া, সে কার্য সম্পন্ন করিতেন। অনুমান ইং ১৮৪৩ সালে জ্যৈষ্ঠমাসের শেষে, গঙ্গাধর তর্কবাগীশ মহাশয় বিষম বিসূচিকারোগাক্রান্ত হইলেন এবং অবিলম্বে তাঁহার শৌচ-প্রস্রাব বন্ধ হইয়া অত্যন্ত যাতনা হইতে লাগিল। অগত্যা তাঁহাব প্রিয়ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্রকে আহ্বান করিলেন। দাদা, শ্রবণমাত্রই অত্যন্ত বিষণ্নবদনে দ্রুতবেগে তৎকালীয় বিখ্যাত ডাক্তার বাবু নবীনচন্দ্র মিত্র ও তালতলানিবাসী ডাক্তার বাবু দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দের বাটী যাইয়া, তাঁহাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া, তর্কবাগীশ মহাশয়ের বাটীতে গমন করিলেন। তিন দিবস অনন্যকর্মা ও অনন্যমনা হইয়া, তিনি পীড়িত পণ্ডিতের চিকিৎসা করাইলেন। তাহাতে তর্কবাগীশ প্রথমত আরোগ্যলাভ করেন, কিন্তু পরে হঠাৎ এক দিবস তাঁহার প্রাণত্যাগ হয়। কয়েক দিবস অগ্রজ মহাশয় স্বহস্তে তাঁহার মলমূত্রাদি পরিষ্কার করেন। চিকিৎসকগণ কয়েক দিবসের ভিজিটের টাকা পর্যন্ত গ্রহণ করেন নাই। উক্ত কয়েক দিবসের ঔষধের মূল্যও অগ্রজ মহাশয় স্বয়ং প্রদান করিয়াছিলেন। বাল্যকালের শিক্ষকের প্রতি তাঁহার এরূপ শ্রদ্ধা ও ভক্তি দেখিয়া, সংস্কৃত-কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্রগণ তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং সকলে একবাক্যে বলিলেন যে, 'তর্কবাগীশের পুত্র ও কন্যা এ সময়ে নিকটে উপস্থিত নাই; অনেক ছাত্র বিদ্যমান রহিয়াছে বটে, কিন্তু কেহই ঈশ্বরের মত ভক্তিপূর্বক স্বহস্তে বিষ্ঠা পরিষ্কার করিতে পারে নাই।' অতঃপর অপর যে কোন আত্মীয় বন্ধুর পীড়া হইত, তিনি বিনা ভিজিটে ডাক্তার পাইবার জন্য অগ্রজকে জানাইতেন। তিনিও কি আত্মীয় কি অনাত্মীয় কাহারও পীড়ার সংবাদ পাইলে, ডাক্তার দুর্গাচরণ বাবুকে লইয়া, সেই রোগীর ভবনে যাইতেন। যে রোগীর কোন অভিভাবক নাই জানিতে পারিতেন, তাহার বাটীতে যাইয়া সকল অভাব পূরণ করিতেন। তিনি তৎকালে বাসাস্থিত ভ্রাতা এবং অন্যান্য আত্মীয়দিগকে ঐ সকল রোগীর শুশ্রূষার জন্য পাঠাইতেন; একারণ, অনেকেই বলিত, ঈশ্বরের মত দয়ালু ও ধর্মশীল লোক সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

ইহার কিছু দিন পরে, দর্শনশাস্ত্রাধ্যাপক জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননের নারিকেলডাঙ্গাস্থ ভবনে, তাঁহার ভাগিনেয় ঈশানচন্দ্র ভট্টাচার্যের ওলাউঠা হয়। তর্কপঞ্চানন মহাশয়, ভয়ে ভাগিনেয়কে বাটীর বাহিরে সামান্য একস্থানে রাখিয়াছিলেন, চিকিৎসা করান হয় নাই, মৃত্যুর আশঙ্কায় শয্যা পর্যন্ত দেন নাই; রোগীকে দরমার

উপর শয়ান রাখা হইয়াছিল। অগ্রজ মহাশয়, এই সংবাদ পাইয়া, ডাক্তার বাবু দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সমভিব্যাহারে লইয়া, নারিকেলডাঙ্গায় তর্কপঞ্চাননের ভবনে উপস্থিত হইয়া, চিকিৎসা করাইতে প্রবৃত্ত হন। ঐ রাত্রিতেই মধ্যম সহোদর দীনবন্ধু ন্যায়রত্নকে বহুবাজারে পাঠাইয়া, বালিশ, তোষক, মাদুর প্রভৃতি আনাইয়াছিলেন। নিশীথসময়ে মুটে না পাওয়ায়, মধ্যমাগ্রজ দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন স্বয়ং প্রায় দেড়ক্রোশ পথ উক্ত শয্যাদি মাথায় করিয়া লইয়া যান। অতঃপর রোগীকে ভাল শয্যায় শয়ন করান হইল, এবং রোগীর গাত্রের মলমূত্র অগ্রজ মহাশয় স্বহস্তে পরিষ্কার করিয়া দিলেন। তৎপরে রোগী সম্পূর্ণরূপ আরোগ্য লাভ করিলে, তিনি বাসায় গমন করিলেন। তর্কপঞ্চাননের ভাগিনেয় বিষম বিস্থচিকারোগাক্রান্ত হইলেন; কিন্তু তর্কপঞ্চানন, তাঁহার শিশুসন্তানদিগকে ভয়ে রোগীর ত্রিসীমায় আগমন করিতে দেন নাই। অগ্রজ মহাশয়, বহুবাজার হইতে ডাক্তার, ঔষধ ও শয্যা-সহিত তথায় যাইয়া, চিকিৎসা করাইলেন। তদ্দর্শনে অনেকেই আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিলেন। ইহার কিছু দিন পরে সংস্কৃত-কলেজের তৎকালীন সর্বপ্রধান ছাত্র প্রিয়নাথ ভট্টাচার্যের মধ্যম ও কনিষ্ঠ সহোদর বিস্থচিকারোগগ্রস্ত হন। অগ্রজ মহাশয়, এই সংবাদ-প্রাপ্তিমাত্র দুর্গাচরণবাবু প্রভৃতি ডাক্তারগণকে লইয়া চিকিৎসা করান। সুচিকিৎসায় প্রিয়নাথের মধ্যম সহোদর দীনবন্ধু আরোগ্য লাভ করেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যপ্রযুক্ত তাঁহার সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়।

ঐ সময় বহুবাজারস্থ বাসাবাটীর পার্শ্বে মোক্তার বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের এক ভৃত্যের ওলাউঠা হয়। মোক্তারবাবু, চাকরের হাত ধরিয়া উপর হইতে নামাইয়া পথে শোয়াইয়া রাখেন। অগ্রজ, তাহাকে ভূমিতে পতিত দেখিয়া, অনেক দুঃখ-প্রকাশ-পূর্বক নিজ বাসায় লইয়া গিয়া, আপন শয্যায় শয়ন করাইলেন, এবং অবিলম্বে, ডাক্তার আনাইয়া চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। পাচ সাত দিন চিকিৎসা ও শুশ্রূষায় রোগী সম্পূর্ণরূপ আরোগ্য লাভ করিল।

ঐ সময় অগ্রজ মহাশয়, অনেক অনাথ ও পীড়িত লোকের চিকিৎসাদি-কার্যে বিস্তর অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। অগ্রজের এরূপ দয়া দেখিয়া সকলেই বলিত, ইনি মানুষ নহেন, সাক্ষাৎ দেবতা। এইরূপ কত রোগীর প্রতি যে অগ্রজ দয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন, বিস্তৃতিভয়ে তাহা লিখিতে ক্ষান্ত রহিলাম।

এই সময় সংস্কৃত-কলেজের ব্যাকরণের প্রথম শ্রেণীর পণ্ডিত হরনাথ তর্কভূষণ মাসিক নব্বই টাকা ও তৃতীয় শ্রেণীর পণ্ডিত গঙ্গাধর তর্কবাগীশ মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনে কর্ম করিতেন। ইঁহাদের উভয়ের মৃত্যু হইলে, এডুকেশন কৌন্সেলের সেক্রেটারি ডাক্তার ময়েট সাহেব, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যক্ষ মার্শেল সাহেবের নিকট যাইয়া বলেন যে, উক্ত কার্য নির্বাহের জন্য উপযুক্ত দুই জন পণ্ডিত মনোনীত করিয়া দেন। তাহাতে মার্শেল সাহেব অগ্রজকে ব্যাকরণের প্রথম

শ্রেণীর কর্মে নিযুক্ত হইবার এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর নিমিত্ত একটি লোক মনোনীত করিয়া দিবার জন্য আদেশ করেন।

ইহা শ্রবণ করিয়া অগ্রজ উত্তর করিলেন, 'মহাশয়! আমি টাকার প্রত্যাশা করি না, আপনার অনুগ্রহ থাকিলেই আমি কৃতার্থ হইব। আর আপনার নিকট থাকিলে, আমি অনেক নূতন নূতন উপদেশ পাইব। আমি দুইটি উপযুক্ত শিক্ষক মনোনীত করিয়া আপনাকে দিব।' এই কথা বলিয়া তারানাথ তর্কবাচস্পতির নাম ব্যক্ত করিলেন। সাহেব বলিলেন, 'তারানাথ এখন কোথায় অবস্থিতি করেন?' অগ্রজ বলিলেন যে, 'তিনি পূর্বে সংস্কৃত-কলেজে অধ্যয়ন করিয়া, সর্বোৎকৃষ্ট প্রশংসাপত্র পাইয়া, কয়েক বৎসর কাশীধামে অবস্থানপূর্বক, পাণিনি ব্যাকরণ ও বেদান্ত প্রভৃতি অধ্যয়ন করেন। সম্প্রতি অম্বিকাকালনায় চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া, বহুসংখ্যক ছাত্রকে শিক্ষা দিতেছেন।' এই কথা শুনিয়া, সাহেব বলেন, 'তাঁহার চাকরি করিতে ইচ্ছা আছে কি না, অগ্রে জানা আবশ্যক।' ঐ দিবস অগ্রজ বাসায় আসিয়া, মাতৃস্বসার পুত্র সর্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়কে সমভি-ব্যাহারে লইয়া হাটখোলার ঘাটে গঙ্গা পার হইয়া পদব্রজে কালনা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পরদিন বৈকালে তথায় উপস্থিত হইলে, বাচস্পতি ও তাঁহার পিতা অকস্মাৎ অগ্রজকে অবলোকন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। অনন্তর বাচস্পতি মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এরূপ বেশে পদব্রজে এত পথ আসিবার কারণ কি?' অগ্রজ বলিলেন, 'আপনি কলেজে অধ্যয়ন করিয়া যে প্রশংসাপত্র পাইয়াছেন, তাহা আমায় প্রদান করুন। আমি আপনার সার্টিফিকেট ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যক্ষ মার্শেল সাহেবকে দেখাইব। তিনি আপনাকে মাসিক নব্বই টাকা বেতনে সংস্কৃত-কলেজে ব্যাকরণের প্রথম শ্রেণীর শিক্ষকতাকার্যের জন্য গবর্নমেণ্টে লিখিবেন।' ইহা শুনিয়া বাচস্পতি মহাশয় ও তাঁহার পিতা পরম আহ্লাদিত হইলেন, এবং প্রশংসাপত্রগুলি অগ্রজের হস্তে সমর্পণ করিলেন। প্রায় ত্রিশ ক্রোশ পথ পদব্রজে গমন করিয়া, সর্বেশ্বরের চরণদ্বয় স্ফীত ও তাহাতে বেদনা হইয়াছিল; অতঃপর আর চলিতে পারিবেন না বিবেচনায়, নৌকারোহণে কলিকাতা যাত্রা করিলেন। পর দিবস কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া, সমস্ত বিবরণ বলিয়া, বাচস্পতির সার্টিফিকেট ও আবেদনপত্র সাহেবকে প্রদান করিলেন।

মার্শেল সাহেব রিপোর্ট করিলে পর, গবর্নমেণ্ট, বাচস্পতি মহাশয়কে নব্বই টাকা বেতনের পদে নিযুক্ত করিলেন, এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যাকরণের পণ্ডিতের পদ ও পুস্তকাধ্যক্ষের কর্ম খালি হওয়াতে, সেক্রেটারি বাবু রসময় দত্ত মহাশয়, মফঃস্বলের চতুষ্পাঠীর পণ্ডিতগণকে ঐ কর্ম দিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু ময়েট সাহেবকে জিজ্ঞাসা করাতে, মার্শেল সাহেব তাঁহার পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রের পরামর্শানু-সারে ময়েট সাহেবকে বলিলেন, 'মফঃস্বলস্থ টোলের পণ্ডিতের দ্বারা কলেজের ছাত্রদিগের অধ্যাপনাকার্য উত্তমরূপে নির্বাহ হইবে না। অতএব কলেজেরই

পরীক্ষোত্তীর্ণ পূর্বতন ছাত্রদিগকে ঐ কর্ম দিলে, অধ্যাপনা-কার্য ভালরূপে সম্পন্ন হইবে।' তদনুসারে সেক্রেটারী মহাশয়, ঐ দুই কর্মে লোক নিযুক্ত করিবার জন্য, ব্যাকরণ-বিষয়ে নূতন পরীক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। মফঃস্বলের পণ্ডিত প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর প্রভৃতি এবং সংস্কৃত-কলেজের কয়েকজন প্রসিদ্ধ ছাত্র পরীক্ষা প্রদান করিলেন। পরীক্ষায় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রথম ও গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন দ্বিতীয় হইলেন। তদনুসারে বিদ্যাভূষণকে পঞ্চাশ টাকা ও বিদ্যারত্নকে ত্রিশ টাকা বেতনে, উক্ত দুই পদে নিযুক্ত করা হইল। গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন সংস্কৃত-কলেজে ফার্স্ট গ্রেডের সিনিয়র এস্‌কলার্শিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি অতি উপযুক্ত লোক ছিলেন। সাহিত্য ও অলঙ্কার-শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। তর্কবাচস্পতি মহাশয়, সংস্কৃত-ভাষায় অদ্বিতীয় লোক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সভায় বিচার করিবার ইঁহার বিশিষ্টরূপ ক্ষমতা ছিল। একারণ, বাচস্পতি মহাশয় বাঙ্গালাদেশে বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তর্কবাচস্পতি, বিদ্যাভূষণ ও বিদ্যারত্ন এই তিনজন উপযুক্ত লোক সংস্কৃত-কলেজে নিযুক্ত হইলেন। দাদা, সংস্কৃত-কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন; একারণ, কৌশল ও অনুরোধ কবিয়া, তিন জন উপযুক্ত লোককে কলেজে প্রবিষ্ট কবাইয়া দিয়া, পরম আহ্লাদিত হইয়াছিলেন। মার্শেল সাহেব, মাসিক নব্বই টাকা বেতনের উক্ত পদ অগ্রজকে দিবার মানস করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি তাহাতে স্বীকার না পাইয়া, বাচস্পতি মহাশয়ের দেশে গিয়া, তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া আনাইয়া, কর্মে প্রবিষ্ট করাইয়া দেন, ইহাতে বিষয়ী লোক মাত্রেই আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিলেন। একারণ, বাচস্পতি মহাশয়ের সহিত অগ্রজের অত্যন্ত সদ্ভাব ছিল।

১৮৪২ খৃস্টাব্দে রবার্ট কস্ট নামক একজন সম্ভ্রান্ত-বংশোদ্ভব সিবিলিয়ান, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে অধ্যয়ন করিতেন। অগ্রজ মহাশয় সেই সময়ে ঐ কলেজের প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার সহিত আলাপ হইলে, তিনি মধ্যে মধ্যে কলেজে আসিয়া, অগ্রজের সহিত নানা বিষয়ের আলোচনা করিতেন। তিনি বিলক্ষণ বুদ্ধিমান ও বিদ্বান ছিলেন। অগ্রজের সহিত আলাপ করিয়া, তিনি সাতিশয় সুখী হইতেন। একদিন তিনি আগ্রহ-সহকারে সবিশেষ অনুরোধ করিয়া অগ্রজকে বলিলেন, 'যদি তুমি, আমার বিষয়ে সংস্কৃত-ভাষায় কবিতা রচনা করিয়া দাও, তাহা হইলে আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইব।' তাঁহার অনুরোধের বশবর্তী হইয়া, ক্ষণকাল অপেক্ষা করিতে বলিয়া, নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বয় তাঁহার হস্তে প্রদান করিলেন। সাহেব, শ্লোক লইয়া প্রীতমনে প্রস্থান করিলেন। শ্লোকদ্বয় এই—

'শ্রীমান্ রবর্ট্‌কস্টোঽস্য বিদ্যালয়মুপাগতঃ।
সৌজন্যপূর্ণৈরালাপৈর্নিতরাং মামতোষয়ৎ॥ ১॥
স হি সদ্‌গুণসম্পন্নঃ সদাচাররতঃ সদা।
প্রসন্নবদনো নিত্যং জীবতু্বর্ষশতং সুখী॥ ২॥'

কস্ট সাহেব সন্তুষ্ট হইয়া, অগ্রজ মহাশয়কে দুই শত টাকা দিতে মানস করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাহা না লইয়া, সাহেবকে উপদেশ দেন যে, এই টাকা কলেজে জমা করিয়া দেন, সংস্কৃত-কলেজের যে ছাত্র সংস্কৃত-রচনায় ভাল পরীক্ষা দিবেন, তিনি পঞ্চাশ টাকা পারিতোষিক পাইবেন। এইরূপ ব্যবস্থা হইলে, বৎসর বৎসর পরীক্ষায় একজন করিয়া ছাত্র কবিতা-রচনার পুরস্কার পঞ্চাশ টাকা পাইবেন। সংস্কৃত-কলেজের ছাত্রেরা চারি বৎসর কস্ট সাহেবের পুরস্কার পাইয়াছিলেন, তৎকালে এই পুরস্কারকে কস্ট সাহেবের পুরস্কার বলিত। কস্ট সাহেব, অগ্রজকে নির্লোভ ও উদার-হৃদয় দেখিয়া, যার-পর-নাই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। কস্ট সাহেবের পুরস্কার-প্রাপ্তির পরীক্ষায়, অগ্রজ মহাশয় প্রথম বৎসর এই প্রশ্ন দেন যে, বিদ্যা, বুদ্ধি, সুশীলতা এই তিনের গুণবর্ণনা করিয়া এই গুণত্রয়ের মধ্যে কোন্‌টি প্রধান, তাহা সংস্কৃত-গদ্যে লিখ। তৎকালে ঐ পরীক্ষা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সমাধা হইত। সংস্কৃত-কলেজে সিনিয়র ছাত্রবর্গের মধ্যে নীলমাধব ভট্টাচার্য সর্বাপেক্ষা উত্তম রচনা করিয়াছিলেন, সুতরাং তিনিই ঐ কস্ট সাহেবের ৫০৲ টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হন। দ্বিতীয় বৎসরে সংস্কৃত পদ্য লিখিবার প্রশ্ন হয়, তাহাতে দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন ও শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন এই দুইজন সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হন। শ্রীশের ব্যাকরণ ভুল হইয়াছিল, কিন্তু দীনবন্ধুর ব্যাকরণ ভুল হয় নাই। দীনবন্ধু সহোদর, এজন্য লোকে যদি দুর্নাম করে, এই আশঙ্কায় শ্রীশকেই ঐ পারিতোষিক প্রদান করিতে বাধ্য হন।

এই সময়ে, রবার্ট কস্ট পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া পঞ্জাবপ্রদেশে নিযুক্ত হন, এবং অনেক দিন কর্ম করিয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করেন। প্রস্থানের পূর্বে একদিন অগ্রজের সহিত দেখা করিয়া, তিনি বলিলেন, 'আমি স্বদেশে যাইতেছি, আর ভারতবর্ষে আসিব না, তোমার সহিত আমার শেষ দেখা।' কিয়ৎক্ষণ কথোপকথনের পর তিনি বলিলেন, 'যদি পূর্বের মত তোমার কবিতা-রচনার অভ্যাস থাকে, তাহা হইলে কল্য আমার বিষয়ে কিছু শ্লোক রচনা করিয়া পাঠাইলে, পরম আহ্লাদিত হইব।' তদনুসারে অগ্রজ মহাশয় নিম্নলিখিত কয়েকটি কবিতা লিখিয়া, তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন।

'দোষৈর্বিনাকৃতঃ সর্বৈঃ সর্বৈরাসেবিতো গুণৈঃ।
কৃতী সর্বাসু বিদ্যাসু জীয়াৎ কস্টো মহামতিঃ॥ ১॥
দয়াদাক্ষিণ্যমাধুর্যগাম্ভীর্যপ্রমুখা গুণাঃ।
নয়বর্ত্মরতে নূনং রমন্তেঽস্মিন্ নিরন্তরম্॥ ২॥
সদা সদালাপরতের্নিত্যং সৎপথবর্তিনঃ।
সর্বলোকপ্রিয়স্যাস্য সম্পদস্তু সদা স্থিরা॥ ৩॥
অস্য প্রশান্তচিত্তস্য সর্বত্র সমদর্শিনঃ।
সর্বধর্মপ্রবীণস্য কীর্তিরায়ুশ্চ বর্ধতাম॥ ৪॥

বিদ্যাবিবেকবিনয়াদিগুণৈরুদারৈঃ-
নিঃশেষলোকপরিতোষকরশ্চিরায়।
দূরং নিরস্তখলদুর্বচনাবকাশঃ
শ্রীমান্ সদা বিজয়তাং মু রবর্ট কস্টঃ ॥ ৫ ॥'

পূর্বপ্রদর্শিতরূপে সংস্কৃত-রচনা-বিষয়ে সাহস ও উৎসাহ জন্মিলে, অগ্রজ মহাশয় সময়ে সময়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, কোন কোন বিষয়ে শ্লোক রচনা করিতেন। মেঘ-বিষয়ে যে শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নে প্রকাশ করা গেল।

'প্রায়ঃ সহায়যোগাৎ সম্পদমধিকর্তুমীশতে সর্বে।
জলদাঃ প্রাবৃড়পায়ে পরিহীয়ন্তে শ্রিয়া নিতরাম্॥ ১ ॥

কিং নিম্নগা জলদমণ্ডলবর্জিতেন
তোয়েন বৃদ্ধিমুপগন্তুমধীশতে তাম্।
ন স্যাদজস্রগলিতং যদি পান্থযূনাং
সাহায্যকায় কিল নির্মলমশ্রুবর্ষম্॥ ২ ॥

কান্তাভিসাররসলোলুপমানসানাম্
আতঙ্ককম্পিতদৃশামভিসারিকাণাম্।
যদ্বিঘ্নকৃদ্ দুরিতমর্জিতবানজস্রং
কেনাধুনা ঘন তরিষ্যসি তন্ন বিদ্মঃ॥ ৩ ॥

ক্ষীণং প্রিয়াবিরহকাতরমানসং মাং
নো নির্দয়ং ব্যথয় বারিদ নাত্মবেদিন্।
ক্ষীণো ভবিষ্যসি হি কালবশং গতঃ সন্
আস্তে তবাপি নিয়তস্তড়িতা বিয়োগঃ॥ ৪ ॥

সর্বত্র সন্নমৃতদস্তটিনীশরীর-
সংবর্ধকস্তমুর্ভূতাং শমিতোপতাপঃ।
যচ্চাতকেষু করুণাবিমুখোঽসি নিত্যং
নায়ং মতো জলদ কিং বত পক্ষপাতঃ॥ ৫ ॥'

বিদ্যাসাগর মহাশয়, জন মিয়র নামক এক সিবিলিয়ানের প্রস্তাব-অনুসারে পুরাণ, সূর্যসিদ্ধান্ত ও ইয়ুরোপীয় মতানুযায়ী ভূগোল ও খগোল বিষয়ক কতকগুলি শ্লোক রচনা করিয়া, এক শত টাকা পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই কবিতাগুলি মুদ্রিত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি বাল্যকালে সংস্কৃত গদ্য-পদ্যে দেশভ্রমণ, সন্তোষ, ক্রোধ প্রভৃতি নানাবিষয় রচনা করিয়াছিলেন। ঐ সকল কাগজ আমার নিকট ছিল। আমি যৎকালে বালক-বালিকা-বিদ্যালয় বসাইবার জন্য দেশে গিয়া তাঁহার আদেশানুসারে কার্য করি, তৎকালে ঐ সকল কাগজপত্র মধ্যমাগ্রজের নিকট রাখি, তিনি উহা যদুনাথ মুখোপাধ্যায় ভগিনীপতিকে দেন। যদুনাথ তৎকালে সংস্কৃত-কলেজে অধ্যয়ন করিতেন;

ঐ সকল লেখা দেখিয়া, তৎকালের সংস্কৃত-কলেজের অনেক ছাত্র সংস্কৃত-রচনা শিখিয়াছিলেন। দীনবন্ধু ও যদুনাথ কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন, তজ্জন্য উক্ত রচনার কাগজ সকল পাওয়া যায় নাই। যাহা উপস্থিত ছিল, তাহাই ১২৯৬ সালে ১লা অগ্রহায়ণ প্রকাশ করিয়াছেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কর্ম করিবার সময়ে সীটনকার, কস্ট, চ্যাপ্‌ম্যান, সিসিল বীডন, গ্রে, গ্রাণ্ড, হেলিডে, লর্ড ব্রাউন, ইডেন প্রভৃতি বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত সিবিলিয়ানের সহিত অগ্রজের বিশেষরূপে ঘনিষ্ঠতা ও আত্মীয়তা ছিল। সিবিলিয়ানগণ তাঁহাকে বিশেষ সম্মান করিতেন। কোন কোন সম্ভ্রান্ত সিবিলিয়ানকে পরীক্ষায় পাশ না হইলে, দেশে ফিরিয়া যাইতে হইত। একারণ, মার্শেল সাহেব দয়া করিয়া ঐ সকল সিবিলিয়ানদের পরীক্ষার কাগজে নম্বর বাড়াইয়া দিতে বলিতেন। অধ্যক্ষেরও কথা না শুনিয়া অগ্রজ ন্যায়ানুসারে কার্য করিতেন। উপরোধ করিলে ঘাড় বাঁকাইয়া বলিতেন, 'অন্যায় দেখিলে কার্য পরিত্যাগ করিব।' একারণ, সিবিলিয়ান ছাত্রগণ ও অধ্যক্ষ মার্শেল সাহেব, তাঁহাকে আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। ঐ বৎসর গবর্নমেণ্ট, সংস্কৃত-কলেজের দ্বিতীয় এস্‌কলার্শিপের পরীক্ষাগ্রহণের ভার, মার্শেল সাহেবের প্রতি অর্পণ করেন। অগ্রজ মহাশয়, উক্ত সাহেবের জুনিয়র ও সিনিয়র উভয় ডিপার্টমেণ্টের প্রশ্ন প্রস্তুত ও মুদ্রিত করিয়া দেন। পরীক্ষাস্থলে প্রশ্ন দেখিয়া, কলেজের শিক্ষক মহাশয়গণ অগ্রজের পাণ্ডিত্য ও কৌশলের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এই বৎসর মধ্যম সহোদর, সংস্কৃত-কলেজের পরীক্ষায় সিনিয়র ডিপার্টমেণ্টের সর্বপ্রধান হইলেন। মধ্যম দীনবন্ধু, অগ্রজ মহাশয়ের তুল্য বুদ্ধিমান ছিলেন। ইতঃপূর্বে বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম উল্লেখ হইয়াছে, তিনি অগ্রজ মহাশয়ের নিকট ছয় মাসের মধ্যে ব্যাকরণ শেষ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি 'রঘুবংশ', 'কুমারসম্ভব', 'মাঘ', 'ভারবি', 'মেঘদূত', 'শকুন্তলা', 'উত্তর-চরিত' প্রভৃতি সাহিত্য গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া 'অলঙ্কার', 'সাহিত্যদর্পণ', 'কাব্য-প্রকাশ' অধ্যয়ন করেন; তৎপরে প্রাচীন 'স্মৃতি', 'মনু', 'মিতাক্ষরা' অধ্যয়ন করিয়া, সংস্কৃত-কলেজের সিনিয়র ডিপার্টমেণ্টের ছাত্রগণের সহিত পরীক্ষা দিয়া, সেকেণ্ড গ্রেডের এস্‌কলার্শিপ প্রাপ্ত হন। তৎপরে রাজকৃষ্ণবাবু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, দুই বৎসর কুড়ি টাকা করিয়া ফার্স্ট গ্রেডের এস্‌কলার্শিপ প্রাপ্ত হন। আউট স্টুডেণ্ট অর্থাৎ বাহিরের কোন বিদ্যার্থী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, এস্‌কলার্শিপ পাইবারও নিয়ম ছিল; তদনুসারে রাজকৃষ্ণবাবু পরীক্ষা দিয়া বৃত্তি লাভ করেন। ইনি অতিশয় ধীশক্তি-সম্পন্ন ছিলেন এবং অনন্যকর্মা ও অনন্যমনা হইয়া নিরন্তর অধ্যয়ন করিতেন। সুতরাং রাজকৃষ্ণবাবু ছয় মাসে ব্যাকরণ ও দুই বৎসরে সাহিত্য, অলঙ্কার ও স্মৃতি অধ্যয়ন করিয়া, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সংবাদ-শ্রবণে সংস্কৃত-কলেজের শিক্ষকগণ ও অপরাপর সকলে বিস্ময়ান্বিত হন। ইহার কারণ এই যে, যিনি সাহিত্যের পণ্ডিত, তিনি স্মৃতি বা অলঙ্কার পড়াইতে অক্ষম; যিনি যে বিষয়ের পণ্ডিত, তিনি তাহাই শিক্ষা

দিতে পারিতেন, অপর বিষয়ে সম্পূর্ণ অসমর্থ ছিলেন। অগ্রজ, সকল বিষয়েই শিক্ষা দিতে দক্ষ ছিলেন। অনেকে রাজকৃষ্ণবাবুকে দেখিবার জন্য অগ্রজের বাসায় সমাগত হইতেন। তৎকালের কলেজের শিক্ষকগণ দাদার অলৌকিক-ক্ষমতাদর্শনে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। সংস্কৃত-কলেজের নিয়ম ছিল যে, তিন বৎসর ব্যাকরণ অধ্যয়ন এবং তৎপরে দুই বৎসর সাহিত্য শিক্ষা করিতে হইত। অনন্তর এক বৎসর অলঙ্কার-শ্রেণীতে শিক্ষা লাভ করিয়া ব্যুৎপত্তি জন্মিলে, ছাত্রগণ দর্শন বা স্মৃতির শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিত। পরে টেস্ট একজামিনে উত্তীর্ণ হইলে পর, সিনিয়র ডিপার্টমেণ্টে পরীক্ষা দিতে পাইত। এরূপ স্থলে, অগ্রজ আড়াই বৎসর শিক্ষা দিয়া, রাজকৃষ্ণবাবুকে সিনিয়রের পরীক্ষাপ্রদানে, চতুর্দিক হইতে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিল। কিরূপ প্রণালী অবলম্বনে শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহা পরিজ্ঞাত হইবার জন্য অনেকে অগ্রজ মহাশয়ের বাসায় সমুপস্থিত হইতেন।

কলিকাতা তালতলা-নিবাসী ডাক্তার বাবু দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অগ্রজ মহাশয়ের পরমবন্ধু ছিলেন। পূর্বে তিনি হেয়ার সাহেবের স্কুলের শিক্ষকের পদ পরিত্যাগপূর্বক, মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করেন। তিনি অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন ও চিকিৎসা-বিদ্যায় সম্পূর্ণরূপ পারদর্শী ছিলেন। অগ্রজ মহাশয় কিছুদিন তাঁহার নিকট ইংরাজী শিক্ষা করিয়াছিলেন। উক্ত কৃতবিদ্য চিকিৎসক কলিকাতায় স্থায়ী হইলে, আত্মীয়বর্গের ও অন্যান্য সাধারণ লোকের সবিশেষ উপকার হইবে, এই মানসে, তাঁহাকে কলিকাতায় স্থায়ী করিবার নিমিত্ত অগ্রজের ঐকান্তিক ইচ্ছা হইয়াছিল। ইত্যবসরে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে অশীতিমুদ্রা বেতনের একটি হেড রাইটারের পদ শূন্য হইলে, উক্ত ডাক্তার বাবুকে ঐ পদে নিযুক্ত করাইবার জন্য কলেজের অধ্যক্ষ মার্শেল সাহেবকে অনুরোধ করেন। সাহেব, তদীয় অনুরোধের বশবর্তী হইয়া, দুর্গাচরণবাবুকে ঐ পদে নিযুক্ত করিয়া দেন।

সংস্কৃত কলেজে আসিস্টাণ্ট সেক্রেটারি রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার মহাশয় পরলোক-যাত্রা করিলে পর, শিক্ষাসমাজের সেক্রেটারি ডাক্তার ময়েট সাহেব, ঐ পদে উপযুক্ত লোক অর্থাৎ ইংরাজী ও সংস্কৃতভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিত নিযুক্ত করিবার মানসে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যক্ষ মার্শেল সাহেবের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'একটি কার্যদক্ষ লোক নিযুক্ত না করিলে, সংস্কৃত-কলেজের বিশেষ উন্নতির আশা নাই। দেখুন, প্রাচীন রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ঐ পদে কয়েক বৎসর ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর অবধি রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার ঐ কার্য করিয়া আসিতেছিলেন। উল্লিখিত পণ্ডিতদ্বয় দ্বারা কলেজের কোন উন্নতি হইতে দেখি নাই। এক্ষণে আপনার পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে ঐ পদে নিযুক্ত করা সর্বতোভাবে কর্তব্য।' মার্শেল সাহেব, অগ্রজ মহাশয়কে সংস্কৃত-কলেজের ঐ পদে নিযুক্ত হইবার কথা ব্যক্ত করিলে পর, তিনি বলিলেন, 'ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রবিষ্ট হইবার পূর্বে, আমারও ঐ পদগ্রহণে আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। কিন্তু এক্ষণে

মহাশয়ের নিকট হইতে কার্য পরিত্যাগ করিয়া আমার যাইতে ইচ্ছা নাই।' ইহা শুনিয়া সাহেব, সংস্কৃত-কলেজে নিযুক্ত হইবার জন্য আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করাতে বলিলেন, 'মহাশয়! যদি আমার মধ্যম সহোদর দীনবন্ধু ন্যায়রত্নকে এই পদে নিযুক্ত করেন, তাহা হইলে সংস্কৃত-কলেজের ঐ পদে নিযুক্ত হইবার আমার কোন আপত্তি নাই। ইহার কারণ এই যে, তথায় যাইয়া আমি যেরূপ বন্দোবস্ত করিব, তাহাতে যদি সেক্রেটারি বাবু রসময় দত্ত মহাশয়ের সহিত মনান্তর ঘটে, কিম্বা আমার বন্দোবস্ত বা কথা রক্ষা না পায়, তাহা হইলে নিশ্চয় পদ পরিত্যাগ করিব। সহসা কার্য পরিত্যাগ করিলে, অর্থাভাবে আমার পরিবারবর্গের বিশেষ কষ্ট হইবে; কিন্তু এখানে আপনার নিকট দীনবন্ধুর কর্ম থাকিলে, অন্নকষ্ট হইবে না। আর আমার মধ্যম সহোদর দীনবন্ধু অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন। অল্পবয়সেই সংস্কৃত-কলেজে উচ্চ-শ্রেণীর পরীক্ষায় সর্বপ্রধান হইয়া, কয়েক বৎসর সর্বোৎকৃষ্ট এস্‌কলার্শিপ পাইয়াছে।' সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি আমাকে যেরূপ ব্যাকরণ, সাহিত্য ও নাটকাদি পড়াইয়া থাক, যদি দীনবন্ধু সেইরূপ পড়াইতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাকে এখানে তোমাব পদে নিযুক্ত করিতে আমার কোন আপত্তি নাই, ফলত আমাকে রীতিমত পড়াইতে পারিলেই আমি সম্মত আছি।' ইহা শ্রবণ করিয়া তিনি উত্তর করিলেন, 'ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার, বেদান্ত ও দর্শন-শাস্ত্র এবং লীলাবতী ও বীজগণিতে দীনবন্ধুর বিশিষ্টরূপ ব্যুৎপত্তি ও অধিকার আছে, অধিক আর কি বলিব, আমা অপেক্ষা দীনবন্ধু কোন বিষয়ে ন্যূন নহে, বরং অঙ্কশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন।' ইহা শুনিয়া মার্শেল সাহেব গবর্নমেণ্টে রিপোর্ট করিয়া, মধ্যম সহোদর মহাশয়কে অগ্রজ মহাশয়ের পদে নিযুক্ত করিলেন।

এই সময় তিনি দুগ্ধ ও তদ্দ্বারা যে সকল খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত হয়, তৎসমস্ত ভোজন করিতেন না। ইহার কারণ এই যে, গাভীদোহনসময়ে বৎসকে আবদ্ধ রাখায়, সেই বৎস স্তন্য-পানার্থে ছট্‌ফট করে; কিন্তু মনুষ্য এমন নৃশংস ও স্বার্থপর যে, তাহারা মাতৃদুগ্ধ তাহাকে পান করিতে দেয় না; এইরূপ গাভীর দোহন দেখিয়া তাঁহার অত্যন্ত মানসিক কষ্ট হইত; কখন কখন চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইত। প্রায় পাঁচ বৎসর কাল তিনি দুগ্ধ ও ঘৃতের দ্বারা প্রস্তুত মিষ্টান্নাদি ভোজন করিতেন না, এবং তৎকালে মৎস্যও পরিত্যাগ করিয়া নিরামিষ ভোজন করিতেন। কিছুকাল এই নিয়মে দিনপাত করেন, পরে জননীদেবীর অনুরোধের বশবর্তী হইয়া, মৎস্য খাইতে বাধ্য হইলেন; কিন্তু তদবধি দুগ্ধ অসহ্য হইল, অর্থাৎ দুগ্ধ পান করিলে ভেদ ও বমি হইত।

১৮৪৬ খৃঃ অব্দের এপ্রিল মাসে অগ্রজ মহাশয় মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনে সংস্কৃত-কলেজের আসিস্টাণ্ট সেক্রেটারির পদে নিযুক্ত হইলেন। অনন্তর তিনি ব্যাকরণের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর অধ্যয়নের নূতন প্রণালী প্রচলিত করিলেন। তদনুসারে অধ্যাপকগণ ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হন। বিদ্যালয়ের

কোন কোন শিক্ষক চেয়ারে উপবিষ্ট হইয়া নিদ্রা যাইতেন; ছাত্রগণের মধ্যে কেহ পাখা লইয়া অধ্যাপককে বাতাস করিত। তিনি এই কুপ্রথা উঠাইয়া দিলেন। সাড়ে দশটার মধ্যেই অধ্যাপক ও ছাত্রগণকে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইতে হইবে, এইরূপ নিয়ম করিয়া দিলেন। অতঃপব সেক্রেটারির বিনা অনুমতিতে কি শিক্ষক কি ছাত্র কেহই ইচ্ছামত বিদ্যালয় হইতে বাটী যাইতে পারিবেন না। ছাত্রগণ ইচ্ছানুসারে একবারেই সকলে ক্লাস হইতে বাহিরে মালীর গৃহে যাইতে পারিবে না; এক এক জন করিয়া যাইবে, কিন্তু তাহাও কাষ্ঠের পাশ গ্রহণ করিয়া যাইতে হইবে। অধ্যাপক ও বিদ্যার্থীগণ আবেদন ব্যতিরেকে অনুপস্থিত হইতে পারিবেন না। সাহিত্য-শ্রেণীতে যে সকল পুস্তক অধ্যয়ন করান হইত, তন্মধ্য হইতে অশ্লীল কবিতা-সমূহ রহিত করিয়া, অধ্যাপককে অধ্যয়ন করাইতে হইত। কলেজ, জুনিয়র ও সিনিয়র এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইল। তন্মধ্যে সাহিত্য ও অলঙ্কারের শ্রেণী জুনিয়র, এবং দর্শন, বেদান্ত ও স্মৃতির শ্রেণী সিনিয়র। জুনিয়রের পরীক্ষায় ছাত্রবর্গকে পাঁচ দিন পাঁচ বিষয়ের পরীক্ষা দিতে হইত। ব্যাকরণের প্রশ্ন হইত, কিন্তু ছাত্রগণ নীরস বলিয়া প্রায় ব্যাকরণ দেখিতে আলস্য করিত, সুতরাং ব্যাকরণে অনেক ছাত্র ফেল হইত। একারণ, অগ্রজ মহাশয় মাসে মাসে ব্যাকরণের পরীক্ষা ও শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ব্যাকরণের প্রথম শ্রেণীর অধ্যাপক তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়, যথানিয়মে উক্ত জুনিয়র ডিপার্টমেণ্টের ছাত্রগণকে উপদেশ দিতেন। সাহিত্য ও অলঙ্কারের অধ্যাপক, নিয়মানুসারে বাঙ্গালা-ভাষা হইতে সংস্কৃত অনুবাদ, সংস্কৃত-ভাষা হইতে বাঙ্গালা অনুবাদ ও শ্লোকের টীকা করাইতেন। তৎকালে নিয়ম ছিল, অলঙ্কারের শ্রেণী হইতে ছাত্রগণ লীলাবতী ও বীজগণিতের অঙ্ক শিক্ষা করিত; কিন্তু সাহিত্য শ্রেণীর ছাত্রগণের মধ্যে কেহ অঙ্ক শিক্ষা করিবার জন্য জ্যোতিষের শ্রেণীতে যাইত না, এতদ্বিষয়েও কর্তৃপক্ষের কোন বন্দোবস্ত ছিল না; সুতরাং সাহিত্য-শ্রেণীর ছাত্রগণ অঙ্কে প্রায় ফেল হইত। এজন্য অগ্রজ মহাশয়, যোগধ্যান শাস্ত্রীর শ্রেণীতে সাহিত্য-শ্রেণীর ছাত্রগণের অঙ্ক শিক্ষা করিবার জন্য নূতন ব্যবস্থা করিয়া দেন। ঐরূপে দর্শন ও স্মৃতির ছাত্রগণের, অলঙ্কার-শ্রেণীতে গিয়া নিয়মানুসারে অলঙ্কারগ্রন্থ শিখিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন। অলঙ্কারের অধ্যাপক প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয়, ছাত্রবর্গকে রীতিমত সংস্কৃত গদ্য-পদ্য-রচনা ও বাঙ্গালা রচনা শিক্ষা দিতেন। দর্শন ও স্মৃতির শিক্ষক মহাশয়, প্রশ্নের উত্তর লিখিবার অনুশীলনে বিশিষ্টরূপ যত্নবান হইতেন। এরূপ নিয়ম করিয়া দেওয়ায়, ছাত্রগণের লিখিবার অধিকার জন্মিল। অগ্রজের এই অভিনব বন্দোবস্তে, শিক্ষক ও বিদ্যার্থীগণ পরম সন্তোষলাভ করিয়াছিলেন।

অগ্রজ মহাশয়, একসময় সংস্কৃত-কলেজের বিশেষ কার্যোপলক্ষে হিন্দু-কলেজের প্রিন্সিপাল কার সাহেবের নিকট গমন করিয়াছিলেন। সাহেব, টেবিলের উপর চর্মপাদুকাসহিত চরণদ্বয় উত্তোলন করিয়া, অগ্রজের সহিত কথোপকথন করেন।

তাঁহার সেই অসৌজন্যে, অগ্রজ মনে মনে অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। কিছুদিন পরে ঐ কার সাহেব, হিন্দু-কলেজের কোন কার্যানুরোধে, সংস্কৃত-কলেজে অগ্রজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসেন। কার সাহেব, ইতিপূর্বে যেরূপ শিষ্টাচার দেখাইয়া আপ্যায়িত করিয়াছিলেন, অদ্যাপি তিনি তাহা বিস্মৃত হন নাই। সাহেব দেখা করিতে আসিতেছেন শুনিয়া, অগ্রজ, চটি-চর্মপাদুকাসহিত চরণযুগল টেবিলের উপর রাখিয়া, সাহেবকে বসিবার জন্য কোনরূপ সম্ভাষণ বা অভ্যর্থনা করিলেন না। সাহেব দণ্ডায়মান হইয়া, তাঁহার সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণপরে সাহেব লজ্জিত ও অবমানিত হইয়া প্রস্থান করিলেন। তৎপরে শিক্ষাসমাজের সেক্রেটারি ময়েট সাহেবের নিকট রিপোর্ট করেন যে, হিন্দু-কলেজের কোন কার্যানুরোধে, সংস্কৃত কলেজের আসিস্টাণ্ট সেক্রেটারির সমীপে গিয়াছিলাম। তিনি আমার প্রতি যেরূপ অভদ্রতা করিয়াছেন, তাহাতে আমার বিশেষরূপ অপমান হইয়াছে। অন্য কোন ইউরোপীয়ান হইলে, এরূপ অপমান সহ্য করিতেন না। শিক্ষাসমাজ, অগ্রজ মহাশয়ের কৈফিয়ৎ তলব করেন। তিনিও তাহার উত্তর লেখেন যে, ইতিপূর্বে ঐ সাহেব আমার প্রতি ঐরূপ অসৌজন্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ আমাকে বসিতে না বলিয়া, টেবিলের উপর চর্মপাদুকা সহিত চরণদ্বয় অর্পণ করিয়া, আমার সহিত কথাবার্তা কহিয়াছিলেন। তাহাতে শিক্ষা-সমাজের সেক্রেটারি পরম সন্তোষ লাভ করিয়া, হাস্যপূর্ণ-বদনে কহিলেন, বাঙ্গালার মধ্যে পণ্ডিত বিদ্যাসাগরের মত তেজস্বী লোক আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই, এই কারণেই আমরা, সকল বাঙ্গালী অপেক্ষা পণ্ডিতকে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিয়া থাকি। বাঙ্গালায় বিদ্যাসাগরের সদৃশ আর দ্বিতীয় লোক নাই। ময়েট সাহেব যতদিন শিক্ষা সমাজের অধ্যক্ষ ছিলেন, ততদিন বিদ্যাসাগরের সহিত পরামর্শ না করিয়া কোন কার্য করিতেন না।

ইং ১৮৪৬ সালে, পূজ্যপাদ জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয় মানবলীলা সংবরণ করিলে, সংস্কৃত-কলেজের সাহিত্য-শাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ শূন্য হয়। সংস্কৃত-কলেজের সেক্রেটারি বাবু রসময় দত্ত মহাশয়, অগ্রজ মহাশয়কে ঐ পদে নিযুক্ত করিবেন, স্থির করিয়াছিলেন। এই সময়ে অগ্রজ, সংস্কৃত-কলেজে আসিস্টাণ্ট সেক্রেটারির পদে নিযুক্ত ছিলেন। কোনও বিশেষ কারণবশত তিনি অধ্যাপকের পদগ্রহণে অসম্মত হইয়া, মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে নিযুক্ত করিবার নিমিত্ত সবিশেষ অনুরোধ করেন। তৎকালে মদনমোহন তর্কালঙ্কার মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনে কৃষ্ণনগর কলেজে প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত ছিলেন। অগ্রজের যত্নে মদনমোহন তর্কালঙ্কার উক্ত পদে নিযুক্ত হন। জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই, সর্বানন্দ ন্যায়বাগীশ সাহিত্য-শ্রেণীর প্রতিনিধিরূপে কার্য করিতেছিলেন। ন্যায়বাগীশ মহাশয়, পূর্বের ন্যায় প্রত্যহ বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইয়া চেয়ারে বসিয়া নিদ্রা যাইতেন, অনবরত নস্য লইতেন, তথাপি নিদ্রা উঁহাকে পরিত্যাগ করিত না।

এই কারণে ছাত্রেরা এই কবিতাটি পাঠ করিতেন—'সর্বানন্দন্যায়বাগীশো ভায়া নিত্যং নিদ্রাং যাতি কলেজমধ্যে। ধীরো নাম্না ধ্যাপনা নাস্তি তস্য চত্বারিংশন্মুদ্রিকাণাং গতেঽপি।' তিনি ছাত্রগণকে পড়াইবার সময় কেবল মল্লিনাথের টীকাগুলি আবৃত্তি করিয়া দিতেন। কবিতার ভাব, অর্থ, কি অন্বয় বলিয়া দিতেন না, তজ্জন্য ছাত্রগণের মনস্তুষ্টি হইত না। তিনি শিক্ষক থাকিলে, আগামী বর্ষে বাৎসরিক পরীক্ষায় কৃতকার্য হইবার আশা নাই, এই বিবেচনায় সাহিত্য-শ্রেণীর ছাত্রগণ আসিস্টাণ্ট সেক্রেটারিকে সমস্ত বিবরণ অবগত করাইয়াছিল এবং শিক্ষা-সমাজের অধ্যক্ষ ময়েট সাহেবের নিকট এই আবেদন করিয়াছিল যে, ত্বরায় উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত না হইলে, আমাদের পাঠের অনেক ক্ষতি হইতেছে। তৎকালে অনেকের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল যে, সর্বানন্দ বহুকাল হইতে কলেজের সকল শ্রেণীতে প্রতিনিধির কার্য করিয়া থাকেন, অতএব উপস্থিত সাহিত্য-শ্রেণীর কার্যটি ইহারই হওয়া উচিত। সেই সময়ে অনেকে বলিষাছিলেন, 'বিদ্যাসাগর মহাশয়, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে তাড়াইয়া আপনার বন্ধু মদনকে আনাইবার জন্য ছাত্রগণকে খেপাইয়াছে।' অনন্তর, বিদ্যাসাগরের কৌশলে মদনমোহন তর্কালঙ্কার ঐ পদে নিযুক্ত হইবার আদেশ পাইয়াছে শুনিয়া, ন্যায়বাগীশ মহাশয় প্রস্থান করেন। কৃষ্ণনগরের কার্য ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিতে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের বিলম্ব হওয়ায়, অগ্রজ মহাশয় কয়েকদিন সাহিত্য-শ্রেণীতে কিরাতার্জুনীয় অর্থাৎ 'ভারবি' পড়াইতে প্রবৃত্ত হইলেন। ছাত্রগণ তাঁহার অধ্যাপনায় পাণ্ডিত্য-দর্শনে পরমাহ্লাদিত হইয়াছিল। তদন্তর মদনমোহন তর্কালঙ্কার কলিকাতায় আগমনপূর্বক কয়েকদিবস বিদ্যাসাগরের বাসায় অবস্থিতি করিয়া, তাঁহার নিকট 'ভারবি'র যে যে অংশ ছাত্রগণকে পড়াইতে হইবে, সেই সেই স্থলের সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া লইতেন। ক্রমশ অধ্যাপনাকার্য করিয়া, তর্কালঙ্কার সাহিত্য-শাস্ত্রে অসাধারণ লোক হইয়া উঠিলেন। মদনমোহন তর্কালঙ্কার, অগ্রজের বাল্যবন্ধু ও সহাধ্যায়ী ছিলেন। এই কারণেই যে উঁহাকে ঐ পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এরূপ নহে, সহাধ্যায়নকালে উক্ত মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে কাব্যশাস্ত্রে বিশেষরূপ ব্যুৎপন্ন জানিতেন বলিয়াই, উঁহাকে ঐ পদে নিযুক্ত করিবার জন্য প্রয়াস পাইয়াছিলেন। অগ্রজের আন্তরিক আগ্রহাতিশয় না থাকিলে, ঐরূপ উপযুক্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় উক্ত পদে নিযুক্ত হইতেন না।

তৎকালে ভাল বাঙ্গালা পুস্তক ছিল না। 'জ্ঞানপ্রদীপ', 'প্রবোধচন্দ্রোদয়', 'পুরুষ-পুস্তক পরীক্ষা' ও 'হিতোপদেশ'-এর বাঙ্গালা প্রভৃতি যে তিন চারি খানি মাত্র বাঙ্গালা ছিল, তৎপাঠে কোনও ফলোদয় হইত না। সিবিলিয়ানদের অধ্যয়নের অত্যন্ত গোলযোগ হইত। একারণ, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যক্ষ মার্শেল সাহেব মহোদয়, অগ্রজ মহাশয়কে একদিন বলেন যে, 'ঈশ্বরচন্দ্র। তুমি কতকগুলি ভাল বাঙ্গালা পুস্তক ভাষান্তর হইতে অনুবাদ বা নূতন রচনা করিয়া মুদ্রিত ও প্রকাশিত কর, নচেৎ এখানকার ছাত্রগণের বাঙ্গালা-শিক্ষার অত্যন্ত অসুবিধা দেখিতেছি।'

সাহেবের অনুরোধ শ্রবণে অগ্রজ বলিলেন, 'মহাশয়! আমি কি লিখিব, আদেশ করুন।' সাহেব বলিলেন, 'তুমি ত হিন্দী 'বেতালপঞ্চবিংশতি' রীতিমত অধ্যয়ন করিয়াছ। ঐ পুস্তক অবলম্বন করিয়া, হিন্দীভাষা হইতে বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় অনুবাদ কর। আর সিরাজউদ্দৌলার সিংহাসনাধিরোহণ হইতে, ইংরাজদের বাঙ্গালা অধিকার পর্যন্ত মার্শমান সাহেবের রচিত ইংরাজী পুস্তক অবলম্বন করিয়া সরল বাঙ্গালা-ভাষায় অনুবাদ কর। 'বেতালপঞ্চবিংশতি'-র বাঙ্গালা ছাপাইতে যেমন অধিক ব্যয় হইবে, তেমন গবর্নমেণ্ট এখানকার লাইব্রেরীর জন্য একশত পুস্তক তিন শত টাকা মূল্যে গ্রহণ করিবেন। তাহাতে তোমার ছাপানর ব্যয় নির্বাহ হইবে। অবশিষ্ট পুস্তক বিক্রয় করিয়া তুমি যথেষ্ট লাভ করিতে পারিবে। প্রথমত মার্শেল সাহেবের উত্তেজনায় উৎসাহান্বিত হইয়া, তিনি হিন্দী বেতালের অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অল্পদিনের মধ্যে লেখা শেষ হইলে, ঐ পুস্তক লালবাজারস্থ রোজারীয় কোম্পানীর মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছিল।

তিনি আসিস্টাণ্ট সেক্রেটারির পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, সংস্কৃত-কলেজের বন্দোবস্ত করায়, কলেজের সেক্রেটারি বাবু রসময় দত্ত মহাশয় ও এডুকেশন কৌন্সেলের সেক্রেটারি ডাক্তার ময়েট সাহেব, পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বন্দোবস্ত অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এই বৎসরের এস্‌কলার্শিপ পরীক্ষার ফল অনেক অংশে উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। ঐ বৎসর ফাল্গুনমাসে পারিতোষিক-বিতরণ-কার্য সমাধার পর, অগ্রজ ছোট ছোট ভাইগুলিকে কলিকাতায় রাখিয়া বাটী গমন করেন; ইহার কয়েক দিন পরে, দ্বাদশবর্ষীয় হরচন্দ্র নামক চতুর্থ সহোদর, বিসূচিকারোগে আক্রান্ত হইয়া, অকালে কালগ্রাসে নিপতিত হয়। অনুগত, অসাধারণ বুদ্ধিশক্তি-সম্পন্ন ভ্রাতার মৃত্যুসংবাদে অগ্রজ মহাশয় অত্যন্ত শোকাতুর হইয়াছিলেন। লেখাপড়ার চর্চা একেবারে পরিত্যাগ করিয়া, দিবারাত্র কয়েকমাস রোদনেই সময়াতিপাত করিতেন। পাঁচ ছয় মাস রীতিমত আহার না করায়, অতিশয় দুর্বল হইয়াছিলেন। ভ্রাতৃবর্গের মধ্যে হরচন্দ্র অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিল। তাহার উপর জ্যেষ্ঠের এরূপ আশা ছিল যে, (নিজে পরিবার প্রতিপালনের জন্য চাকরি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, ইচ্ছামত ভালরূপ লেখাপড়া শিখিতে পারিলাম না; যাহা জানি, তাহাতে দেশের কোন উপকার হইবে না।) হরচন্দ্রকে মনের মত লেখাপড়া শিখাইব, তাহার দ্বারা দেশস্থ লোকের উপকার হইবে। জননীদেবী, পুত্রশোকে আহার-নিদ্রা-পরিত্যাগ-পূর্বক নিরন্তর রোদন করিয়া থাকেন, একারণ, তাঁহার সান্ত্বনার জন্য অন্যান্য ভ্রাতৃবর্গকে কলিকাতা হইতে দেশে পাঠাইয়া দেন। মধ্যম সহোদর দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান পণ্ডিতের কার্যে ছয় মাস প্রতিনিধি রাখিয়া, অন্যান্য ভ্রাতৃবর্গসমভিব্যাহারে দেশে অবস্থিতি করেন। কিয়দ্দিবস পরে জননীদেবীর শোকের কিছু লাঘব হইলে পর, অগ্রজ মহাশয় আমাদিগকে পুনর্বার কলিকাতা যাইবার আদেশ করেন।

ঐ সময় অগ্রজ মহাশয়, সংস্কৃত-কলেজের কোন বন্দোবস্ত উপলক্ষে কথা রক্ষা না হওয়ায়, হঠাৎ কর্ম ত্যাগ করেন। রিজাইনপত্র প্রাপ্ত হইয়া কলেজেব অধ্যক্ষ বাবু রসময় দত্ত ও শিক্ষাসমাজের সেক্রেটাবি ডাক্তার ময়েট সাহেব, অগ্রজকে অনেক প্রকার উপদেশ প্রদান কবিয়া, কর্ম পবিত্যাগ করিতে নিবারণ করেন, এবং অন্যান্য আত্মীয় বন্ধুবান্ধবও বিশিষ্টরূপ হিতগর্ভ উপদেশ দেন, কিন্তু কাহারও কথা শ্রবণ করেন নাই। একারণ, অনেক আত্মীয় তৎকালে বলেন, 'বিদ্যাসাগব! অতঃপর তুমি কি করিয়া দিনপাত করিবে?' তাহা শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে উত্তর করিলেন, 'আলু পটল বিক্রয় বা মুদীর দোকান করিয়া জীবিকা-নির্বাহ করিব।' এরূপ সম্মানের কার্য অক্লেশে পরিত্যাগ করায়, অনেকে আশ্চর্যান্বিত হইলেন। কেহ কেহ বলিলেন যে, বিদ্যাসাগরেব মতিভ্রম হইয়াছে, নচেৎ একপ সম্মানের পদ পরিত্যাগ করেন কেন? কিন্তু কর্ম ত্যাগ করিয়া অগ্রজের কিছুমাত্র মানসিক কষ্ট হইল না। তৎকালে বাসায় নিরুপায আত্মীয় ও স্বসম্পর্কীয় প্রায় কুড়িটি বালককে অন্নবস্ত্র দিয়া বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করাইতেছিলেন। তন্মধ্যে কাহাকেও বাসা হইতে যাইবার কথা এক দিনের জন্যও বলেন নাই। বাল্যকাল হইতে অগ্রজ মহাশয় পরম দয়ালু ছিলেন। কিসে পরের উপকার হইবে, সতত এই চিন্তাতেই মগ্ন থাকিতেন। ভালরূপ ইংরাজী-ভাষা শিক্ষার জন্য, প্রত্যহ প্রাতে বহুবাজারের পঞ্চাননতলার বাসা হইতে, সভাবাজারস্থ রাজা রাধাকান্ত দেবের বাটীতে রাজার জামাতা বাবু অমৃতলাল মিত্র ও অপর জামাতা বাবু শ্রীনাথচন্দ্র বসুর নিকট যাইতেন এবং আগ্রহাতিশয় সহকারে ইংরাজী ভাসার অনুশীলনে প্রবৃত্ত ছিলেন। মধ্যম সহোদর, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান পদে নিযুক্ত থাকিয়া মাসিক যে পঞ্চাশ টাকা বেতন পাইতেন, তদ্দ্বাবা কলিকাতার বাসাখরচ অতিকষ্টে নির্বাহ হইতে লাগিল। অগ্রজ মহাশয়, দেশস্থ বাটীব মাসিক ব্যয়-নির্বাহের জন্য মাসে মাসে পঞ্চাশ টাকা ঋণ করিয়া প্রেরণ করিতে লাগিলেন।

১৯০৩ সংবতে [১৮৪৭ খৃঃ], হিন্দী 'বেতালপঞ্চবিংশতি'র বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশিত করিলেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কর্মাধ্যক্ষ, সিবিলিয়ানদের পাঠের উদ্দেশে, একশত 'বেতালপঞ্চবিংশতি' তথাকার লাইব্রেরীতে রাখিলেন; গবর্নমেণ্ট উহার মূল্য তিনশত টাকা প্রদান করিলেন। এতদ্দ্বারা ছাপানর ব্যয় নির্বাহ হইল। অবশিষ্ট চারিশত পুস্তকের মধ্যে প্রায় দুই শত পুস্তক আত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধবকে বিনামূল্যে বিতরণ করিলেন। 'বেতালপঞ্চবিংশতি' মুদ্রিত হইবার পূর্বে, অপর আর কেহ কখনও এরূপ উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা-ভাষায় পুস্তক লিখিতে পারেন নাই। এজন্য দেশবিদেশে অগ্রজ মহাশয়ের প্রশংসা হইতে লাগিল। এক 'বেতালপঞ্চ-বিংশতি' লিখিয়া, বাঙ্গালাদেশের মধ্যে তাঁহার অদ্বিতীয় নাম প্রকাশিত হইল। 'বেতালপঞ্চবিংশতি' পুস্তকে অতি সুমধুর পদবিন্যাস হইয়াছিল। তৎকালে 'বেতাল-পঞ্চবিংশতি'র বাঙ্গালা পাঠ করিবার জন্য, সকল সম্প্রদায়ের লোকের আন্তরিক

ইচ্ছা হইয়াছিল। এই পুস্তকের বাঙ্গালা পাঠ করিয়া, তৎকালীন সংস্কৃত-কলেজের ও অন্যান্য বিদ্যালয়ের বালকবৃন্দ বাঙ্গালা লিখিতে শিক্ষা করিতেন। অগ্রজ মহাশয়, বাঙ্গালা-ভাষা শিক্ষার আদি-পথপ্রদর্শক, ইহা সকলকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। তিনিই প্রচলিত বাঙ্গালা-ভাষা লিখিবার ও শিক্ষা করিবার আদি-গুরুস্বরূপ। ঐ সময়ে কি সংস্কৃত, কি ইংরাজী, সকল বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ, অনেকেই 'বেতালপঞ্চবিংশতি' পুনঃ পুনঃ অধ্যয়ন করিয়া কণ্ঠস্থ করিয়াছিল ; ইহার কারণ এই যে, বাঙ্গালা রচনা বা অনুবাদ করিবার সময় 'বেতালপঞ্চবিংশতি' র কোন কোন স্থলের অবিকল পঙ্‌ক্তি লিখিয়া দিত।

ইহার কিয়দ্দিবস পরে, সিরাজউদ্দৌলার সিংহাসনাধিরোহণ হইতে ইংরাজদের অধিকার পর্যন্ত, মার্শমান সাহেবের 'হিস্টিরি অব বেঙ্গল' অর্থাৎ 'বাঙ্গালার ইতিহাস', প্রাঞ্জল দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়া মুদ্রিত করেন। তৎকালে 'বাঙ্গালার ইতিহাস' সকলেই সমাদরপূর্বক গ্রহণ করিয়াছিল। স্বল্পদিনের মধ্যেই সমুদয় পুস্তক নিঃশেষ হইয়া যায়। ইহার কয়েক মাস পরে অর্থাৎ সন ১২৫৬ সালের ২৬শে ভাদ্র 'জীবন-চরিত' নামক পুস্তক মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলেন। রবর্ট উইলিয়ম চেম্বর্স, বহুসংখ্যক সুপ্রসিদ্ধ মহানুভবদিগের বৃত্তান্ত সঙ্কলন করিয়া, ইংরাজী-ভাষায় যে জীবনচরিত পুস্তক প্রচার করিয়াছেন, তন্মধ্য হইতে কেবল কোপর্নিকস, গ্যালিলিয়, নিউটন, হর্শেল প্রভৃতি কয়েকটি মহানুভবের চরিত, ইংরাজী ভাষা হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিয়া, এই পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইতিপূর্বে এতদ্দেশীয় কেহ কখনও এরূপ জীবনচরিত সঙ্কলন বা অনুবাদ করেন নাই। বিশেষত এতদ্দেশে এরূপ জীবনচরিত লিখিবার প্রথা পূর্বে প্রচলিত ছিল না। ইউরোপীয়দের ন্যায় জীবন-চরিত লিখিবার প্রথা প্রচলিত থাকিলে, এতদ্দেশেরও অনেক মহানুভবের নাম প্রকাশ হইত। দুর্ভাগ্যপ্রযুক্ত এরূপ প্রথা না থাকাতে, ভারতবর্ষের পূর্বতন অসংখ্য মহানুভব মহামহোপাধ্যায়ের নাম কালসহকারে বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। বাঙ্গালা-দেশের বিদ্যার্থী বালকবৃন্দের বিশিষ্টরূপ উপকার দর্শিতে পারে, এই আশায়, অগ্রজ মহাশয় ঐ পুস্তকের অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। 'সামান্য কৃষকের পুত্র নিউটন, নিজের যত্ন ও পরিশ্রমে লেখাপড়া শিক্ষা করিয়া জগদ্বিখ্যাত হইয়াছিলেন। নিউটন অদ্বিতীয় বুদ্ধিমান ও বিদ্বান হইয়াও স্বভাবত বিনীত ছিলেন ; তিনি আপন বিদ্যার কিঞ্চিন্মাত্র অভিমান করিতেন না। নিউটনের এই এক সুপ্রসিদ্ধ কথা ধরাতলে জাগরূক রহিয়াছে, 'আমি বালকের ন্যায় বেলাভূমি হইতে উপলখণ্ড সঙ্কলন করিতেছি, কিন্তু জ্ঞানমহার্ণব পুরোভাগে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে' ইত্যাদি রূপ বিদ্যাশিক্ষার উত্তেজক জীবনচরিত পাঠে, এতদ্দেশীয় লোক নানাপ্রকার উপদেশ প্রাপ্ত হইবে, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তদ্দেশের তৎকালীন রীতি, নীতি, ইতিহাস, আচার, ব্যবহার পরিজ্ঞাত হইবে। 'জীবনচরিত' পুস্তক মুদ্রিত করিবার স্বল্পদিনের মধ্যেই লোকের আগ্রহাতিশয়ে, সমস্ত পুস্তক নিঃশেষিত হইল। তৎকালীন বিদ্যার্থীমাত্রেই এই

পুস্তক সমাদরপূর্বক পাঠ করিতেন। অগ্রজ মহাশয়ের সুন্দর অনুবাদ ও ললিত রচনা-প্রণালী দর্শনে, সকলে অপরিসীম আনন্দলাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি সাধারণের নিকট অদ্বিতীয় লেখক বলিয়া প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন। ইতিপূর্বে সাধুভাষায় ইংরাজী পুস্তকের এরূপ অনুবাদ করিতে কেহ সক্ষম হন নাই।

কাপ্তেন ব্যাঙ্ক সাহেব, সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও হিন্দী শিক্ষার মানসে, শিক্ষাসমাজের অধ্যক্ষ ডাক্তার ময়েট সাহেবকে এই অনুরোধ করেন যে, ইংরাজী ও সংস্কৃত-ভাষায় বিলক্ষণ অভিজ্ঞ একটি পণ্ডিত নির্বাচন করিয়া দেন। সংস্কৃত-কলেজের সেক্রেটারির কার্য পরিত্যাগ করিয়া নিরর্থক বসিয়া আছেন মনে করিয়া, ময়েট সাহেব, কাপ্তেন ব্যাঙ্ককে শিক্ষা দিবার জন্য অগ্রজ মহাশয়কে অনুরোধ করেন। অগ্রজ মহাশয়, ময়েট সাহেবের অনুরোধপরতন্ত্র হইয়া, ব্যাঙ্ক সাহেবকে কয়েক মাস প্রত্যহ শিক্ষা দিতে যাইতেন। সাহেব, স্বল্পদিনের মধ্যেই বাঙ্গালা ও হিন্দী ভাষা ভালরূপ শিক্ষা করিলেন। কয়েক মাস পরে, ব্যাঙ্ক সাহেব মাসিক পঞ্চাশ টাকার হিসাবে একেবারে কয়েক মাসের টাকা তাঁহাকে প্রদান করিতে উদ্যত হইলে, তিনি ঐ টাকা গ্রহণ করেন নাই। সাহেব, টাকা না লইবার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, অগ্রজ বলেন, 'আপনি বলিয়াছিলেন যে, আপনি ময়েট সাহেবের পরম আত্মীয়, আমিও তাঁহার আত্মীয়, এমত স্থলে আমি কি প্রকারে আপনার নিকট বেতন লইতে পারি?' চাকরি না থাকায় ক্রমশ ঋণগ্রস্ত হইতেছিলেন, তথাপি সাহেবের নির্বন্ধাতিশয়েও, শ্রমলব্ধ টাকা গ্রহণ করিলেন না। অন্য লোক এরূপ অবস্থায় কদাচ উপস্থিত প্রচুর টাকা পরিত্যাগ করিতে পারিতেন না। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার অর্থের প্রতি দৃষ্টি কম ছিল।

এই সময়ে অগ্রজ, মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সহিত পরামর্শ করিয়া, সংস্কৃত-যন্ত্র নাম দিয়া একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন। ছয়শত টাকায় একটি প্রেস ক্রয় করিতে হইবে; টাকা না থাকাতে তাঁহার পরমবন্ধু বাবু নীলমাধব মুখোপাধ্যায়ের নিকট ঐ টাকা ঋণ করিয়া, তর্কালঙ্কারের হস্তে দিলে, তর্কালঙ্কার প্রেস ক্রয় করেন। ঐ টাকা ত্বরায় নীলমাধব মুখোপাধ্যায়কে প্রত্যর্পণ করিবার কথা ছিল। এক দিবস কথাপ্রসঙ্গে অগ্রজ, মার্শেল সাহেবকে বলেন যে, 'আমরা একটি ছাপা-খানা করিয়াছি, যদি কিছু ছাপাইবার আবশ্যক হয়, বলিবেন।' ইহা শুনিয়া সাহেব বলিলেন, 'বিদ্যার্থী সিবিলিয়ানগণকে যে ভারতচন্দ্রকৃত 'অন্নদামঙ্গল' পড়াইতে হয় তাহা অত্যন্ত জঘন্য কাগজে ও জঘন্য অক্ষরে মুদ্রিত; বিশেষত অনেক বর্ণাশুদ্ধি আছে। অতএব যদি কৃষ্ণনগরের রাজবাটী হইতে আদি 'অন্নদামঙ্গল' পুস্তক আনাইয়া শুদ্ধ করিয়া ত্বরায় ছাপাইতে পার, তাহা হইলে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্য আমি একশত পুস্তক লইব এবং ঐ এক শতের মূল্য ছয়শত টাকা দিব। অবশিষ্ট যত পুস্তক বিক্রয় করিবে, তাহাতে তুমি যথেষ্ট লাভ করিতে পারিবে, তাহা হইলে যে টাকা ঋণ করিয়া ছাপাখানা করিয়াছ, তৎসমস্তই

পরিশোধ হইবে।' সুতরাং কৃষ্ণনগরের রাজবাটী হইতে অন্নদামঙ্গল পুস্তক আনাইয়া, মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন। একশত পুস্তক ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে দিয়া ছয়শত টাকা প্রাপ্ত হন ; ঐ টাকায় নীলমাধব মুখোপাধ্যায়ের ঋণ পরিশোধ হয়। ইহার পর যে সকল সাহিত্য, ন্যায়, দর্শন পুস্তক মুদ্রিত ছিল না, তৎসমস্ত গ্রন্থ ক্রমশ মুদ্রিত করিতে লাগিলেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ও সংস্কৃত-কলেজের লাইব্রেরীর জন্য যে পরিমাণে নূতন নূতন পুস্তক লইতে লাগিল, তদ্দ্বারা ছাপানর ব্যয় নির্বাহ হইয়াছিল। অন্যান্য লোকে যাহা ক্রয় করিতে লাগিলেন, তাহা লাভ হইতে লাগিল। ঐ টাকায় ক্রমশ ছাপাখানার ইস্টেট বা কলেবর বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। অনন্তর, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হেড রাইটারের পদ শূন্য হইলে, ঐ পদে অগ্রজ মহাশয় মাসিক আশি টাকা বেতনে নিযুক্ত হইলেন। তিনি যেরূপ পরিশ্রম করিয়া ইংরাজী শিক্ষা করিতেছিলেন, এক্ষণেও ঠিক সেইরূপভাবে শিক্ষা করিতে লাগিলেন। ইংরাজীতে যে সকল রিপোর্ট গবর্নমেণ্টে পাঠাইতে হইত, তৎসমুদয় স্বয়ং রচনা করিতেন ; অন্য কাহারও সাহায্য লইতে হইত না। তাঁহার ইংরাজী রচনা অতি উৎকৃষ্ট হইত। একারণ, কৃতবিদ্য ইংরাজী লেখকগণ তাঁহার ইংরাজী রচনা দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইতেন। সর্বদা অনেক রিপোর্ট প্রস্তুত করিয়া রচনা যেমন উৎকৃষ্ট হইয়াছিল, ইংরাজী হস্তাক্ষরও তদনুরূপ অতি উত্তম হইয়াছিল। পণ্ডিতলোকের অধিক বয়সে নিজের যত্ন ও পরিশ্রমে এরূপ ইংরাজী শিক্ষা করা, অতি আশ্চর্যের বিষয় বলিতে হইবে।

এই সময় সংস্কৃত-কলেজের গণিতশাস্ত্রাধ্যাপক যোগধ্যান পণ্ডিত মানবলীলা সংবরণ করেন। তিনি সংস্কৃত-কলেজের ছাত্রগণকে লীলাবতী ও বীজগণিতের অঙ্ক শিক্ষা দিতেন। তৎকালে তিনি বঙ্গদেশের মধ্যে অঙ্কশাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। কলেজের কর্মাধ্যক্ষ বাবু রসময় দত্ত, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল হইতে গণিত-শাস্ত্রের অঙ্ক শিক্ষা দিবার জন্য লোক নির্বাচন করিয়া আনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন ; কিন্তু অগ্রজের অভিপ্রায় ছিল যে, সংস্কৃত-কলেজের মধ্যে যিনি অঙ্কে প্রতিবৎসর পরীক্ষায় সর্বশ্রেষ্ঠ হইয়া থাকেন, ন্যায়বিচারে তাঁহারই এই পদ পাওয়া সর্বতোভাবে বিধেয়। অতএব তিনি মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া, শিক্ষা-সমাজের প্রেসিডেণ্ট ও সেক্রেটারিকে অনুরোধ করিয়া বলেন যে, সংস্কৃত-কলেজের সকল ছাত্র অপেক্ষা প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য প্রতিবৎসর অঙ্কের পরীক্ষায় সর্বোৎকৃষ্ট হইয়া থাকেন এবং কলেজের সকল ছাত্র অপেক্ষা তাহার অঙ্কে ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছে। অন্যান্য বিষয়েও পরীক্ষায় গত বৎসর সর্বোৎকৃষ্ট হইয়া প্রধান স্কলার্শিপ প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব উক্ত পদ তাঁহারই পাওয়া উচিত। ইহা শ্রবণ করিয়া, শিক্ষাসমাজ, প্রিয়নাথ ভট্টাচার্যকে উক্ত পদে নিযুক্ত করেন। প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য, কর্মে নিযুক্ত হইয়া, আন্তরিক যত্নের সহিত বালকগণকে শিক্ষা দিতেন। এজন্য পূর্ব-বৎসর অপেক্ষা ঐ বৎসর পরীক্ষায় ছাত্রগণ অঙ্কে উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। পরীক্ষায়

পূর্ব-বৎসর অপেক্ষা ফল ভাল হওয়াতে, অগ্রজ মহাশয় প্রিয়নাথের প্রতি পরম সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

এই বৎসর শিক্ষাসমাজ, সংস্কৃত-কলেজের জুনিয়র ও সিনিয়র উভয় ডিপার্ট-মেণ্টের বাৎসরিক পরীক্ষার ভার অগ্রজ মহাশয় ও ডাক্তার রোয়ারের প্রতি অর্পণ করেন। কিন্তু অগ্রজ মহাশয়ই স্বয়ং উভয় ডিপার্টমেণ্টের প্রশ্ন প্রস্তুত করেন। কলেজের অধ্যাপকগণ প্রশ্ন দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। পাঁচ দিবস পরীক্ষার স্থলে উপস্থিত থাকায়, প্রশ্ন প্রস্তুত করায় ও পরীক্ষার কাগজ দেখায়, তাঁহার যথেষ্ট পরিশ্রম হইয়াছিল; তজ্জন্য গবর্নমেণ্ট হইতে উভয় পরীক্ষকই পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সিনিয়র ডিপার্টমেণ্টের পরীক্ষায় রামকমল ভট্টাচার্য, কাব্য ও অলঙ্কারের প্রশ্নের সর্বাপেক্ষা ভাল উত্তর লিখিয়াছিলেন; একারণ, অগ্রজ মহাশয় রামকমল ভট্টাচার্যকে ঐ পুরস্কারের টাকা হইতে সমগ্র সংস্কৃত 'মহাভারত' পুস্তক ক্রয় করিয়া দিয়াছিলেন। অবশিষ্ট টাকা হইতে দরিদ্র লোকদিগকে বস্ত্র ক্রয় করিয়া দিয়াছিলেন। তৎকালে কোন পরীক্ষক নিজ হইতে ছাত্রকে পারিতোষিক প্রদান করেন নাই; বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এ বিষয়ের প্রথম পদ-প্রদর্শক বলিতে হইবে। কিছুদিন পরে, রামকমল ভট্টাচার্য কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া কষ্ট পাইতেছেন শুনিয়া, তিনি বাবু দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ডাক্তার মহাশয়কে সমভিব্যাহারে লইয়া, রামকমল ভট্টাচার্যের বাটী যাইয়া চিকিৎসা করাইতে প্রবৃত্ত হন। যতদিন তিনি সম্পূর্ণরূপ আরোগ্য লাভ করিতে না পারিয়াছিলেন, ততদিন অগ্রজ মহাশয়, বহুবাজারের বাসা হইতে সিমুলিয়ায় তাঁহাদের বাটী যাইতে আলস্য করিতেন না। তাঁহার অনুরোধে দুর্গাচরণ বাবু ভিজিট গ্রহণ করেন নাই। ঐ সময়ে রামকমল ভট্টাচার্যের বাটীতে দেবনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত দাদার প্রথম আলাপ হয়। তিনি উক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে সম্মান করিতেন। তৎকালে নীলাম্বর বাবুর শৈশবাবস্থা। নীলাম্বরবাবু ঐ সময়ে বহুকাল হইতে রোগে আক্রান্ত হইয়া কষ্ট পাইতেছিলেন। অগ্রজ, নীলাম্বরবাবুর মস্তক দেখিয়া ব্যক্ত করেন যে, এই বালক অসাধারণ ধী-শক্তিসম্পন্ন। তিনি তাঁহাকে সংস্কৃত-কলেজে ভর্তি করিয়া, লেখাপড়ার বন্দোবস্ত করিয়া দেন।

সন ১২৫৬ সালের ৩০শে কার্তিক নিশাযোগে অগ্রজ মহাশয়ের পত্নী এক সন্তান প্রসব করেন। তিনি, অধিক বয়স পর্যন্ত পুত্রলাভে বঞ্চিতা ছিলেন; একারণ, পিতৃদেব তাঁহাকে নারায়ণের ঔষধ সেবন করান, তন্নিমিত্ত ঐ শিশুর নাম নারায়ণ রাখেন। ইহার কয়েকদিন পরে, অষ্টমবর্ষীয় পঞ্চম সহোদর হরিশ্চন্দ্র, লেখাপড়া শিক্ষার জন্য কলিকাতায় গিয়াছিল। কলিকাতায় উপস্থিতির কয়েক দিন পরে, সে বিষম বিস্থচিকারোগে আক্রান্ত হইয়া, অকালে কালগ্রাসে নিপতিত হয়। অগ্রজ মহাশয়, কয়েক মাস শোকে অভিভূত হইয়াছিলেন। তিনি যথাসময়ে রীতিমত ভোজন করিতেন না এবং লেখাপড়ায় বিরত হইয়াছিলেন। আমরা

সাত ভাই; এজন্য জ্যেষ্ঠাগ্রজ সর্বদা বলিতেন যে, যদ্যপি সকলে জীবিত থাকি, তবে দেশের অনেক উপকার করিতে পারিব। তিনি মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, নিজে উপার্জন করিয়া সংসারযাত্রা নির্বাহ করিব; অন্যান্য ভ্রাতৃবর্গকে দেশে রাখিয়া, বিদ্যালয় স্থাপন-পূর্বক, দেশের দরিদ্র লোকের সন্তানগণকে লেখাপড়া শিখাইব। কিন্তু উপর্যুপরি দুই বৎসর দুইটি ভ্রাতার মৃত্যুতে তিনি হতাশ হইয়াছিলেন। হরিশ্চন্দ্র ইতিপূর্বে বলিয়াছিল যে, 'দাদা। আমার বিবাহে বাজনা করিতে হইবে।' এজন্য অদ্যাপি অগ্রজ, অপর লোকের বিবাহে বাদ্যের শব্দ শুনিলে, দীর্ঘ নিশ্বাস-পরিত্যাগপূর্বক অশ্রুবিসর্জন করিতেন। লোকপরম্পরায় শুনিলেন যে, জননীদেবী পুত্রদ্বয়ের মৃত্যুতে সর্বদা রোদন করিয়া থাকেন; এজন্য জননীদেবীকে দেশ হইতে কলিকাতায় লইয়া আইসেন এবং পাঁচ মাস কাল নিকটে রাখিয়া সান্ত্বনা করেন। জননী, দেশে থাকিয়া স্বয়ং পাকাদিকার্য নির্বাহ করিয়া, অপরাপর আগন্তুক ব্যক্তিগণকে বা দরিদ্র নিরুপায় লোকদিগকে ভোজন করাইতে ভালবাসিতেন। তাঁহাকে অন্যমনস্ক করিয়া রাখিবার জন্য, তিনি সর্বদা আত্মীয় ও বন্ধুগণকে নিমন্ত্রণ কবিয়া আনিতেন। জননী, স্বয়ং পাকাদিকার্য নির্বাহ করিয়া, উপস্থিত নিমন্ত্রিতদিগকে খাওয়াইতেন। রন্ধন-পরিবেষনাদি-কার্যে ব্যাপৃত থাকায়, তাঁহার শোকের অনেক লাঘব হইতে লাগিল। জননীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তিনি পাঁচ মাস কাল অকাতরে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। কিয়ৎপরিমাণে শোকেব হ্রাস হইলে পর, বৈশাখ মাসে অন্যান্য ভ্রাতৃবর্গসহিত জননীকে দেশে পাঠাইয়া দেন। ঐ সময়ে অগ্রজের পুত্র নারায়ণের বয়ঃক্রম ছয় মাস; তাহার অন্নপ্রাশন উপলক্ষে পিতৃদেব সমারোহ করিয়া, আত্মীয়গণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইয়াছিলেন। অগ্রজ, তৎকাল পর্যন্ত মৃত হরিশ্চন্দ্র ভ্রাতার শোক সংবরণ করিতে পারেন নাই; কেবল পিতার অনুরোধে দেশে গমন করেন। দেশে অবস্থিতির সময় মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, অল্পবয়স্ক বালকবালিকাগণ প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ 'শিশুশিক্ষা' পড়িয়া, তৎপরে কি পুস্তক অধ্যয়ন করিবে? অনন্তর 'রুডিমেণ্টস অফ নলেজ' নামক পুস্তক বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া, ১২৫৭ সালে 'বোধোদয়' নামে একখানি পুস্তক মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন। নিম্নশ্রেণীস্থ বালকগণের পাঠোপযোগী এরূপ কোনও পুস্তক একাল পর্যন্ত কেহ প্রকাশ করিতে পারেন নাই।

বাল্যকাল হইতেই অগ্রজ মহাশয় মনে মনে চিন্তা করিতেন যে, স্ত্রীলোকেরা কেন লেখাপড়া শিক্ষা করিতে পায় না? কেনই বা ইহারা যাবজ্জীবন জ্ঞানোপার্জনে অসমর্থা থাকে? কুলীনদের বহুবিবাহ কি উপায়ে রহিত হয়? ইহা শাস্ত্রসম্মত নয়; এই কুপ্রথা যতদিন না দেশ হইতে নির্বাসিত হয়, ততদিন বঙ্গদেশবাসী হিন্দুগণের মঙ্গল নাই।

বিধবা বালিকা দৃষ্টিপথে পতিত হইলে, তিনি আন্তরিক দুঃখানুভব করিতেন।

এক দিবস, কোন আত্মীয়ের দ্বাদশবর্ষীয়া দুহিতা বিধবা হইলে তদ্দর্শনে জননীদেবী শোকে অভিভূতা হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। অগ্রজ, জননীকে সান্ত্বনা করিলে পর, জননী ও পিতৃদেব বলিলেন যে, 'বিধবাবালিকার পুনর্বার বিবাহ-বিধি কি ধর্মশাস্ত্রের কোন স্থলে কিছু লেখা নাই? শাস্ত্রকারেরা কি এতই নির্দয় ছিলেন?' জনক-জননীর মুখনিঃসৃত এই বাক্য তাঁহার হৃদয়ে প্রোথিত হইয়া রহিল।

হিন্দু-কলেজের সিনিয়র ডিপার্টমেণ্টের ছাত্রগণ ঐক্য হইয়া, 'সর্ব-শুভকরী' নামক মাসিক সংবাদপত্রিকা প্রকাশ করেন। উক্ত সংবাদপত্রের অধ্যক্ষ বাবু রাজকৃষ্ণ মিত্র প্রভৃতি অনুরোধ করিয়া, অগ্রজকে বলেন যে, 'আমাদের এই নূতন কাগজে প্রথম কি লেখা উচিত তাহা আপনি স্বয়ং লিখিয়া দিন। প্রথম কাগজে আপনার রচনা প্রকাশ হইলে, কাগজের গৌরব হইবে এবং সকলে সমাদরপূর্বক কাগজ দেখিবে।' উঁহাদের অনুরোধের বশবর্তী হইয়া, তিনি প্রথমত বাল্য-বিবাহের দোষ কি, তাহা রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত বলিয়া, তৎকালীন কৃতবিদ্য লোকমাত্রেই সমাদরপূর্বক 'সর্ব-শুভকরী' পত্রিকা পাঠ করিতেন। পর মাসে, মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়, স্ত্রীশিক্ষা-বিষয়ক প্রবন্ধ লিখেন। ইহার পর, চৈত্রসংক্রান্তির সময় লোকে যে জিহ্বা বিদ্ধ করে ও পীঠ ফুঁড়িয়া চড়ক করিয়া থাকে, এবং মৃত্যুর পূর্বে যে গঙ্গায় অন্তর্জলি করে, এই দ্বিবিধ কুপ্রথার নিবারণার্থে প্রবন্ধ লিখিবার জন্য দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন ও তৎকালীন সংস্কৃত-কলেজের সুলেখক ছাত্র মাধবচন্দ্র গোস্বামীর প্রতি ভার দেন।

এই বৎসর অগ্রজ মহাশয়, শিক্ষাসমাজ কর্তৃক হিন্দু-কলেজ; হুগলি-কলেজ, কৃষ্ণনগর-কলেজ ও ঢাকা-কলেজের সিনিয়র ডিপার্টমেণ্টের ছাত্রগণের বাঙ্গালা-রচনার পরীক্ষক নিযুক্ত হন। ভারতবর্ষের স্ত্রীলোকগণকে লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়া উচিত কি না? এই বিষয়ে তিনি প্রশ্ন দেন। সকল ছাত্র অপেক্ষা কৃষ্ণনগর-কলেজের নীলকমল ভাদুড়ী; উক্ত প্রশ্নের সর্বোৎকৃষ্ট উত্তর লিখিয়াছিলেন। তজ্জন্য গবর্নমেণ্ট তাঁহাকে একটি স্বর্ণমেডেল প্রদান করেন। উক্ত কয়েকটি বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণকালে, প্রেসিডেণ্ট মহামতি ড্রিঙ্ক ওয়াটার বেথুন উপস্থিত থাকিয়া, ঐ সকল বিদ্যালয়ে স্ত্রীশিক্ষা-বিষয়ের সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া, সাধারণের মনোহরণ করিতেন এবং ঐ সকল বিদ্যালয়ের যে সকল ছাত্র ভাল পরীক্ষা দিয়াছিলেন, পারিতোষিক প্রদান-সময়ে, তাঁহাদের রচনাও সর্বসমক্ষে পাঠ করা হইয়াছিল। তদবধি সভাস্থ শ্রোতাগণের মধ্যে অনেক কৃতবিদ্য লোক, যাহাতে দেশে স্ত্রী-শিক্ষা প্রচলিত হয়, তদ্বিষয়ে আন্তরিক যত্ন করিতে লাগিলেন।

সংস্কৃত-কলেজের সাহিত্যশাস্ত্রাধ্যাপক মদনমোহন তর্কালঙ্কার, সংস্কৃত-কলেজ পরিত্যাগ করিয়া, মুরশিদাবাদের জজপণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হইলে পর, কাব্য-শাস্ত্রের শিক্ষকের পদ শূন্য হয়। তৎকালীন এডুকেশন কৌন্সিলের সেক্রেটারি

ডাক্তার ময়েট সাহেব অগ্রজ মহাশয়কে ঐ পদে নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, অগ্রজ মহাশয় নানা কারণ দর্শাইয়া প্রথমত অস্বীকার করেন, পরে ময়েট সাহেব সবিশেষ যত্ন ও আগ্রহ প্রকাশ করাতে তিনি বলিয়াছিলেন, 'যদি শিক্ষাসমাজ আমাকে অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করেন, তাহা হইলে আপাতত এই পদ গ্রহণ করিতে পারি।' অনন্তর তিনি খৃঃ ১৮৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে নব্বই টাকা বেতনে সংস্কৃত-কলেজে সাহিত্যশাস্ত্রের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার পরমবন্ধু বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, তৎকালে জার্ডিন কোম্পানির হৌসে কেসিয়ারি পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করিয়া, রাজকৃষ্ণবাবুকে ঐ কলেজের হেড রাইটারের পদে নিযুক্ত করাইয়া দেন। অগ্রজ মহাশয় কিছুদিন সাহিত্য-শ্রেণীর অধ্যাপনার কার্য সম্পন্ন করিতেছেন, ইত্যবসরে বাবু রসময় দত্ত মহাশয় সংস্কৃত-কলেজের সেক্রেটারির পদ পরিত্যাগ করিলেন। সেই সময়ে, কিরূপ ব্যবস্থা করিলে, সংস্কৃত-কলেজের উন্নতি হইতে পারে, তদ্বিষয়ের রিপোর্ট প্রদান করিবার জন্য আদেশ হইল। তদনুসারে অগ্রজ মহাশয় রিপোর্ট প্রদান করিলে, ঐ রিপোর্ট দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া, শিক্ষা-সমাজ তাঁহাকে সংস্কৃত-কলেজের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করিলেন। এতদিন সংস্কৃত-কলেজের অধ্যক্ষতাকর্ম, সেক্রেটারি ও আসিস্টান্ট সেক্রেটারি, এই দুই ব্যক্তি দ্বারা নির্বাহিত হইয়া আসিতেছিল, এক্ষণে ঐ দুই পদ রহিত করিয়া, শিক্ষা-সমাজ অগ্রজকে একশত পঞ্চাশ টাকা বেতনে সংস্কৃত-কলেজের প্রিন্সিপাল পদে নিযুক্ত করিলেন। তখন তিনি কিরূপ বন্দোবস্ত করিলে কলেজের সম্যক উন্নতি হইবে, নিরন্তর এই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি, শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নকে সাহিত্য-শ্রেণীর অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করিলেন। তৎকালে সাহিত্য-শ্রেণীর যে সকল পাঠ্যপুস্তক অবধারিত ছিল, তন্মধ্যে যে কয়েক প্রকারের পুস্তক দুষ্প্রাপ্য হইয়াছিল, তৎসমূহ পুনর্মুদ্রিত করাইয়া বিদ্যার্থীগণের বিশিষ্ট-রূপ সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। ভরতমল্লিক, জয়-মঙ্গল, নাথুরাম শাস্ত্রী ও প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের টীকাসম্বলিত 'রঘুবংশ' মুদ্রিত ছিল, কিন্তু উহার টীকাগুলি সর্বাঙ্গসুন্দর না থাকায়, মল্লিনাথের টীকাসম্বলিত 'রঘুবংশ' ও 'কুমারসম্ভব' মুদ্রিত করিয়া সাধারণের বিশেষ উপকার করিয়াছিলেন। ইহার পূর্বে 'কুমারসম্ভব' মুদ্রিত হয় নাই, সুতরাং কলেজের ছাত্রগণ হস্তলিখিত পুস্তকদর্শনে অধ্যয়ন করিত। এইরূপ দর্শন-শ্রেণীর বিদ্যার্থীগণের যে সকল পাঠ্যপুস্তক মুদ্রিত ছিল না, তৎসমুদয় ত্বরায় মুদ্রিত করাইয়া, ঐ অভাব মোচন করেন। ইহাতে কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্রবর্গের এবং অন্যান্য টোলের ছাত্রবর্গের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল।

প্রিন্সিপালের পদে নিযুক্ত হইবার ছয়-সাত মাস পরে, অগ্রজ মহাশয় অত্যন্ত পীড়িত হন। কিছু সুস্থ হইবার পর শিরঃপীড়া ও দন্তরোগে আক্রান্ত হইয়া অতিশয় যন্ত্রণা ভোগ করেন; অনেক চেষ্টা করিয়া কিছু সুস্থ হন। কিন্তু শিরঃপীড়া হইতে,

একবারে নিষ্কৃতি করিতে পারেন নাই, বহু দিবস ব্যাপিয়া শিরঃপীড়ার সূত্র ছিল। প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হইবার কয়েক মাস পরে, এক ভয়ানক দুর্ঘটনা উপস্থিত হইল। অগ্রজ মহাশয়ের প্রধান সহায় লেজিস্‌লেটিভ কৌন্সিলের মেম্বর ও শিক্ষাসমাজের প্রেসিডেণ্ট ভারতহিতৈষী, বিদ্যোৎসাহী, মহামতি বেথুন সাহেব মহোদয় কালগ্রাসে নিপতিত হইলেন।

অগ্রজ মহাশয়, সংস্কৃত-কলেজের ও অন্যান্য কলেজের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য এবং ভারতবর্ষের জেলায় জেলায় বিদ্যালয় স্থাপন জন্য বিদ্যোৎসাহী বেথুন সাহেবের ভবনে নিরন্তর গমন কবিতেন। মহামতি ভারতহিতৈষী বেথুন সাহেব, ভারতবর্ষের অবলাগণের বিদ্যা-শিক্ষার জন্য সর্বপ্রথমে কলিকাতা মহানগরীতে বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করেন। প্রথমত কলিকাতাস্থ হিন্দুদলপতিগণ স্ত্রীশিক্ষা-বিষয়ে নানাবিধ অমূলক আপত্তি উত্থাপন করেন; তথাপি বেথুন সাহেব ভগ্নোৎসাহ হন নাই। সর্বাগ্রে কলিকাতা স্থকিয়া স্ট্রীটের বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের বৈঠকখানায় অভিনব বালিকাবিদ্যালয়ের কার্য আরম্ভ হয়। সাহেব, প্রতিদিন বালিকা-বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান করিতে আসিতেন; কিরূপে বিদ্যালয়ের উন্নতি হয়, সতত এই চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন। কিছু দিন পরে, পটলডাঙ্গার গোলদিঘীর দক্ষিণপূর্ব-কোণে, পূর্বে যে গৃহে হেয়ার সাহেবের স্কুল ছিল, সেই বাটীতে ঐ বিদ্যালয়ের কার্য নির্বাহ হইত। বালিকাগণকে উৎসাহ দিবার জন্য মধ্যে মধ্যে তৎকালীন গবর্নর জেনারেলের পত্নী লেডী ডালহৌসি, বেথুন-সংস্থাপিত এই বিদ্যালয়ে আসিয়া কার্য পরিদর্শন করিতেন এবং ত্বরায় যাহাতে বিদ্যালয়ের উন্নতি হয়, তদ্বিষয়ে বিশিষ্টরূপ মনোযোগ দিয়াছিলেন।

কলিকাতাস্থ দলপতিদের নিবারণে প্রথমত কেহ কেহ স্বীয় দুহিতাগণকে শিক্ষার জন্য এই নবপ্রতিষ্ঠিত বালিকাবিদ্যালয়ে পাঠাইতে সাহস করেন নাই। অগ্রজ মহাশয়ের অনুরোধে বহুবাজারনিবাসী বাবু নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, বাবু হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, বাবু রামগোপাল ঘোষ, বাবু ঈশানচন্দ্র বসু, তৎকালের সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান উকীল বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত, পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি, পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রভৃতি কয়েকজন কৃতবিদ্য ও সম্ভ্রান্ত লোক স্বীয় স্বীয় কন্যাগণকে শিক্ষার্থে বেথুন-বালিকাবিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতেন। উক্ত মহোদয়গণ দলপতিদের নিবারণেও ক্ষান্ত হইলেন না। এজন্য কলিকাতা ও পল্লিগ্রামস্থ সম্ভ্রান্ত দলপতিরা ঐক্য হইয়া, উঁহাদের সহিত সামাজিক ব্যবহার বন্ধ করিয়া দেন, এবং সংবাদপত্রেও তাঁহাদের যথোচিত দুর্নাম ঘোষণা করিয়াছিলেন। তাহাতেও তাঁহারা স্ব স্ব প্রাণসম দুহিতাগণকে বিদ্যালয়ে পাঠাইতে ক্ষান্ত হয়েন নাই। তৎকালে অগ্রজ মহাশয়ের কন্যা হয় নাই, তজ্জন্য অনেকে বলিত, 'বিদ্যাসাগরের কন্যা থাকিলে, কখনও তিনি ইহাদের মত গাড়ী করিয়া বেথুনস্কুলে পাঠাইতেন না। অপরকে উত্তেজিত করিয়া দিয়া নিজে বাহিরে থাকিয়া,

সাহেবদের সুখ্যাতিভাজন হইতেছেন।' যে গাড়ীতে বালিকাগণকে বিদ্যালয়ে পাঠান হইত, ঐ গাড়ীতে ধর্মশাস্ত্র 'মনুসংহিতা'-র এই বচনটি স্পষ্টাক্ষরে লেখা ছিল : 'কন্যাপ্যেয়ং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ।'

সমাজের ভয়ে অন্যান্য কৃতবিদ্য অনেক লোক স্ব স্ব দুহিতা, ভগিনী ও ভাগিনেয়ী প্রভৃতিকে বেথুনস্কুলে পাঠাইতে সাহস করিতেন না। যে সকল বালিকা ঐ বিদ্যালয়ে অধ্যয়নার্থে প্রবিষ্টা হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কোন কোন বালিকার পাণিগ্রহণ-সময়ে বিপক্ষপক্ষ প্রতিবেশী সকল অনেক আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন। অগ্রজ মহাশয়, পরিশ্রম স্বীকার করিয়া, গতিবিধি ও উপরোধ অনুরোধ দ্বারা ঐ সকল আপত্তি খণ্ডন করিয়া দিতে ক্ষান্ত থাকিতেন না। তৎকালে বেথুন ফিমেল-স্কুলের চিরস্থায়িতার কোন আশাই ছিল না। পরিশেষে বেথুন সাহেব মহোদয়, অগ্রজ মহাশয়কে ঐ বিদ্যালয়ের অবৈতনিক সেক্রেটারির পদে নিযুক্ত করিলেন। তিনি সেক্রেটারির পদে নিযুক্ত হইয়া, ইহার উন্নতির জন্য কায়মনোবাক্যে বিলক্ষণ যত্নবান হইয়াছিলেন। বেথুন সাহেব, ফিমেল স্কুলের বাটী-নির্মাণার্থে স্বীয় প্রচুর অর্থের দ্বারা সিমুলিয়ায় স্বতন্ত্র স্থান ক্রয় করেন। বনিয়াদ খোঁড়া হইল, ক্রমশ ভিত্তি হইতে আরম্ভ হইল ; ইত্যবসরে বেথুন সাহেব, কলিকাতার সন্নিহিত প্রায় দশ মাইল পশ্চিম জনাইগ্রামবাসী লোকদিগের অনুরোধের বশবর্তী হইয়া, তথাকার স্কুল পরিদর্শনে গমন করেন। বর্ষাকাল, সুতরাং পথ অতিশয় কর্দমময় হইয়াছিল ; তজ্জন্য গাড়ী না চলাতে, শকট হইতে অবরোহণ করিয়া, পদব্রজেই কর্দমোপরি গমন করিয়া বিদ্যালয়ে উপস্থিত হন। ইহার অব্যবহিত পরেই ভয়ানক জ্বরে আক্রান্ত হইয়া, কালের করাল-কবলে নিপতিত হন। ভারতের অদ্বিতীয় বন্ধু, বিদ্যোৎসাহী, সদ্‌গুণবিভূষিত পরম দয়ালু বেথুন সাহেব মহানুভবের মৃত্যু-সংবাদে দেশীয় কৃতবিদ্য লোক ও বিদ্যালয়ের ছাত্রসমূহ বিষণ্নমনে মৃত-মহাত্মার সদনে উপস্থিত হইয়া, শোক ও দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অগ্রজ মহাশয়, সর্বসমক্ষে রোদন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার বদনমণ্ডল অশ্রুজলে প্লাবিত হইল, অন্যান্য লোকের উপদেশেও নিবৃত্ত হইলেন না। তিনি বাঙ্গালাদেশের বিদ্যালয়সমূহের উন্নতির জন্য নিরন্তর বেথুনের ভবনে যাইতেন। নিঃস্বার্থ, নির্লোভ, যথার্থ দেশহিতৈষী বেথুন সাহেব, তাঁহার প্রতি আন্তরিক স্নেহ ও মমতা প্রদর্শন করিতেন। বিশেষত ভারতবর্ষের জেলাসমূহের মফঃস্বলে প্রায়ই বিদ্যালোচনার অভাব ছিল ; তথাকার অধিকাংশ প্রজাপুঞ্জ কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া দিনপাত করিত। তাহাদের সন্তানগণ বাল্যকালে পাঠশালায় সামান্য শিক্ষা করিত ; তাহার পর অর্থের অসদ্ভাব-প্রযুক্ত কলিকাতায় লেখাপড়া শিক্ষার জন্য যাইতে সম্পূর্ণরূপ অক্ষম হইত। তজ্জন্য যাহাতে গবর্নমেণ্টের দ্বারা দেশে দেশে বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, তদ্বিষয়ের উপায় নির্ধারণের জন্য সাহেবের সহিত প্রায়ই আন্দোলন হইত। সাহেব, মফঃস্বলের স্থানে স্থানে বিদ্যালয় স্থাপন জন্য

গবর্নমেণ্টকে উত্তেজিত করিতেন। তাঁহার কথাতেই তৎকালীন গবর্নর জেনারেল লর্ড ডালহৌসি কর্ণপাত করিয়াছিলেন। তাহাতেই যে দেশের এরূপ উন্নতি হইযাছে, তাহার সন্দেহ নাই। তিনি আর কিছুদিন জীবিত থাকিলে, না জানি দেশের কতই উন্নতিলাভ হইত। ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য-প্রযুক্ত, বেথুন মহোদয় ইহজগৎ পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর মৃতদেহ সমাধিস্থানে নীত হইল; হেলিডে সাহেব ও অগ্রজ মহাশয়, উভয়ে এক শকটে আরোহণ করিলেন, বিদ্যালয় সমূহের প্রায় সহস্রাধিক ছাত্রগণ সমবেত হইয়া, সমাধিস্থানে সমুপস্থিত হইলেন।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপনান্তে সকলে ম্লান-বদনে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। অনন্তর গবর্নর জেনারেল বাহাদুর, বেথুন-ফিমেল-স্কুলের ভার স্বহস্তে লইয়া, তৎকালীন হোমডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারি সিসিল বীডন সাহেব মহোদয়কে এই বিদ্যালয়ে প্রেসিডেণ্ট এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়কে পূর্বের মত অবৈতনিক সেক্রেটারির পদে নিযুক্ত করিলেন। তাঁহার আন্তরিক যত্ন ও অধ্যবসায়ে, ক্রমশ বালিকাবিদ্যালয়ের উন্নতি হইতে লাগিল। যাঁহারা উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান বিদ্বেষ্টা ছিলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় ক্রমশ তাঁহাদিগকে কমিটি করিয়া উপদেশ দিয়া, তাঁহাদের বাটীর (অর্থাৎ সভা-বাজারস্থ রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর প্রভৃতির বাটীর) বালিকাগণকেও বেথুন-ফিমেল-স্কুলে প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন। সর্বপ্রথমে ভারতবর্ষে স্ত্রী-শিক্ষা প্রচার বিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ই বেথুন সাহেবকে প্রবৃত্ত করেন। ফলত বিদ্যাসাগর মহাশয় আন্তরিক যত্ন না করিলে, তৎকালে এতদ্দেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত হওয়া দুষ্কর হইত। তাঁহার যত্নের শৈথিল্য থাকিলে কোন্‌কালে বেথুন-ফিমেল-স্কুল উঠিয়া যাইত।

চেম্বর্স, ইংরাজী-ভাষায় 'মর‍্যাল ক্লাসবুক' নামে যে পুস্তক প্রচারিত করিয়াছেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় সন ১২৫৭ সালে, এতদ্দেশীয় বালকবালিকাগণের নীতিজ্ঞানার্থ 'নীতিবোধ' নাম দিয়া, বাঙ্গালাভাষায় ঐ পুস্তকখানি অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হন। প্রথমত পশুগণের প্রতি ব্যবহার, পরিবারের প্রতি ব্যবহার, প্রধান ও নিকৃষ্টের প্রতি ব্যবহার, পরিশ্রম, স্বচিন্তা ও স্বাবলম্বন, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, বিনয়, এই কয়েকটি প্রস্তাব অনুবাদ করিয়াছিলেন এবং প্রত্যেক প্রস্তাবের উদাহরণস্বরূপ যে সকল বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে 'নেপোলিয়ন বোনাপার্ট'-এর কথাও তাঁহার অনূদিত; কিন্তু প্রিন্সিপাল-পদে নিযুক্ত হওয়ায় ও অন্যান্যরূপ কার্যে নিরন্তর ব্যাপৃত থাকায়, অনবকাশ-প্রযুক্ত তিনি তাঁহার পরমবন্ধু বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতি 'নীতিবোধ' প্রস্তুত করিবার ভারার্পণ করেন। তিনি অবশিষ্ট অংশ লিখিয়া, সন ১২৫৮ সালের ৪ঠা শ্রাবণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন।

ঐ সালে মার্শেল সাহেব, সংস্কৃত-কলেজের জুনিয়র ও সিনিয়র উভয় ডিপার্ট-মেণ্টের পরীক্ষক নিযুক্ত হন। অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এ বৎসরের পরীক্ষার ফল উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সুনিয়মই ইহার কারণ। ঐ বৎসরের

আশ্বিন মাসে পূজার অবকাশে অগ্রজ মহাশয়, বাবু প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারিকে সঙ্গে লইয়া বাটী যান। তথায় উভয়েই পুস্তক লইয়া শচীসরোবরের এক অশ্বত্থ-বৃক্ষের মূলে বসিয়া, পুস্তক-পাঠ ও কথোপকথন করিতেন। যে কয়েক দিবস বাটীতে অবস্থিতি করিতেন, সেই কয়েক দিন দরিদ্র লোকের বিলক্ষণ সুবিধা হইত , কারণ, তিনি তাহাদিগকে গোপনে কিছু কিছু দান করিতেন।

গ্রামবাসীদের বাটীতে যাইয়া ও সবিশেষ অনুসন্ধান লইয়া, যাহার যেরূপ অভাব থাকিত, সাধ্যানুসারে তিনি তাহার সেই অভাব মোচন করিতেন। ইহা জানিয়া অন্যান্য ধনশালী লোকেরা আশ্চর্যান্বিত হইতেন যে যিনি এতাদৃশ প্রচুর অর্থ দান করেন, তাঁহার গোপনে দান করিবার কারণ কি ? আমরা যাহা দান করি, তাহা সকলকেই প্রকাশ করিয়া থাকি। একদিবস একটি ভদ্রলোক, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, 'মহাশয়! গোপনে দান করিবার তাৎপর্য কি ?' তিনি উত্তর করেন যে, 'লোকের সমক্ষে দিলে লইতে যদি লজ্জিত হয়, এজন্য গোপন-ভাবে দেওয়া হয়। যাঁহারা প্রকাশ্যে দান করেন, তাঁহারা লোকের নিকট প্রতিষ্ঠা-লাভের অভিপ্রায় করিয়া থাকেন। আমি সর্বসমক্ষে কাহাকেও দান করি না ; লোকের কষ্ট দেখিলেই দিয়া থাকি। নামে আমার আবশ্যক নাই।'

ঐ বৎসর আশ্বিন মাসে অগ্রজ মহাশয় বাটীতে থাকিয়া দেখিলেন, কনিষ্ঠ সহোদর ঈশান ও তাঁহার পুত্র নারায়ণকে পিতৃদেব অত্যন্ত আদর করেন ; তদ্দর্শনে পরিহাসপূর্বক পিতৃদেবকে বলিলেন, 'আপনি ঈশানের ও নারায়ণের মাথা খাইতেছেন, তথাপি আপনি লোকের নিকট আপনাকে কিরূপে নিরামিষাশী বলিয়া পরিচয় দেন ?'

তৎকালে সংস্কৃত-কলেজে কেবল ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যজাতীয় সন্তানগণ অধ্যয়ন করিত। ব্রাহ্মণের সন্তানেরা সকল শ্রেণীতেই অধ্যয়ন করিত; বৈদ্যজাতীয় বালকেরা দর্শনশাস্ত্র পর্যন্ত অধ্যয়ন করিতে পাইত, বেদান্ত ও ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে পাইত না। শূদ্র-বালকের পক্ষে সংস্কৃত-কলেজে অধ্যয়ন নিষেধ ছিল। অগ্রজ মহাশয়, প্রিন্সিপাল হইয়া, শিক্ষাসমাজে রিপোর্ট করিলেন যে, হিন্দুমাত্রেই সংস্কৃত-কলেজে অধ্যয়ন করিতে পারিবে। শিক্ষাসমাজ রিপোর্টে সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। ইহা শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণেরা আপত্তি করিলেন যে, 'শূদ্রের সন্তানেরা সংস্কৃত-ভাষা কদাচ শিক্ষা করিতে পাইবে না।' তাহাতে অগ্রজ মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, 'পণ্ডিতেরা তবে কেমন করিয়া সাহেবদিগকে সংস্কৃত-শিক্ষা দিয়া থাকেন ? আর সভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত দেব শূদ্র-বংশোদ্ভব, তবে তাঁহাকে কি কারণে সংস্কৃত-শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল ?' এইরূপে অগ্রজ মহাশয়ের দ্বারা সকল আপত্তি খণ্ডিত হইয়াছিল। তাঁহার মত এই যে, শূদ্র-সন্তানেরা ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, ও দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে পারিবেন, শাস্ত্রের কোনও স্থানে ইহার বাধা নাই। কেবল ধর্মশাস্ত্র স্মৃতি অধ্যয়ন করিতে

পারিবেন না। তজ্জন্য শূদ্রগণের স্মৃতির শ্রেণীতে অধ্যয়ন রহিত হইয়াছে। তদবধি শূদ্রজাতীয় সন্তানগণ সংস্কৃত-কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া সংস্কৃত-ভাষা অবাধে শিক্ষা করিয়া আসিতেছেন। শূদ্রেরা যে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতেছেন, কেবল বিদ্যাসাগর মহাশয়ই ইহার প্রধান উদ্যোগী; ইঁহার যত্নে ও আগ্রহাতিশয়েই শূদ্রগণের সংস্কৃতশিক্ষা প্রচলিত হইয়াছে এবং ইহাতে দেশের বিশেষ উপকার সাধিত হইতেছে।

তৎকালে সংস্কৃত কলেজে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যজাতির সন্তানেরা বিনা বেতনে অধ্যয়ন করিত। বেতন না লইয়া শিক্ষা দেওয়ায়, সাহেবদের নিকট বিদ্যালয়ের গৌরব থাকে না। একারণ, তিনি অতঃপর ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও শূদ্রের যে সকল নূতন বালক অধ্যয়নার্থ আসিত, তাহাদের নিকট হইতে মাসিক বেতন আদায়ের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

সাহিত্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হইলে, অগ্রে সংস্কৃত-ব্যাকরণ শিক্ষা করা অত্যাবশ্যক, নচেৎ সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি লাভ হয় না। অনেক কৃতবিদ্য বিচক্ষণ বিষয়ী লোক, সংস্কৃত-ভাষা শিখিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন, কিন্তু ব্যাকরণে অজ্ঞতাপ্রযুক্ত সংস্কৃত অধ্যয়নে বঞ্চিত হইয়াছেন। অধ্যাপকগণ সুকুমারমতি শিশুগণকে ব্যাকরণের যাহা উপদেশ প্রদান করিতেন, বালকগণ তাহা কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিত, কোন বালকই ভালরূপ বুঝিতে পারিত না। শুকপক্ষীকে লোকে যেমন রাধাকৃষ্ণ পাঠ শিক্ষা দেয়, অনেকবার শিক্ষা দেওয়ায় বনের পক্ষীও যেমন ঐ নাম বলিতে পারে; কিন্তু রাধাকৃষ্ণ যে কি পদার্থ তাহা তাহার কখনই বোধগম্য হয় না; ব্যাকরণেও তাহাদের সেইরূপ ব্যুৎপত্তি জন্মিত।

সন ১২৫৮ সালের ১লা অগ্রহায়ণ অগ্রজ মহাশয়, অল্পবয়স্ক বালকগণের আশু সংস্কৃত-ভাষার অধ্যয়নের সৌকর্যার্থে ব্যাকরণের 'উপক্রমণিকা' নামক পুস্তক রচনা করিয়া মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিলেন। ইহার মধ্যে সন্ধি, শব্দ, ধাতু, কৃদন্ত, কারক, সমাস, তদ্ধিত আছে। সংস্কৃত-ভাষায় অধিকাংশ পুস্তক দেবনাগর অক্ষরে লিখিত থাকে; একারণ, 'উপক্রমণিকা'-র শেষভাগে দেবনাগর অক্ষরের বর্ণ-পরিচয়ও মুদ্রিত হইয়াছে। 'উপক্রমণিকা' শেষ করিয়া সাহিত্য বুঝিতে পারিবে না, এই জন্য শেষে সরল-ভাষায় সংস্কৃত গদ্য-রচনাও সন্নিবেশিত হইয়াছে। বিদ্যার্থী বালকগণ ছয় মাসের মধ্যে 'উপক্রমণিকা' পাঠ করিয়া, সংস্কৃত-ভাষা শিখিতে সক্ষম হয় দেখিয়া, সর্বসাধারণ লোকে অগ্রজের এই লোকাতীত ক্ষমতায় আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিলেন।

'উপক্রমণিকা' অধ্যয়ন করিয়াই 'রঘুবংশ' প্রভৃতি অধ্যয়ন করা শিশুগণের পক্ষে দুরূহ বিবেচনা করিয়া, পঞ্চতন্ত্র গ্রন্থ হইতে কতিপয় সরল গল্প উদ্ধৃত করিয়া, সন ১২৫৮ সালের ১লা অগ্রহায়ণ, 'সংস্কৃত ঋজুপাঠ' নামক পুস্তক মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন। সন ১২৫৮ সালের ২২শে ফাল্গুন রামায়ণের কতিপয় শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া, ২য় ভাগ 'ঋজুপাঠ' মুদ্রিত করেন। তৎপরে 'হিতোপদেশ'-এর সরল গদ্য ও পদ্য এবং

"মহাভারত', 'বিষ্ণুপুরাণ', 'ঋতুসংহার', 'বেণীসংহার' ও 'ভট্টিকাব্য' এই সকল গ্রন্থের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া, তৃতীয় ভাগ 'ঋজুপাঠ' মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন। বালকেরা এক বৎসরের মধ্যে 'ঋজুপাঠ' প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ অধ্যয়ন করিয়া, অনায়াসে সাহিত্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার অধিকার পাইয়া থাকে, এবং সংস্কৃত রচনা করিবারও যে সামান্যরূপ ক্ষমতালাভ করিয়া থাকে, তাহা বিলক্ষণরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। ব্যাকরণের 'উপক্রমণিকা' প্রচার না হইলে, বিষয়ী লোক প্রভৃতি কখনই সংস্কৃত অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইতে সক্ষম হইতেন না। ফলত বিদ্যাসাগর মহাশয়ই সংস্কৃত-ভাষা শিখিবার সহজ-পথপ্রদর্শক।

কলিকাতায়, গ্রীষ্মের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব, ঐ সময় কলিকাতায় থাকিয়া পাঠ করা একান্ত কষ্টকর; একারণ, ঐ সময়ে অবকাশের আবশ্যক বিবেচনা করিয়া বৈশাখ, জৈষ্ঠ দুই মাস অবকাশের জন্য শিক্ষাসমাজে আবেদন করিয়া কৃতকার্য হন। তদবধি বাঙ্গালাদেশে ঐ দৃষ্টান্তে ক্রমশ গ্রীষ্মাবকাশ প্রবর্তিত হইয়াছে।

অগ্রজ মহাশয় ১১৫৯ সালের গ্রীষ্মাবকাশে কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়া, পদব্রজে ছয় ক্রোশ অন্তর চণ্ডীতলা গ্রামের এক পান্থনিবাসে রাত্রিযাপনপূর্বক, পরদিবস পদব্রজেই তথা হইতে কুড়ি ক্রোশ অন্তর বীরসিংহায় বাটীতে পৌঁছিয়াই, পিতা মাতা ভাই ভগিনী ও প্রতিবেশী বন্ধুবর্গের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

পর দিবস হইতে গ্রামস্থ নিরুপায়দিগকে বিবেচনামত কিছু কিছু দিয়া সাহায্য করিতে লাগিলেন; ইহা দেখিয়া গ্রামের ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের অনেকে ইঁহাকে ধনশালী বলিয়া স্থির করিলেন। বোধ হয়, এই কারণেই গ্রামস্থ ব্যক্তিদের যোগে ৩০শে বৈশাখ আমাদের বাটীতে ডাকাইতি হয়। ঐ দিবস আমরা রাত্রি নয়টার পর ভোজনান্তে অন্তঃপুরে শয়ন করিয়াছি, সদর বাটীতে প্রায় ত্রিশ জন পুরুষ নিদ্রা যাইতেছিলেন, এতদ্ব্যতীত দুই জন গ্রাম্য-চৌকিদারও জাগরিত ছিল। নিশীথসময়ে বাটীর সম্মুখে প্রায় চল্লিশ জন লোক ভয়ানক চীৎকার করিয়া উঠিল; ঐ চীৎকার-শ্রবণে আমাদের সকলেরই নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন, ডাকাইতদল মশাল জ্বালিয়া মধ্যদ্বার ভাঙ্গিতেছিল, তদ্দর্শনে দাদা অত্যন্ত ভীত হইলেন। আমরা অলক্ষিত-ভাবে খিড়কির দ্বার দিয়া, তাঁহাকে লইয়া বাটী হইতে প্রস্থান করি। দস্যুগণ, অগ্রজকে ধরিতে পারিলে, টাকার জন্য বিলক্ষণ যাতনা দিত। অনন্তর দস্যুগণ যথাসর্বস্ব লুঠিয়া লইয়া প্রস্থান করিল। রাত্রিতেই ঘাঁটাল-থানার দারোগাকে সংবাদ দেওয়ায়, তিনি পরদিন প্রাতে পৌঁছিয়া, পুলিশকর্মচারিদের প্রথানুসারে গোলমাল করায়, পিতৃদেব বলিলেন, 'আপনি কুলীন-ব্রাহ্মণের ছেলে বলিয়া আপনার মর্যাদা রাখিতে পারি, কিন্তু এ সম্বন্ধে আপনাকে কিছু দিতে পারি না।' অনন্তর পিতৃদেব পরিবারবর্গের কাহারও দ্বিতীয় বস্ত্র না থাকায় ও ঘটী, বাটী, থালা ইত্যাদি কিছুমাত্র না থাকায়, ঐ সকল দ্রব্য ক্রয় করিবার জন্য উদয়গঞ্জ ও খড়ার গ্রামে গমন করিলেন। ইত্যবসরে অগ্রজ মহাশয় বাটীর সম্মুখে ভ্রাতা ও বন্ধুবর্গ

লইয়া, কপাটী খেলা আরম্ভ করিলেন। দারোগাবাবু ফাঁড়ীদারকে বলিলেন, 'এ বামুনের (ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের) এত কি জোর যে, আমি দারোগা, আমার মুখের উপর জবাব দেয় যে, এক পয়সাও দিব না; এবং ইহাও অতি আশ্চর্যের বিষয় যে, (অঙ্গুলি দ্বারা দাদাকে দেখাইয়া) ঐ ছোঁড়াটা কি রকমের লোক; কল্য ডাকাইতি হইয়াছে, আজ সকালেই বাটীর সম্মুখে কপাটী খেলিতেছে।' ফাঁড়ীদার বলিল, 'হুজুর, ইনি সামান্য লোক নহেন। ইনি দেশে আসিলে, জাহানাবাদের ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট বাবু ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল, বন্ধুভাবে এখানে আসিয়া ইঁহার সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া, আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করেন, এবং শুনা যায় যে, বড় লাট ও ছোট লাট সাহেবের সহিত ইঁহার বন্ধুত্ব আছে, ইঁহার মত লইয়া জজ ম্যাজিস্ট্রেট বাহাল হয়।' ইহা শুনিয়া দারোগা স্তব্ধ হইল, এবং শান্তভাবে কার্য করিল, ডাকাইতির কোন কিনারা হইল না। গ্রীষ্মকালের শেষে কলিকাতায় আসিবার পর, এক দিবস ছোট লাট হেলিডের সহিত দাদার সাক্ষাৎ হইলে, কথা প্রসঙ্গে হেলিডে সাহেব বলিলেন, 'তুমি অতি কাপুরুষ, বাটীতে ডাকাইত পড়িল, আর তুমি বিষয় রক্ষা না করিয়া ও তাহাদিগকে না ধরিয়া, কাপুরুষের মত পলায়ন করিলে, ইহা অপেক্ষা তোমার পক্ষে আর কি লজ্জার বিষয় হইতে পারে।'

ঐ সময়ে দেশহিতৈষী হেলিডে সাহেব, লেপ্টেনেণ্ট গবর্নরের পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। ঐ পদ ভারতবর্ষে এই নূতন স্থাপিত হইল। ঐ সময়ে এডুকেশন কৌন্সেলের কার্যদক্ষ সেক্রেটারি ডাক্তার ময়েট সাহেব, কিছু দিনের জন্য অবকাশ গ্রহণ করিয়া, স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করেন। হেলিডে সাহেব বাহাদুর নূতন লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর হইয়া, সাবেক শিক্ষা-সমাজের পরিবর্তন করেন। এডুকেশন কৌন্সেল নামের পরিবর্তে এক্ষণে পব্‌লিক ইন্‌স্টিটিউসন এই নামকরণ করিলেন। সেক্রেটারি নাম না রাখিয়া, ডিরেক্টরের পদ স্থাপন করেন ও ঐ পদে গর্ডন ইয়ং সাহেবকে নিযুক্ত করেন। তৎকালে বিদ্যাসাগর মহাশয়, হেলিডে সাহেবকে বলেন যে, 'আপনি অল্পবয়স্ক সিবিলিয়ান বালককে এতবড় গুরুতর ভার দিয়া ভাল করেন নাই; তিনি এ প্রদেশের রীতি-নীতি আচার-ব্যবহার কিছুমাত্র পরিজ্ঞাত নন; যেহেতু ঐ সাহেব সিবিলিয়ান, অহঙ্কৃত ও বালক, বিশেষত উনি অল্পদিন হইল ভারতবর্ষে সমাগত হইয়াছেন; এ প্রদেশের রীতি-নীতি কিছুই পরিজ্ঞাত নহেন, শিখিতে আরও কিছুকাল লাগিবে। ইনি কিরূপে এই গুরুতর ভার বহন করিবেন, বুঝিতে পারি না। ডাক্তার ময়েট, বহুকাল হইতে শিক্ষাসমাজের কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন, তাঁহার প্রতি এ ভার সমর্পণ করিলে, সর্বতোভাবে ভাল হইত।' ইহা শ্রবণ করিয়া, হেলিডে সাহেব বলিলেন, 'আমার নিজের এ বিষয় পরিদর্শনে বিলক্ষণ ইচ্ছা আছে। আমি নিজেই সকল কাজ দেখিব, ইয়ং সাহেব উপলক্ষমাত্র; তুমি দুই মাস ইয়ং সাহেবকে কার্যশিক্ষা দাও। ইয়ং বুদ্ধিমান, ত্বরায় কার্যদক্ষ হইবার

সম্ভাবনা।' হেলিডের আদেশে, বিদ্যাসাগর মহাশয় কয়েক মাস, মধ্যে মধ্যে ডিরেক্টার আফিসে যাইয়া, ঐ সাহেবকে উপদেশ প্রদান করিয়া কার্যক্ষম করিয়া দেন। যে কয়েক মাস ইয়ং সাহেব কার্য শিক্ষা করেন, সেই কয়েক মাস অগ্রজকে বিশেষ সম্মান করিতেন।

অগ্রজ মহাশয়, জন্মভূমি বীরসিংহা ও তৎসন্নিহিত গ্রামবাসী লোকগণের ও বালকবৃন্দের মোহান্ধকার নিবারণমানসে বিদ্যালয় স্থাপন করিবেন, শৈশবকাল হইতে এ বিষয় মনে মনে আন্দোলন করিতেছিলেন। কিন্তু অর্থাভাবপ্রযুক্ত, বিদ্যালয় স্থাপন করিব এই কথা, এতাবৎকাল পর্যন্ত ব্যক্ত করিতে পারেন নাই। এক্ষণে মাসিক তিন শত টাকা বেতন পাইতেন ও 'বেতালপঞ্চবিংশতি', 'জীবনচরিত', 'বাঙ্গালার ইতিহাস', 'উপক্রমণিকা', 'বোধোদয়' প্রভৃতি পুস্তক বিক্রয়েব লাভও যথেষ্ট হইত, একাবণ, ভ্রাতৃচতুষ্টয়সহ ফাল্গুনমাসে জলপথে উলুবেড়ে, গেঁয়োখালি, তমোলুক, কোলা, বাকসী, গোপীগঞ্জ হইয়া তৃতীয় দিবসে ঘাঁটালে নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া বাটী যান, এবং বাটীতে সমুপস্থিত হইয়া, পিতৃদেব মহাশয়কে বলেন যে, 'আপনি দেশে টোল কবিয়া দেশস্থ লোককে বিদ্যাদান কবিবেন, ইহা বহুদিন পূর্বে মধ্যে মধ্যে প্রায় ব্যক্ত করিতেন, এক্ষণে মহাশয়ের আশীর্বাদ প্রভাবে অবস্থা ভাল হইয়াছে, অতএব আমি বীরসিংহায় একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিতে মানস করিয়াছি।' ইহা শ্রবণ করিয়া, জননীদেবী ও পিতৃদেব মহাশয় পবম আহ্লাদিত হইয়া, দাদার মুখচুম্বন কয়িয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন। পরদিন বিদ্যালয়ের স্থান নিরূপণ হইল। ভূস্বামী রামধন চক্রবর্তী প্রভৃতিকে মূল্য দিয়া ভূমিবিক্রয়ের কোবালাপত্র লিখাইয়া লইলেন। ইহার পরদিবস মজুব পাওয়া যায় নাই দেখিয়া, দাদা স্বয়ং কোদালগ্রহণপূর্বক ভ্রাতৃবর্গসহ মাটি খনন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পরে বিদ্যালয়গৃহ শীঘ্র নির্মাণজন্য, পিতৃদেবকে সহস্রাধিক মুদ্রা দিয়া কলিকাতায় গমন করিলেন।

১৮৫৩ খৃঃ অব্দে গ্রীষ্মাবকাশের পূর্বে চৈত্রমাসে, মধ্যম ও তৃতীয় সহোদর ও তৎকালীন বাসায় যে যে আত্মীয় সংস্কৃত-কলেজের উচ্চশ্রেণীতে অধ্যয়ন করিত, তাহাদিগকে দেশস্থ বালকগণের শিক্ষাকার্য সম্পাদনার্থে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। বিদ্যাভবন প্রস্তুত হইতে আরও চারি মাস সময় অতিবাহিত হইবে, একারণ, দেশস্থ স্বীয় বাসভবনে ও সন্নিহিত প্রতিবেশীলোকের ভবনে, ফাল্গুনমাসে বীরসিংহাগ্রামে বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ইতিপূর্বে এ প্রদেশে কোনও স্কুল স্থাপিত হয় নাই। স্থানীয় অনেকের সংস্কার ছিল, স্কুলে অধ্যয়ন করিলে খৃস্টান হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলিতেন, ছেলেরা নাস্তিক হইবে। কোন কোন ভট্টাচার্যের সংস্কার ছিল, জাতিভ্রংশ হইবে; ইত্যাদি কত লোকে কত কথাই প্রকাশ করিতে লাগিল। তৎকালে বীরসিংহাবাসী লোকদিগের অবস্থা অত্যন্ত মন্দ ছিল। সদ্গোপেরা কৃষিকর্ম করিয়া দিনপাত করিত। ইহাদের সন্তানগণ গরু চরাইত;

কেহ কেহ অন্যের ক্ষেত্রে মজুরি করিয়া দিনপাত করিত। অনেকের দিনান্তে অন্ন-জুটা দুষ্কর হইত। যাহা হউক, বিদ্যালয় স্থাপন করিবামাত্র পাঁচ-সাত দিনের মধ্যেই প্রায় শতাধিক বালক অধ্যয়নার্থ প্রবিষ্ট হইল। ক্রমশ সন্নিহিত গ্রাম পাথরা, উদয়গঞ্জ, কুরাণ, গোপীনাথপুর, যত্নপুর, দণ্ডীপুর, ঈড়পালা, দীর্ঘগ্রাম, সাততেঁতুল, আমড়াপাট, পুড়শুড়ী, মামূরল, আকপপুর, আগর, রাধানগর, ক্ষীরপাই প্রভৃতি গ্রাম হইতে যথেষ্ট বালক বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। পাঠ্যপুস্তক ক্রয় করে, অনেকেরই এমন সঙ্গতি ছিল না। বিদ্যালয় অবৈতনিক হইল। অগ্রজ মহাশয়, কলিকাতা হইতে প্রায় তিন শতের অধিক বালকের জন্য পাঠ্যপুস্তক এবং কাগজ, শ্লেট প্রভৃতি অকাতরে প্রেরণ করিতেন। স্বগ্রামের যে যে ছাত্রের বস্ত্রাভাব ছিল, তাহাদিগকে বস্ত্র ক্রয় করিয়া দিবার জন্য, আমাকে-আদেশ দেন। ঐ সময়ে বিদেশস্থ অনেক অধ্যাপকের পুত্র, অধ্যয়ন-মানসে সমাগত হন।

যাহারা অন্যের বাটীতে বেতন গ্রহণ করিয়া দিবসে গরু চরাইত, বা যাহারা দিবসে কৃষিকর্ম করিত, তাহাদের লেখাপড়া শিক্ষার জন্য নাইট-স্কুল স্থাপন করিলেন। ঐ স্কুলে সন্ধ্যার পর রাত্রি দুই প্রহর পর্যন্ত দুইজন শিক্ষক নিযুক্ত ছিলেন; বিনামূল্যে পুস্তক দিতে হইত, এই সকল বিষয়ে যাহা ব্যয় হইত, তাহা অগ্রজ মহাশয় স্বয়ং নির্বাহ করিতেন। ঐ সময়ে এ প্রদেশে ডাক্তারি চিকিৎসার প্রচলন ছিল না। অগ্রজ মহাশয়, দেশস্থ লোকের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া, দাতব্যচিকিৎসালয় স্থাপন করেন। সকলেই বিনামূল্যে ঔষধ পাইত। বীরসিংহা, বোয়ালিয়া, পাথরা, মামুদপুর প্রভৃতি সন্নিহিত গ্রামে কাহারও বাটীতে চিকিৎসা করিতে হইলে, পদব্রজে যাইয়া বিনা ভিজিটে চিকিৎসা করিবার ব্যবস্থা ছিল। এতদ্ব্যতীত দুঃস্থ লোকের পথ্যের জন্য সাগু, বাতাসা, মিছরি প্রভৃতি দেওয়া হইত।

তৎকালে এ প্রদেশের স্ত্রীলোকেরা লেখাপড়া শিক্ষা করিত না। বীরসিংহায় সর্বাগ্রে বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। সকল বালিকাই বিনামূল্যে পুস্তক পাইত। যৎকালে কলিকাতায় প্রথম বেথুন-ফিমেল-স্কুল স্থাপিত হয়, তৎকালে কলিকাতা-বাসী সম্ভ্রান্ত দলপতিগণ ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত লোকেরা নানারূপ গোলযোগ করিয়া-ছিলেন; কিন্তু বীরসিংহায় বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হইলে, প্রতিবেশীবর্গ সন্তুষ্টচিত্তে স্বীয় স্বীয় দুহিতাদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দিতেন। তজ্জন্য, সন্নিহিত অপরাপর গ্রামস্থিত লোক সকল কোনও প্রকার আপত্তি উত্থাপন করেন নাই। বালক-বিদ্যালয়ে প্রথমত বাংলা এবং সংস্কৃত কাব্য ও অলঙ্কারাদির শিক্ষা দেওয়া হইত; কিছুদিন পরে, অধিক সংস্কৃত সাহিত্যাদি অধ্যয়ন না করাইয়া, রীতিমত ইংরাজী ও সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া হইত। অগ্রজ মহাশয়, উক্ত বিদ্যালয়ে মাস্টার ও পণ্ডিতের বেতন মাসিক তিন শত টাকা প্রদান করিতেন; এতদ্ব্যতীত পুস্তকাদির জন্য

মাসিক অন্তত এক শত টাকা ব্যয় হইত। অগ্রজের পরম আত্মীয় বাবু প্যারিচরণ সরকার তাঁহার 'ফার্স্ট বুক', 'সেকেণ্ড বুক', 'থার্ডবুক' প্রভৃতি পুস্তকগুলি বালকদিগকে পাঠার্থ বিনামূল্যে দান করিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, বীরসিংহার বালিকা-বিদ্যালয়ে মাসে মাসে ত্রিশ টাকা ব্যয় করিতেন। ডাক্তারখানায়, ডাক্তার কম্পাউণ্ডারের বেতন এবং বাজে খরচ ও ঔষধাধির মূল্য প্রভৃতিতে মাসে মাসে এক শত টাকা প্রদান করিতেন। নাইট-স্কুলে প্রতিমাসে পনের টাকা প্রদান করিতেন।

ইতিপূর্বে গ্রামে কয়েকটি পাঠশালা ছিল; অবৈতনিক স্কুল হওয়াতে তাহা উঠিয়া গেল। পাঠশালার শিক্ষকগণের দিনপাতের জন্য কোন উপায় না থাকায়, পাঠশালার গুরুমহাশযেরা অগ্রজের নিকট দুঃখ জানাইতে লাগিলেন। একারণ, তিনি তাঁহাদের প্রতি দয়া করিয়া, আমায় আদেশ করেন যে, ঈশ্বরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হরচন্দ্র আচার্য, উমাচরণ চট্টোপাধ্যায় ও মধুসূদন ভট্টাচার্য এই কয়েকজনকে তুমি প্রাতে ও রাত্রিতে পরিশ্রমসহকারে বাঙ্গালা পুস্তক ও 'উপক্রমণিকা', 'পঞ্চতন্ত্র', 'রামায়ণ' প্রভৃতি ত্বরায় শিখাইয়া দাও। অদ্য হইতে ইহারা নিম্ন-শ্রেণীর শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। পাঠশালায় ইহাদের যেরূপ প্রাপ্য ছিল, তদপেক্ষায় কিছু অধিক বেতন পাইবে; ভাল করিয়া শিখিতে পারিলে, রীতিমত বেতন দেওয়া যাইবে। তাঁহার বাল্যকালের গুরুমহাশয় কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়কে নিম্ন-শ্রেণীর ছোট ছোট ছেলেদিগের বর্ণ-পরিচয় শিক্ষা দিবার নিমিত্ত নিযুক্ত করেন।

খৃঃ ১৮৫৫ সালে সংস্কৃত-কলেজের অধ্যক্ষতা সত্ত্বেও মহানুভব লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর হেলিডে সাহেব বাহাদুর, ইহাকে হুগলি, বর্ধমান, নদীয়া ও মেদিনীপুর, এই জেলাচতুষ্টয়ের স্থানে স্থানে বিদ্যালয় সংস্থাপন ও পরিদর্শন জন্য মাসিক দুই শত টাকা বেতনে স্পেসিয়াল ইন্‌স্পেক্টার নিযুক্ত করেন।

ঐ সময়ে, অগ্রজের সংস্কৃত-কলেজের প্রিন্সিপালের বেতন তিন শত টাকা, উপরি উক্ত কার্যের বেতন দুই শত টাকা, এতদ্ব্যতীত জেলায় জেলায় পরিভ্রমণের ব্যয় স্বতন্ত্র নির্দিষ্ট ছিল।

তৎকালে প্রাট সাহেব এবং আরও দুই জন ইংরাজ, স্কুল ইন্‌স্পেক্টারের পদে নিযুক্ত হন। এই সময়ে ইংলণ্ডের রাজপুরুষদের সহিত শিক্ষা-বিষয়ে পরস্পর পত্র লেখা চলিতেছিল। ত্বরায় স্কুল বসাইবার জন্য ইংলণ্ড হইতে আদেশপত্র আসায়, অগ্রজ মহাশয়, সত্বর স্থানে স্থানে স্কুল বসাইতে লাগিলেন। কিন্তু ডিরেক্টর ইয়ং সাহেব, আদেশ-পত্রের বিপরীত অর্থ করিয়া ক্ষান্ত থাকিলেন। অপর তিন জন স্কুল-ইন্‌স্পেক্টার সাহেব এবং লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর হেলিডে সাহেব বিপরীত বুঝিয়া, অগ্রজকে কিছুদিনের জন্য স্কুল বসাইতে ক্ষান্ত থাকিতে বলিলেন। তিনি ক্ষান্ত না হওয়ায়, ডাইরেক্টার এ বিষয়ে লেপ্টেনেণ্ট গবর্নরকে জানাইলেন। লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর, অগ্রজ মহাশয়কে ডাকাইয়া, অনেক বাদানুবাদের পর ঐ বিষয় বিলাতে

রাজপুরুষদিগের গোচর করিলেন। রাজপুরুষগণ এই সংবাদ পাইয়া, লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর বাহাদুরকে ত্বরায় বিদ্যালয় স্থাপনের আদেশ পাঠান এবং ঐ পত্রে অগ্রজের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এই সূত্রে তাঁহার সহিত ডাইরেক্টর ইয়ং সাহেবের অপ্রণয় বদ্ধমূল হয়। এই অপ্রণয়ই তাঁহার ভাবী পদ-পরিত্যাগের মূল কারণ।

আদর্শ বিদ্যালয়ে বা অন্যান্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে যাঁহারা শিক্ষকতার কার্যে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহাদের শিক্ষার জন্য অগ্রজ, গবর্নমেণ্টকে অনুরোধ করিয়া, কলিকাতায় নর্‌ম্যাল স্কুল স্থাপন করেন। প্রথমত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত, পণ্ডিত মধুসূদন বাচস্পতি ও রাজকৃষ্ণ গুপ্ত, নর্‌ম্যাল স্কুলের শিক্ষকতাপদে নিযুক্ত হন। কিছুদিন পরে অক্ষয়বাবু শিরঃপীড়া প্রভৃতি নানা রোগে আক্রান্ত হইয়া কর্ম পরিত্যাগ করিলে, তৎকালের সংস্কৃত-কলেজের সর্বপ্রধান ছাত্র বাবু রামকমল ভট্টাচার্যকে নর্‌ম্যাল স্কুলের প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত করেন। রামকমল বাবু সংস্কৃত ও ইংরাজীতে অদ্বিতীয় লোক ও অসাধারণ ধী-শক্তিসম্পন্ন; তাঁহার ন্যায় বুদ্ধিমান লোক সম্প্রতি দৃষ্টিগোচর হয় নাই। একারণ, বিদ্যাসাগর মহাশয়, রামকমলকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন; তাঁহার আশা ছিল, রামকমলের দ্বারা দেশের অনেক উপকার হইবে। তৎকালে মফঃস্বলের টোল হইতে অনেক ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও অপরাপর লোক, বিদ্যালয়ের পণ্ডিতের কর্ম প্রাপ্তাভিলাষে নর্‌ম্যালে প্রবিষ্ট হইয়া, শিক্ষাজন্য পরীক্ষা দিতে লজ্জিত হইতেন না। যাঁহারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেন, তাঁহারাই নর্‌ম্যালে প্রবিষ্ট হইতে পারিতেন। ঐ সময় সংস্কৃত-কলেজের অনেক কৃতবিদ্য ছাত্র, কর্মপ্রার্থনায় নর্‌ম্যালে প্রবিষ্ট হইয়া অঙ্ক, ভূগোল ও পদার্থবিদ্যা শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হন। কয়েক মাস পরে, যাঁহারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন, অগ্রজ মহাশয় তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও আদর্শ-বিদ্যালয়ে, কাহাকেও ইংরাজী-বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন।

রামকমলবাবু মধ্যে মধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বলিতেন. 'কত টাকা হইলে আপনার খ্যাতি কিনিতে পারিব।' বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্ম পরিত্যাগ করিলেন, উড্‌রো সাহেব নর্‌ম্যাল বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধায়ক হইয়াছিলেন। রামকমলবাবুর সহিত উড্‌রো সাহেবের সদ্ভাব ছিল না; মধ্যে মধ্যে বিলক্ষণ বাদানুবাদ হইত। একদিবস উড্‌রো সাহেব কোন অন্যায় কথা বলায়, অসহ্য বোধ হইলে, অথবা অন্য কোন কারণে রামকমলবাবু সেইদিনই উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করেন। এই সংবাদে অগ্রজ শোকাভিভূত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। সংবাদদাতা তাঁহাকে বলেন, সাত-আট জন ব্রাহ্মণ প্রেরণ করুন, তাঁহারা শবকে মেডিকেল কলেজে লইয়া যাইবেক। তথায় পরীক্ষাকার্য সমাধা হইলে পর, সেই মৃতদেহ নিমতলার ঘাটে দাহ-কারণ লইয়া যাইতে হইবে। উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে বলিয়া, আমাদের পাড়ার কোন ব্রাহ্মণ দাহ করিতে যাইতে স্বীকার পাইতেছেন না; আর মুদ্দফরাসের দ্বারা বহন করিয়া লইয়া গেলে, দুর্নাম ও জাতিনাশ হইবে।

বিদ্যাসাগর মহাশয়, উক্ত শব-বহন-কারণ অনেককে অনুরোধ করেন, কিন্তু কেহই সম্মত হয় নাই; পরিশেষে ভ্রাতা ঈশানচন্দ্র, পিতৃব্যপুত্র পীতাম্বর, মাতুলপুত্র ঈশ্বর ঘোষাল, ভগিনীপতি যদুনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি আট জনকে প্রেরণ করেন। উঁহারা তাঁহার বাটী হইতে শব বহন করিয়া, মেডিকেল কলেজে লইয়া যান; তথায় পোস্টমর্টম অর্থাৎ পরীক্ষার পর, পুনরায় নিমতলার ঘাটে লইয়া গিয়া, দাহাদি-কার্য সম্পন্ন করেন।

ঐ সময় বিদ্যাসাগর মহাশয়কে প্রতি সপ্তাহের মধ্যে একদিন অর্থাৎ বৃহস্পতি-বারে ছোট লাট হেলিডে সাহেব বাহাদুরের বাটী যাইতে হইত। তিনি তাঁহাকে চটিজুতা, থানের ধুতি ও থানের চাদর এই তিনের পরিবর্তে পেণ্টলন, চাপকান, পাগড়ি, মোজা ও বুটজুতা পরিধান করিবার আদেশ দেন। অগ্রজ মহাশয়, অগত্যা কয়েকবার গোপনে সাহেবের কথিতমত পোশাক পরিধান করেন; কিন্তু উক্ত বেশ-ধারণে লজ্জিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধের ন্যায় ক্লেশ অনুভব করিয়া, লেপ্টেনেণ্ট গবর্নরের সমক্ষে বলেন, 'আপনার সহিত আমার এই শেষ-দেখা, আমি এই বেশ ধারণ করিতে বা সং সাজিতে পারিব না, ইহাতে আমার চাকরি থাক বা না থাক। ইহা শ্রবণ করিয়া লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর, দাদাকে তাঁহার অভিলষিতবেশে আসিবার আদেশ দিলেন। তাঁহার আজীবনে এই কয়েকবার ভিন্ন চটিজুতা, থান ধুতি, থানের চাদর পবিত্যাগ করেন নাই। পরে রোগ ও বার্ধক্য-নিবন্ধন চিকিৎসকের উপদেশে সময়ে সময়ে ফ্লানেলের জামা ও উড়ানি ব্যবহার করিতে দেখা গিয়াছে।

বাবু শ্যামাচরণ বিশ্বাস ও বিমলাচরণ বিশ্বাস অগ্রজের পরমবন্ধু ছিলেন। কলিকাতা হইতে নয় ক্রোশ অন্তরে তাঁহাদের পৈতৃক বাস। তাঁহারা সংস্কৃত-কলেজের সম্মুখে বাটী নির্মাণ করিয়া বাস করিতেন। সময়ে সময়ে তাঁহারা পৈতৃক বাসভূমি পাঁইতেল গ্রামে যাইতেন। এক বৎসর জগদ্ধাত্রীপূজা উপলক্ষে অগ্রজ, উক্ত শ্যামাচরণ বিশ্বাসের সহিত পাঁইতেল গ্রামে গমন করেন। তথায় রাত্রিজাগরণে ও হিম লাগায় কলিকাতায় প্রত্যাগত হইবার পর, তাঁহার জ্বর হইল, পরে নাসারোগ দৃষ্ট হইলে পর, তৎকালীন বহুবাজারস্থ বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। জ্বর ভাল হইলেও নাসারোগের নিবৃত্তি না হওয়ায়, কয়েক বৎসর নস্য ব্যবহার করিয়াছিলেন।

ইহার কিয়দ্দিবস পরে উদরাময় ও শরীরের দুর্বলতা-নিবারণ-মানসে জনৈক ব্যায়ামশিক্ষক (হিন্দুস্থানী পালোয়ান) রাখিয়া, কয়েক মাস ব্যায়াম শিক্ষা করেন।

এই সময়ে অগ্রজ মহাশয়, বৈঁচি গ্রামে যাইয়া, বাবু গবিনচাঁদ বসুর ভবনে গমন করেন এবং তাঁহার বাটীতেই একটি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তৎকালে তথাকার সম্ভ্রান্ত ও ধনশালী বাবু রাখালদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সাহায্যে বৈঁচিতে একটি ইংরাজী-বঙ্গবিদ্যালয় স্থাপন করেন। বাঙ্গালা মডেল-স্কুলের স্থান

নির্দিষ্ট-করণ-জন্য, প্রথমে হুগলি-জেলার অন্তঃপাতী শ্যাখালা গ্রামে পণ্ডিত প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হন। উক্ত গ্রামে বহুসংখ্যক ভদ্রলোকের বাসস্থান অবলোকন করিয়া, তথায় বাঙ্গালা আদর্শ-বিদ্যালয় সংস্থাপনের উপযুক্ত স্থান স্থির করিলেন। তৎপরে খানাকুল কৃষ্ণনগর গ্রামে বাবু প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী মহাশয়ের সদনে অবস্থিতি করিয়া দেখিলেন, ঐ গ্রাম অতি সমাজস্থান, অনেক ব্রাহ্মণ-কায়স্থের আবাসভূমি, একারণ, কৃষ্ণনগরে বিদ্যালয় স্থাপনের অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। তদনন্তর হারোপ, বাঙ্গালপুর, কামারপুকুর, ক্ষীরপাই প্রভৃতি গ্রামে যাইয়া আদর্শ-বিদ্যালয় স্থাপনের উৎকৃষ্ট স্থান নিরূপণ করেন। পরে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত রাণীগোপালনগর, বাসুদেবপুর, মালঞ্চ, বদনগঞ্জ প্রভৃতি গ্রামে এবং ঐ জেলাস্থ অন্যান্য গ্রামে যাইয়া, বিদ্যালয়ের স্থান নিরূপণ করেন। তদনন্তর জেলা বর্ধমানস্থ জৌগ্রাম, মানকর প্রভৃতি গ্রামে যাইয়া এবং নদীয়া জেলাস্থ মফঃস্বলের নানাগ্রামে যাইয়া, বিদ্যালয়ের স্থান মনোনীত করেন।

উক্ত চারি জেলায় পরিভ্রমণকালে, পথে কেহ শারীরিক অসুস্থতাপ্রযুক্ত চলিতে অক্ষম হইয়া ভূমে পতিত আছে দেখিতে পাইলে, তিনি পাল্কী হইতে নামিয়া ঐ পীড়িত অপরিচিত পথিককে নিজের পাল্কীতে তুলিয়া দিয়া, স্বয়ং পদব্রজে গমনপূর্বক উহাকে তাহার বাটীতে অথবা বাটীর নিকটস্থ কোন বিপণীতে পৌঁছাইয়া দিতেন এবং পান্থনিবাসের অধিকারীকে তাহার আবশ্যক ব্যয়ের টাকা প্রদান করিতেন। এইরূপ বিপদাপন্ন যে সকল লোক তাঁহার দৃষ্টিপথে পড়িয়াছিল, তাহারা পরে আসিয়া অগ্রজকে পরিচয় দিত, এবং সেই সকল লোক তাঁহার পরম বন্ধু বলিয়া গণ্য হইত।

মফঃস্বল পরিভ্রমণকালে, সমভিব্যাহারে চক্‌চকিয়া টাকা, আধুলী, সিকি, দুয়ানি, পয়সা যথেষ্ট রাখিতেন। পথে দরিদ্র লোক নয়নগোচর হইলে, উহাদিগকে অকাতরে দান করিতেন। পরিভ্রমণসময়ে অর্থব্যয় করিতে কখনই কুণ্ঠিত হইতেন না। একারণ, অনেকে তাঁহাকে বলিত যে, আপনাকে আমরা বিদ্যাসাগর না বলিয়া, দয়ার সাগর বলিব। মফঃস্বল-পরিভ্রমণসময়ে অনেক নিরুপায় বালক পুস্তক, বস্ত্র ও স্কুলের বেতনের জন্য তাঁহাকে ধরিত, তিনিও সকলেরই আশা পূর্ণ করিতেন। প্রতিমাসেই উক্ত নিরাশ্রয় বালকদিগের সাহায্য করিতেন, কখনই বিস্মৃত হইতেন না। একদিন তিনি নিবর্দো দত্তপুকুরনিবাসী বাবু কালীকৃষ্ণ দত্তের বাটীতে গিয়াছিলেন; তথায় ক্ষেত্র নামক এক ব্রাহ্মণবালক অধ্যয়ন করিতে পান না শ্রবণ করিয়া, উহাকে সমভিব্যাহারে আনয়ন করেন এবং কলিকাতার বাসায় অন্ন-বস্ত্র দিয়া সংস্কৃত-কলেজে প্রবিষ্ট করিয়া দেন। অন্তত বার বৎসর কাল তাহাকে বাসায় রাখিয়া বিদ্যাশিক্ষা করান। সম্প্রতি ঐ ব্যক্তি সম্ভ্রান্ত বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। বারাসত-নিবাসী তাঁহার পরমবন্ধু ডাক্তার নবীনচন্দ্র মিত্রের বাটীতে মধ্যে মধ্যে যাইতেন; তথাকার কয়েকজন বালক তাঁহার সঙ্গে আসিয়া, বাসায়

অবস্থান করিয়া অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন। ঐরূপ বর্ধমান জেলার অন্তঃপাতী যৌগ্রাম হইতে নিমাইচরণ সিংহ বাসায় অবস্থিতি করিয়া সংস্কৃত-কলেজে শিক্ষা করেন। খাঁটুরা গোবরডাঙ্গার কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক বালক তাঁহার নিকট ক্রন্দন করায়, কয়েক বৎসর অন্নবস্ত্র দিয়া সংস্কৃত-কলেজে প্রবিষ্ট করাইয়া দেন।

এই সময়ে বর্ধমান, নদীয়া, হুগলি ও মেদিনীপুর এই জেলাচতুষ্টয়ের বিদ্যালয়-সমূহের তত্ত্বাবধানের জন্য তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য, মাধবচন্দ্র গোস্বামী, দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন ও হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টার নিযুক্ত করেন। ইঁহারা চারিজনে প্রত্যেকে এক এক জেলায় নিযুক্ত হন।

মধ্যে মধ্যে দেশে গিয়া বীরসিংহা বিদ্যালয়ের ও নাইট-স্কুলের বা রাখাল-স্কুলের অনেক দরিদ্র বালক বাটীতে ভোজন করিয়া অধ্যয়ন করিবে, এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত বিদেশস্থ অনেক ব্রাহ্মণতনয়কে নিজ বাটীতে অন্ন দিয়া, বীরসিংহা বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করাইতেন। এস্থলে উঁহাদের মধ্যে কয়েকটির নাম প্রদত্ত হইল—জেলা মেদিনীপুরের কুণ্ডাপুর গ্রামনিবাসী পণ্ডিত অন্নদাপ্রসাদ ন্যায়ালঙ্কারের পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য ও ঈশানচন্দ্র ভট্টাচার্য, নারাজোলনিবাসী দর্পনারায়ণ বিদ্যাভূষণের পুত্র দিগম্বর চক্রবর্তী, শ্রীবরাগ্রামে ভট্টাচার্য মহাশয়দের বাটীর দৌহিত্রসন্তান বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রামেড়নিবাসী রামার্চন বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলা হুগলির ঝিংকবানিবাসী দুর্গাপ্রসাদ চূড়ামণির পুত্র বরদাপ্রসাদ ও সারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য, ঐ গ্রামনিবাসী রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ন্যূনাধিক ষাট জন বালক বাটীতে ভোজন করিয়া, লেখাপড়া শিক্ষা করিত। মধ্যে মধ্যে পিতৃদেব বলিতেন যে, আমি বাল্যকালে বিলক্ষণ অন্নকষ্ট পাইয়াছি, অতএব অন্নব্যয় করা সর্বাপেক্ষা প্রধান কর্ম। পিতৃদেব স্বয়ং কুমারগঞ্জের হাটে যাইয়া, দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া আনিতেন; ছাত্র সকলকে এবং পুত্র, দৌহিত্রদিগকে একত্র বসাইয়া আহার করাইতেন। জননীদেবী সন্তুষ্টা হইয়া, নিজেই রন্ধন-পরিবেষনাদি কার্যে সমভাবে পাচক ও পাচিকাদিগের সাহায্য করিতেন। ঐ সময় অগ্রজ মহাশয়, প্রতিবৎসর বীরসিংহা বিদ্যালয়ের সাত-আট জন দরিদ্র বালককে কলিকাতায় লইয়া যাইতেন এবং উঁহাদিগকে বাসায় অন্ন-বস্ত্র দিয়া, কাহাকেও সংস্কৃত-কলেজে, কাহাকেও মেডিকেল কলেজে এবং কাহাকেও বা ইংরাজী স্কুলে অধ্যয়ন করাইতেন। কয়েক বৎসরের মধ্যে বীরসিংহা বিদ্যালয়ের শতাধিক ছাত্র মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন করে। এইরূপ প্রতি বৎসর আট-দশ জন ছাত্র কলিকাতার বাসায় ভোজন করিয়া, নরম্যাল-স্কুলে অধ্যয়ন-পূর্বক অন্যান্য মফঃস্বল-বিদ্যালয়ের শিক্ষক হইয়াছিলেন।

তৎকালের শিক্ষাসমাজের অধ্যক্ষ ডাক্তারময়েট মহোদয়, বেথুন সাহেবের স্মরণার্থ বীটনসোসাইটি নামক সমাজ স্থাপন করেন। ঐ সমাজে বিদ্যাসাগর-রচিত

সংস্কৃত সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব পঠিত হয়। অনেকের অনুরোধে অগ্রজ মহাশয়, সভাপতির অনুমতি লইয়া, উক্ত প্রস্তাব পুস্তকাকারে মুদ্রিত করেন।

বাল্যকাল হইতে ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্যন্ত অগ্রজ মহাশয়কে কখনও তামাক খাইতে দেখি নাই; পরে তামাক খাইতে আরম্ভ করেন। প্রথমত বাসায় কাহারও নিকট খাইতেন না, গোপনে অপরের বাটীতে খাইতেন। তামাক খাইবার বিশেষ কারণ এই যে, রাত্রিজাগরণ করিয়া লেখাপড়ার অনুশীলন করিতেন, তজ্জন্য দাঁতের গোড়া ফুলিত। তৎকারণেই, বাবু দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ডাক্তার মহাশয়, সর্বদা উপদেশ দিতেন যে, তামাকের ধূমে দন্তমূলের যাতনার অনেক লাঘব হইবে। একারণ, অগত্যা ডাক্তারের উপদেশানুসারে তামাক খাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু তৎকালে বাটী আগমন করিয়া পনের দিবস অবস্থিতি করিলেও আমরা কখনও তাঁহাকে তামাক খাইতে দেখি নাই। ছোট ছোট ভ্রাতৃবর্গ প্রভৃতি কেহই না দেখিতে পায় এরূপ গোপনভাবে তিনি তামাক খাইতেন।

বাল্যকালে বড়বাজারের দোয়েহাটানিবাসী জগদ্দুর্লভ সিংহের ভবনে বাসা ছিল। বাল্যকালে উক্ত সিংহের পরিবারবর্গ, অগ্রজ মহাশয়কে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। উক্ত সিংহের মৃত্যুর পর, তাঁহার পুত্র ভুবনমোহন সিংহের দুরবস্থা হইলে, উহাকে সাংসারিক-ব্যয়-নির্বাহার্থে মাসে মাসে ত্রিশ টাকা প্রদান করিতেন। উক্ত ভুবনমোহন সিংহের মৃত্যুর পর, উঁহার পত্নীকেও ঐ টাকা প্রদান করিয়া আসিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত উঁহার কন্যার বিবাহের সমস্ত ব্যয় নির্বাহ করিয়াছিলেন এবং উঁহার অভিনব জামাতার কর্ম করিয়া দিয়াছিলেন।

ঐ সময়ে জননীদেবীর মাতৃষ্বসার পুত্র শ্যামাচরণ ঘোষাল কলিকাতায় লৌহ-সিন্দুকের ও তাওয়া চাটু প্রস্তুতের ব্যবসা করিতেন। আমরা দুই ভ্রাতা পঠদ্দশায় তাঁহার বাসায় তিন মাস ছিলাম। নানা কারণে ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া তিনি অত্যন্ত কষ্টে পড়িয়াছেন এবং পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া মৃতকল্প ও শীর্ণকায় আছেন শুনিয়া, দাদা আমার দ্বারা উক্ত শ্যামাচরণ ঘোষাল মাতুল মহাশয়কে ডাকাইয়া বলেন যে, 'আপনি মাসিক কয় টাকা পাইলে, দেশে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিতে পারেন?' তাহাতে তিনি বলেন, 'যদি যাবজ্জীবন মাসে মাসে দশ টাকা করিয়া দিতে পার, তাহা হইলে নিশ্চিন্ত হইয়া দেশে অবস্থিতি করিতে পারি। আমার দ্বিতীয় কথা এই যে, তিনটি ভ্রাতুষ্পুত্রকে বীরসিংহায় তোমার বাটীতে রাখিয়া, অন্নবস্ত্র দিয়া লেখাপড়া শিক্ষা দিতে হইবে।' অগ্রজ, তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া, মাসে মাসে ঐ দশ টাকা প্রদান করেন। আর উঁহার তিনটি ভ্রাতুষ্পুত্রকে বাটীতে রাখিয়া লেখাপড়া শিক্ষা দিয়া, বিষয়কর্মে নিযুক্ত করিয়া দেন ও পরে তাঁহার পুত্রকেও লেখাপড়া শিখাইয়া বিষয়কর্মে নিযুক্ত করিয়া দেন।

বাবু প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী মহাশয়, হিন্দুকলেজে শিক্ষালাভ করিয়া,

সর্বোৎকৃষ্ট এস্‌কলার্শিপ মাসিক চল্লিশ টাকা ও স্বর্ণ-মেডেল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তৎকালে বাবু প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী যে ভালরূপ ইংরাজী শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা প্রকাশ পাইয়াছিল। কোন কারণবশত তাঁহাকে কলেজে সামান্য-বেতনে শিক্ষকতাকার্যে নিযুক্ত হইতে হয়। দূরদেশে, স্বল্পবেতনে কয়েক বৎসর অবস্থিতি করিয়া, পরিশেষে বিনা অনুমতিতে ঢাকা-কলেজ হইতে প্রস্থান করেন; এজন্য শিক্ষাসমাজ প্রসন্নবাবুকে আর কোন কর্ম না দেওয়ায়, অগত্যা প্রসন্নবাবু, অগ্রজ মহাশয়ের শরণ লইলেন। পরমদয়ালু অগ্রজ মহাশয়, প্রসন্নবাবু এবং উঁহার ভ্রাতৃবর্গ ও তাঁহার কনিষ্ঠ পিতৃব্যকে প্রায় দুই বৎসর কাল বহুবাজারের পঞ্চাননতলায় নিজ বাসায় রাখিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা নিজব্যয়ে আহারাদি করিতেন। অগ্রজ মহাশয়, এডুকেসন কৌন্‌সেলের সেক্রেটারি ময়েট সাহেব মহাশয়কে অনুরোধ করিয়া, প্রসন্নবাবুকে প্রথমত হিন্দুকলেজের নিম্নশ্রেণীর শিক্ষক নিযুক্ত করান। প্রসন্নবাবু স্বল্প-বেতনে কর্ম করিতে প্রথমত অসম্মত হইয়াছিলেন; কারণ, এই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াই মাসিক চল্লিশ টাকা বৃত্তি পাইয়াছিলেন; এক্ষণে ঐ বিদ্যালয়ে স্বল্প-বেতনে নিম্ন-শ্রেণীর কর্ম করিতে লজ্জা বোধ হইল। ইহা প্রকাশ করিলে পর, অগ্রজ তাঁহাকে উপদেশ দিলেন যে, তুমি না বলিয়া ঢাকা কলেজ হইতে আসায়, শিক্ষাসমাজ তোমার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন। এক্ষণে এই কর্ম করিতে স্বীকার না পাইলে, অপরাধী বলিয়া তোমাকে কোন ভাল কর্মে নিযুক্ত করিবেন না। এইরূপ উপদেশ দেওয়ায়, তিনি উক্ত কার্য-গ্রহণে স্বীকৃত হইয়া ত্বরায় ঐ কর্মে প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রসন্নবাবু, অগ্রজের অনুরোধে চারিটার ছুটির পর, কয়েক মাস সংস্কৃত-কলেজে তৎকালের প্রধান ছাত্র রামকমল, তারাশঙ্কর, সোমনাথ, সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতিকে ইংরাজী শিক্ষা দিতেন, এবং প্রতিদিন প্রাতঃকালে অগ্রজ মহাশয়ের নিকট সংস্কৃত 'বিষ্ণুপুরাণ', 'রঘুবংশ' প্রভৃতি অধ্যয়ন করিতেন। দাদাও সময়ে সময়ে প্রসন্নবাবুর নিকট ইংরাজী পুস্তক দেখিতেন। প্রসন্নবাবু অতিশয় বুদ্ধিমান ও কার্যদক্ষ লোক ছিলেন। একমাত্র অগ্রজ মহাশয়ের চেষ্টাই ইঁহার ভবিষ্যৎ উন্নতির মূল। তাঁহার অনুগ্রহেই প্রসন্নবাবু ক্রমশ উচ্চপদে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন। প্রথমত সংস্কৃত-কলেজে একশত টাকা বেতনে হেড মাস্টারের পদে নিযুক্ত হইয়া, ক্রমশ সংস্কৃত-কলেজের প্রিন্সিপাল হন। প্রিন্সিপাল-পদে থাকিয়া গ্রেডে উঠিয়া, মাসিক হাজার টাকার অধিক বেতন পাইয়াছিলেন। তিনি সংস্কৃত-কলেজ হইতে বহরমপুর কলেজের প্রিন্সিপাল এবং তৎপরে প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রফেসার হইয়াছিলেন।

ইতিপূর্বে সংস্কৃত-কলেজে বাবু রসিকলাল সেন ও বাবু বিশ্বনাথ সিংহ ইংরাজীর শিক্ষক ছিলেন। যে যে ছাত্রের ইংরাজী শিখিতে ইচ্ছা হইত তাহারাই দুই ঘণ্টা করিয়া ইংরাজী-ভাষা অধ্যয়ন করিত। সকল বালক ইংরাজী অধ্যয়ন করিত না; তাহাতে সাধারণের কোনও ফলোদয় হইবার আশা ছিল না। অগ্রজ মহাশয়,

শিক্ষাসমাজকে অনুরোধ করিয়া, বাবু রসিকলাল সেন ও বিশ্বনাথ সিংহকে সংস্কৃত-কলেজ ত্যাগ করাইয়া, অপর স্থানে অধিক বেতনে হেড মাস্টারের পদে নিযুক্ত করিয়া দেন এবং সংস্কৃত-কলেজের লীলাবতী ও বীজগণিতের অধ্যাপক প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য মহাশয়কে সিবিল গাইড আইন পাঠ করিতে বলেন। অনন্তর তৎকালীন শিক্ষাসমাজের প্রেসিডেণ্ট, সার জেমস কল্‌বিন সাহেব মহোদয়কে অনুরোধ করেন যে, সংস্কৃত-কলেজে ইংরাজীতে অঙ্ক শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়া রিপোর্ট করিব। সংস্কৃত-অঙ্কের অধ্যাপক প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য অনেক দিন হইতে মাসিক নব্বই টাকা বেতনে নিযুক্ত আছেন; ইনি সিবিল গাইড আইন শিক্ষা করিয়াছেন; এস্‌পিসিয়াল আদেশ হইলে, ইনি আইন-পরীক্ষায় কৃতকার্য হইবেন। ইঁহাকে মুন্‌সেফের পদে নিয়োগ করিবার আদেশ হইলে, সংস্কৃত-কলেজে ইহার পরিবর্তে ইংবাজীতে অঙ্ক শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা স্থির কবা হইয়াছে। অনন্তর প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য পরীক্ষা দিয়া মুন্‌সেফী পদে নিযুক্ত হইলেন। সাধারণ লোক অগ্রজের এরূপ অলৌকিক ক্ষমতাদর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে সংস্কৃত-কলেজে ইংরাজী শিক্ষার জন্য, বাবু প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী, বাবু শ্রীনাথ দাস, বাবু কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, বাবু তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় ও বাবু প্রসন্নকুমার রায় প্রভৃতি ইংরাজী শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইলেন। সিনিয়ার ও জুনিযার ডিপার্টমেণ্টে এস্‌কলার্শিপ পরীক্ষায়, সংস্কৃতের ও অন্যান্য বিষয়ের পরীক্ষায় ছাত্রগণকে যেরূপ নম্বর রাখিতে হইত, সেইরূপ একদিন ইংরাজীর নম্বর রাখিতে হইবে, নচেৎ এস্‌কলার্শিপ পাইবে না। এই নিয়ম করায়, অগত্যা সকলকেই রীতিমত ইংরাজী শিখিতে হইয়াছিল। ক্রমশ সংস্কৃত-কলেজের ছাত্রগণ ইংরাজী-বিদ্যালয়ের ন্যায় ইংরাজী শিখিতে প্রবৃত্ত হইল। পরবৎসর হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রথা নূতন সৃষ্টি হইয়াছিল। সংস্কৃত-কলেজের ছাত্রগণের মধ্যে অনেকেই প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়েব প্রবেশিকা পরীক্ষায়, অন্যান্য ইংরাজী-বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের মত কৃতকার্য হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ই সংস্কৃত-কলেজে ইংরাজী শিক্ষা দিবার আদি-কারণ। তাঁহারই আন্তরিক যত্ন ও আগ্রহাতিশয়েই সংস্কৃত-কলেজের উন্নতি হইয়াছে, ইহা সকলকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। উত্তরকালে যিনিই অধ্যক্ষ হউন না কেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাম কোনকালেই বিলুপ্ত হইবার আশঙ্কা নাই।

ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বপ্রধান কবি কালিদাসের প্রণীত 'শকুন্তলা', সংস্কৃতভাষায় সর্বোৎকৃষ্ট নাটক। অগ্রজ মহাশয়, ঐ পুস্তক বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া ১২৬১ সালে ২৫শে অগ্রহায়ণ মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলেন। পাঠকবর্গ বিদ্যাসাগরের অনূদিত 'শকুন্তলা' পাঠ করিয়া যে পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন, ইহা এস্থলে উল্লেখ করা বাহুল্য। দেশবিদেশস্থ কি বিদ্যার্থী, কি পণ্ডিতমণ্ডলী, কি বিষয়ীলোক সকলেই অতিশয় আগ্রহের সহিত ইহা পাঠ করিতেন।

রাজা রামমোহন রায়ের পুত্র রমাপ্রসাদ রায়ের সহিত অগ্রজ মহাশয়ের অত্যন্ত প্রণয় ছিল। রমাপ্রাসাদবাবু, বর্দ্ধমানের রাজবাটী হইতে নৈহাটি-নিবাসী নন্দকুমার ন্যায়চুঞ্চু নামক স্বল্পবয়স্ক, অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন, ন্যায়শাস্ত্রে অদ্বিতীয় এক পণ্ডিতকে আনয়ন করিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অর্পণ করেন। ঐ নন্দকুমারেব পিতৃকুল ও মাতৃকুল, বুদ্ধিমত্তা ও বিদ্যাবত্তার কারণ বঙ্গদেশে সুপ্রসিদ্ধ; এই কারণে, অগ্রজ মহাশয়, নন্দকুমায় ন্যায়চুঞ্চুকে পরম সমাদরে গ্রহণ কবিয়া, কোন উচ্চপদ শূন্য না থাকায়, অগত্যা একটি ত্রিশ টাকা বেতনের পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত করিলেন। ইনি সংস্কৃত-কলেজের ছাত্র ছিলেন না; একারণে, শিক্ষা-বিভাগেব ডাইরেক্টার ইয়ং সাহেবের নানা আপত্তি খণ্ডন করিয়া, আপাতত কিছুকালের জন্য ঐ পদে রাখিলেন। কিন্তু সংস্কৃত-বিদ্যালয়ে পূজ্যপাদ জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের সহিত বিচাব হওয়ায়, নন্দকুমার ন্যায়চুঞ্চু উৎকৃষ্ট সাব্যস্ত হন। পরে পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের কান্দীগ্রামে তাঁহাদের স্থাপিত বিদ্যালয়ে আশি টাকা বেতনে ন্যায়চুঞ্চুকে নিযুক্ত করিয়া পাঠান। কয়েক বৎসর পরে তিনি জ্বরকাশ-বোগে আক্রান্ত হইলে, অগ্রজ মহাশয় তাঁহাকে কলিকাতায় আনাইযা, তৎকালের বিখ্যাত ডাক্তাব গুডিভ সাহেব প্রভৃতি চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করান। ঐ বোগেই তাঁহার মৃত্যু হইলে পর, তাঁহাব জননীদেবীর, পত্নীর এবং নাবালক সহোদরগণের ভবণপোষণ ও তাহাদের বিদ্যানুশীলনাদির সমুদয় ব্যয় নির্বাহ করিয়াছিলেন ও আবশ্যকমত সময়ে সময়ে নিজে তত্ত্বাবধান করিতেন। এমন কি তাঁহার ভ্রাতৃবর্গকে সহোদর-নির্বিশেষে তত্ত্বাবধান করিয়া আসিয়াছেন। এক্ষণে, রঘুনাথ ভট্টাচার্য, যদুনাথ ভট্টাচার্য, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও মেঘনাদ ভট্টাচার্য, নন্দকুমার ন্যায়চুঞ্চুর এই চারি সহোদর, পৈতৃক পদমর্যাদা বজায় বাখিয়া, সাংসারিক কার্য সমাধা করিতেছেন।

বিধবাবিবাহ

অগ্রজ মহাশয়, শৈশবকাল হইতে পুরুষ-জাতি অপেক্ষা স্ত্রী-জাতির দুঃখদর্শনে অতিশয় দুঃখানুভব করিতেন। তিনি, কি আত্মীয়, কি অনাত্মীয়, কি নিকৃষ্ট জাতি, কি ভদ্রজাতি, নিরুপায় পতিপুত্রবিহীনা স্ত্রীলোকদিগের আনুকূল্য করিতে কখনও ত্রুটি করেন নাই। পুরুষ-জাতি অপেক্ষা স্ত্রী-জাতি স্বাভাবিক দুর্বল, এই কারণে তিনি স্ত্রী-জাতির সমধিক পক্ষপাতী ছিলেন।

এক দিবস বীরসিংহা-বাটীর চণ্ডীমণ্ডপে উপবিষ্ট হইয়া, অগ্রজ, পিতৃদেবের সহিত বীরসিংহার বিদ্যালয়গুলির সম্বন্ধে কথোপকথন করিতেছিলেন, এমন সময়ে জননীদেবী রোদন করিতে করিতে চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া, একটি বালিকার বৈধব্য-সংঘটনের উল্লেখকরত দাদাকে বলিলেন, 'তুই এত দিন যে শাস্ত্র পড়িলি, তাহাতে বিধবাদের কোনও উপায় আছে কি না?' ইহা শুনিয়া পিতৃদেব বলিলেন, 'ঈশ্বর! ধর্মশাস্ত্রে বিধবাদের প্রতি শাস্ত্রকারেরা কি কি ব্যবস্থা করিয়াছেন?' দাদা উত্তর করিলেন, 'শাস্ত্রে বিধবাদিগের প্রথমত ব্রহ্মচর্যে অপারক হইলে, সহমরণ বা বিবাহ।' ইহা শুনিয়া পিতৃদেব বলিলেন, 'রাজা রামমোহন রায়, কালীনারায়ণ চৌধুরী ও দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতির যোগাড়ে ও পরামর্শে, গবর্নর জেনেরেল লর্ড বেণ্টিঙ্ক সহমরণ-প্রথা নিবারণ করিয়াছেন। আর কলিতে ব্রহ্মচর্যে অপারক; সুতরাং বিধবাদিগের পক্ষে বিবাহই একমাত্র উপায়।' ইহা শুনিয়া দাদা বলিলেন, 'বেদ', 'স্মৃতি', 'পুরাণ' পাঠ করিয়া অনেক দিন হইতে আমার ধারণা হইয়াছে যে, বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ; ইহাতে আমার অণুমাত্র সন্দেহ নাই, এবং ইহা সাধারণের হৃদয়ঙ্গম হইবে। কিন্তু এ বিষয়ের পুস্তক প্রচার করিলে, অনেকে নানাপ্রকার কুৎসা ও কটুকাটব্য প্রয়োগ করিবে। তাহাতে পাছে আপনারা দুঃখিত হন, এই আশঙ্কায় আমি নিবৃত্ত আছি।' এই কথা শুনিয়া তাঁহারা বলিলেন, 'আমরা উভয়ে এক-বাক্যে বলিতেছি, এ বিষয়ে যাহা কিছু সহ্য করিতে হয়, তাহা করিব এবং আমা-দিগকে যখন যাহা করিতে হইবে, তাহা সাধ্যমতে ত্রুটি করিব না। কিন্তু তুমি পুস্তক প্রচার করিবার অগ্রে আর একবার ধর্মশাস্ত্র ভাল করিয়া দেখিয়া প্রবৃত্ত হইবে। প্রবৃত্ত হইবার পর কিছুতেই পশ্চাৎপদ হইবে না; এমন কি, আমরা তোমার পিতামাতা, আমরা নিবারণ করিলেও ক্ষান্ত থাকিবে না।'

বিধবাবিবাহ প্রস্তাবের বহুকাল পূর্ব হইতে, অনেক ধনশালী লোক বালিকা-বিধবার বিবাহ দেওয়া সর্বতোভাবে কর্তব্য, এতদ্বিষয়ে আন্দোলন করিয়া আসিতে-ছিলেন; কিন্তু অনেক ধনশালী ব্যক্তির (রাজা রাজবল্লভ প্রভৃতির) আন্তরিক যত্ন থাকিলেও, এ বিষয়ে সাহস করিতে পারেন নাই। অগ্রজের উক্ত প্রস্তাবের দশ বৎসর পূর্বে, বহুবাজারনিবাসী বাবু নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, স্বীয় ভবনে কতকগুলি আত্মীয় লোককে ঐক্য করিয়া, বিধবাবিবাহ দিবার ইচ্ছা প্রকাশ

করিয়াছিলেন। এরূপ অপরাপর দেশেও অনেকেই বালবিধবা দেখিয়া, দুঃখানুভব করত তাহাদের বিবাহ দিতে সম্মত ছিলেন; কিন্তু সমাজের ভয়ে অগ্রে প্রবৃত্ত হইতে কাহারও সাহস হয় নাই।

কোন কোন ধনশালী লোকের প্রাণসমা কন্যা বিধবা হইলে প্রচাব করিতেন যে, বিধবাবিবাহ যিনি প্রচলিত করিতে পারিবেন, তাঁহাকে ব্যয়নির্বাহার্থে লক্ষ টাকা পুরস্কার প্রদান করিব। যৎকালে কন্যার বৈধব্য সংঘটন হয় তৎকালেই দিন কয়েকের জন্য লোকের মানসিক দুঃখ উপস্থিত হয় যে, একাদশীর দিবস বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠের প্রচণ্ড দিনকরের উত্তাপে বালিকা কন্যা শুষ্ককণ্ঠ হইয়া জলপান না করিয়া কেমন করিয়া প্রাণধারণ করিবে। কন্যার এরূপ অসহ্য কষ্ট দেখা অপেক্ষা আমাদের মৃত্যু হওয়া শ্রেয়। কিছু দিন অতীত হইলে, ঐ কন্যার জনক-জননীর আর ঐরূপ দুর্ভাবনা থাকে না। পবে যৌবনাবস্থায় সমুপস্থিতা হইয়া প্রাকৃতিক নিয়মেব বশীভূত হইয়া কার্য করিলে, পিতা-মাতা দেখিয়াও দেখেন না। ভ্রূণহত্যা-দিতেও পরাঙ্মুখ হন না। পুরুষজাতির স্ত্রীবিয়োগ হইলে, ঐ মৃতা-স্ত্রীকে শ্মশানে দাহ করিতে করিতেই কর্তৃপক্ষ বলিযা থাকেন, যথাসর্বস্ব বিক্রয় কবিযাও পুনরায় ত্বরায় বিবাহ দিতে হইবে, নচেৎ চলিবে না। দেখুন স্পষ্টরূপে শাস্ত্রকারেরা বলিয়া-ছেন, পুরুষজাতি অপেক্ষা স্ত্রীজাতিব দুর্জয় রিপুবর্গ অষ্টগুণ প্রবল, এমন স্থলে পতিবিয়োগেব সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোকদিগের দুর্নিবাব কামপ্রবৃত্তি কি অন্তর্হিত হয় যে, পিতা-মাতা বিধবা-কন্যার বিবাহ দিতে ইচ্ছা কবেন না! কি আশ্চর্য, কন্যাব ভ্রূণ-হত্যা করিতে এবং স্ত্রীহত্যা করিতেও সম্মত আছেন, কিন্তু শাস্ত্রানুসারে বিবাহ দিতে ইচ্ছা করেন না। অনেক সম্ভ্রান্ত লোককেও কন্যাব ভ্রূণহত্যা করিতে শ্রবণ করা যায়, কিন্তু উঁহাবাই সমাজে ভদ্রলোক বলিয়া পরিগণিত হন।

অগ্রজ মহাশয়ের বিধবাবিবাহের পুস্তক মুদ্রিত হইবার কিছুদিন পূর্বে, কলিকাতার অন্তঃপাতী পটলডাঙ্গানিবাসী বাবু শ্যামাচরণ দাস কর্মকার, স্বীয় দুহিতার বৈধব্য-দর্শনে দুঃখিত হইয়া, মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, যদি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা ব্যবস্থা দেন, তবে পুনর্বার কন্যার বিবাহ দিব। তদনুসারে তিনি সচেষ্ট হইয়া বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা-প্রতিপাদক এক ব্যবস্থা-পত্র সংগ্রহ করেন। উহাতে কাশীনাথ তর্কালঙ্কার, ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন, রামতনু তর্কসিদ্ধান্ত, ঠাকুরদাস চূড়ামণি, হরিনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত, মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতি কতকগুলি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের স্বাক্ষর ছিল। ইঁহারা সকলেই ঐ ব্যবস্থায় স্ব স্ব নাম স্বাক্ষর করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই, কিছুদিন পরে তাঁহারাই আবার বিধবাবিবাহের বিষম বিদ্বেষী হইয়া উঠেন। বাবু শ্যামাচরণ দাসের সংগৃহীত ব্যবস্থা মুক্তারাম বিদ্যা-বাগীশের নিজের রচিত এবং ব্যবস্থাপত্র বিদ্যাবাগীশের স্বহস্ত লিখিত। কিছুদিন পরে যখন ঐ ব্যবস্থা-উপলক্ষে রাজা রাধাকান্তদেবের ভবনে বিচার উপস্থিত হয়, তৎকালে ভরতচন্দ্র শিরোমণি মহাশয় প্রভৃতি মধ্যস্থ ছিলেন যে, কে বিচারে জয়ী

হন। ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন, বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা-পক্ষ রক্ষার নিমিত্ত, নবদ্বীপের প্রথম স্মার্ত ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের সহিত বিচার করেন এবং বিচারে জয়ী হইয়া, এক-জোড়া শাল পুরস্কার প্রাপ্ত হন। একজন পরিশ্রম করিয়া ব্যবস্থার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, আর একজন বিরোধী-পক্ষের সহিত বিচার করিয়া ঐ ব্যবস্থার প্রামাণ্য রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কিয়দ্দিবস অতীত হইলে ইহারা উভয়েই বিধবাবিবাহ অশাস্ত্রীয় বলিয়া, সর্বাপেক্ষা অধিক বিদ্বেষ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শ্যামাচরণ দাস বিষয়ী লোক, কিন্তু সংস্কৃত-ভাষায় অনভিজ্ঞ ছিলেন। পণ্ডিত মহাশয়দের কথার স্থিরতা নাই দেখিয়া, স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। বস্তুত উল্লিখিত বিচার দ্বারা উপস্থিত বিষয়ের কিছুমাত্র মীমাংসা হইল না, তথাপি ঐ বিচার দ্বারা এই এক মহৎ ফল দর্শিয়াছিল যে, তদবধি অনেকেই এ বিষয়ের নিগূঢ়-তত্ত্ব জানিবার নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছিলেন।

জনক-জননীর ঐ সম্বন্ধের কথোপকথনগুলি হৃদয়ে জাগরূক থাকায়, অগ্রজ মহাশয়, সবিশেষ যত্ন-সহকারে এ বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এবং কয়েক মাস দিবারাত্র পরিশ্রম-সহকারে সমস্ত ধর্মশাস্ত্র আদ্যোপান্ত অবলোকন করিয়া, যথাসাধ্য চেষ্টাকরত সাধারণের গোচরার্থে খৃঃ ১৮৫৫ সালে বা সম্বৎ ১৯১২ সালের কার্তিক মাসে বঙ্গ-ভাষায় অনুবাদসহ 'বিধবাবিবাহের ব্যবস্থা-পুস্তক' প্রচার করেন। ইহা মুদ্রিত হইবার পর, 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না?' সমস্ত ভারতবর্ষে এ বিষয়ের আন্দোলন চলিতে লাগিল; বঙ্গদেশের অনেকেই নানাপ্রকার কুৎসা ও গালি দিতে লাগিল। এই সময়ে পিতৃদেব, কলিকাতায় বহুবাজারস্থ পঞ্চাননতলার বাসায় একদিন ডাক্তার নবীনচন্দ্র মিত্র ও অগ্রজের সহিত কথোপকথনে হাস্যবদনে বলিলেন, 'ঈশ্বর! আর তোমাকে আমার শ্রাদ্ধ করিতে হইবে না।' ইহা শুনিয়া অগ্রজ সহাস্যমুখে বলিলেন, 'খরেদরে এক হাঁটু,' (ইহার অর্থ এই যে, যেমন সামান্য লোকে নানাপ্রকার গালাগালি করিবে, তেমনই বিজ্ঞ ব্যক্তিরা সমস্ত পর্যালোচনা করিয়া, মানসিক সন্তোষ লাভ করিবেন এবং বিধবারা বৈধব্য-যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া, সুখে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিবে। বিশেষত ভ্রূণহত্যা প্রভৃতি মহা-পাপকর ও জাতিনাশকর কার্যগুলির হ্রাস হইবে।) পিতৃদেব বলিলেন, 'বাবা! ধরিবার পূর্বে ভাবা উচিত, ধ'রেছ ছেড়ো না, প্রাণ পর্যন্ত স্বীকার করিও। এই অভিপ্রায়েই পূর্বে বীরসিংহার চণ্ডীমণ্ডপে, আমরা উভয়েই তোমাকে বলিয়াছিলাম।'

বিধবাবিবাহ-পুস্তক প্রচারিত হইবামাত্র, লোকে এরূপ আগ্রহ-প্রদর্শনপূর্বক গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন যে, এক সপ্তাহের অনধিক কালমধ্যেই প্রথম মুদ্রিত দুই সহস্র পুস্তক নিঃশেষ হইয়া গেল। তদ্দর্শনে উৎসাহান্বিত হইয়া অগ্রজ মহাশয়, আবার তিন সহস্র পুস্তক মুদ্রিত করিয়াছিলেন; তাহাও অনতিবিলম্বে শেষ হইতে দেখিয়া, পুনর্বার দশ সহস্র পুস্তক মুদ্রিত করেন। ঐ পুস্তক এরূপ আগ্রহ-সহকারে

সর্বত্র পরিগৃহীত হইতেছে দেখিয়া, তিনি পরম আহ্লাদিত হইলেন। কি বিষয়ী, কি শাস্ত্রব্যবসায়ী, অনেকেই উক্ত প্রস্তাবের উত্তর লিখিয়া মুদ্রিত করিয়া, সর্বসাধারণের গোচরার্থে প্রচার করিয়াছিলেন। যে বিষয়ে সকলে অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবেন বলিয়া অগ্রজের স্থিরসিদ্ধান্ত ছিল, সেই বিষয়ে অনেকে শ্রম ও ব্যয় স্বীকার করিয়া, উত্তর-পুস্তক মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়া, তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। অগ্রজ মহাশয়, ঐ উত্তর-পুস্তকগুলি দেখিয়া, শাস্ত্রজলধি-মন্থন-পূর্বক প্রত্যেকের হিসাবে প্রত্যেক প্রত্যুত্তর পরিচ্ছেদগুলি লিখিয়া, একত্র সংগ্রহ করিয়া, দ্বিতীয় পুস্তক মুদ্রিত করেন। এই পুস্তক প্রচারিত ও দৃষ্ট হইবামাত্র, সমস্ত ভারতবাসী নিরুত্তর ও মনে মনে সন্তোষলাভ করিয়া, মৌখিক অসন্তোষকর বাক্যসকল প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ভারতবাসী হিন্দুরা সকলেই বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রীয়তা স্বীকার করিয়াও দেশাচারের একান্ত অনুগত দাস বলিয়া বিবাহে পরাঙ্মুখ রহিলেন।

অগ্রজ মহাশয়, ধর্মশাস্ত্রের বিচারে বাঙ্গালা-দেশের প্রধান প্রধান পণ্ডিত সকলকে পরাজয় করিলেন। ইহাতে কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কি ভদ্র, কি অভদ্র সকল সম্প্রদায়ের লোকে অগ্রজ মহাশয়ের গুণানুবাদ করিতে লাগিল। কেহ কেহ বিলক্ষণ গালি দিতেও লাগিল, কিন্তু তিনি তাহাতে কর্ণপাতও করেন নাই। অনেকেই স্ব স্ব বিধবা দুহিতা বা ভগিনী কিম্বা ভাগিনেয়ীর বিধবাবিবাহ দিবার জন্য সর্বদা অগ্রজ মহাশয়ের নিকট গতি-বিধি করিতে লাগিলেন। বিধবার বিবাহ হইলে, উহার গর্ভসম্ভূত সন্ততিগণের রাজকীয় আইনানুসারে মৃত পিতার বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইবার জন্য গবর্নমেণ্টে আবেদন করা কর্তব্য, এই বিষয়ে তৎকালের হোমডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারি সার সিসিল বীডন, সুপ্রীম কৌন্সেলের মেম্বরগণ এবং লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর হেলিডে সাহেব প্রভৃতি আইন পাশের আবেদন জন্য, অগ্রজ মহাশয়কে উপদেশ প্রদান করেন। তদনুসারে প্রায় দুই সহস্র লোকের স্বাক্ষর করাইয়া, আবেদন-পত্র গবর্নমেণ্টে প্রেরিত হয়। গবর্নমেণ্টের কৌন্সেলের বিচারে, হিন্দুশাস্ত্রানুসারে বিধবার পুনর্বার যখন বিবাহ হইতে পারে, তখন বিধবার গর্ভজাত পুত্র ঔরসজাত পুত্র বলিয়া পৈতৃক-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে, এই ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইল। ইংরাজী ১৮৫৬ খৃঃ অব্দের ১৩ই জুলাই, এই আইন পাশ হইল। ইহার নাম ১৮৫৬ সালের ১৫ আইন হইল। এই সংবাদে ভারতবর্ষের সকলেই মনে মনে পরম আহ্লাদিত হইলেন। তৎকালে গ্রাণ্ড সাহেব, আইন-পাশ-বিষয়ে আশাতীত সাহায্য করিয়াছিলেন। তজ্জন্য ভারতবাসী হিন্দুমাত্রেই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ আছেন। গ্রাণ্ড সাহেবকে অভিনন্দন-পত্র দিবার সময়ে, অগ্রজ মহাশয়, কৃষ্ণনগরের রাজা শ্রীশচন্দ্র বাহাদুর, বাবু রামগোপাল ঘোষ, পণ্ডিতাগ্রগণ্য তারানাথ তর্কবাচস্পতি প্রভৃতি অনেকেই গ্রাণ্ড সাহেবের বাটীতে গমন করেন। কৃষ্ণনগরের রাজা শ্রীশচন্দ্র বাহাদুর স্বহস্তে উক্ত সাহেবকে

অভিনন্দন-পত্র প্রদান করেন। বিধবাবিবাহ আইনবদ্ধ করিবার জন্য, গবর্নমেণ্টের নিকট আবেদন-পত্র প্রেরিত হইলে পর, তৎকালের কয়েক ব্যক্তি সন্তোষপূর্বক অগ্রজ মহাশয়ের নামে ঐ বিষয়ে কতকগুলি সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন?; তন্মধ্যে নিম্নলিখিত একটি সঙ্গীত এস্থলে সন্নিবেশিত করা গেল—

বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হ'য়ে,
সদরে ক'রেছো রিপোর্ট, বিধবাদের হবে বিয়ে।
কবে হবে এমন দিন, প্রচার হবে এ আইন,
দেশে দেশে জেলায় জেলায় বেরোবে হুকুম,
বিধবা রমণীর বিয়ের লেগে যাবে ধুম,
সধবাদের সঙ্গে যাবো, বরণডালা মাথায় ল'য়ে।
আর কেন ভাবিস্ লো সই, ঈশ্বর দিগাছেন সই,
এবার বুঝি ঈশ্বরেচ্ছায় পতি প্রাপ্ত হই,
রাধাকান্ত মনোভ্রান্ত দিলেন না কো সই,
লোকমুখে শুনে আমরা আছি লোক লাজভয়ে।
একাদশী উপসের জ্বালা, কর্ণেতে লাগিত তালা,
ঘুচে যাবে সে সব জ্বালা, জুড়াবে জীবন,
দুজনাতে পালঙ্কেতে, করিব শয়ন—
বিনাইয়া বাঁধ্‌বো খোঁপা গুজিকাটি মাথায় দিয়ে।
যেদিন হ'তে মহাপ্রসাদ, শুনেছি ভাই এ সংবাদ,
সে দিন হ'তে আনন্দেতে হয় না রেতে ঘুম—
পছন্দ ক'রেছি বর, না হ'তে হুকুম,
ঠাকুরপোরে ক'র্‌ব বিয়ে, ঠাকুরঝিরে ব'লে ক'য়ে॥

উপরি উক্ত গীতটি কি নগরমধ্যে, কি পল্লীগ্রামে, কি বনমধ্যে, কি স্থলপথে, কি জলপথে, বঙ্গদেশের সর্বত্রই সকলেরই শ্রুতিগোচর হইত। বিধবার বিবাহ হইবে, ইহা শ্রবণে, মনে মনে সকলেই পরম আহ্লাদিত হইয়াছিলেন। এ প্রদেশে ইতর-জাতি অর্থাৎ দুলে, হাড়ী, কেওরা প্রভৃতি নীচজাতির বিধবার বিবাহ প্রচলিত আছে; কিন্তু ভদ্রসমাজে এ প্রথা না থাকায়, ইহা এক নূতন কাণ্ড।

ঐ সময়ে শান্তিপুরের তন্তুবায়গণ উপরি উক্ত গীতটি কাপড়ের পাড়ে ঝাঁপে তুলিয়াছিল। ঐ বস্ত্র অনেকেই আগ্রহাতিশয়ের সহিত অধিক মূল্য দিয়া ক্রয় করিত। অনেকেই বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেখিতে আসিত। যখন তিনি পদব্রজে পথে যাইতেন, অনেক স্ত্রীলোক একদৃষ্টিতে তাঁহাকে অবলোকন করিত। কারণ, এতাবৎ দীর্ঘকালের মধ্যে ভারতবর্ষে অনেক ধনী ও গুণী লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু হতভাগিনী বিধবা স্ত্রীলোকদের প্রতি কেহ কখনও বিদ্যাসাগরের মত দয়া প্রকাশ করেন নাই। যিনি যতই প্রকাশ্যে বিধবাবিবাহের বিদ্বেষ্টা হউক না.

কেন, কিন্তু মনে মনে বলিতেন যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবাবিবাহের প্রচলনের ব্যবস্থা করিয়া ভালই করিয়াছেন। তিনি অন্তত একটি বিধবার বিবাহ দিতে পারিলে, অনন্তকালব্যাপিনী কীর্তি রাখিয়া যাইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এস্থলে কৃষ্ণনগরনিবাসী বাবু বিষ্ণুচন্দ্র বিশ্বাসের অনুরোধে, তাঁহার বিবরণটি নিম্নে প্রকাশ করা গেল।

বিদ্যাসাগর মহাশয়, কৃষ্ণনগরের লোকদিগকে অতিশয় ভালবাসিতেন ও অনেকের যথেষ্ট উপকার করিয়াছিলেন। কৃষ্ণনগরনিবাসী বাবু বিষ্ণুচন্দ্র বিশ্বাস, কৃষ্ণনগর কলেজে অধ্যয়নেব মানস করিয়াছিলেন। কিন্তু কলেজের বেতনের অসদ্ভাবপ্রযুক্ত লেখাপড়া শিক্ষা করিতে অক্ষম হইয়া, স্থানীয় অন্যান্য লোকের উপদেশানুসারে কলিকাতায় বাবু রামগোপাল ঘোষ মহাশয়ের ভবনে উপস্থিত হন। উক্ত বাবু কোন সাহায্য না করায়, নিতান্ত নিরুপায় হইয়া চিন্তাকুল হন। অবশেষে ভোজন করিবার জন্য তাঁহাদের দেশস্থ দ্বারিকানাথ বাবুর বহুবাজারের বাসায় উপস্থিত হন। তথায় আহার করিয়া দেশে গমন করেন। পুনর্বার বন্ধুবর্গের উপদেশানুসারে আট পয়সা পাথেয় লইয়া, দুই দিবস পদব্রজে গমন করিয়া, কলিকাতায় রামগোপাল বাবুর বাটীতে আইসেন। কিন্তু তিনি বলেন যে, 'আমার স্কুল নাই যে আমি তোমাকে পড়াইব।' অবশেষে হতাশ হইয়া, ভোজনের জন্য দেশস্থ উক্ত দ্বারিকানাথবাবুর বাসায় গমন করেন। তথায় যাইয়া দেখিলেন, সেখানে দ্বারিকানাথবাবুব বাসা নাই, সুতরাং নিরুপায় হইয়া আমাদের বাসায় বসিয়া চিন্তা ও রোদন করিতে লাগিলেন। আমরা তাঁহাকে ভোজন করাইলাম, এবং পরদিন তাঁহাকে উপদেশ দিলাম, তোমার অভিলষিত বিষয় অগ্রজের নিকট বল, তাহা হইলে, তিনি তোমার উপায় করিয়া দিবেন। তৎকালে অগ্রজ, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে আশি টাকা বেতনে হেড রাইটার ছিলেন। অনন্তর বিষ্ণুবাবু, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পায়ে ধরিয়া রোদন করিলে, তিনিও দয়ার্দ্র হইয়া বলিলেন, 'তুমি কেন কাঁদিতেছ?' তাহাতে বিষ্ণুবাবু বলিলেন, 'আমি গরীবের ছেলে, কৃষ্ণনগরের কলেজে অধ্যয়ন করিব মানস করিয়াছি, কিন্তু স্কুলের বেতন দিতে অক্ষম। অনেকের পরামর্শে রামগোপালবাবুর নিকট আসিয়াছিলাম; কিন্তু তিনি মাসে মাসে একটি টাকাও সাহায্য স্বীকার পাইলেন না। মহাশয় যদি মাসে মাসে একটি করিয়া টাকা দেন, তাহা হইলে আমার স্কুলে পড়া হয়।' ইহা শুনিয়া অগ্রজ বলিলেন, 'তথায় যদি আমার কেহ আত্মীয় থাকেন, তুমি তাঁহার নাম কর, আমি তাঁহার নিকট টাকা পাঠাইয়া দিব। এক্ষণে তোমার পথখরচ কি চাই বল?' ইহা শুনিয়া বিষ্ণুবাবু বলিলেন, 'বাটী হইতে আটটি পয়সা আনিয়াছিলাম, তন্মধ্যে সাতটি খরচ হইয়াছে, একটিমাত্র আছে।' এই কথা শ্রবণ করিয়া দুই দিনের পাথেয় দশ আনা দিলেন। বিষ্ণুবাবু, রামতনু লাহিড়ীর নাম করায়, অগ্রজ তাঁহার নিকটেই উঁহার স্কুলের বেতন পাঠাইয়া দিতেন। বিষ্ণুবাবু স্কুলের বেতন ব্যতীত অপর কিছুই

কখনও গ্রহণ করেন নাই; একারণ, অগ্রজ মহাশয় বিষ্ণুবাবুকে বিশেষ স্নেহ করিতেন।

উক্ত বিষ্ণুবাবুর কথায়, কৃষ্ণনগরনিবাসী ভগবানচন্দ্র দত্তকে মাসে মাসে আট টাকা দিতেন। ইঁহার মৃত্যুর পর ইঁহার স্ত্রীকে মাসে মাসে পাঁচ টাকা ও বৎসরে আট খানি বস্ত্র দিতেন। ভগবান দত্তের স্ত্রী, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুর দুই দিন পূর্বে, মাসহারা ও বস্ত্র লইয়া গিয়াছিলেন।

খৃঃ ১৮৬৩ সালে নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী কৃষ্ণনগরনিবাসী বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ লাহিড়ী, সরবেয়ার জেনারাল আফিসে মাসিক চল্লিশ টাকা বেতনে কেরাণীগিরি কর্ম করিয়া দিনপাত করিতেন। অল্পবয়সে তাঁহার কয়েকটি পুত্র ও কন্যা উৎপন্ন হয়; তজ্জন্য ক্রমশ আয় অপেক্ষা সাংসারিক ব্যয়-বাহুল্য হইতে লাগিল। অতঃপর মাসিক চল্লিশ টাকায় সংসার নির্বাহ হওয়া দুষ্কর হইবে মনে করিয়া, ভাবী-উন্নতির প্রত্যাশায়, কলিকাতা মেডিকেল কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া, চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হন। শেষ-বৎসরে তাঁহার সংসার এরূপ অচল হয় যে, অর্থাভাবে অধ্যয়ন পরিত্যাগ না করিলে, সংসারযাত্রা নির্বাহ হওয়া দুরূহ। তৎকালে তাঁহার বিখ্যাত ও কার্যদক্ষ পিতৃব্যগণের নিকট কোনরূপ সাহায্য না পাইয়া, পরিশেষে অগত্যা অগ্রজ মহাশয়কে বিনয়পূর্বক আপন অবস্থা অবগত করাইলেন। তিনিও, লক্ষ্মীনারায়ণবাবুর ঐরূপ কথা শুনিয়া, অনুগ্রহপূর্বক প্রায় দুই বৎসর কাল মাসে মাসে পঞ্চাশ টাকা করিয়া উঁহার সংসারের ব্যয়-নির্বাহার্থে প্রদান করিয়াছিলেন। সময়ে সময়ে এইরূপ কৃষ্ণনগরের অনেক লোকের উপকার করিয়াছিলেন। সকলের কথা লিখিলে, হয় ত অনেকের মনে দুঃখ হইবে, এজন্য ক্ষান্ত হইলাম। দুঃখের বিষয় এই, আমাদের দেশের অনেকে বিশেষ উপকার পাইয়াও কৃতজ্ঞতা দেখাইতে লজ্জাবোধ করেন এবং কেহ কেহ সময়ে সময়ে উপকারীর অনেক কুৎসাও করিয়া থাকেন।

সন ১২৬২ সালের ১লা বৈশাখ, অগ্রজ মহাশয়, শিশুগণের শিক্ষার সুবিধার জন্য 'বর্ণপরিচয়'-এর প্রথম ভাগ নূতন প্রণালীতে প্রচারিত করিলেন। বালকদিগের প্রথমপাঠ্য এরূপ পুস্তক ইতিপূর্বে কেহ প্রকাশ করেন নাই।

সন ১২৬২ সালের ১লা আষাঢ় অগ্রজ মহাশয়, বালকবালিকাদিগের সংযুক্ত বর্ণপরিচয় শিক্ষার সৌকর্যার্থে 'দ্বিতীয় ভাগ বর্ণপরিচয়' নাম দিয়া, নূতন প্রণালীতে এক পুস্তক মুদ্রিত করিলেন। উহা যে প্রণালীতে রচনা করিয়াছিলেন, সেরূপ প্রণালীতে পূর্বে কেহ কখনও রচনা করেন নাই। এই 'দ্বিতীয় ভাগ বর্ণপরিচয়' ভালরূপ শিখিলে, বালকবালিকাগণ অপরাপর সকল পুস্তক অক্লেশে আবৃত্তি করিতে সমর্থ হয়। ভারতবর্ষের মধ্যে যাহারা প্রথমে বাঙ্গালা-ভাষা শিক্ষা করিয়া থাকেন, তাহাদের মধ্যে প্রায় সকলকেই অগ্রজের রচিত 'দ্বিতীয় ভাগ বর্ণপরিচয়' শিক্ষা করিতে হয়।

বালকবালিকাগণের পক্ষে প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ 'বর্ণপরিচয়' শিক্ষা করিয়া, 'বোধোদয়' ও 'নীতিবোধ' অধ্যয়ন করা কিছু কঠিন বোধ হইবে, একারণ, অগ্রজ মহাশয়, শিশুগণের শিক্ষার সুবিধার জন্য, ইংরাজী ঈসপ রচিত গল্পের সরল বাঙ্গালা-ভাষায় অনুবাদ করিয়া, সন ১২৬২ সালের ফাল্গুন মাসে 'কথামালা' নাম দিয়া এক পুস্তক প্রচার করিলেন।

সন ১২৬৩ সালের ১লা শ্রাবণ অগ্রজ মহাশয়, 'চরিতাবলী' মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন। ইহাতে অতি সরল ভাষায় ডুবাল, উইলিয়ম রস্কো, হীন, জিরমস্টোন, প্রভৃতি ইউরোপীয় মহানুভবদিগের জীবনচরিত বর্ণিত হইয়াছে। ইঁহাদের জীবন-চরিত পাঠ করিলে, এতদ্দেশীয় শিশুগণের লেখাপড়ায় অনুরাগ জন্মিবে ও উৎসাহ-বৃদ্ধি হইতে পারে; যেহেতু, উপরি উক্ত মহাত্মারা প্রায় সকলেই দরিদ্রের সন্তান সকলেই নানারূপ ক্লেশ পাইয়া, নিজের যত্নে ও পরিশ্রমে লেখাপড়া শিখিয়া, জগদ্বিখ্যাত হইয়াছিলেন। অগ্রজ মহাশয়, এতদ্দেশীয় দরিদ্র-বালকগণকে লেখাপড়া শিখিতে উৎসাহান্বিত করিয়া দিবার মানসে, আগ্রহপূর্বক পরিশ্রম সহকারে এই পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। ইহা বাঙ্গালা-প্রদেশের সকল বঙ্গবিদ্যালয়ের শিশুগণ সমাদরপূর্বক অধ্যযন করিয়া থাকেন।

বাবু শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের বিধবাবিবাহের কয়েকদিন পূর্বে, পূজ্যপাদ প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয়, অগ্রজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলেন, 'ঈশ্বর! তুমি বিধবা-বিবাহের দ্বিতীয় পুস্তকে যে বিচার করিয়াছ, তাহা আমি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া পরম আহ্লাদিত হইয়াছি। বিধবাবিবাহ যে শাস্ত্রসম্মত, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। তুমি যে অত্যন্ত পরিশ্রম-সহকারে নানা স্থানে যাইয়া, আবেদন-পত্রে সম্ভ্রান্ত লোকদের স্বাক্ষর করাইয়া, রাজদ্বারে আবেদন করিয়াছিলে, এবং তাহাতেই বিধবাবিবাহ বিধিবদ্ধ হইয়াছে, ইহা শুনিয়া আমি পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছি। ভবিষ্যতে যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত হইবে, তুমি তাহার পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছ। পরন্তু, যিনি এ বিষয়ের ব্যবস্থা দিবেন, এবং যিনি ইহা আইনবদ্ধ করাইবেন, তাঁহাকেই যে বিধবাবিবাহ দেওয়াইতে হইবে, এমন কথা নয়। এ সকল বহুব্যয়সাধ্য কর্ম; তোমার টাকা কোথায়? কোনও কারণে কর্মচ্যুত হইলে, কি উপায়ে দিনপাত করিবে? ইহা ধনশালী লোকদের কার্য। বরং, আমার বিবেচনায় কিছুকাল মফঃস্বলে পরিভ্রমণ করিয়া, রাজা ও সম্ভ্রান্ত জমিদারদিগকে স্বমতে আনয়ন-পূর্বক এই গুরুতর কার্যে প্রবৃত্ত হও। অন্যথা, কলিকাতাবাসী অল্পবয়স্ক, অপরিণামদর্শী ও অব্যবস্থিতচিত্ত যুবকবৃন্দের কথায় নির্ভর করিয়া, এই গুরুতর কার্যে হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে।' পূজ্যপাদ তর্কবাগীশ মহাশয়ের এই কথা শুনিয়া, অগ্রজ বলিলেন, 'মহাশয়, উৎসাহ ভঙ্গ করিবেন না। আমি কখনই পশ্চাৎপদ হইব না।' তাঁহার বাক্য-শ্রবণে তর্কবাগীশ মহাশয় বলিলেন, 'অগ্রে টাকার যোগাড় ও মফঃস্বলবাসী রাজা ও জমিদারগণকে স্বমতে

আনয়নপূর্বক একার্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত ছিল; একথা আমি তোমাকে বারম্বার বলিতেছি।' ইহা বলিয়া তর্কবাগীশ মহাশয় প্রস্থান করেন।

এস্থলে নিম্নলিখিত গল্পটি না লিখিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। তর্কবাগীশ মহাশয়ের পূর্বপুরুষের রচিত সাহিত্যদর্পণের হস্তলিখিত টীকাসমেত পুঁথিটি অতি জীর্ণ হইয়াছিল; একারণ, ছাত্রগণকে বলিয়াছিলেন যে, 'তোমরা ক্লাশে বসিয়া এই আদর্শ দেখিয়া, অন্য পুস্তক লিখিবে, কেহ বাটী লইয়া যাইও না; যেহেতু জীর্ণপুস্তক, অনায়াসেই নষ্ট হইতে পারে বা দৈবাৎ তৈল পড়িয়া পাতার অক্ষর অস্পষ্ট হইতে পারে।' তজ্জন্য সকলেই ক্লাশে বসিয়া লিখিত। কিন্তু এক দিবস অগ্রজ মনে করিলেন, এখানে লেখায় অনেক সময় নষ্ট হয়। বাটীতে লিখিলে, এক রাত্রেই অনেক লেখা হইবে; এইরূপ মনে করিয়া গোপনে কতকগুলি পাতা লইয়া যাইতেছিলেন। বর্ষাকাল, ছাতা নাই, পথে ভিজিতে ভিজিতে যাইতেছেন; হঠাৎ পড়িয়া গিয়া, পরিধান-বস্ত্রাদি এবং প্রাচীন পুঁথির পাতাগুলি ভিজিয়া গেল। তাহা দেখিয়া, দাদা রোদন করিতে লাগিলেন। পরে মনে মনে ভাবিলেন যে, গুরুর বাক্য অবহেলন করিয়া এই বিপদে পড়িলাম। কোন সদুপায় স্থির করিতে না পারিয়া, রোদনে প্রবৃত্ত হইলেন। অবশেষে এক ব্যক্তি বলিল, 'কান্না কেন, সম্মুখে এই ভুনারীর দোকানে পুঁথির পাতাগুলি অগ্নিতে সেক, তাহা হইলে শুকাইবে।' তাহার পরামর্শানুসারে ঐরূপ করিতেছেন, এমন সময়ে তর্কবাগীশ মহাশয়, ঐ পথ দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি অগ্রজকে ভুনারীর দোকানে ঐরূপ অবস্থাপন্ন দেখিয়া বলিলেন, 'ঈশ্বর! এখানে কি করিতেছ?' তর্কবাগীশ মহাশয়কে দেখিয়া, ভয়ে কোন কথা বলিতে না পারিয়া, মাথা চুলকাইতে লাগিলেন। তাঁহার আর্দ্র বস্ত্র দেখিয়া, তর্কবাগীশ মহাশয় নিজের উড়ানি পরিধান করিতে দিলেন, এবং বলিলেন, 'পুঁথির পাতের জন্য তোমার কোন চিন্তা নাই।' অনন্তর একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া, তাঁহাকে বড়বাজারের বাসায় পৌছাইয়া দিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় এরূপ শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিতমহাশয়ের কথা রক্ষা না করিয়া নিজের জিদ বজায় রাখিয়া, শ্রীশবাবুর বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

তৎকালে বঙ্গদেশের অনেকেই বলিত যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় আন্তরিক যত্নের সহিত পরিশ্রমপূর্বক ধর্মশাস্ত্র সকল আদ্যন্ত অবলোকন করিয়া, বিধবাবিবাহ যে শাস্ত্রসম্মত ইহা প্রমাণ করিয়া, বঙ্গদেশের সকল পণ্ডিতকে পরাজয় করিয়াছেন এবং রাজদ্বারে আবেদন করিয়া, বিধবাবিবাহের আইন পাশ করাইয়াছেন; কিন্তু অদ্যাপি একটিও বিধবাবিবাহ দিতে পারিলেন না। অগ্রে একটি বিধবার বিবাহ-কার্য সমাধা হইলে, দেখিয়া শুনিয়া অনেকেই বিধবা-কন্যার বিবাহ দিবেন। কিছু দিন সর্বত্র সকল সময়ে এই কথারই আন্দোলন হইতে লাগিল।

সন ১২৬৩ সালের ২৪শে অগ্রহায়ণ সর্বপ্রথমে মহাসমারোহপূর্বক কলিকাতায়

কিয়া-স্ট্রীটস্থ অগ্রজের পরমবন্ধু বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভবনে) একটি া-কন্যার বিবাহবিধি সম্পন্ন হইল। বর, বিখ্যাত কথক, সম্ভ্রান্ত ও ধনশালী, য়াগ্রামনিবাসী রামধন তর্কবাগীশের পুত্র শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। ইনি প্রথমে ত-কলেজের আসিস্টাণ্ট সেক্রেটারির পদে নিযুক্ত ছিলেন, তৎপরে ঐ লয়ের সাহিত্যশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। কিছুদিন পরে াদাবাদের জজ-পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন। কন্যার নাম শ্রীমতী কালীমতী দেবী, ইহার পিতার নাম ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়, ইহার নিবাস বর্দ্ধমান-জেলার অন্তঃপাতী পলাশডাঙ্গা গ্রাম। কন্যাব প্রথম বিবাহ চারি বৎসর বয়সের সময়ে হইয়াছিল, ছয় বৎসরের সময় বিধবা হয়। বিধবাবিবাহের সময় তাহার বয়স দশ বৎসর মাত্র। নদীয়া জেলাব অন্তঃপাতী বহিবগাছিগ্রামনিবাসী হরমোহন ভট্টাচার্য্যের সহিত প্রথম পাণিগ্রহণ হইয়াছিল। এই প্রথম বিধবাবিবাহ অতি সমারোহপূর্ব্বক সম্পন্ন হয়। ইহাতে অগ্রজ মহাশয়ের বিস্তর অর্থব্যয় হয়। সংস্কৃত-কলেজের অধ্যাপক জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, ভরতচন্দ্র শিবোমণি, প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ ও তারানাথ তর্কবাচস্পতি এবং অন্যান্য টোলের অধ্যাপক, অনেকেই বিবাহ-সভায় উপস্থিত ছিলেন। বালিগ্রামনিবাসী বাবু মাধবচন্দ্র গোস্বামী, ঐ গ্রামের বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণসহ সভায় উপস্থিত ছিলেন। তৎকালীন সংস্কৃত-কলেজের পণ্ডিত শিবপুবনিবাসী হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এবং উক্ত গ্রামের অনেক ব্রাহ্মণও সমুপস্থিত ছিলেন। কলিকাতানিবাসী সম্ভ্রান্ত ও ধনশালী বাবু নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি অনেক লোকও উপস্থিত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত নানা স্থানের ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ বিবাহের সভাস্থলে সমুপস্থিত হই া-ছিলেন। বিবাহকার্য নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছিল। প্রথমত, বিধবা-বিবাহ যাহাতে না হইতে পারে, তদ্বিষয়ে কলিকাতাস্থ ও ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসীগণ ঐক্য হইয়া, অনেকে বাধা দিয়া কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। বিবাহস্থলে অধিক জনতা হইলে গোলযোগ হইবার আশঙ্কায়, রাজপুরুষেরা শান্তিরক্ষার্থ যথেষ্ট পুলিশ-কর্মচারীও নিয়োগ করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, বিধবার বিবাহ দিয়া, অনন্তকালস্থায়ী কীর্তিস্তম্ভ স্থাপন করিলেন দেখিয়া, তদানীন্তন অনেক কৃতবিদ্য ও ধনশালী লোক মনে মনে এই বিষয় আন্দোলনপূর্বক ঈর্ষান্বিত হইয়াছিলেন।

২নং। সন ১২৬৩ সালের ২৫শে অগ্রহায়ণ, কলিকাতায় একটি কায়স্থ-জাতীয় বিধবার বিবাহকার্য সমারোহপূর্বক সমাধা হয়। কন্যার নাম থাকমণি দাসী, পিতার নাম ঈশানচন্দ্র মিত্র, নিবাস কলিকাতা, ঠনঠনিয়া। নয় বৎসর বয়সের সময় কন্যার প্রথম বিবাহ সম্পন্ন হয়, বিবাহের তিন মাস পরে বৈধব্য সংঘটন হয়, দ্বিতীয়বার বিবাহসময়ে বয়স বার বৎসর। নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী শাপুরগ্রামনিবাসী কৃষ্ণমোহন বিশ্বাসের সহিত প্রথম বিবাহ হইয়াছিল। দ্বিতীয় বরের নাম মধুসূদন ঘোষ; নিবাস পানিহাটী গ্রাম, জেলা ২৪ পরগণা, পিতার

নাম কৃষ্ণকালী ঘোষ। ইহারা কুলীন কায়স্থ। বর, কলিকাতা হাটখোলার দত্ত-বাবুদের বাটীর দৌহিত্র; ইহার জ্যেষ্ঠতাত বাবু হরকালী ঘোষ, সদর-দেওয়ানি আদালতের উকীল, ইনি সভাবাজারের রাজবাটীর জামাতা। বর অতি প্রসিদ্ধ-বংশোদ্ভব; তৎকালে প্রেসিডেন্সি-কলেজে ল-ক্লাশে অধ্যয়ন করিতেন। এই বিবাহেও অগ্রজের যথেষ্ট ব্যয় হইয়াছিল।

৩নং। সন ১২৬৩ সালের ১১ই ফাল্গুন কায়স্থবংশোদ্ভব এক বিধবা-রমণীর বিবাহকার্য মহাসমারোহে সমাধা হইয়াছিল। কন্যার নাম শ্রীমতী গোবিন্দমণি দাসী, নয় বৎসর বয়ক্রমকালে প্রথম বিবাহ হয়, দশ বৎসরের সময় বৈধব্য সংঘটন হয়। পুনরায় বিবাহকালে কন্যার বয়স চৌদ্দ বৎসর হইয়াছিল। কন্যার পিতার নাম রামসুন্দর ঘোষ, নিবাস ভবানীপুর, জেলা ২৪ পবগণা। প্রথম বরের নাম প্রাণকৃষ্ণ সিংহ, নিবাস কলিকাতা, হোগলকুড়িয়া। দ্বিতীয় বরের নাম দুর্গানারায়ণ বসু, নিবাস বোড়াল, জেলা ২৪ পরগণা; পিতার নাম মধুসূদন বসু, ইহারা অতি সম্ভ্রান্ত লোক। দুর্গানারায়ণ বসু, মেদিনীপুর গবর্নমেণ্ট ইংরাজী-স্কুলের শিক্ষক; ইনি বিখ্যাত রাজনারায়ণ বসুর পিতৃব্যপুত্র। এ বিবাহেও অগ্রজ মহাশয়ের বিলক্ষণ ব্যয়াধিক্য হইয়াছিল।

৪নং। ১২৬৩ সালের ২৬শে ফাল্গুন কলিকাতায় আর একটি কায়স্থের বিধবা-কন্যার বিবাহকার্য সমাধা হয়। কন্যার নাম শ্রীমতী নৃত্যকালী দাসী। ইহার প্রথম বিবাহ সাত বৎসর বয়ঃক্রমকালে হইয়াছিল; একাদশ বৎসর বয়সের সময় বিধবা হয়, পুনবায় বিবাহ-সময়ে বয়স চৌদ্দ বৎসর হইয়াছিল। ইহার পিতার নাম হরিশ্চন্দ্র বিশ্বাস, নিবাস সুখচর, জেলা ২৪ পরগণা। প্রথম বরের নাম রামকমল সরকার, নিবাস চন্দনপুখুর, জেলা ২৪ পরগণা। দ্বিতীয় বরের নাম মদনমোহন বসু, নিবাস বোড়াল, জেলা ২৪ পরগণা, পিতৃনাম নন্দলাল বসু। এই বর বিখ্যাতবংশোদ্ভব কুলীন কায়স্থ। ইনি পরম ধর্মপরায়ণ বিখ্যাত বাবু রাজ-নারায়ণ বসু মহাশয়ের মধ্যম সহোদর। দেশহিতৈষী বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়, সাধারণের হিতকামনায় আগ্রহপূর্বক মধ্যম সহোদরের ও পিতৃব্য-পুত্র দুর্গানারায়ণ বসুর বিধবাবিবাহ দিয়া, সাধারণ কৃতবিদ্য লোকের নিকট প্রশংসার ভাজন হইয়াছেন। এই সময় সিপাহী-বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়ায়, বিধবাবিবাহের কার্য কিছুদিন স্থগিত ছিল।

১৮৫৭ খৃঃ অব্দে কলিকাতায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ঐ সময়েই বিদ্যাসাগর মহাশয় ইউনিভারসিটির অন্যতম সভ্য হন।

কিছুদিন পরে গবর্নমেণ্ট, সংস্কৃত-শিক্ষা রহিত করিবার প্রস্তাব করায়, ইউনি-ভারসিটির সেনেটে; অন্য সকল মেম্বরই সংস্কৃত-শিক্ষার প্রতিকূলে বদ্ধপরিকর হইলেন; কিন্তু অগ্রজ, সংস্কৃত-শিক্ষার অনুকূলে নানা অকাট্য যুক্তি দর্শাইয়া, সংস্কৃত-শিক্ষা রহিত না হইয়া বরং ঐ শিক্ষার বৃদ্ধি করিতে ও প্রবলতা রাখিতে

কৃতকার্য হইলেন। সকল মেম্বরের প্রতিকূলে নিজের মত বজায় রাখা, অপর কাহারও সাধ্য নহে; এজন্য তিনিও সমস্ত ভারতবাসীর নিকট ভক্তি ও শ্রদ্ধার ভাজন হইলেন।

সিবিলিয়ানগণ ফোর্ট-উইলিয়ম কলেজে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, মফঃস্বলে আসিস্টাণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট প্রভৃতি পদ পাইয়া থাকেন। এই সময়ে লর্ড ডালহৌসি গবর্নর জেনারাল বাহাদুর, সিবিলিয়ানগণের উচ্চপদযোগ্যতার পরীক্ষার জন্য, সেণ্ট্রাল-কমিটি নামে একটি কমিটি স্থাপন করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় উক্ত কমিটির অন্যতম মেম্বর হইলেন, এবং উক্ত কমিটিতে বাঙ্গালা ও হিন্দী পরীক্ষার, ইঁহার মতই প্রবল ছিল। কিছুকাল পরে নানা কারণে তিনি ঐ পদ পরিত্যাগ করেন।

সন ১২৬৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসে অগ্রজ মহাশয়, সিসিল বীডন মহোদয়কে বলিয়াছিলেন যে, সিপাহী-বিদ্রোহ-নিবন্ধন বিধবাবিবাহ-কার্য স্থগিত রাখা হইয়াছে। ইহা শ্রবণ করিয়া সিসিল বীডন মহোদয় বলিলেন, 'যখন আমাদের তরবারির উপর নির্ভর, তখন ভয় করিয়া বিধবাবিবাহ-কার্য স্থগিত রাখা তোমার কর্তব্য নয়।' অনন্তর তাঁহার কথা শুনিয়া পুনর্বার বিধবাবিবাহ দিতে যত্নবান হইলেন।

৫নং। সন ১২৬৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসের শেষে ব্রাহ্মণজাতীয় একটি বিধবা-বালিকার বিবাহ হয়। কন্যার নাম শ্রীমতী লক্ষ্মীমণি দেবী, পিতার নাম স্বরূপচন্দ্র চক্রবর্তী, নিবাস চন্দ্রকোণার অতি সন্নিহিত কেয়াগেড়ে গ্রাম। তৎকালে ঐ গ্রাম, জেলা হুগলির অন্তর্গত ছিল; এক্ষণে জেলা মেদিনীপুরভুক্ত হইয়াছে। কন্যার তিন বৎসর বয়সে প্রথম বিবাহ হয়, ঐ বৎসরেই বৈধব্য সংঘটন হয়; এক্ষণে অর্থাৎ দ্বিতীয়বার বিবাহের সময় বয়স আট বৎসর হইয়াছিল। প্রথম বরের নাম শিশুরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, নিবাস শিরসা, জেলা মেদিনীপুর। দ্বিতীয় বরের নাম যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়। ইনি সংস্কৃত-কলেজে অধ্যয়ন করিয়া, সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন; ইঁহার নিবাস গৈপুর, জেলা নদীয়া। এই বিবাহেও অগ্রজ মহাশয় প্রচুর অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

ইতিপূর্বে লেখা হইয়াছে যে, তৎকালীন লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর হেলিডে সাহেব মহোদয়, অগ্রজ মহাশয়কে আন্তরিক স্নেহ ও শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি সপ্তাহের মধ্যে বৃহস্পতিবার নানাবিষয়ের যুক্তি ও পরামর্শ করিবার জন্য, অগ্রজকে তাঁহার বাটীতে যাইবার আদেশ করেন। অগ্রজ, তজ্জন্য প্রতি সপ্তাহের বৃহস্পতিবার উঁহার ভবনে যাইতেন। একদিন সম্ভ্রান্তপদস্থ মান্যগণ্য ও রাজন্য প্রভৃতিতে গৃহ পরিপূর্ণ হইয়া ছিল; এমন সময়ে অগ্রজ মহাশয় ঐ গৃহে সমুপস্থিত হইয়া, চাপরাসী দ্বারা টিকিট পাঠাইবামাত্র চাপরাসী আসিয়া বলিল, 'পণ্ডিতজীকে লাট সাহেব আসিতে বলিলেন।' তাহা শ্রবণ করিয়া, রায় কিশোরীচাঁদ মিত্র প্রমুখ

ভিজিটারগণ আশ্চর্যান্বিত হইলেন যে, আমাদের মধ্যে কেহ পুলিশের ম্যাজিস্ট্রেট, কেহ রাজা, কেহ উচ্চপদস্থ কর্মচারী। আমরা বিদ্যাসাগরের আসিবার অনেক পূর্বে টিকিট পাঠাইয়াছি; তাহাতে আমাদিগকে আহ্বান না করিয়া, আমাদের অনেকক্ষণ পরে আগত, তালতলার চর্মপাদুকা-পরিহিত ও গাত্রে লংক্লাথের চাদর-যুক্ত ঐ ভট্টাচার্যকে অগ্রে ডাকিলেন। মনে মনে এইরূপ অপমান বোধ হওয়াতে, সকলে ঈর্ষান্বিত হইয়া, কোন এক উচ্চপদস্থ সাহেবের দ্বারা লাট সাহেবকে জানাইলেন যে, 'তিনি বিদ্যাসাগরকে কি কারণে এত সম্মান করেন?' ইহা শ্রবণ করিয়া, লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর উঁহাদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তিকে উত্তর দেন যে, 'বিদ্যাসাগরের দ্বারা অনেক উপদেশ ও কাজ পাই। কারণ, বিদ্যাসাগর নিঃস্বার্থ ও দেশহিতৈষী এবং সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ ও অসাধারণ বুদ্ধিমান। ইঁহার নিকট সদুপদেশ গ্রহণ করিলে, দেশের অনেক উপকার সাধিত হইয়া থাকে। অন্য যাঁহারা আসিয়াছেন, তাঁহারা কেবল স্বীয় স্বীয় স্বার্থ-সাধনোদ্দেশে আসিয়া থাকেন। বিদ্যাসাগরের সহিত কাহারও তুলনা নহে।'

একদিন ছোট লাট হেলিডে সাহেব, কথাপ্রসঙ্গে অগ্রজ মহাশয়কে বলেন যে, 'বঙ্গদেশের মধ্যে কেবল কলিকাতায় একটিমাত্র বালিকাবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। কুসংস্কারপরতন্ত্র হইয়া সর্বসাধারণ-লোকে বালিকাগণকে ঐ বিদ্যালয়ে অধ্যয়নার্থ প্রেরণ করেন না; অতএব আমার ইচ্ছা যে, তুমি মফঃস্বলের স্থানে স্থানে বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন না করিলে, সাধারণ বালিকাগণের লেখাপড়া শিক্ষার প্রচলন হওয়া দুষ্কর। অতএব তুমি যেমন হুগলি, বর্ধমান, নদীয়া ও মেদিনীপুর—এই জেলা-চতুষ্টয়ের স্থানে স্থানে মডেল-স্কুল অর্থাৎ আদর্শ-বঙ্গ-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া পরিদর্শন করিতেছ, সেইরূপ মফঃস্বলের স্থানে স্থানে বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করিয়া, হিন্দু-স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের জন্য তোমার চেষ্টা করা কর্তব্য।' তজ্জন্য অগ্রজ মহাশয় আন্তরিক যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে বর্ধমান, নদীয়া, হুগলী ও মেদিনীপুর এই কয়েক জেলার মফঃস্বলে স্থানে স্থানে প্রায় শতাধিক বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। প্রত্যেক বালিকাবিদ্যালয়ে দুইজন পণ্ডিত একটি চাকরাণী নিযুক্ত করিলেন এবং বিনামূল্যে বালিকাগণের পুস্তকাদি প্রদান করিতে লাগিলেন। কয়েক মাস অতীত হইলে পর, ঐ সকল বালিকাবিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের বেতনাদির বিল করিয়া, ডিরেক্টারের নিকট পাঠাইলেন; কিন্তু ডিরেক্টার ইয়ং সাহেব, ঐ বিল মঞ্জুর করিলেন না।

ইতিপূর্বে কথিত হইয়াছে, আদর্শ-বিদ্যালয় স্থাপন-সময়ে ডিরেক্টার ইয়ং সাহেবের সহিত অগ্রজ মহাশয়ের অপ্রণয় হওয়ায়, ডিরেক্টার ঐ সময় হইতে একাল পর্যন্ত তাঁহার ছিদ্রান্বেষণে তৎপর ছিলেন। এই সময়ে পার্লিয়ামেণ্টে কন্‌সারভেটিব পার্টি প্রবল হয় এবং তৎকালে লর্ড এলেন্‌বরা ভারতবর্ষে সাধারণ-শিক্ষার বিরুদ্ধে অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। ডিরেক্টার ইয়ং সাহেবও ঐ মতাবলম্বী ছিলেন; সুতরাং

ডিরেক্টার এক্ষণে ছিদ্র পাইয়া, বালিকাবিদ্যালয়ের বিলের প্রতিবাদ করেন। এই বিল পাশ করিতে অক্ষম হইয়া, অগ্রজ মহাশয়, লেপ্টেনেণ্ট গবর্নরকে জানাইলেন। তিনি বলিলেন, 'লর্ড এলেন্‌বরা ভারতবর্ষের শিক্ষাসমাজের ব্যয় লাঘবের নিমিত্ত অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। বালিকাবিদ্যালয়ে গবর্নমেণ্ট টাকা দিতে সম্মত নহেন। কিন্তু আমি তোমাকে বিদ্যালয় বসাইবার বাচনিক আদেশ দিয়াছি সত্য বটে; অতএব তুমি আমার নামে ঐ সকল বালিকাবিদ্যালয়ের কয়েক মাসের বেতনের টাকা আদায় জন্য অভিযোগ কর; আবেদন করিলেই আমি তোমায় টাকা দিতে বাধ্য হইব।' ইহা শুনিয়া, অগ্রজ বলিলেন, 'আমি কখনও কাহারও নামে নালিশ করি নাই, অতএব আপনার নামে কি প্রকারে অভিযোগ করিব? ঐ টাকা আমি নিজে ঋণ করিয়া পরিশোধ করিব। আপনার কথায় বিশ্বাস করিয়া, মফঃস্বলে বালিকা-বিদ্যালয় সকল স্থাপন করা হইয়াছে; শিক্ষকগণকে কয়েক মাসের বেতন না দিয়া, কিরূপে জবাব দেওয়া যায়?' এই বলিয়া মর্মান্তিক ক্রোধান্বিত হইয়া প্রস্থান করেন।

দ্বিতীয়ত, হুগলি, নদীয়া, বর্ধমান, মেদিনীপুর—এই জেলা-চতুষ্টয়ের স্কুলসমূহের এসিস্টাল ইনস্পেক্টারের পদে তিনি নিযুক্ত ছিলেন; ঐ সকল জেলায় বিদ্যালয় সমূহের যেরূপ উন্নতি পরিদর্শন করেন, তদনুযায়ী রিপোর্ট করিয়া থাকেন; তজ্জন্য ডিরেক্টার অর্থাৎ শিক্ষাসমাজের কর্মাধ্যক্ষ স্পষ্ট প্রকাশ করিয়া বলেন, 'এতদপেক্ষা উৎকৃষ্ট অর্থাৎ ভালরূপ সাজাইয়া রিপোর্ট করিবে, নচেৎ সাধারণের নিকট গৌরব হইবে না।' অগ্রজ বলিলেন, 'যাহা হইয়াছে আমি তাহাই লিখিব, বাড়াইয়া লেখা আমার কর্ম নহে। যদি ইহাতে সন্তুষ্ট না হন, তাহা হইলে আমি কর্ম পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি।'

তৃতীয়ত, যৎকালে গবর্নমেণ্ট, সংস্কৃত-কলেজের বাটী নির্মাণ করেন, তৎকালে গবর্নমেণ্টের উদ্দেশ্য ছিল যে, মধ্যস্থলের উন্নত দ্বিতল বাটীতে উক্ত কলেজের অধ্যাপকগণের বাসবাটী হইবে, আর ঐ বাটীর উভয় পার্শ্বের একতলা ভবনে বিদ্যার্থীগণ বসিয়া অধ্যয়ন করিবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যপ্রযুক্ত তৎকালের অধ্যাপকবর্গ বলিলেন, 'ম্লেচ্ছের ভবনে বাস করা কোনও রূপে হইবে না।' একারণ, মধ্যস্থলের দ্বিতল-ভবনে শিক্ষাকার্য সমাধা হইয়া আসিতেছে। উভয় পার্শ্বের গৃহ খালি পড়িয়া আছে।

তৎকালে গবর্নমেণ্ট, বিদ্যালয়ের উন্নতির অভিপ্রায়ে নিম্নশ্রেণীর ছাত্রগণকে মাসিক পাঁচ টাকা বৃত্তি ও উচ্চশ্রেণীর ছাত্রগণকে মাসিক আট টাকা বৃত্তি প্রদান করিতেন। কিছু দিন পরে, তৎকালের গবর্নর জেনারাল লর্ড বেণ্টিক, সংস্কৃত-কলেজ উঠাইয়া দিবার উদ্যোগ পাইলে, কলেজের শিক্ষক জয়গোপাল তর্কালঙ্কার প্রভৃতি নিরুপায় হইয়া, কলেজের স্থায়িত্বের মানসে বিলাতে উইলসন সাহেবকে এই পত্রখানি লিখেন যে—

অস্মিন্ সংস্কৃতপাঠসদ্মসরসি ত্বংস্থাপিতা যে সুধী-
হংসা কালবশেন পক্ষরহিতা দূরং গতে তে ত্বয়ি।
তত্তীরে নিবসন্তি সংহিতশরা ব্যাধাস্তদুচ্ছিত্তয়ে
তেভ্যস্ত্বং যদি পাসি পালক তদা কীর্তিশ্চিরং স্থাস্যতি॥

উইলসন সাহেব বিলাতে কলেজের প্রফেসার ছিলেন। বিদ্যালয়েই ঐ পত্র পাইয়া, উক্ত কবিতা পাঠ করিয়া নেত্রজলে প্লাবিত হইলেন। সেই বিদ্যালয়ের সম্ভ্রান্তবংশীয় বিদ্যার্থীগণ প্রফেসারের রোদনের কারণ অবগত হইয়া সকলে মুক্তকণ্ঠে বলিল, যে ভাষা পাঠ করিলে এরূপ চক্ষুর জল বিনির্গত হয়, সেই ভাষা একেবারে পরিত্যাগ করা যুক্তিসিদ্ধ নয়। অনন্তর উপস্থিত সকলেই ঐক্য হইয়া কর্তৃপক্ষগণকে অনুরোধ করায়, তাঁহারা সংস্কৃত-কলেজ স্থায়ী করিলেন সত্য বটে ; কিন্তু তদবধি ব্যয়ের অনেক লাঘব করিয়া দিলেন এবং বিদ্যালয়ে নূতন প্রবিষ্ট আর কেহ বৃত্তি পাইল না।

ঐ সময়ে লালবাজারের একটি সামান্য বাটিতে হিন্দু-কলেজ ছিল। তথায় নানা অসুবিধাপ্রযুক্ত ঐ বিদ্যালয়ের কর্মাধ্যক্ষগণ, সংস্কৃত-কলেজের পূর্ব ও পশ্চিম উভয় পার্শ্বের শূন্য-ভবনে হিন্দু-কলেজ স্থাপনের অনুমতি প্রার্থনা করেন। গবর্নমেণ্ট, সংস্কৃত-কলেজের ঐ স্থানে হিন্দু-কলেজ স্থাপনের আদেশ প্রদান করেন। তদবধি ঐ স্থানে হিন্দু-কলেজের শিক্ষাকার্য সমাধা হইয়া আসিতেছে। ক্রমশ ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি হইলে পর, সংস্কৃত-কলেজের পশ্চিমাংশের উপরের কয়েকটি গৃহ ও হল অধিকার করিয়াছে। ঐ সময়ে প্রেসিডেন্সি-কলেজের স্বতন্ত্র বাটীর বন্দোবস্ত হইয়াছিল। তৎকালে বিদ্যাসাগর মহাশয়, সংস্কৃত-কলেজে ইংরাজী-শিক্ষার নূতন সুপ্রণালী স্থাপন করেন ; সুতরাং অধিক ঘরের আবশ্যক হয়। পশ্চিমাংশের উপরের দুইটি গৃহ হিন্দু-কলেজের কোনও ব্যবহারে লাগিত না, কেবল চাবি বন্ধ থাকিত। ঐ দুইটি ঘর লইবার জন্য শিক্ষাসমাজের কর্মাধ্যক্ষকে জানাইলে, তিনি অগ্রজ মহাশয়কে বলেন যে, তুমি নিজে হিন্দু-কলেজের প্রিন্সিপাল সার্টক্লিপ সাহেবকে বলিবে। তাহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন যে, সার্টক্লিপের সহিত বিদ্যালয় উপলক্ষে বিলক্ষণ মনান্তর আছে ; আমি তাঁহাকে কোন কথা বলিব না। ইহাতে সাহেব জিদ করিয়া বলেন যে, তোমাকে তাঁহার নিকট যাইতে হইবে। তচ্ছ্রবণে অগ্রজ বলেন যে, তুমি যদি একদিন তথায় যাইয়া আমায় ডাকাও, তাহা হইলে অগত্যা আমায় যাইতে হইবে। কয়েক দিন পরে সাহেব, হিন্দু-কলেজে গিয়াছিলেন ; কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ডাকান নাই। সুতরাং তথায় যাইয়া দেখা না করিয়া, সাহেবের বাটীতে গিয়া, ঘরের কথা উল্লেখ করিলে, তিনি অগ্রজকে সার্টক্লিপের সহিত দেখা করিতে বারম্বার জিদ করিলেন। তাহাতে অগ্রজ, তৎক্ষণাৎ সেই-খানেই কাগজ লইয়া, রেজাইন-পত্র লিখিয়া দিয়া প্রস্থান করেন। পরে রেজাইন-পত্র দেখিয়া লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর, রেজাইন মঞ্জুর করিতে ইচ্ছা করেন নাই। তিনি

তাঁহাকে ডাকাইয়া পাঠান, কিন্তু অগ্রজ তাহাতেও দেখা করিতে যান নাই। অবশেষে বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিতে স্বীকার পাইলেও বলিয়াছিলেন, আর চাকরি করিব না। অনেকে রেজাইন-পত্র ফিরিয়া লইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু অগ্রজ কাহারও উপদেশ শ্রবণ করেন নাই।

১৮৫৮ খৃঃ অব্দের শেষে বিদ্যাসাগর মহাশয়, সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপালের পদ পরিত্যাগ করেন। ঐ সময়ে কলিকাতার সুপ্রীমকোর্টের চিফ জস্টিস সার জেম্স্ কল্‌বিন সাহেব মহোদয়, তৎকালীন শিক্ষাসমাজের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। ইনি অগ্রজকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন; একারণ, অগ্রজকে বলেন, 'তুমি যেরূপ হিন্দু-ল (আইন) অবগত আছ, উকীল হইলে তোমার আরও প্রতিপত্তি হইবে।' ইহা শুনিয়া অগ্রজ তাঁহাকে বলেন যে, 'আমি ইংবাজী আইন জানি না, আর এ বয়সে আইন পরীক্ষা দিতেও ইচ্ছা নাই।' তাহাতে চিফ জস্টিস বলেন যে, 'তোমার মত অদ্বিতীয় বুদ্ধিমান, দেশহিতৈষী, বিদ্যোৎসাহী, বিচক্ষণ কার্যদক্ষ ব্যক্তিকে পরীক্ষা দিতে হইবে না। আমার পাশ করিয়া দিবার ক্ষমতা আছে, তোমার মত লোক পাইলে, গবর্নমেণ্টের ও ভাবতবর্ষের অনেক উপকার হইবে।' কল্‌বিন সাহেব মহোদয়ের উত্তেজনায়, তৎকালীন সদর-দেওয়ানী আদালতের সর্বপ্রধান উকীল বাবু দ্বাবকানাথ মিত্র মহোদয়ের বাটীতে প্রতিদিন প্রাতে ও সায়ংকালে যাইয়া দেখিলেন যে, হিন্দুস্থানী মোক্তারদের সহিত টাকার জন্য অনেক হুড়াহুড়ি করিতে হয়। তাহা দেখিয়া শুনিয়া ওকালতী-কর্মে ঘৃণা জন্মিল এবং কল্‌বিন সাহেবের বাটী যাইয়া বলিলেন, 'অধিক টাকা পাইব বলিয়া এরূপ বিসদৃশ ঘৃণিত-কর্মে প্রবৃত্ত হইতে আমার প্রবৃত্তি হয় না।' সাহেব নানাপ্রকার উপদেশ দিয়া, অনেক বুঝাইলেন, তথাপি অগ্রজের অর্থকরী ওকালতী-কর্মে প্রবৃত্তি হইল না।

স্বাধীনাবস্থা

যে সকল বালিকাবিদ্যালয়, ছোট লাট হেলিডে সাহেবের বাচনিক আদেশে স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই সকল বিদ্যালযের শিক্ষকদের বেতন ন্যূনধিক চারি সহস্র টাকা স্বয়ং ঋণ করিয়া প্রদান করেন। অতঃপর অধিকাংশ বালিকাবিদ্যালয় উঠাইয়া দিয়া, নদীয়া, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও হুগলি জেলার অন্তঃপাতী বীরসিংহ, রামজীবনপুর, উদয়রাজপুর, গোবিন্দপুর, ঈড়পালা, কুরাণ, যৌগ্রাম প্রভৃতি গ্রামে প্রায় কুড়িটি বালিকাবিদ্যালয় স্থায়ী করেন, এবং ঐ সকল বিদ্যালয়ের ব্যয় স্বয়ং ও নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের সাহায্যে নির্বাহ করিতেন। যে যে মহানুভবেরা উক্ত বালিকাবিদ্যালয়ে সাহায্য দান করিতেন, তাঁহাদের নাম এই—তৎকালীন গবর্নর জেনারালের পত্নী লেডি ক্যানিং, হোমডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারি সিসিল বীডন ও তৎকালীন কৌন্সেলের মেম্বর গ্রাণ্ট ও গ্রে সাহেব প্রভৃতি এবং রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও চকদিঘিনিবাসী বাবু সারদা প্রসাদ সিংহ প্রভৃতি। এই সকল মহোদয়েরা ভারতবর্ষের কামিনীগণের ভাবী হিতকামনায় বালিকাবিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ প্রতি মাসেই অগ্রজ মহাশয়ের নিকট নিয়মিত টাকা প্রেরণ করিতেন। কতিপয় বৎসর উক্তরূপ সাহায্যেই বালিকাবিদ্যালয় সকল চলিয়া আসিতেছিল। পরে অগ্রজ মহাশয়, তৎকালীন ছোট লাট গ্রাণ্ড সাহেবের অনুরোধের বশবর্তী হইয়া, গবর্নমেণ্টের প্রদত্ত অর্ধেক চাঁদা গ্রহণ করিয়া ব্যয়নির্বাহ করিতেন। অনন্তর ক্রমশ কলিকাতার সন্নিহিত উপনগরে বালিকাবিদ্যালয় সকল স্থাপিত হইতে লাগিল। প্রথমত, ভারতবর্ষে বালিকাবিদ্যালয় প্রচলনজন্য হিন্দুদিগের মধ্যে অগ্রজই প্রধান উদ্যোগী ছিলেন, অতঃপর স্ত্রীশিক্ষা-বিষয়ে দেশীয় অন্যান্য সম্ভ্রান্ত লোকের পূর্বের ন্যায় ঘৃণা বা দ্বেষ রহিল না; সকলেই স্বীয় স্বীয় দুহিতা প্রভৃতিকে বিদ্যালয়ে পাঠাইতে লাগিলেন। অবশেষে কলিকাতার দলপতিগণও বেথুন-বালিকাবিদ্যালয়ের স্ব স্ব দুহিতা প্রভৃতিকে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। গবর্নমেণ্ট, স্ত্রীশিক্ষা-বিষয়ে প্রজাবর্গের উৎসাহ-বর্ধনার্থে পল্লীগ্রামের বালিকাবিদ্যালয়ে সাহায্য-প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন। অগ্রজ মহাশয়ও ঐ সকল বালিকাবিদ্যালয়ে যেরূপ সাহায্য করিতেন, সেইরূপ অপরাপর স্থানের সম্ভ্রান্ত লোকদিগের স্থাপিত বালিকাবিদ্যালয়েও মাসে মাসে সাহায্য করিতেন; এবং ঐ সকল বালিকাবিদ্যালয়ের পারিতোষিক দানের সংবাদ-প্রাপ্তি-মাত্র উৎসাহ-বর্ধনার্থ অন্তত বিংশতি মুদ্রার পারিতোষিক পুস্তক পাঠাইয়া দিতেন। কিছু দিন পরে, হিন্দুস্থানেও বালিকাবিদ্যালয় স্থাপিত হইতে লাগিল। ঐ সময়ে কাশীবাসী রাজা দেবনারায়ণ সিংহ প্রভৃতি মহোদয়গণ, প্রায় প্রতি বৎসর কলিকাতার ইণ্ডিয়া লেজিস্লেটিভ কৌন্সিলে আগমন করিতেন। অগ্রজ মহাশয়, ঐ সকল বড় লোকদিগকে কলিকাতার বেথুন-ফিমেল্‌-স্কুল দেখাইবার জন্য সমভিব্যাহারে লইয়া যাইতেন। উক্ত বিদ্যালয়ের যে কয়েকটি বালিকা ভালরূপ শিক্ষা

করিয়াছিল, রাজা দেবনারায়ণ সিংহ, তাহাদিগকে বেনারসের সাটি পুরস্কার করেন। একবার রাজা দেবনারায়ণ সিংহ মহোদয়, কথাপ্রসঙ্গে অগ্রজ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, 'এই স্কুলবাটী কোন্ মহাত্মার অর্থব্যয়ে নির্মিত হইয়াছে?' তাঁহার প্রশ্ন শুনিয়া অগ্রজ বলেন, 'মহামতি অবলাবন্ধু বেথুন সাহেব এই বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া, ইহার ইমারত প্রভৃতির জন্য প্রায় লক্ষ টাকা প্রদান করিয়াছেন।' অনন্তর ঐ সকল মহাত্মারা দেশে গমনপূর্বক প্রোৎসাহিত হইয়া, স্থানে স্থানে বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন-বিষয়ে আন্তরিক যত্ন করিতেন।

তৎকালে সিসিল বীডন সাহেব, হিন্দুবালিকাগণের লেখাপড়া শিক্ষার উৎসাহ-বর্ধনার্থ আন্তরিক যত্ন প্রকাশ করিতেন, এবং বেথুন-ফিমেল স্কুলের পারিতোষিক-দান-সময়ে গবর্নর জেনারাল প্রভৃতিকে সর্বসমক্ষে প্রকাশ করিয়া বলিতেন, ভারতবর্ষের বালিকাবিদ্যালয়-প্রচলন-বিষয়ে বিদ্যাসাগরই একমাত্র প্রধান উদ্‌যোগী। মফঃস্বলে যে কোন স্থানে বালিকাবিদ্যালয় হইয়াছে, তাহাও বিদ্যাসাগরের যত্নে ও উৎসাহেই হইয়াছে এবং পরেও যে ভারতবর্ষের নানাস্থানে ফিমেল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইবে, বিদ্যাসাগরই তাহার পথপ্রদর্শক।

এতদ্ব্যতীত তৎকালে যে যে বালিকা-বিদ্যালয়ে পারিতোষিক-দান-কার্য সমাধা হইত, সেই সেই স্থানীয় কৃতবিদ্যগণ, বিদ্যাসাগরের গুণ-কীর্তন না করিয়া ক্ষান্ত হইতেন না।

মগরার সন্নিহিত দিগসুগ্রামনিবাসী সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, শৈশবকাল হইতে সংস্কৃত-কলেজে অধ্যয়ন করিয়া, সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষা উত্তমরূপ শিক্ষা করিয়া; এস্‌কলার্শিপ প্রাপ্ত হন। কিন্তু তিনি পরীক্ষোত্তীর্ণ হইবার কিছুদিন পরেই বধির হইলেন; সুতরাং কর্ম পাইলেন না। বহু পরিবার অনাহারে মারা পড়িবে বলিয়া এক দিবস অগ্রজের নিকট রোদন করিতে লাগিলেন। ইঁহার রোদনে পর-দুঃখকাতর অগ্রজ মহাশয়ের হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হইল; কিন্তু কি করিবেন, ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, অবশেষে সোমপ্রকাশ নামে সংবাদপত্র প্রচার করেন। ইহাতে যাহা লাভ হইবে, তাহা সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিবারগণের ভরণপোষণার্থ ব্যয়িত হইবে। সোমপ্রকাশে প্রথম যাহা প্রকাশ হইয়াছিল, তাহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিজের রচনা। ঐ সময়ে বর্ধমানাধিপতি ধীরাজ বাহাদুর, সংস্কৃত মহাভারত দেশীয়-ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রচার করিবার মানস করিলে, অগ্রজ তাঁহাকে বলিলেন, 'সংস্কৃত-কলেজের ছাত্র সারদাপ্রসাদ উত্তম বাঙ্গালা অনুবাদ করিতে পারে। সারদা কালা হইয়াছে, অন্য কোন কর্ম করিতে অক্ষম, কিন্তু আপনার মহাভারত রচনা ভালরূপ করিতে পারিবে এবং আপনার পুস্তকালয়ের লাইব্রেরিয়ানের কার্যও সুন্দররূপে সম্পন্ন করিতে পারিবে।' তাঁহার অনুরোধে সারদাপ্রসাদ রাজবাটীতে কর্ম পাইয়া, পরিবার-প্রতিপালনে সক্ষম হইয়াছিলেন। অনন্তর দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে যোগ্যপাত্র বিবেচনায়, তাঁহাকে

সোমপ্রকাশ সংবাদপত্র প্রচারের ভার অর্পণ করিলেন। তদবধি বিদ্যাভূষণ মহাশয়ই উহার উপস্বত্বভোগী হইলেন।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যক্ষ জি. টি. লেজার মার্শেল সাহেব, শিক্ষা-সমাজের কর্মাধ্যক্ষ ডাক্তার ময়েট সাহেব, শিক্ষাসমাজের প্রেসিডেণ্ট ড্রিঙ্ক-ওয়াটার বেথুন সাহেব, ইঁহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন এবং ইঁহারা তিন জনেই তাঁহার উন্নতি, প্রতিপত্তি ও মানসম্ভ্রমের আদি কারণ; অগ্রজ, ইঁহাদের প্রতি-মূর্তি অঙ্কিত করাইয়া, কলিকাতার বাদুড়বাগানের বাটীতে রাখিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যহ উক্ত প্রতিমূর্তিগুলি একবার না দেখিয়া থাকিতে পারিতেন না।

মেট্রোপলিটান

১৮৫৯ খৃঃ অব্দে কলিকাতা ট্রেনিং স্কুল স্থাপিত হয়। ঠাকুরদাস চক্রবর্তী, মাধবচন্দ্র ধাড়া, পতিতপাবন সেন, যাদবচন্দ্র পালিত, বৈষ্ণবচরণ আঢ্য, ইঁহারাই স্কুলের স্থাপয়িতা এবং শ্যামাচরণ মল্লিক পেট্রন ছিলেন।

ঐ স্কুল-স্থাপয়িতাগণ এবং আরও কয়েকজন দেশীয় ভদ্রলোক, একত্র একটি কমিটি স্থাপন করিয়া, খৃঃ ১৮৬৩ সাল পর্যন্ত উক্ত বিদ্যালয়ের কার্য নির্বাহ করেন। কিন্তু পরস্পরের মনোমালিন্যবশত এবং বিদ্যালয়ের অবস্থার অবনতি দেখিয়া, ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হস্তে সমস্ত ভার অর্পণ করেন। কিয়দ্দিবস পরে মেম্বরগণের পরস্পর মনান্তর ঘটিলে পৃথক পৃথক স্থানে দুইটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। মেম্বরগণ তাঁহাদের স্থাপিত বিদ্যালয়ের নাম ট্রেনিং একাডেমি রাখিয়াছিলেন। কিন্তু অগ্রজ স্বীয় ব্যয়ে বেঞ্চ প্রভৃতি বিদ্যালয়ের আবশ্যক দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া, মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউসন স্থাপন করেন। উভয় বিদ্যালয় অতি সন্নিহিত স্থানে স্থাপিত হয়, এবং উভয় বিদ্যালয়ই পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বীভাবে চলিতে লাগিল। অগ্রজ মহাশয়, উপযুক্ত শিক্ষকসকল নিযুক্ত করিতে লাগিলেন, এবং নিজব্যয়ে বহুমূল্য পুস্তকাদি ক্রয় করিয়া, বিদ্যালয়ের লাইব্রেরী স্থাপন ও উত্তম বন্দোবস্ত করেন। ক্রমশ এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় গবর্নমেণ্ট বিদ্যালয় অপেক্ষা এখানে বহুসংখ্যক ছাত্র উত্তীর্ণ হওয়ায় চতুর্দিক হইতে বিদ্যার্থী বালকবৃন্দ মেট্রোপলিটান স্কুলে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। অগ্রজ মহাশয়, নিরন্তর বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য যত্নবান ছিলেন; একারণ, সকল বিদ্যালয় অপেক্ষা ইহা ক্রমশ উন্নত-পদবীতে অধিরূঢ় হইয়াছে। কিয়দ্দিবস পরে ছাত্রদত্ত বেতন দ্বারা বিদ্যালয়ের সকল প্রকার ব্যয় নির্বাহ হইতে লাগিল। অতঃপর তাঁহাকে নিজ হইতে আর সাহায্য করিতে হইত না। নিম্ন-শ্রেণী পর্যন্ত সকল ছাত্রেরই মাসিক তিন টাকা বেতন ধার্য করেন; কেবল বাঙ্গালা-বিভাগে মাসিক এক টাকা

বেতন। নিতান্ত দরিদ্র বালকগণ বিনা বেতনে পড়িতে পাইত। অনেক দরিদ্র বালককে পুস্তক ও বাসা-খরচ পর্যন্ত নিজব্যয়ে সাহায্য করিতেন। অন্যান্য বিদ্যালযে শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে প্রহাব করিতেন; কিন্তু তিনি স্বীয় বিদ্যালয়ে প্রহার বা দুর্বাক্য প্রয়োগ রহিত করেন। যদি কোন শিক্ষক, বালকগণকে প্রহার বা দুর্বাক্য বলিতেন, তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ পদচ্যুত করিতেন। যে বালক শিক্ষকের সদুপদেশ শ্রবণ না করে ও অধ্যয়নে মনোনিবেশ না করে এবং অন্য বালকের পড়াশুনার ব্যাঘাত জন্মায়, তাহাকে প্রথমত নানাপ্রকার উপদেশ দেওয়া হইত। যদি উপদেশে ফল না হইত, তবে তাহার নাম কর্তন করিয়া, বিদ্যালয় হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার নিয়ম করিয়াছিলেন।

এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এল.এ. ও বি.এ. কোর্স অধ্যয়ন জন্য প্রেসিডেন্সী-কলেজে প্রবিষ্ট হইলে, মাসিক বাব টাকা বেতন লাগিত; এজন্য মধ্যবিত্ত বিদ্যার্থীগণ উক্ত কলেজে অধ্যয়ন করিতে অক্ষম হইত। অগ্রজ মহাশয়, সাধারণের হিতকামনায় এল এ. ক্লাস খুলিলেন, এবং অনেক দরিদ্র বালকও প্রবিষ্ট হইবার জন্য নাম লেখাইল। কিন্তু দুর্ভাগ্যপ্রযুক্ত তৎকালে গভর্নমেণ্ট আবেদনপত্রে সম্মতি প্রদান না করায়, আপাতত এল.এ. ক্লাস বন্ধ রাখিলেন। কিন্তু ঐ চিন্তা অগ্রজ মহাশয়েব মনোমধ্যে অহর্নিশ জাগরূক রহিল। তিনি যাহা ধরিতেন, তাহার চূড়ান্ত না দেখিয়া কখনও নিবৃত্ত হইতেন না। তাঁহার উদ্যম একবার ভঙ্গ হইলে, ক্ষণমাত্রও বিচলিত হইতেন না, বরং দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত কার্যে প্রবৃত্ত হইতেন। কিছুদিন পরে পুনর্বার চেষ্টা করিলেন। সেই সময়ে বিদ্যালয়সমূহের কর্তৃপক্ষ সাহেবরা অহঙ্কারপূর্বক বলেন যে, 'বাঙ্গালীদের ইংরাজী-কলেজ চালাইবার এখনও ক্ষমতা হয় নাই। ইংরাজ ভিন্ন ইংরাজী-কলেজ পরিচালনা অসম্ভব।' অগ্রজ, তাঁহাদের এই সাহঙ্কাব-বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া, তর্ক-বিতর্ক দ্বারা নানা প্রকার বাধা অতিক্রমপূর্বক, নিজ কলেজে সমস্ত দেশীয় শিক্ষক নিযুক্ত করত ভারতবাসীদের মধ্যে সর্বপ্রথমে কলেজ-ক্লাস খুলিলেন। এই কলেজ লইয়া ই. সি. বেলির সহিত তাঁহার অনেক কথাবার্তা হয়। ই. সি. বেলি বলেন, 'বিদ্যাসাগর! কিরূপে তুমি নিজ কলেজ চালাইবে? ইংরাজ-সাহায্য ব্যতীত ইংরাজী-কলেজ কিছুতেই চলিতে পারে না।' অগ্রজ, তাঁহাকে উত্তর করেন, আমি আপন বিদ্যালয়ের ছাত্রবর্গকে ইংরাজী-বিদ্যা শিখাইতে না পারিলেও পাশ করাইতে পারিব, ইহা নিশ্চয় জানিবেন।' ১৮৭২ খৃস্টাব্দে এল.এ. ক্লাসের এফিলিয়েসন মঞ্জুর হয়, এবং সেই বৎসর হইতে এল.এ. পরীক্ষার্থীদিগের রীতিমত পড়াশুনা আরম্ভ হয়। এই সময় অগ্রজ মহাশয় কায়িক অত্যন্ত অসুস্থ হইয়াছিলেন। ১৮৭৬ খৃঃ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে, অগ্রজ মহাশয়ের তৃতীয় জামাতা বাবু সূর্যকুমার অধিকারী, কলেজ এবং স্কুলের সেক্রেটারির পদে নিযুক্ত হইয়া, আয় ও ব্যয়ের উত্তম বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।

১৮৭৯ খৃঃ অব্দে বি.এ. ক্লাস খোলা হয়। বৎসর বৎসর বি.এ. পরীক্ষার্থীদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; এমন কি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বৎসর ২৫০টি ছাত্র বি.এ. পাশ হয়, সেই বৎসর ঐ ২৫০ জনের মধ্যে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ এই এক মেট্রোপলিটান হইতে এবং বাকী দুই-তৃতীয়াংশ কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য যাবতীয় বিদ্যালয় হইতে পাশ হইয়াছিল। তদ্দর্শনে অগ্রজ মহাশয়, প্রোৎসাহিত হইয়া ল-ক্লাশ খুলিবার জন্য যত্নবান হন, এবং ১৮৮৪ খৃঃ অব্দে ল-ক্লাশ খোলা হয়। ১৮৮৫ খৃঃ অব্দে বি.এল. পরীক্ষায় মেট্রোপলিটান-কলেজ সর্বপ্রথম স্থান অধিকার করে। সেই বৎসর বেঙ্গল-গভর্নমেণ্ট সুফল দেখিয়া, কলিকাতা গেজেটে মেট্রোপলিটান-কলেজের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া, এক রেজোলিউসন প্রকাশ করেন।

ইতিপূর্বে কলিকাতা সুকিয়াস্ট্রীটের যে বাটীতে বিদ্যালয় ছিল, লাহাবাবুরা ঐ বাটী ক্রয় করিয়া, ঐ স্থান হইতে অপর স্থানে বিদ্যালয় উঠাইয়া লইয়া যাইবার নোটীস দেন। এই সংবাদে অগ্রজ মহাশয়ের অত্যন্ত দুর্ভাবনা হয়। তিনি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, অবশেষে স্থির করেন, বাদুড়-বাগানে যে স্থানে নিজের বসতবাটী আছে, ঐ স্থানে আপন নূতন বাটী ভগ্ন করিয়া, ও উহার সংলগ্ন আরও কিঞ্চিৎ ভূমি ক্রয় করিয়া, কলেজ-বাটী প্রস্তুত করিব। তাহার প্ল্যান পর্যন্ত প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার প্রকৃত মহত্ত্বের পরিচায়ক; কারণ, ঐ বাটী ভিন্ন তাঁহার কলিকাতায় অবস্থিতি করিবার ও তাঁহার লাইব্রেরী স্থাপন করিবার অপর আর কোন স্বকীয় স্থান ছিল না এবং ঐ বাটীও মূল্যবান ছিল। ঐ সময়ে পঞ্চাশ সহস্র টাকা মজুত ছিল। প্রিন্সিপাল সূর্যবাবুর যত্নে, শঙ্কর ঘোষের লেনে মহেন্দ্র-নারায়ণ দাসের নিকট, বিদ্যালয়ের নিমিত্ত ন্যূনাধিক ত্রিশ হাজার টাকায় ভূমি ক্রয় করা হয়। বাটী নির্মাণের জন্য তৎকালে যে টাকার অসদ্ভাব হয়, তাহা কর্জ করিয়া বাটী-নির্মাণ-কার্য সম্পন্ন করেন। ভূমি-খরিদ ও ইমারত-নির্মাণ প্রভৃতি কার্যে, প্রায় একলক্ষ ত্রিশহাজার টাকা ব্যয়িত হয়। অল্পদিনের মধ্যেই বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণের জন্য যাহা ঋণ হইয়াছিল, তৎসমস্ত পরিশোধ হইয়া যায়। খৃঃ ১৮৮৭ সালের জানুয়ারী মাসে, কলেজ-ক্লাস নূতন বাটীতে প্রবেশ করে, এবং ইহার দুই চারি মাস পরে স্কুলও নূতন বাটীতে যায়।

শাখা-স্কুলের মধ্যে ১৮৭৪ সালে শ্যামপুকুর ব্রাঞ্চস্কুল স্থাপিত হয়। ১৮৮৫ খৃঃ অব্দে বহুবাজার এবং ১৮৮৭ খৃঃ অব্দে বড়বাজার ও বালাখানা ব্রাঞ্চ এই তিনটি স্কুল স্থাপন করেন। এস্থলে ইহাও স্বীকার করা উচিত যে, এই কয়েকটি স্কুল স্থাপন-সময়ে, প্রিন্সিপাল সূর্যবাবু নিরন্তর যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন।

১৮৮৮ খৃঃ অব্দে ১লা ভাদ্র বৃহস্পতিবার পূজ্যপাদ জ্যেষ্ঠা বধূদেবী পরলোক গমন করায়, অগ্রজ মহাশয় নানাপ্রকার দুর্ভাবনায় অভিভূত হইলেন এবং ক্রমশ তাঁহার শারীরিক ও মানসিক অবস্থার অবনতি হইতে লাগিল। ঐ বৎসর ভাদ্র মাসের ২৫শে রবিবার সূর্যবাবুকে পদচ্যুত করেন, এবং অঙ্কশাস্ত্রাধ্যাপক বাবু

বৈদ্যনাথ বসুকে প্রিন্সিপালের কার্য চালাইবার ভারার্পণ করেন। ইতিপূর্বে অগ্রজ, কায়িক অসুস্থতানিবন্ধন মধ্যে মধ্যে বায়ুপরিবর্তনজন্য কর্মাটাড় নামক স্থানে গমন করিতেন, কিন্তু জামাতা সূর্যকুমারকে পদচ্যুত করিয়া অবধি প্রায় কর্মাটাড়ে গমন করেন নাই। কলিকাতায় সর্বদা অবস্থিতি করিয়া, ক্রমশ অবসন্ন হইতে লাগিলেন; তথাপি প্রায় প্রত্যহ বিদ্যালয়গুলি পরিদর্শন না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন না।

যৎকালে বিদ্যাসাগর মহাশয় কিছু দিনের জন্য তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার কার্যকলাপ পরিদর্শন করিতেন, ঐ সময়ে তিনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন; তন্মধ্যে মহাভারতের উপক্রমণিকা অধ্যায় বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া, ক্রমশ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮৬০ খৃঃ অব্দে পুনরায় উহা পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন।

১৮৬০ খৃঃ অব্দে হিন্দু পেট্রিয়টের বিখ্যাত এডিটার, ভবানীপুরনিবাসী বাবু হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় মানবলীলা সম্বরণ করেন। ইঁহার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে অপর কেহ উক্ত সংবাদপত্র চালাইবার যোগ্য লোক না থাকা প্রযুক্ত উঁহার উত্তরাধিকারিণী পঞ্চ সহস্র মুদ্রা মূল্য লইয়া, কলিকাতা জোড়াসাঁকোনিবাসী বিদ্যোৎসাহী বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়কে হিন্দু-পেট্রিয়টের স্বত্বাধিকার বিক্রয় করেন। বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ, মাসিক ছয় শত টাকা বেতনে একজন সুযোগ্য ইউরোপীয়ান লেখক নিযুক্ত করিয়া, কিছু দিন হিন্দু পেট্রিয়ট সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। পরে প্রচার করিতে অক্ষম হইয়া, অগ্রজ মহাশয়ের হস্তে উহার সমস্ত ভার সমর্পণ করেন। অগ্রজ মহাশয়ও কয়েকবার ঐ কাগজ প্রচার করিয়া বিরক্ত হইলেন, এবং প্রকাশ করিলেন যে, উপযুক্ত পাত্রে বিনামূল্যে এই সংবাদপত্রের পরিচালন-ভার অর্পণ করিব। একারণ, হিন্দু-পেট্রিয়টের স্বত্বপ্রাপ্ত্যভিলাষে অনেক কৃতবিদ্য লোক তাঁহার নিকট গতিবিধি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময়ে কৃষ্ণদাস পাল, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের কেরানীর পদে নিযুক্ত ছিলেন। যদিও বাবু কৃষ্ণদাস পাল তৎকালীন কোন বিখ্যাত বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া জুনিয়র বা সিনিয়র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছিলেন না, তথাপি বাটীতে স্বয়ং সর্বদা অধ্যয়ন করায়, তাঁহার ভালরূপ ইংরাজী লিখিবার অসাধারণ ক্ষমতা জন্মিয়াছিল। কৃষ্ণদাস পাল অতিশয় বুদ্ধিমান ও কার্যদক্ষ ছিলেন; বিশেষত অগ্রজের সহিত তাঁহার বিশেষ সদ্ভাব ছিল। তজ্জন্য অগ্রজ মহাশয়, বাবু কৃষ্ণদাস পালকে হিন্দু-পেট্রিয়টের স্বত্ব এককালে সমর্পণ করেন। তদ্দর্শনে অনেক কৃতবিদ্য লোক স্পষ্টবাক্যে বলিয়াছিলেন যে, বিদ্যাসাগর, কৃষ্ণদাসকে বিনামূল্যে হিন্দু-পেট্রিয়ট একেবারে দিয়া ভাল কাজ করেন নাই। যেহেতু, কৃষ্ণদাস পাল কোনও ভাল বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া বৃত্তি পান নাই। হিন্দু-কলেজ, হুগলি-কলেজ ও কৃষ্ণনগর-কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ যশস্বী লেখকদিগের মধ্যে কাহাকেও না দিয়া অন্যায় কার্য করিলেন। তৎকালে

অনেকেই অগ্রজকে নির্বোধ জ্ঞান করিয়াছিলেন। কিন্তু বাবু কৃষ্ণদাস পাল, হিন্দু-পেট্রিয়টের এডিটার হইয়া, ক্রমশ বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। হিন্দু-পেট্রিয়ট উপলক্ষেই বাবু কৃষ্ণদাস পাল বিখ্যাত হইয়াছিলেন এবং ক্রমশ তিনি ভারত-ব্যবস্থাপক-সভার সভ্য হইয়াছিলেন। পরন্তু, কৃষ্ণদাসবাবুর ওরূপ নাম ও প্রতিপত্তি লাভ হইবার কোন আশাই ছিল না; অগ্রজই কৃষ্ণদাসবাবুর এই উন্নতির মূল।

ইতিপূর্বে যৎকালে অগ্রজ মহাশয়, বৈঁচিগ্রামে বালিকাবিদ্যালয় ও ইংরাজী-বঙ্গবিদ্যালয় স্থাপনোপলক্ষে গিয়াছিলেন, তৎকালে বাবু গোবিন্দচাঁদ বসুর বাটীতে অবস্থিতি করিতেন। স্থানীয় লোকের প্রমুখাৎ অবগত হইয়াছিলেন যে, বৈঁচি-গ্রামের মধ্যে উক্ত বাবুরা সাবেক বনিয়াদি তালুকদার এবং পরম দয়ালু। কালসহকারে ইঁহাদের সম্পত্তিসমূহ লোপ হইয়া যাওয়ায়, গোবিন্দচাঁদবাবু ঢাকা জেলায় মুনসেফী কর্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যপ্রযুক্ত গোবিন্দচাঁদবাবু কর্মচ্যুত হইয়া, উপায়ান্তর-বিহীন হইয়াছেন শুনিয়া, অগ্রজ মহাশয় অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়া, কয়েক দিবস পরে পাইকপাড়ানিবাসী রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ মহোদয়কে অনুরোধ করিয়া, বৃন্দাবনের লালাবাবুর ঠাকুরবাটীর ও তৎসন্নিহিত জমিদারির নায়েবের পদে মাসিক একশত পঞ্চাশ টাকা বেতনে নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

কয়েক বৎসর পরে গোবিন্দচাঁদবাবু ঐ পদ পরিত্যাগ করায়, উঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র-গণের কলেজের অধ্যয়ন বন্ধ হয়। অগ্রজ ইহা শ্রবণ করিয়া, উঁহার ভ্রাতা বাবু গোকুলচাঁদ বসুকে স্বীয় সংস্কৃত-প্রেস এবং উহার ডিপজিটারিতে মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনে ম্যানেজার নিযুক্ত করেন। ঐ টাকায় তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র দেবেন্দ্র ও উপেন্দ্র বসু প্রভৃতির কলিকাতায় বাসাখরচ নির্বাহ হইত। এতদ্ভিন্ন গোকুলবাবু সাংসারিকব্যয়-নির্বাহের জন্য কয়েক মাসের মধ্যে অতিরিক্ত প্রায় দুই সহস্র টাঁকা না বলিয়া খরচ করেন; ইহাতে অগ্রজ মহাশয় কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ বা অসন্তুষ্ট হন নাই।

এই ঘটনার কয়েক মাস পরে, কলিকাতা বহুবাজারনিবাসী বাবু নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, উক্ত গোকুলবাবু প্রভৃতির নামে অভিযোগ করিয়া, বৈঁচির বসতবাটী ক্রোক করিয়া নীলাম করিবেন স্থির করিলেন। গোকুলচাঁদ বাবু প্রভৃতি উক্ত সংবাদ অগ্রজ মহাশয়ের কর্ণগোচর করিলে, তিনি অকাতরে প্রায় সহস্র মুদ্রা ডিক্রীদার নীলকমলবাবুকে প্রদান করিয়া উঁহাদের বাস্তবাটী প্রভৃতি মুক্ত করিয়া দিলেন।

ঐ সময়ে একদিন সন্তিপুরনিবাসী শ্যামাচারণ চট্টোপাধ্যায় আসিয়া ক্রন্দন করিয়া বলেন, জনাই গ্রামের মুখোপাধ্যায় মহাশয়েরা ডিক্রী করিয়া আমাদের বাটী নীলাম করিবেন। আপনি পাঁচশত টাকা দিলে বাটী রক্ষা হয়; নচেৎ

পরিবার লইয়া কাহার বাটীতে যাইয়া বাস করিব। ইহা শুনিবামাত্র অগ্রজ মহাশয়, তাঁহাকে অকাতরে পাঁচশত টাকা দান করিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় খৃঃ ১৮৪৭ অব্দে বা বাঙ্গালা ১২৫৪ সালে সংস্কৃত-ডিপজিটারি সংস্থাপন করেন। সংস্কৃত-যন্ত্রে মুদ্রিত স্বকীয় পুস্তক সকল ও অন্যান্য আত্মীয় ব্যক্তিব রচিত পুস্তক এবং এতদ্ব্যতীত বিদেশীয় লোকের মুদ্রিত পুস্তক এই পুস্তকালয়ে বিক্রয় হইত। ইহা স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, কতকগুলি নিরাশ্রয় অনুগত ব্যক্তি প্রতিপালিত হইবে; কিন্তু অনেকেই কার্যভার গ্রহণ করিয়া, আত্মসাৎ করিতে কুন্ঠিত হন নাই। তাঁহাদের সংস্কার ছিল যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় অপরাধ দেখিলেও আদালতে অভিযোগ করিতে পারিবেন না। অবশেষে নানা কারণে ঐ সকল আত্মীয় লোককে কর্মচ্যুত করিয়া, ডিপজিটারির কার্যের সৌকর্যার্থে ১৮৫৯ খৃঃ অব্দের ১১ই জুন তারিখে বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে একশত পঞ্চাশ টাকা বেতনে কর্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে রাজকৃষ্ণবাবু ফোর্ট উইলিয়ম-কলেজে মাসিক আশি টাকা বেতনে কর্ম করিতেন। রাজকৃষ্ণবাবু সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষায় পারদর্শী; এরূপ কার্যদক্ষ লোক অতি বিরল। ইনি কর্মাধ্যক্ষ থাকিয়া, অগ্রজ মহাশয়ের নানা বিষয়ের বিশিষ্টরূপ সুবিধা করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে, অগ্রজ মহাশয় উঁহার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া, অনুরোধপূর্বক উঁহাকে প্রেসিডেন্সী কলেজের সংস্কৃতের প্রফেসারিপদে নিযুক্ত কবিয়া দেন। তৎপবে ঐ পদে বৈঁছির বাবু গোকুলচাঁদ বসুকে মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনে নিযুক্ত করেন। কিন্তু তিনি সুচারুরূপে কর্ম নির্বাহ করিতে অক্ষম হওয়ায়, তাঁহাকে পদচ্যুত করেন। এক দিবস বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভবনে কৃষ্ণনগরের ব্রজনাথবাবুর সহিত কথোপকথন সময়ে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, আপনি এক্ষণে ডিপজিটারির কার্য রীতিমত চালাইয়া, ইহার উপস্বত্ব ভোগ করুন, পরে যেরূপ বিবেচনা হয় করা যাইবে।

সন ১২৭১ সালের ভাদ্র মাস হইতে ব্রজবাবু ডিপজিটারির উপস্বত্ব নির্বিরোধে ভোগ করিয়া আসিয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উক্তরূপ নিঃস্বার্থ-দান-প্রভাবে কৃষ্ণনগরের মধ্যে ব্রজবাবু একজন ধনশালী ও মান্যগণ্য ব্যক্তি হইয়া উঠিয়াছিলেন।

অতঃপর সন ১২৯২ সালের অগ্রহায়ণ মাসে অগ্রজ মহাশয়, ব্রজবাবুর ও তাঁহার পরমাত্মীয় কোন ব্যক্তির কার্যকলাপ অবলোকনে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া, ডিপজিটারি হইতে স্ব-রচিত ও প্রকাশিত সমস্ত পুস্তক উঠাইয়া লইয়া, সন ১২৯২ সালের ১৮ই অগ্রহায়ণ তারিখে, কলিকাতা সুকিয়াস্ট্রীটের ২৫ নং বাটীতে কলিকাতা পুস্তকালয় নামে একটি নূতন পুস্তকালয় সংস্থাপিত করেন। তাঁহার স্ব-রচিত ও প্রকাশিত এবং ক্রীত সমস্ত পুস্তক এই স্থানেই বিক্রয় হইয়া থাকে। যে সময় সংস্কৃত-যন্ত্রের পুস্তকালয় হইতে পুস্তক সকল উঠাইয়া লন, ঐ সময়ে ব্রজবাবু অগ্রজকে ডিপজিটারি প্রত্যর্পণ করিবার প্রস্তাব করেন; কিন্তু অগ্রজ মহাশয়

তাহা না লইয়া, কেবলমাত্র নিজের পুস্তকগুলি উঠাইয়া লন। ডিপজিটারি ব্রজ-বাবুকেই রাখিতে বলিলেন। ইহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয় যে কতদূর ঔদার্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঠকবর্গই অনুভব করিবেন।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, কলিকাতাতেই পাঁচটি বিধবাবিবাহ-কার্য সমাধা হইয়াছে, পল্লীগ্রামে একটিও হয় নাই; একারণ, অগ্রজ মহাশয়, স্বদেশে বিবাহ দেওয়াইবার জন্য সবিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন। দেশীয় অনেক লোক তাঁহার নিন্দা করিত; কিন্তু মহাপুরুষকে সকলই সহ্য করিতে হইয়াছিল। দেশের বিধবা রমণীগণের ত্বরায় যাহাতে বিবাহ হয়, তদ্বিষয়ে জননীদেবী বিশিষ্টরূপ যত্নবতী হইয়াছিলেন। সন ১২৬৫ সালের আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে জেলা হুগলি মহকুমা জাহানাবাদের অন্তঃপাতী রামজীবনপুর, চন্দ্রকোণা, সোলা, শ্রীনগর, কালিকাপুর, ক্ষীরপাই প্রভৃতি গ্রামে প্রায় পনেরটি বিধবা রমণীর পাণিগ্রহণকার্য সমাধা হয়। অগ্রজ মহাশয়, ঐ সকল বিবাহের সমস্ত ব্যয় নির্বাহ করেন। যাহারা বিধবার পাণিগ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদের বিপক্ষ প্রতিবাসিবর্গ উহাদের প্রতি নানারূপ অত্যাচার করিয়াছিল। অতঃপর অত্যাচার না হইতে পারে, তদ্বিষয়ে রাজ-পুরুষগণ সতর্ক হইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও উহাদিগকে বিপক্ষের অত্যাচার হইতে রক্ষার জন্য, অকাতরে যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। তৎকালীন জাহানাবাদের ডেপুটী মাজিস্ট্রেট মৌলবী আবদুল লতিব খাঁন বাহাদুর সম্পূর্ণরূপ আনুকূল্য করেন; তিনি পুলিশ দ্বারা সাহায্য না করিলে, প্রতিবাসীরা বিবাহ-সময়ে বিস্তর অনিষ্টসাধন করিতে পারিত; একারণ, আমরা কস্মিনকালেও উক্ত মহাত্মা মৌলবী আবদুল লতিব খাঁন বাহাদুরের নাম বিস্মৃত হইতে পারিব না। ১২৬৬ সাল হইতে ১২৭২ সাল পর্যন্ত ক্রমিক বিস্তর বিধবা কামিনীর বিবাহ-কার্য সমাধা হয়। ঐ সকল বিবাহিত লোককে বিপদ হইতে রক্ষার জন্য, অগ্রজ মহাশয়, বিশেষরূপ যত্নবান ছিলেন; উহাদিগকে মধ্যে মধ্যে আপনার দেশস্থ ভবনে আনাইতেন। বিবাহিতা ঐ সকল স্ত্রীলোককে যদি কেহ ঘৃণা করে, একারণ, জননীদেবী ঐ সকল বিবাহিতা ব্রাহ্মণজাতীয় স্ত্রীলোকের সহিত একত্র একপাত্রে ভোজন করিতেন। মধ্যে মধ্যে ঐ সকল স্ত্রীলোক আমাদের বাটীতে আসিলে, জননীদেবী এবং বাটীর অপরাপর স্ত্রীলোকেরা উহাদের সহিত একত্র সমভাবে পরিবেষনাদি করিয়া, ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইত।

সন ১২৭০।৭১।৭২।৭৩ সালে জেলা মেদিনীপুর মহকুমায় গড়বেতার অন্তঃপাতী রায়খা, বাছুয়া, লেদাগমা, কেশেডাল, রসকুণ্ড, শ্রীরামপুর প্রভৃতি গ্রামে বহুসংখ্যক কায়স্থজাতীয় বিধবা-কন্যার বিবাহ-কার্য সমাধা হয়। ঐ সময়েই বর্ধমান জেলার অন্তঃপাতী যৌগ্রামের নিমাইচরণ সিংহের সহিত জাহানাবাদ মহকুমার অন্তঃপাতী যদুপুর গ্রামের রামকৃষ্ণ বসুর বিধবা-তনয়ার কলিকাতায় বিবাহ হয়। অগ্রজ মহাশয়, উহাদের সাংসারিক-ক্লেশ নিবারণের জন্য যথাসাধ্য আনুকূল্য করিয়া

আসিয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য, স্ত্রীজাতির কষ্ট-নিবারণ। তদ্বিষয়ে তাঁহাকে যথাসর্বস্ব ব্যয় করিতেও কখনও কাতর বা কুণ্ঠিত হইতে দেখা যায় নাই।

সন ১২৬৫ সালের অগ্রহায়ণ মাসের শেষে পিতামহীর আসন্নকাল উপস্থিত দেখিয়া, বীরসিংহা হইতে তাঁহাকে গঙ্গাযাত্রা করান হয়। তিনি শালিখায় গঙ্গা-তীরে, বিনা আহারে, কেবল গঙ্গাজল পান করিয়া, কুড়ি দিন পরে গঙ্গালাভ করেন। তাঁহার শ্রাদ্ধাদি-কার্যে বিধবাবিবাহের প্রতিবাদিগণ অনেকে শত্রুতা করিয়াও কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। শ্রাদ্ধোপলক্ষে এ প্রদেশের বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতগণের সমাগম হইয়াছিল; অনেকে মনে করিয়াছিল, বিদ্যাসাগরের পিতামহীর শ্রাদ্ধে কোনও ব্রাহ্মণ ভোজন করিতে আসিবেন না; তাহা হইলেই পিতৃদেব মনোদুঃখে দেশত্যাগী হইবেন। যাহারা এরূপ মনে করিয়াছিল, তাহারা অতি নির্বোধ; কারণ, অগ্রজ মহাশয় দেশে অবৈতনিক ইংরাজী-সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন, প্রায় চারি পাঁচ শত বালককে বিনা বেতনে শিক্ষা এবং ঐ সমস্ত বালককে পুস্তক কাগজ শ্লেট প্রভৃতি প্রদান করিতেন। ইহা ভিন্ন বাটীতে প্রত্যহ ষাটটি বিদেশস্থ সম্ভ্রান্ত ও অধ্যাপকদের বিদ্যার্থী সন্তানগণকে অন্নবস্ত্র প্রদান করিয়া অধ্যয়ন করাইতেন। মধ্যে মধ্যে অনেক ভিন্ন গ্রামের ছাত্রগণেরও চাকরি করিয়া দিতেন। দেশে দাতব্য-ঔষধালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। ডাক্তার বিনা ভিজিটে গ্রামের ও সন্নিহিত গ্রামবাসীদিগের ভবনে চিকিৎসা করিতে যাইত। নাইট-স্কুলের ছাত্রগণের মধ্যে অনেকেই কলিকাতার বাসায় অন্নবস্ত্র পাইয়া, মেডিকেল-কলেজে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া চিকিৎসক হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত কি ধনশালী, কি মধ্যবিত্ত, কি দরিদ্র, সকল সম্প্রদায়ের লোক বিপদাপন্ন হইয়া আশ্রয় লইলে, বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইত; চাঁদা প্রদান করিয়া, বিস্তর বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া সাধারণের বিশিষ্টরূপ প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। এবংবিধ লোকের পিতামহীর শ্রাদ্ধে শত্রুপক্ষ কেমন করিয়া বিঘ্ন জন্মাইতে পারে?

অগ্রজ মহাশয়, পিতৃদেবকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য, শ্রাদ্ধের ব্যয়ার্থ রীতিমত টাকা দিয়াছিলেন। শ্রাদ্ধের দিবস অনেক অধ্যাপক ভট্টাচার্যের সমাগম হইয়াছিল। বরদাপরগণার প্রায় সমস্ত ব্রাহ্মণ, কুটুম্ব ও বন্ধুবান্ধব অন্যূন তিন সহস্র ব্রাহ্মণ ফলাহার করেন, এবং পরদিবস অন্নেও প্রায় দুই সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করেন। ইহাতে পিতৃদেব পরম আহ্লাদিত হইয়াছিলেন।

পরবৎসর সপিণ্ডনসময়েও দাদা পিতৃদেবকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য যথেষ্ট টাকা দিয়াছিলেন। অধ্যাপকগণের নিমন্ত্রণার্থ প্রথমে যে কবিতাটি প্রস্তুত হয়, উহা দুর্বোধ দেখিয়া, স্বয়ং এই সরল কবিতাটি লিখিয়া দেন—

পৌষস্য পঞ্চবিংশাহে রবৌ মাতুঃ সপিণ্ডনং।
কৃপয়া সাধ্যতাং ধীরৈর্বীরসিংহসমাগতৈঃ॥

আমাদের বাটীর সন্নিহিত রাধানগরনিবাসী জমিদার বৈদ্যনাথ চৌধুরীর পৌত্র বাবু শিবনারায়ণ চৌধুরী, এ প্রদেশের মধ্যে সম্ভ্রান্ত ও মান্যগণ্য জমিদার ছিলেন। বাবু রমাপ্রসাদ রায়ের নিকট ইনি জমিদারী বন্ধক রাখিয়া, পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা ঋণ গ্রহণ করেন। ইহার সুদও পঁচিশ হাজার টাকা হইয়াছিল। এই পঁচাত্তর হাজার টাকার কিস্তীবন্দী করিতে যাইয়া, বাবু শিবনারায়ণ চৌধুরী কলিকাতাস্থ উক্ত রায় মহাশয়ের দপ্তরখানায় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। উঁহার পুত্রদ্বয়, রমাপ্রসাদবাবুর নিকট কাঁদিয়া পদানত হইলেও, উক্ত রায় মহাশয়ের অন্তঃকরণে দয়ার উদ্রেক হইল না। অনন্তর রাধানগরনিবাসী মৃত শিবনারায়ণ চৌধুরীর পুত্রদ্বয় এবং মৃত সদানন্দ ও লক্ষ্মীনারায়ণ চৌধুরীর বিধবা পত্নীদ্বয়, ইহারাও কলিকাতায় অগ্রজ মহাশয়ের নিকট যাইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। উঁহাদের রোদনে অগ্রজ মহাশয়েরও চক্ষে জল আসিল। উঁহারা রমাপ্রসাদবাবুর ভয়ে তাঁহার বাটী পরিত্যাগ করিয়া খিদিরপুর পদ্মপুকুরের ধর্মদাস কেরানীর ভবনে গুপ্তভাবে প্রায় চারি মাস কাল অবস্থিতি করেন। অগ্রজ, উঁহাদিগকে ঋণজাল হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করেন। যাঁহার নিকট টাকার স্থির করিতেন, রমাপ্রসাদবাবু তাঁহাকেই টাকা দিতে নিবারণ করিয়া দিতেন। তজ্জন্য কলিকাতার মধ্যে কোন মহাজন টাকা ধার দিতে অগ্রসর হয় নাই। অবশেষে রাজা প্রতাপসিংহের আত্মীয় বাবু কালীদাস ঘোষ মহাশয়ের নিকট পঞ্চাশ সহস্র টাকা ও অন্য এক ব্যক্তির নিকট পঞ্চবিংশ সহস্র মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া টাকা দিতে যাইলে, উক্ত রায় মহাশয় টাকা গ্রহণ করিতে অস্বীকার হইলেন। কারণ, তিনি উঁহাদের জমিদারী লইব, এরূপ দৃঢ়সংকল্প করিয়াছিলেন। সুতরাং অগ্রজ মহাশয়, সুইনহো লা-কোম্পানীর বাটীতে গতিবিধি করিয়া, অবিলম্বে টাকা জমা দিয়া, উহাদিগকে রমাপ্রসাদবাবুর নিকট ঋণদায় হইতে মুক্ত করিয়া দেন। অগ্রজ মহাশয়, রাধানগরের চৌধুরী-বাবুদের জমিদারী রক্ষার জন্য, ক্রমিক ছয় মাস কাল অনন্যকর্মা ও অনন্যমনা হইয়া, নানা স্থানে নিজের প্রায় দুই সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া কৃতকার্য হইয়াছিলেন। তিনি রমাপ্রসাদ-বাবুর হস্ত হইতে উহাদিগকে পরিত্রাণ করিয়া, দেশস্থ সাধারণের নিকট বিলক্ষণ প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন; কিন্তু এইজন্য তদবধি বাবু রমাপ্রসাদ রায়ের সহিত অগ্রজের মনান্তর ঘটিয়াছিল। অতঃপর কয়েক বৎসর চৌধুরী বাবুরা পরম-সুখে কালাতিপাত করেন। দুঃখের বিষয় এই, ভ্রাতৃবিরোধ ও সুবন্দোবস্ত না হওয়াতে, রীতিমত ঋণ পরিশোধ না হইয়া, দুই এক মহাজন পরিবর্তনের পর, ঐ সম্পত্তি ক্রোক নীলামে বিক্রয় হয়। তন্নিবন্ধন উহাদের কষ্ট উপস্থিত হইলে, মৃত লক্ষ্মী-নারায়ণ চৌধুরীর পত্নী ও সদানন্দ চৌধুরীর পত্নীকে মাসিক ব্যয়-নির্বাহার্থ অগ্রজ মহাশয় প্রতি মাসে প্রত্যেককে গোপনভাবে ত্রিশ টাকা করিয়া মাসহারা প্রেরণ করিতেন। কিছুদিন পরে মোনপুরের কাশীনাথ ঘোষ আট শত টাকার জন্য উক্ত চৌধুরীর নামে অভিযোগ করিয়া বসতবাটী ক্রোক করিলে, আমি, অগ্রজ মহাশয়

ও উঁহাদের অনুরোধে, কাশীনাথ ঘোষের সহিত একশত পঞ্চাশ টাকায় রফা করিয়া, দাদার নিকট হইতে ঐ টাকা লইয়া, উক্ত বিষয় খোলসা করিয়া দিয়াছিলাম।

ঐ বৎসর পিতৃদেব মহাশয়, দীনবন্ধু কুম্ভকারকে সমভিব্যাহারে লইয়া, পদব্রজে তীর্থপর্যটনে প্রস্থান করেন। তৎকালে পশ্চিমাঞ্চলে রেলওয়ে হয় নাই। এক বৎসর কাল সকল তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া, পরিশেষে পুষ্কর তীর্থ হইতে অগ্রজকে এক পত্র লিখেন যে, তুমি আমার বংশে রামাবতার, তোমার পিতা বলিয়া এ প্রদেশের সকল স্থানের লোকই আমাকে পরম সমাদর করিয়া থাকেন; অথচ তুমি কাশী, এলাহাবাদ, কানপুর, মথুরা, বৃন্দাবন, জ্বালামুখী, পুষ্কর প্রভৃতি তীর্থে কখনও আগমন কর নাই। তোমার শব্দপরিচয়ে আমি সকলের নিকট পরিচিত হইতেছি। অনন্তর, অগ্রজ মহাশয়ের অনুরোধে পিতৃদেব ত্বরায় দেশে পুনরাগমন করেন।

সংস্কৃত-কলেজের ছাত্রদিগের উৎসাহ-বর্ধনার্থ অগ্রজ মহাশয়, তৎকালের লেপ্টেনেন্ট গবর্নর গ্রাণ্ড সাহেবকে বলেন যে, রামকমল ভট্টাচার্য, গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায়কে ডেপুটি মাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত করা আবশ্যক হইয়াছে। সাহেব, উঁহাদের নাম লিখিয়া রাখিলেন এবং বলিলেন, 'ইহারা এক্ষণে কি করিতেছেন শুনিতে ইচ্ছা করি।' অগ্রজ বলিলেন, 'রামকমল, কলিকাতার নর্ম্যাল-স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত আছেন।' সাহেব শুনিয়া উত্তর করিলেন, 'যিনি ছেলে পড়াইয়া থাকেন, তিনি অকর্মা হইয়াছেন, তাঁহার দ্বারা এ সকল কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়া কঠিন।' ইহা শুনিয়া দাদা বলিলেন, 'রামকমল সংস্কৃত ও ইংরাজী ভালরূপ জানেন। বিশেষত অঙ্কে ইঁহার তুল্য লোক এক্ষণে দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব ইঁহাকে ডেপুটী মাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত না করিলে, আমি বড়ই দুঃখিত হইব।' তাহা শুনিয়া সাহেব বলিলেন, 'আচ্ছা, পণ্ডিত, তোমার কথা স্বীকার করিলাম।' গিরিশ কি করেন জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, ইনি এক্ষণে চব্বিশ-পরগণার জজ-আদালতে ওকালতি করিতেছেন। তাহা শুনিয়া, সাহেব উত্তর করেন, 'ইনি উঁহার অপেক্ষা উপযুক্ত লোক, ইনি ভালরূপ কার্য করিতে পারিবেন।' রামাক্ষয়ের এই পরিচয় দেন যে, ইনি আমার অধীনে ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টারের পদে থাকিয়া, মফঃস্বলের বিদ্যালয় সকল পরিদর্শন করিতেছেন। ইহা শুনিয়া সাহেব উত্তর করেন যে ইনিও কার্যক্ষম হইবেন।

কয়েক মাস অতীত হইল, তথাপি ইঁহারা কার্যভার প্রাপ্ত হইলেন না। তজ্জন্য একদিন রামকমল অগ্রজকে বলিলেন, 'আপনার কথায় বিশ্বাস নাই, যেহেতু অদ্যাপি আমরা ডেপুটী মাজিস্ট্রেটের কর্মে নিযুক্ত হইতে পরিলাম না।' পর দিবস দাদা, গ্রাণ্ডসাহেবের নিকট গমন করিয়া, সাহেবকে বিশেষরূপ অনুরোধ করাতে তিনি বলিলেন, 'আচ্ছা, রামকমল শীঘ্রই কর্ম পাইবেন।' দুঃখের বিষয় এই, বাসায় প্রত্যাগত হইয়া কিয়ৎক্ষণ পরে জানিলেন যে, রামকমল উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ

করিয়াছেন। রামাক্ষয়, ত্বরায় ডেপুটী মাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হইলেন। গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ওকালতীতে বিশিষ্টরূপ পশার করিয়াছেন, এজন্য ডেপুটী মাজিস্ট্রেটের পদগ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না।

সন ১২৬৯ সালের কার্ত্তিক মাসে অগ্রজ মহাশয়, বাটী আগমন করেন। এই সংবাদে স্থানীয় অনেক দুঃখিনী ভদ্র-কুলাঙ্গনা স্বীয় স্বীয় সাংসারিক কষ্টনিবারণ-মানসে তাঁহার নিকট আসিয়াছিলেন। তিনি দরিদ্র স্ত্রীলোকদের প্রতি বিশেষ দয়াপ্রকাশ করিতেন। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীজাতির প্রতি সচরাচর ইঁহার অধিক অনুগ্রহ দৃষ্টিগোচর হইত। ঐ সময়ে বৎসরের মধ্যে প্রায় দুই তিন বার দেশে আগমন করিতেন। প্রত্যেক বারে অন্তত নগদ পাঁচশত টাকা,' অন্যূন পাঁচশত টাকার বস্ত্র লইয়া আসিয়া, নিরুপায় স্ত্রীলোকদিগকে অকাতরে বিতরণ করিতেন।

এক দিবস অগ্রজ, মধ্যাহ্ন-সময়ে বাটীর মধ্যে ভোজন করিতে যাইয়া দেখিলেন যে, দুইটি অপরিচিত স্ত্রীলোক বসিয়া আছেন। একটির বয়স প্রায় ষাট বৎসর, অপরটির বয়স আঠার-উনিশ বৎসর। তাহাদের পরিধেয় বস্ত্র অতি জীর্ণ, মুখের ভাব দেখিলেই বোধ হয় উহারা অতি দুঃখিনী। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মা! ইহারা কে? এখানে বসিয়া কেন?' জননীদেবী বলিলেন, 'বয়োজ্যেষ্ঠাটি তোমার বাল্যকালের গুরুমহাশয়ের প্রথমকার স্ত্রী, আর অল্পবয়স্কাটি ইহার কন্যা। ইহারা তোমাকে আপনাদের দুঃখের কথা বলিবার জন্য এখানে বসিয়া আছেন। তোমার গুরুমহাশয় দুই পুরুষিয়া ভঙ্গ-কুলীন, ছয় সাতটি মাত্র বিবাহ করিয়াছেন।' উক্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট দাদা বাল্যকালে পাঠশালায় অধ্যয়ন করিয়াছিলেন; একারণ, উঁহাকে মাসে মাসে আট টাকা দিতেন; আর বীরসিংহা বিদ্যালয়ের বাঙ্গালা ডিপার্টমেণ্টের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন, তজ্জন্যও উপযুক্ত বেতন দিতেন। ইঁহার অন্য আর এক স্ত্রীর গর্ভসম্ভূত এক পুত্রকেও মাসিক দশ টাকা বেতনে বিদ্যালয়ের তৃতীয় পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উক্ত মহাশয়েরা দাদার বিলক্ষণ খাতির রাখিতেন। গুরুমহাশয়ের ভগিনীদ্বয় ও ভাগিনেয় তাঁহারই বাটীতে থাকিতেন। তিনি যাহা উপার্জ্জন করিতেন ও ভূম্যাদির উপস্বত্ব যাহা প্রাপ্ত হইতেন, তৎসমস্তই ভগিনীদ্বয়ের হস্তে সমর্পণ করিতেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নিজে অতি ভদ্রলোক ছিলেন। দেশস্থ সকলেরই সহিত তিনি সৌজন্য প্রকাশ করিতেন। এই কারণে এবং তিনি অনেকেরই গুরুমহাশয় ও কুলীন বলিয়া, সকলেই তাঁহাকে মান্য করিতেন। কিন্তু তাঁহার ভগিনীদ্বয় অত্যন্ত দুর্বৃত্তা ও প্রখরা ছিলেন। যদি তিনি কোন স্ত্রীকে আপন বাটীতে আনিয়া রাখিতেন, তাহা হইলে তাঁহার ভগিনীদ্বয় তাহার দ্রব্যাদি লইয়া বাটী হইতে বহিষ্কৃতা করিয়া দিতেন। তিনি ভয়ে ভগিনীদ্বয়কে কখনও কিছু বলিতে সাহস করিতেন না। একবার আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, মেদিনীপুরের সন্নিহিত পাথরার অল্পবয়স্কা পরমাসুন্দরী কনিষ্ঠা পত্নীকে আনিয়া বাটীতে রাখিয়া-

ছিলেন। তাঁহার ঐ স্ত্রী পিত্রালয় হইতে আসিবার সময়, যথেষ্ট দ্রব্যাদি সমভিব্যাহারে আনিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে ভগিনীদ্বয়, দ্রব্যাদি আত্মসাৎ করিয়া, ঐ অল্পবয়স্কা ভ্রাতৃজায়াকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। তাহা দেখিয়া, তিনি ভগিনীদ্বয়ের ভয়ে কোন কথা বলিতে সাহস করেন নাই। তাঁহার অন্যান্য স্ত্রী বীরসিংহায় আসিলে, তাহাদের প্রতিও এইরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতেন।

অগ্রজ, ঐ দুইটি স্ত্রীলোককে দেখিয়া ভোজনে বিরত হইলেন, এবং উহাদিগকে বলিলেন, 'তোমরা উভয়ে কিজন্য আসিয়াছ, তাহা বল।' বৃদ্ধা বলিলেন, 'আমি তোমার বাল্যকালের শিক্ষক মহাশয়ের প্রথম-বিবাহিতা স্ত্রী, আর এইটি আমার গর্ভসম্ভূতা কন্যা। এই কন্যার পতি কুলীন। তিনি প্রায় চল্লিশটি কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন; এবং যে স্ত্রীর জনক-জননীর নিকট খোরাকীর টাকা প্রাপ্ত হন, সেই স্ত্রীকেই গৃহে রাখেন। আমাদের নিকট কিছুই পাইবার আশা নাই; একারণ, আমার কন্যাকে লইয়া যান না। বৎসরের মধ্যে একবার জামাতাকে আনিতে হইলেও দশ টাকা ব্যয় হয় তাহাও আমাদের ক্ষমতা নাই। কুলীন জামাতার, কন্যাকে প্রতিপালন করিবার কথা নাই। অগত্যা কন্যাটি আমার নিকটেই অবস্থিতি করে। আমি এখান হইতে ত্রিশ ক্রোশ দূরে পিত্রালয়ে যাবজ্জীবন অবস্থিতি করিয়া থাকি। আমার পুত্র, কষ্টে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিয়া থাকে। এক্ষণে পুত্রটি বলিতেছেন, অতঃপর আমি তোমাদের দুইজনকে অন্নবস্ত্র দিতে পারিব না। ইহা শুনিয়া আমি পুত্রকে বলিলাম, বল কি বাবা! তুমি এরূপ বলিলে, আমরা কোথায় যাই? তাহাতে পুত্র বলিল, তুমি জননী, না হয় তোমাকে অন্ন দিতে পারি, কিন্তু ভগিনীকে খেতে দিতে পারিব না। ইহা শুনিয়া আমি বলিলাম, কুলীন কর্তৃক বিবাহিতা কন্যা চিরকাল ভ্রাতার বাটীতেই থাকে। আমার কথা শুনিয়া পুত্র বলিল, সে যাহা হউক, তোমাকেই খেতে দিব, তুমি উহার বন্দোবস্ত কর। ইহা শুনিয়া আমি রাগ করিয়া বলিলাম, তুমি খেতে দিবে না, তবে কি প্রসন্ন বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া দিনপাত করিবে? তাহাতে পুত্র বলিল, উহার যাহা ইচ্ছা তাহাই করুক। তদুপলক্ষে উপযুক্ত পুত্রের সহিত আমার বিলক্ষণ মনান্তর ঘটিল। পুত্রের এইরূপ কথা শুনিয়া চতুর্দিক এককালে অন্ধকারময় দেখিলাম।

'কি করি, ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। অবশেষে শুনিলাম, আমার মাসতুত ভ্রাতার বাটীতে একটি পাচিকার আবশ্যক হইয়াছে। কন্যাটি লইয়া তথায় যাইলাম; কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশত তাঁহারা বলিলেন যে, চারি দিবস অতীত হইল আমাদের বাটীতে পাচিকা নিযুক্ত হইয়াছে। কি করি, কোথা যাই, এই ভাবিতে লাগিলাম। মনে হইল, শুনিয়াছি গঙ্গাতীরে একটি গ্রামে স্বামীর এক সংসার আছে, তথায় এক সপত্নীপুত্র ব্যবসা-উপলক্ষে বিলক্ষণ সঙ্গতি করিয়াছেন। তিনি পরম ধার্মিক ও পরম দয়ালু লোক। যদিও আমি বিমাতা

আর প্রসন্নময়ী বৈমাত্রেয় ভগিনী, কিন্তু তাঁহার নিকট যাইয়া আমাদের অন্ন-বস্ত্রের দুঃখ জানাইলে, অবশ্য তাঁহার দয়ার উদ্রেক হইতে পারে। এই ভাবিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম এবং সমস্ত ব্যক্ত করিয়া রোদন করিতে লাগিলাম। আমাদের কাতরতা-দর্শনে সপত্নীপুত্র হইয়াও যথেষ্ট স্নেহ ও যত্ন করিলেন এবং বলিলেন, মা, যতদিন আপনারা উভয়ে জীবিত থাকিবেন, ততদিন আমি আপনাদিগের ভরণ-পোষণ করিব। ইহা শুনিয়া, আমরা পরম আহ্লাদিত হইলাম। তিনি যথোচিত যত্ন করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার বাটীর স্ত্রীলোকেরা সেরূপ নহেন। তাঁহারা প্রায় বলিতেন যে, এ আপদ আবার কোথা হইতে আসিল। স্ত্রীলোকদের সহিত প্রায় মনান্তর ঘটিত; একারণ, আমি একদিন সপত্নীপুত্রকে বলিলাম, বাবা, আমাদের উভয়ের প্রতি বাটীর স্ত্রীলোকেরা যেরূপ ব্যবহার করিতেছেন, তাহাতে আমরা ক্ষণকাল এখানে অবস্থান করিতে পারি না। তাহাতে তিনি বলিলেন, আমি সকলই ইতিপূর্বে অবগত হইয়াছি। বাটীর স্ত্রীলোকদিগকে শাসন করিলে, উহারা আপনাদের প্রতি আরও অসহ্য ব্যবহার করিবেন। এমন স্থলে আপনারা এখান হইতে প্রস্থান করুন। আমি আপনাদের ভরণপোষণ জন্য, মাসে মাসে কিছু কিছু সাহায্য করিতে পারি। এইরূপে নিরাশ্বাস হইয়া, কন্যার সহিত তথা হইতে বহির্গত হইলাম। পরিশেষে ভাবিলাম, স্বামী জীবিত আছেন এবং বিদ্যাসাগরের বিদ্যালযে পণ্ডিতি কর্ম করিযা থাকেন। তাঁহার নিকট যাইয়া রোদন করিলে, অবশ্য কন্যাটির জন্য দয়া হইতে পারে। এই স্থির করিয়া দশ-বার দিবস অতীত হইল, এখানে আসিয়াছি। পতি নিজে ভদ্রলোক বটে, কিন্তু তিনি তাঁহার দুইটি ভগিনীর নিতান্ত বশীভূত, তাহাদের পরামর্শে আমাদিগকে জবাব দিলেন যে, তোমাদের এখানে থাকা হইবে না। তোমাদিগকে অন্ন-বস্ত্র দিতে পারিব না। স্বামীর কথা শুনিয়া আশ্চর্যান্বিতা হইলাম। কোথা যাই কি করি ভাবিতেছিলাম, এমন সময়ে এই গ্রামের নবীন চক্রবর্তী ও হারাধন চক্রবর্তী প্রভৃতি ও অন্যান্য অনেক লোক বলিল, বিদ্যাসাগর পরম দয়ালু, অনাথা স্ত্রীলোকের একমাত্র বন্ধু। তিনি গতকল্য বাটী আসিয়াছেন, আসিয়া অবধি অনেক দরিদ্র স্ত্রীলোককে যথেষ্ট টাকা ও বস্ত্র বিতরণ করিতেছেন। তাহা শুনিয়া আমরা তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। তুমি আমাদের যাহা হয়, একটা উপায় করিয়া দাও।' বৃদ্ধার ঐ সকল কথা শুনিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয় দুঃখে অভিভূত হইলেন, এবং তাঁহার নয়নদ্বয় অশ্রুজলে প্লাবিত হইল।

কি আশ্চর্য! পুত্র ও স্বামী অম্লানবদনে বলিলেন, তোমাদিগকে অন্ন-বস্ত্র দিতে পারিব না, তোমরা যথায় ইচ্ছা যাও! কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত উহাদের কোন সংস্রব নাই, তিনি বৃদ্ধার কথা শুনিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বৃদ্ধাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া, চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে গমন করিয়া বলিলেন, 'আপনার ব্যবহার দেখিয়া আমি আশ্চর্যান্বিত হইয়াছি। আপনি কেমন

করিয়া বৃদ্ধা স্ত্রী ও যুবতী কন্যাকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতেছেন? আপনি তাঁহাদিগকে বাটীতে রাখিবেন কি না জানিতে ইচ্ছা করি।' দাদার এই ভাবভঙ্গি দেখিয়া, গুরুমহাশয় ভয় পাইলেন, এবং বলিলেন, 'তুমি এক্ষণে বাটী যাও, আমি ঘরে গিয়া দুই ভগিনীর সহিত বুঝিয়া, পরে তোমার নিকট যাইতেছি।' তদনন্তর তিনি অগ্রজের নিকট আসিয়া বলিলেন, 'যদি তুমি তাহাদের হিসাবে মাসে মাসে স্বতন্ত্র কিছু দিতে সম্মত হও, তাহা হইলে আমি উহাদিগকে রাখিতে পারি; নচেৎ আমার ভগিনীদ্বয় উহাদিগকে রাখিতে সম্মতা হইবে না।' অগ্রজ, তৎক্ষণাৎ স্বীকার পাইলেন, এবং তিন মাসের অগ্রিম বার টাকা তাঁহার হস্তে দিয়া বলিলেন, 'এই-রূপে তিন মাসেব টাকা অগ্রিম পাইবেন। এতদ্ভিন্ন ইহাদের পরিধেয় বস্ত্রের ভার আমার প্রতি রহিল।' ছয় মাসের বস্ত্র তাঁহার হস্তেই প্রদান করেন। ছয় মাস পরে আবার বস্ত্রপ্রদানের ভার আমার প্রতি অর্পণ করেন। গুরুমহাশয় আর কোন ওজর করিতে না পারিয়া নিরুপায় হইয়া, স্ত্রী ও কন্যা লইয়া গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। চারি টাকা করিয়া দিবার অঙ্গীকার করিয়াছেন শুনিয়া, তাঁহার ভগিনীদ্বয় সম্মতা হইলেন। গুরুমহাশয়, কখনও কোন স্ত্রীকে আনিয়া নিকটে রাখিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, ভগিনীরা খড়্গহস্ত হইয়া উঠিতেন, সুতরাং তিনি কস্মিনকালে আপন অভিপ্রায় সম্পন্ন করিতে পারেন নাই। ভঙ্গ-কুলীনদের ভগিনী, ভাগিনেয় ও ভাগিনেয়ীরাই পরিবার-স্থানে পরিগণিত। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতির সহিত তাঁহাদের কোন সংস্রব থাকে না। দয়াময় বিদ্যাসাগর মহাশয়, হতভাগিনীদের প্রতি অনুগ্রহ-প্রদর্শন পূর্বক বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া, কলিকাতা প্রস্থান করেন এবং যথাকালে অঙ্গীকৃত মাসিক দেয় প্রেরণ করিতে বিস্মৃত হন নাই। কতিপয় মাস অতীত হইলে পর, অগ্রজ মহাশয় বাটী আসিয়া সেই দুই হতভাগিনীর বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন, চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ও তাঁহার ভগিনীদ্বয় স্থির করিয়াছিলেন যে, বিদ্যাসাগরের অঙ্গীকৃত নূতন মাসহারা পুরাতন মাসিক মাস-হারার অন্তর্ভূত হইয়াছে। আর তাহা কোন কারণে রহিত হইবার নহে। তদনুসারে তিনি ভগিনীদের উপদেশের অনুবর্তী হইয়া, বৃদ্ধা স্ত্রী ও যুবতী দুহিতাকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন; তাঁহারাও উপায়ান্তর বিহীনা হইয়া কলিকাতা প্রস্থান করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া অগ্রজ মহাশয় যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলেন। দাদার দুঃখ দেখিয়া, নবীন চক্রবর্তী প্রভৃতি বলিলেন, 'মহাশয়! গুরু-মহাশয়ের কন্যার কথা শুনিয়া আপনি রোদন করিতে লাগিলেন, তবে আপনি দেশের কুলীনদের কোনও সন্ধান রাখেন নাই। কুলীনদের চরিত্র শুনিলে ঘৃণা ও রাগ হয়। মহাশয়! শুনিতে পাই, সাহেবেরা আপনার কথা শুনিয়া থাকেন। লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সার সিসিল বীডনের সহিত আপনার বিলক্ষণ সদ্ভাব আছে, তিনি আপনাকে সম্মান করিয়া থাকেন। অতএব আপনার নিকট আমাদের এই প্রার্থনা যে, আপনি যোগাড় করিয়া এই কুব্যবহারের মূলোৎপাটনে যত্ন করুন।

কুলীনদিগের বহুবিবাহ কুপ্রথা উঠাইয়া দিবার জন্ত যত্ন পাইলে, অনায়াসে দেশ-বিদেশের রাজা, সম্ভ্রান্ত লোক ও ভূম্যধিকারী প্রভৃতি সকলেই আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করিবেন। আপনি মনোযোগী হইলে, অক্লেশে বহুবিবাহ কুপ্রথা একেবারে দেশ হইতে তিরোহিত হইবে।' এই কথা শুনিয়া, তিনি দীর্ঘনিশ্বাসপরিত্যাগপূর্বক চিন্তা করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে নবীন চক্রবর্তী প্রভৃতি, কতিপয় কুলীন-মহিলার কাহিনী বর্ণন করিয়া বলিলেন, 'মহাশয়! আপনি কলিকাতায় থাকেন, পল্লীগ্রামের কুলীনদের কোনও সংবাদ রাখেন না। এ সকল বিষয় আপনার কর্ণ-গোচর হইলে, দেশের অনেক মঙ্গল হইবে, একারণ, আপনাকে জানাইলাম। ইহাতে আমাদের যদি কোন অপরাধ হয়, তাহা অনুগ্রহপূর্বক ক্ষমা করিবেন।'

কিছুদিন পরে অগ্রজ মহাশয়, তাঁহাকে বলিলেন, 'কোন্ গ্রামের কোন্ কুলীন কত বিবাহ করিয়াছেন, কয়েক মাসের মধ্যে তাহার একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া আমার নিকট পাঠাইবেন।' অনন্তর, বহুবিবাহ নিবারণের আবেদন-পত্রে বঙ্গদেশের সম্ভ্রান্ত লোকদিগের দস্তখত থাকা আবশ্যক বিবেচনা করিয়া, তিনি বর্ধমানাধিপতি শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ মহাতাপচন্দ্র রায় বাহাদুর, নবদ্বীপাধিপতি শ্রীযুক্ত মহারাজা সতীশচন্দ্র রায় বাহাদুর, শ্রীযুক্ত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, শ্রীযুক্ত রাজা সত্যনারায়ণ ঘোষাল বাহাদুর প্রভৃতি এবং প্রায় পঁচিশজন কৃতবিদ্য লোক ও অন্যান্য লোকের স্বাক্ষর করাইয়া, আবেদন-পত্র দাখিল করেন। তৎকালীন লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর সর সিসিল বীডন সাহেব, বহুবিবাহ কুপ্রথা রহিতের ঐ দরখাস্ত সমাদরপূর্বক গ্রহণ করেন। কুলীন অবলাগণের দুর্ভাগ্যপ্রযুক্ত সেই সময়ে রাজ্যে মিউটিনির আশঙ্কা হওয়ায় ও তৎকালে অগ্রজ মহাশয়ের অসুস্থতানিবন্ধন চলৎশক্তি-রহিত হওয়ায় এবং অন্যান্য কারণে, বহুবিবাহ কুপ্রথা ভারতবর্ষ হইতে তিরোহিত হইল না।

সন ১২৬৮ সালের ১লা বৈশাখ অগ্রজ মহাশয়, 'সীতার বনবাস' মুদ্রিত করেন। আমরা বাল্মীকির 'রামায়ণ' পাঠ করিয়াছি এবং অগ্রজ মহাশয়ের রচিত 'সীতার বনবাস'ও দেখিয়াছি। লেখার পাণ্ডিত্য-দর্শনে মোহিত হইতে হয়। কারুণ্য-রসের বর্ণনপক্ষে ইহাকে বাল্মীকির তুল্য বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। অগ্রজ মহাশয়, বাঙ্গালা ভাষায় যেরূপ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন, বোধ করি, এরূপ বাঙ্গালা-ভাষা লেখার প্রতিদ্বন্দ্বী কেহ ভারতবর্ষে অদ্যাপি জন্মগ্রহণ করেন নাই। অতি নিষ্ঠুর নির্দয় ব্যক্তিও সীতার বনবাসের অষ্টম পরিচ্ছেদ পাঠ বা শ্রবণ করিলে, অশ্রুজল বিসর্জন না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে সক্ষম হন না।

এই সময়ে নদীয়া জেলার মহারাজা সতীশচন্দ্র রায় বাহাদুর মানবলীলা সংবরণ করিলে পর, তাঁহার পত্নী, রাণী ভুবনেশ্বরী দেবী, গুরুদেব লক্ষ্মীকান্ত ভট্টাচার্য ও মোক্তারের পরামর্শানুসারে পোষ্যপুত্র গ্রহণ না করিয়া, স্বয়ং বিষয়কার্য চালাইতে অভিলাষ করেন। যাহাতে বিষয় কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীনে না যায়, তদ্বিষয়ে

তাঁহাদের গুরুদেব ও মোক্তার, বিধিমতে চেষ্টা পাইতে ছিলেন। কৃষ্ণনগরের দুই একটি ভদ্রলোক ও তৎকালীন দেওয়ান বাবু কার্তিকেয়চন্দ্র রায় মহাশয় অগ্রজ মহাশয়কে বিশেষরূপে অনুরোধ করেন যে, তিনি কৃষ্ণনগরে যাইয়া রাণীকে উপদেশ দিয়া, যাহাতে বিষয়টি কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীনে যায়, তাহা করুন। তাহা না করিলে, নদীয়ার বিখ্যাত মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নাম ও বংশমর্যাদা এককালে বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা। ইহা শ্রবণ করিয়া অগ্রজ মহাশয়, ত্বরায় কৃষ্ণনগর গমন করিয়া, রাণীকে নিজে ও কমিসনর ক্যাম্বেল সাহেব মহোদয়ের দ্বারা নানাপ্রকার উপদেশ দিয়া, বিষয় কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীনে আনাইয়াছিলেন। তাহাতে এই ফলোদয় হইয়াছিল যে, ঋণ পরিশোধ হইয়া এক্ষণকার মহারাজা ক্ষিতীশচন্দ্র রায় বাহাদুর সাবালক হইয়া, দুই লক্ষ দশ হাজার টাকা প্রাপ্ত হন। তজ্জন্য মহারাজা ক্ষিতীশচন্দ্র, কলিকাতায় আগমন করিয়া কৃতজ্ঞতাপ্রদর্শনার্থ অগ্রজ মহাশয়ের বাটীতে তাঁহার সহিত মধ্যে মধ্যে সাক্ষাৎ করিতেন। অপিচ, বর্তমান মহারাজার পিতামহ শ্রীশচন্দ্র রায় বাহাদুর, অগ্রজ মহাশয়কে এত আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন যে, বিধবাবিবাহের আবেদনপত্রে স্বয়ং স্বাক্ষর করিয়াছিলেন এবং যৎকালে গ্রাণ্ড সাহেব মহোদয়কে কলিকাতা ও অন্যান্য প্রদেশের সম্ভ্রান্ত ধনশালী ও সুশিক্ষিত লোক প্রশংসাপত্র প্রদান করেন, তৎকালে শ্রীশচন্দ্র রায় বাহাদুর স্বয়ং উক্ত সাহেবের বাটীতে যাইয়া, স্বহস্তে ঐ পত্র সাহেবকে প্রদান করেন। রাজা শ্রীশচন্দ্র রায় বাহাদুর বিধবাবিবাহের পক্ষসমর্থনকারী ছিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় ছিল, কলিকাতায় প্রথম বিবাহসময়ে, তাঁহার অধীনস্থ কৃষ্ণনগর সমাজের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া কলিকাতায় আগমনপূর্বক সভাস্থ হইয়া, প্রথম বিধবাবিবাহ কার্য সম্পাদন করিবেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, হতভাগিনী হিন্দু-বিধবাদিগের দুর্ভাগ্যবশত ঐ বিবাহের পূর্বদিবস তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রের মৃত্যু হয়। এই বিপদে পতিত হওয়ায়, তিনি সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। ইহাও প্রকাশ আছে যে, নবদ্বীপাধিপতি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের বংশীয়েরা বঙ্গদেশের সকল সমাজের ও জাতীয় আচার-ব্যবহারাদির কর্তা; তিনি ঐ বিবাহে উপস্থিত হইতে পারিলে, বিধবাবিবাহ বঙ্গদেশে সর্ববাদি-সম্মত হইয়া প্রচলিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। তাঁহার এই অনুপস্থিতিজন্য বিপক্ষদল প্রবল হইয়াছিল।

বর্ধমান জেলার অন্তঃপাতী চক্‌দিঘি-গ্রামনিবাসী ধনশালী সম্ভ্রান্ত জমিদার বাবু সারদাপ্রসাদ সিংহরায় মহোদয়ের সহিত অগ্রজ মহাশয়ের বিশেষ আত্মীয়তা ছিল; তজ্জন্য তিনি সারদাবাবুর অনুরোধে মধ্যে মধ্যে চক্‌দিঘি যাইতেন এবং সারদাবাবুও মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় আসিয়া, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। সারদাবাবুর পুত্রকন্যা হয় নাই। এক সময়ে তিনি কথাপ্রসঙ্গে কলিকাতায় অগ্রজকে বলেন, 'আমার বংশ-রক্ষা হইল না। বংশরক্ষার জন্য পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিব; এবিষয়ে

আপনার মত কি?' ইহা শুনিয়া অগ্রজ মহাশয় প্রত্যুত্তর করেন যে, 'পরের ছেলেকে টাকা দিয়া গ্রহণ করা আমার মতে ভাল নয়; কারণ, সেই বালক বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সৎ কি অসৎ হইবে, তাহা বলা দুষ্কর। যদি দুশ্চরিত্র হয়, তাহা হইলে অল্পদিনের মধ্যেই তোমার চিবসঞ্চিত ধনসম্পত্তি নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে। যদি এরূপ হয়, তাহা হইলে কিরূপে তোমাব কীর্তি থাকিবে? এমন স্থলে, যদি আমার পরামর্শ শুন, তাহা হইলে চকৃদিঘিতে একটি অবৈতনিক উচ্চশ্রেণীর ইংরাজী সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপন কর যে, চকৃদিঘির চতুঃপার্শ্বের সন্নিহিত গ্রামস্থ বালকগণ লেখাপড়া শিক্ষা করিয়া জ্ঞান-লাভ করিবে ও উপার্জনক্ষম হইবে। তাহা হইলেই তোমার নাম ও কীর্তি চিরস্থায়ী হইবে। ঐ বিদ্যালয়ের নাম সারদাপ্রসাদ ইনস্টিটিউসন রাখ। আর দাতব্য-চিকিৎসালয় স্থাপন কর, তাহা হইলে দেশস্থ নিরুপায় পীড়িত ব্যক্তিরা বিনা মূল্যে ঔষধ ও পথ্য পাইয়া, আরোগ্য লাভ করিবে। উক্ত দেশহিতকর মহৎ কার্যদ্বয় স্থাপন করিয়া যাইতে পারিলে, তোমার অনন্তকাল পর্যন্ত যশঃসুধাকর দেদীপ্যমান থাকিবে।' এতদ্ব্যতীত অপরাপর নানাপ্রকার হিতকর কার্য করিবারও উপদেশ দিয়াছিলেন। পূর্বে চকৃদিঘিতে গবর্নমেণ্টের একটি এডেড-স্কুল ছিল। তাহাতে বিশেষ ফলোদয় হইত না। তৎ-পরিবর্তে সারদাবাবু, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরামর্শে ও অনুরোধে খৃঃ ১৮৬১ অব্দে ১লা আগস্ট চকৃদিঘিতে অবৈতনিক এণ্ট্রান্স বিদ্যালয় স্থাপন করেন, এবং তৎকালের লেপ্টেনেণ্ট গবর্নরকে অনুরোধ করিয়া, মেডিকেল বোর্ড হইতে উৎকৃষ্ট ডাক্তার নির্বাচন করিয়া, ১২৬০ সালে (১৮৫৩) চকৃদিঘিতে ডাক্তারখানা স্থাপন করিয়া-ছিলেন। চকৃদিঘিতে এণ্ট্রান্স স্কুল স্থাপন-সময় হইতে দাদা ঐ বিদ্যালয়ের কমিটির মেম্বর ছিলেন। ঐ সময়ে তিনি উহার তত্ত্বাবধান করিতেন। তিনি যেরূপ শিক্ষা-প্রণালীর বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন, ঐ প্রণালী অদ্যাপি সেইরূপ প্রচলিত আছে। স্থানীয় লোক, দাদার ও সারদাবাবুর নাম যে কখনও বিস্মৃত হইবেন, এমত বোধ হয় না।

বিদ্যাসাগর মহাশয়, উক্ত বিদ্যালয় পরিদর্শনজন্য মধ্যে মধ্যে চকৃদিঘি যাইতেন। ঐ সময়ে চকৃদিঘির সন্নিহিত এক গ্রামে একটি দরিদ্র পরিবারকে কয়েক বৎসর মাসিক দশ টাকা মাসহারা দিয়াছিলেন। একদিন তাহাদের অবস্থা অবলোকন করিবার জন্য তাহাদের বাটী গিয়াছিলেন। তাহাদের একটি শিশুকে অতি শীর্ণকায় দেখিয়া বলিলেন, 'ছেলেটি এত রোগা কেন?' তাহাতে গৃহস্বামী বলেন, 'মহাশয়, যে দশ টাকা প্রদান করিয়া থাকেন, তাহাতে অতি কষ্টে আমাদের দিনপাত হয়, ছেলের জন্য দুগ্ধ ক্রয় করা ঐ টাকায় কুলায় না। দুগ্ধ খাইতে না পাইয়া, ছেলেটি দিন দিন শীর্ণ হইতেছে।' ইহা শুনিয়া আরও মাসিক পাঁচ টাকা ঐ ছেলের দুধের জন্য স্বতন্ত্র দিতেন। এক্ষণে ঐ পরিবারের অবস্থা ভাল হইয়াছে। এ বিষয়টি দাদার আত্মীয়, বাবু ছক্কনলাল সিংহ রায় মহাশয়ের পুত্র, বাবু মণিলাল সিংহ রায় ও বাবু

বিনোদবিহারী সিংহ রায় মহাশয়ের নিকট অবগত হইয়াছি। দাদা, দান করিয়া কাহাকেও তাহা ব্যক্ত করিতেন না।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাঙ্গালাভাষায় 'মেঘনাদবধ' প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তক রচনা করিয়া, সাধারণের নিকট কবি বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। তিনি কলিকাতা পুলিসের ইণ্টারপিটারের পদ পরিত্যাগ করিয়া, বারিস্টার হইবার মানসে বিলাত যাত্রা করেন। যাইবার প্রাক্কালে তাঁহার কোন সম্ভ্রান্ত আত্মীয়ের হস্তে যাবতীয় সম্পত্তি গচ্ছিত রাখিয়া প্রস্থান করেন। কিয়দ্দিবস পরে বিলাতে তাঁহার টাকার আবশ্যক হইলে, তাঁহার সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ককে পত্র লিখেন। দুর্ভাগ্যপ্রযুক্ত তাঁহারা প্রত্যুত্তরে কোন পত্র লিখেন নাই। টাকার জন্য তথায় তাঁহার কারাবাস হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া, অগত্যা দয়াময় অগ্রজকে বিনীতভাবে পত্র লিখেন। তিনি তাঁহার ঐরূপ পত্র পাইয়া ছয় সহস্র টাকা ঋণ করিয়া বিলাত পাঠান। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দাদার প্রেরিত আশাতীত প্রচুর টাকা পাইয়া, অপরিসীম হর্ষপ্রাপ্ত হইলেন এবং ঋণপরিশোধপূর্বক বারিস্টার হইয়া, সপরিবারে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া, বারিস্টারের কার্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে ব্যয়-নির্বাহার্থ ক্রমশ কয়েক মাসের মধ্যে প্রায় আরও দুই সহস্র টাকা অগ্রজের নিকট গ্রহণ করেন। দুঃখের বিষয় এই যে, স্বল্পদিনের মধ্যেই মাইকেল মৃত্যুমুখে নিপতিত হন। অগ্রজ মহাশয় কোন আত্মীয়ের নিকট উপরি উক্ত আট হাজার টাকা যাহা ঋণ করিয়া দিয়াছিলেন, সুদসহ উক্ত আত্মীয়কে সমস্ত টাকা তাঁহাকেই পরিশোধ করিতে হইল। তজ্জন্যই বাবু কালীচরণ ঘোষ ও বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সংস্কৃত-যন্ত্র বিক্রয় করেন। পরের হিতকামনায় অগ্রজ ব্যতীত কেহ কি এরূপ ঋণ করিয়া, নিজের জীবিকানির্বাহের সম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারেন?

ঐ সময় গঙ্গাদাসপুরনিবাসী তারাচাঁদ সরকার, রাধানগরনিবাসী বাবু রামকমল মিশ্র ও গঙ্গাদাসপুরনিবাসী বাবু গোরাচাঁদ দত্তের নামে কলিকাতাস্থ আদালতে অভিযোগ করিয়া, পাঁচ শত টাকা আদায় করেন। যে সময়ে উহাদিগকে ওয়ারেণ্ট দ্বারা গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যায়, সেই সময়ে উহারা নিরুপায় হইয়া, পিয়াদাসহ পটলডাঙ্গাস্থ বাবু শ্যামাচরণ বিশ্বাসের ভবনে অগ্রজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহাকে ঐ দায় হইতে মুক্ত করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করেন। নিজের টাকা না থাকা প্রযুক্ত অগ্রজ মহাশয়, তৎক্ষণাৎ তথায় উপবিষ্ট বাবু রাখাল মিত্রের নিকট খত লেখাইয়া ও স্বয়ং সাক্ষী হইয়া পাঁচশত টাকা উক্ত ব্যক্তিদ্বয়কে দেওয়াইয়া, তাহাদিগকে ঋণদায় হইতে মুক্ত করেন। পরে ইহারা ঐ টাকা পরিশোধ না করাতে, রাখালবাবুর মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে অগ্রজ, সুদসহ আট শত টাকা তাঁহার পত্নীকে পরিশোধ দিয়া, ঐ খত খালাস করেন। দাদা, খতে কেবল সাক্ষীমাত্র ছিলেন; উত্তমর্ণ, দাদার খাতিরে টাকা দিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার নিকট চাহিয়াছিলেন। উক্ত অধমর্ণত্রয় আর কখনও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই।

শুনিয়াছি, তাঁহাদের উভয়েরই মৃত্যু হইয়াছে এবং উভয়েরই বিলক্ষণ ভূমিসম্পত্তি আছে।

এক সময়ে পণ্ডিত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার বিপদে পড়িয়া, বিষণ্ণ-বদনে দাদার নিকট আসিয়া বলেন, 'মহাশয়, অত্যন্ত বিপদে পড়িয়াছি, পরিত্রাণের উপায়ান্তর নাই, যদি অনুগ্রহ করিয়া পাচশত টাকা ধার দেন, তাহা হইলে এ যাত্রা পরিত্রাণ পাই, নচেৎ আমায় আত্মহত্যা করিতে হয়।' তাহা শুনিয়া, অগ্রজ অতিশয় দুঃখিত হইলেন। নিজের টাকা না থাকা প্রযুক্ত অপরের নিকট ঋণ করিয়া পাচশত টাকা দিলেন। তাহার পর এই দীর্ঘকালের মধ্যে জগন্মোহন তাঁহার সহিত আর কখনও সাক্ষাৎ করিলেন না।

জাহানাবাদের সন্নিহিত কোন গ্রামে এক ভট্টাচার্য মহাশয়, অগ্রজের নিকট উপস্থিত হইয়া বিষণ্ণ-বদনে রোদন করিতে করিতে বলেন, 'বাবা ঈশ্বর! বড়-বাজারের রামতারক হালদারের নিকট দুই শত টাকা ঋণ করিয়া সংসারযাত্রা নির্বাহ করিয়াছি, তাহারা টাকা না পাইয়া, আমার নামে অভিযোগ করিয়া জয়-লাভ করিয়াছেন এবং ত্বরায় আমাকে খাতক করিয়া, অপমানিত করিবার উদ্‌যোগে আছেন; কিসে পরিত্রাণ পাই?' তাঁহার কাতরতাদর্শনে আমার হস্তে দাবীকৃত সমস্ত টাকা দিয়া, তাঁহাকে আমার সঙ্গে বড়বাজারের মহাজনের দোকানে প্রেরণ করেন। উত্তমর্ণ, আমার নিকট দাবীকৃত উক্ত টাকা লইয়া, তাঁহাকে অব্যাহতি দেন।

অগ্রজ মহাশয় কেবল দরিদ্রগণকে সাহায্য করিতেন, এমন নহে; বন্ধুবান্ধবেরা বিপদে পড়িলে তিনি অকাতরে অর্থসাহায্য করিতেন। ঐ সকল টাকা পরে ফেরৎ পাইব, কখনও এরূপ আশা করিতেন না ও চাহিতেন না। তিনি এই মনে করিতেন যে, আমি বন্ধুদিগের বিপদে সাহায্য করিতেছি, পরে তাঁহাদের সময় ভাল হইলে, ইচ্ছা হয় তাঁহারা স্বয়ং প্রত্যার্পণ করিবেন। দুঃখের বিষয় এই যে, দুই একজন ভিন্ন কেহই তাহা ফেরৎ দেন নাই। কিন্তু দাদাও তাঁহাদিগকে কখনও টাকার কথা বলেন নাই।

সন ১২৭০ সালের ১০ই ফাল্গুন কলিকাতায় একটি বিধবা ব্রাহ্মণতনয়ার পাণি-গ্রহণবিধি সমাধা হয়। ইঁহাদের নিবাস ঢাকা জেলা।

সন ১২৭১ সালের ১২ই মাঘ কলিকাতায় একটি বৈদ্যজাতীয় বিধবার বিবাহ-কার্য সমাধা হয়। বর জগচ্চন্দ্র দাশগুপ্ত, নিবাস পরগণা বিক্রমপুর মধ্যপাড়া জেলা ঢাকা।

এইরূপ সন ১২৭১ ও ৭২ সালে আরও ২০।২৫টি ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, তন্তুবায়, বৈদ্য ও তৈলিক প্রভৃতি জাতীয় বিধবার পাণিগ্রহণবিধি সমাধা হয়।

ভাটপাড়ানিবাসী, অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন, নৈয়ায়িক শ্রীযুক্ত রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়, পাঠসমাপনান্তে মনে মনে স্থির করেন, ভাটপাড়ায় টোল করিয়া

দুই তিনটি ছাত্র বাটীতে রাখিয়া, ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপনার কার্য করিবেন; কিন্তু তাঁহার পিতা বলেন, 'ছাত্রকে অন্ন দিতে পারিব না; খাইতে দিতে হইলে, মাসে ছয়-সাত টাকার কমে চলিবে না।' তাহা শুনিয়া, ন্যায়রত্নের অত্যন্ত দুর্ভাবনা হইল। কারণ, বহুকাল অনবরত পরিশ্রম করিয়া যে দর্শন-শাস্ত্র শিক্ষা করিলেন, তাহা ছাত্র রাখিয়া শিক্ষা না দিলে, সকলই বিফল হয়। তিনি মাসিক ছয় টাকা আয়ের জন্য অনেক স্থানে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই পূর্ণ-মনোরথ হন নাই। তৎকালের বেথুন বালিকাবিদ্যালয়ের পণ্ডিত মাখনলাল ভট্টাচার্য তাঁহার শিষ্য ছিলেন। এক দিবস তাঁহার বাসায় উপস্থিত হইয়া, মনঃকষ্টের কথা ব্যক্ত করিলে পর তিনি বলিলেন, 'পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এরূপ বিষয়ে অনেককে গোপনে মাসহারা দিয়া থাকেন। যদি ইচ্ছা হয় ত চলুন, আমি সঙ্গে করিয়া আপনাকে লইয়া যাই।' ইহা শুনিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয় বলিলেন, 'তিনি পণ্ডিত ও মহাশয় ব্যক্তি, তাঁহার নিকট দান লইবার বাধা নাই।' মাখনলাল ভট্টাচার্য, ন্যায়রত্ন মহাশয়কে সমভিব্যাহারে লইয়া, সুকিয়া স্ট্রীটে রাজকৃষ্ণবাবুর বাটীতে দাদার সহিত সাক্ষাৎ করেন। ইতিপূর্বে দাদা ঐ পণ্ডিতের দর্শনশাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের বিষয় অবগত ছিলেন; তজ্জন্য তাঁহাকে বিলক্ষণ সমাদর করিলেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় বলিলেন যে, 'আমি সমগ্র ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি। এক্ষণে বাটীতে টোল করিয়া বিদ্যাদান করিতে মানস করিয়াছি, কিন্তু টোল করিতে হইলে মাসিক দশ টাকা ব্যয় হইবে, মাসিক এই টাকার সংস্থান না করিতে পারিলে, বাটীতে বসিয়া আপনার কার্য করিতে পারি না। আপনার অবিদিত নাই যে, ন্যায়শাস্ত্র যাহারা অধ্যয়ন করিবে, তাহাদিগকে অন্ন দিতে না পারিলে, তাহারা নিশ্চিন্ত হইয়া দীর্ঘকাল কেমন করিয়া শিক্ষা করিবে।' ন্যায়রত্নের কথা শুনিয়া, অগ্রজ বলিলেন, 'যে পর্যন্ত আপনার পশার না হইবে, সেই পর্যন্ত আমি মাসিক দশ টাকা দিতে পারিব, আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া ছাত্র রাখিয়া দর্শন-শাস্ত্রের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হউন।' দাদা, ক্রমিক আট বৎসরকাল মাসে দশ টাকা করিয়া ন্যায়রত্নের বাটীতে পাঠাইয়া দিতেন। এতদ্ব্যতীত মধ্যে মধ্যে উঁহার পরিবারগণকে বস্ত্রাদিও প্রদান করিতেন। ঐ টাকা ব্যতীত মধ্যে মধ্যে আরও বিশ পঞ্চাশ টাকা সাহায্য করিতেন। পরে পশার হইলে পর, এক দিবস ন্যায়রত্ন মহাশয়, স্বয়ং দাদাকে বলিলেন, 'আর আপনি সাহায্য না করিলেও আমার দিনপাত হইতে পারে।' ন্যায়রত্ন মহাশয়, প্রথমেই আপনার অবস্থা অনেককে জানাইয়াছিলেন, কিন্তু কেহই এরূপ সাহায্য করিতে সাহস করেন নাই। তিনি এ বিষয় অনেকের নিকট স্বীকার করিয়া আপন কৃতজ্ঞতা দেখাইতেন এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়কে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিতেন; অগ্রজও ন্যায়রত্নকে আন্তরিক স্নেহ করিতেন। ন্যায়রত্ন মহাশয়, কৃতজ্ঞতা-সহকারে সভাস্থলে নিজে যেরূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাই এস্থলে লিখিত হইল।

সন ১২৭২ সালের অগ্রহায়ণ মাসে পিতৃদেব স্বপ্ন দেখেন যে, ত্বরায় তোমাব বাসভূমি শ্মশান হইবে। স্বপ্ন দেখিয়া পিতৃদেব অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। তদনন্তর বিখ্যাত গঙ্গানারায়ণ ভট্টাচার্যকে ডাকাইয়া, তাঁহার কোষ্ঠীর ফল গণনা করাইলেন। তিনিও ঐ কথা ব্যক্ত করিলেন; অধিকন্তু বলিলেন যে, 'ত্বরায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শনির দশা উপস্থিত হইবে। গণনানুসারে দেখিতেছি, তাঁহার আত্মবিচ্ছেদ, বন্ধুবিচ্ছেদ ও ভ্রাতৃবিচ্ছেদ ঘটিবে ও তাঁহাকে দেশত্যাগী হইতে হইবে। এক দিনেব জন্যও সুখী হইবেন না ও একস্থানে স্থায়ী হইবেন না। নূতন নূতন স্থানে যাইয়া বাস করিবার ইচ্ছা হইবে। ইহা আপনি অন্যের নিকট ব্যক্ত করিবেন না। বিশেষত, বিদ্যাসাগর বাবাজীর নিকট ব্যক্ত করিলে, তিনি আমায় তিরস্কার করিতে পারেন।' স্বপ্ন-দর্শন ও কোষ্ঠীর গণনা ঐক্য হইল দেখিয়া, পিতৃদেবের অত্যন্ত দুর্ভাবনা হইল। তদবধি তাঁহার আর দেশে থাকিতে ইচ্ছা রহিল না। কয়েক দিন পরে কাশীবাস করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন; সুতরাং আমি অগ্রজ মহাশয়কে ঐ সংবাদ লিখিলাম। তিনি তৎকালে রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহের পীড়া উপলক্ষে মুরশিদাবাদের সন্নিহিত কান্দীগ্রামে অবস্থিতি করিতেছিলেন। পত্র-প্রাপ্তিমাত্রেই অগ্রজ মহাশয়, তদুত্তরে আমায় যাহা লিখেন, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

'তিনি বিদেশে একাকী অবস্থিতি করিবেন, তাহা কোন ক্রমেই পরামর্শসিদ্ধ নহে; সমুদায় আহরণ করিয়া আপনার আহারাদি নির্বাহ করিবেন, তাহাতে কষ্টের একশেষ হইবে। যে ব্যক্তির পুত্র পৌত্রাদি এত পরিবার, তিনি শেষ বয়সে একাকী বিদেশে কালহরণ করিবেন, ইহা অপেক্ষা দুঃখ ও আক্ষেপের বিষয় কি হইতে পারে? সুতরাং এ অবস্থায় তিনি একাকী কাশীতে বাস করিবেন, ইহা আমি কোনও মতে সহ্য করিতে পারিব না। সেরূপ করিলে তাঁহার কষ্টের সীমা থাকিবে না। যদি তাঁহার সেবা ও পরিচর্যার নিমিত্ত কেহ কেহ সঙ্গে যাইতে পারেন, তাহা হইলেও আমি কথঞ্চিৎ সম্মত হইতে পারি; নতুবা তাঁহাকে একাকী পাঠাইয়া দিয়া, আমরা এখানে নিশ্চিন্ত হইয়া, সুখে কালযাপন করিব, ইহা কোনও ক্রমেই ধর্ম-সঙ্গত নহে। অন্যের কথা বলিতে পারি না, আমি কোনও মতেই আমার মনকে প্রবোধ দিতে পারিব না; যদি নিতান্তই তাঁহার যাইবার মানস হইয়া থাকে, তবে এইরূপ তাড়াতাড়ি করিলে চলিবে না। তুমি তাঁহার চরণারবিন্দে আমার প্রণিপাত জানাইয়া কহিবে যে, পাছে আমার মনে দুঃখ হয়, এই খাতিরে তিনি অনেকবার অনেক কষ্ট সহ্য করিয়াছেন, এক্ষণেও সেই খাতিরে আর কিছু কষ্ট সহ্য করুন; আমি সত্বর বাটী যাইবার চেষ্টায় রহিলাম। সেখানে পৌঁছিলে পরামর্শ করিয়া কর্তব্য স্থির করিব; নতুবা অকস্মাৎ এরূপে সংসার ত্যাগ করিয়া যাইলে এবং উপযুক্ত বন্দোবস্ত না করিলে, আমি মর্মান্তিক বেদনা পাইব। যাহা হউক, যেরূপে পার আপাতত তাঁহার এ অভিপ্রায় রহিত

করিবে এবং তিনি আপাততঃ ক্ষান্ত হইলে, এই সংবাদ সত্বর কান্দীতে আমার নিকট পাঠাইবে। যাবৎ এ সংবাদ না পাইব, তাবৎ আমার দুর্ভাবনা দূর হইবে না। দুই চারি দিন কোন মতে এখান হইতে যাইতে পারিব না; নতুবা অদ্যই আমি প্রস্থান করিতাম। যাহা হউক, যেরূপে পার তাঁহাকে আপাতত কোনমতে ক্ষান্ত করিবে; নিতান্ত ক্ষান্ত না হন, এই রবিবারে বাটী হইতে আসিতে না দিয়া, আমাকে সংবাদ লিখিলে, আমি যেরূপে পারি বাটী যাইব। আমি কায়িক ভাল আছি, ইতি তারিখ ৩০শে অগ্রহায়ণ।

শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মণঃ,'

পিতৃদেব মহাশয়কে উক্ত পত্র দেখান ও শ্রবণ করান হইল, তথাপি তিনি কাশী যাইবার জন্য ব্যগ্র হইলেন, সুতরাং পুনর্বার কান্দীতে পত্র লেখা হইল। পত্র-প্রাপ্তি-মাত্রেই আহার-নিদ্রা-পরিত্যাগপূর্বক বর্ধমান আগমন করিলেন, এবং তথা হইতে রাত্রিতেই পাল্কী করিয়া জাহানাবাদে আসিলেন। তথা হইতে বেহারারা আরও আট ক্রোশ আসিতে অসমর্থ হইলে, পদব্রজেই বীরসিংহার বাটীতে আগমন করিলেন। তিনি অনেক অনুনয় বিনয় এবং রোদন করাতেও পিতৃদেব বাটীতে অবস্থিতি করিতে ইচ্ছা করিলেন না। কয়েক দিবস পরে পিতৃদেব, তাঁহার সমভিব্যাহারে কলিকাতায় গমন করিলেন। তথায় কতিপয় দিবস থাকিলেন এবং শেষে অগ্রজের অনেক অনুনয় বিনয়ে দেশে আগমন করিবেন স্থির করিলেন। ইতিমধ্যে কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঈশানের সহিত কথাপ্রসঙ্গে পিতৃদেব তাহাকে বলেন যে, 'ঈশ্বর আমায় দেশে ফিরিয়া যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছে, তোমার মত কি?' ঈশান বলিল, 'আমার মতে দেশে গিয়া সংসারী-ভাবে থাকা আর আপনার উচিত নয়, এই সময় আপনার কাশীধামে গিয়া বাস করাই উচিত।' কনিষ্ঠ সহোদর ঈশান, পিতৃদেবকে এরূপ অসদৃশ নানাবিধ উপদেশ দেওয়াতে, তিনি একেবারে দেশে যাইবার ইচ্ছা পরিত্যাগ করিলেন। ঈশান এই কথা বলিয়াছে শুনিয়া, অগ্রজ মহাশয়, ঈশানের প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন এবং পিতৃদেবকে বলিলেন, 'আপনি গৃহস্থের মধ্যে থাকিয়া সময়াতিপাত করিতেন। এক্ষণে আপনাকে কদাচ একাকী কাশী যাইতে দিব না। বাটীর কেহ আপনার সমভিব্যাহারে না থাকিলে, নিজে বৃদ্ধ বয়সে পাকাদি-কার্য সম্পন্ন করিয়া দিনপাত করা, আপনার পক্ষে অতি কষ্টকর হইবে।' পিতৃদেব কোনও উপদেশ না শুনিয়া, কাশীতে অবস্থিতি করাই স্থির করিলেন; সুতরাং কাশীধামে সুখস্বচ্ছন্দে অবস্থিতি করিবার বন্দোবস্ত হইল।

যাইবার পূর্বে দাদা বলিলেন, আপনি গেলে আমাদের মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইবে। আমাদের জন্য কোনও চিত্ত-বিনোদনের উপায় নাই; অতএব আপনি সম্মতি প্রদান করিলে, চিত্রকর হড্‌সন প্রাটের বাটী গিয়া, তাঁহার দ্বারা পটে

আপনার প্রতিমূর্তি অঙ্কিত করাইয়া লইব। অতএব আপনাকে আর পনর দিবস কলিকাতায় অবস্থিতি করিতে হইবে।' পিতৃদেব সম্মত হইলে, তাঁহার প্রতিমূর্তি অঙ্কিত করাইলেন। ইহাতে তিন শত টাকা ব্যয় হয়। কিছুদিন পরে ঐরূপ জননীদেবীরও প্রতিমূর্তি অঙ্কিত করাইলেন; ইহাতেও তিনশত টাকা ব্যয় হয়। দাদা প্রত্যহ অন্তত দুইবার ঐ মূর্তি দর্শন করিতেন। কর্মাটার ও ফরাশডাঙ্গার বাসাতেও স্বতন্ত্র প্রতিমূর্তি প্রস্তুত করাইয়া রাখিয়াছিলেন।

খৃঃ ১৮৫৯ সালের ১লা এপ্রেল, দেশহিতৈষী পরম-দয়ালু রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, অগ্রজ মহাশয়ের পরামর্শে ও উদ্যোগে তাঁহাদের জন্মভূমি কান্দীগ্রামে ইংরাজী-সংস্কৃত স্কুল স্থাপন করেন। উক্ত রাজাদের জীবিতকাল পর্যন্ত অর্থাৎ ১৮৬৬ সাল পর্যন্ত ঐ স্কুল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ই শিক্ষকাদি নিযুক্ত কবিতেন। রাজাদের টাকায় স্কুলের চেয়ার, ডেস্ক, বেঞ্চ, আলমারি প্রভৃতি ক্রয় করিয়া পাঠাইয়াছিলেন ও বহুমূল্যবান পুস্তকাদি ক্রয় করিয়া, লাইব্রেরী করিয়া দিয়াছিলেন। ঐরূপ বিদ্যালয় গৃহ ও ঐরূপ লাইব্রেরী মফঃস্বলে দৃষ্ট হয় না। পারিতোষিক-প্রদান-কালে অগ্রজ মহাশয় স্বয়ং উপস্থিত থাকিতেন। দাদাকে কোথাও বক্তৃতা করিতে শুনা যায় নাই; কিন্তু ঐ স্থানে অনেকের অনুরোধে মনের ভাব লিখিয়া দিয়াছিলেন, ঐ লেখা অপরে পাঠ করিয়াছিলেন। ঐ বক্তৃতা তৎকালে সংবাদ-পত্রে প্রচারিত হইয়াছিল।

খৃঃ ১৮৬৬ অব্দে যখন রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ উৎকট রোগে আক্রান্ত হইয়া, কান্দী রাজভবনে কার্তিক মাস হইতে মাঘ মাস পর্যন্ত অবস্থিতি করেন, তৎকালে অগ্রজ মহাশয়, রাজার রীতিমত চিকিৎসার জন্য কলিকাতার বিখ্যাত ডাক্তার সি. আই. ই. বাবু মহেন্দ্রনাথ সরকারকে মাসিক সহস্র মুদ্রা বেতনে নিযুক্ত করিয়া ও সমভিব্যাহারে লইয়া কান্দী গমন করেন। অগ্রজ মহাশয় উক্ত চারি মাসের মধ্যে বিশেষ প্রয়োজনবশত দুই তিন বার তথা হইতে বাটী আগমন করেন এবং আট দশ দিন বাটীতে অবস্থিতি করিয়া, পুনর্বার তথায় গমন করেন। উক্ত রাজাদিগকে তিনি সহোদর-সদৃশ স্নেহ করিতেন বলিয়া, এতদূর নিঃস্বার্থভাবে তাঁহার জীবন-রক্ষার জন্য আন্তরিক যত্ন করিয়াছিলেন। ধনশালী সম্ভ্রান্ত লোকের মধ্যে রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর যেরূপ বিনয়ী ও ভদ্রলোক ছিলেন, সেরূপ প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। ইনি সৌজন্যাদি গুণসমূহে সাধারণ মানবগণকে বশীভূত করিয়াছিলেন।

রাজা, কাশীপুরের গঙ্গাতীরে মৃত্যুর পূর্বে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে স্বীয় সমস্ত সম্পত্তির তত্ত্বাবধানজন্য একমাত্র ট্রাস্টি নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু অগ্রজ মহাশয় নানা কারণে রাজার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না; তজ্জন্য তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন।

রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহের মৃত্যুব পর, বিষয় রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তাঁহার পিতামহী রাণী কাত্যায়নী অতিশয় ভাবিতা হইয়াছিলেন। ইতস্তত নানাপ্রকার চিন্তা করিয়া, কলিকাতাস্থ অনেক ধনশালী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে আনাইলেন, কিন্তু ঐ সকল ব্যক্তিদিগের পরস্পর নানা তর্ক-বিতর্কের পর কোন বিষয়েব স্থিরীকরণ না হওয়ায়, রাণী কাত্যাযনী, অগ্রজকে আনাইযা বলিলেন, 'বিদ্যাসাগর বাবা, আমাকে এরূপ গোলযোগে ও বিপদে পতিত হইতে দেখা তোমার উচিত নহে। অতএব আমার এই বিপদের সময় আমাদিগকে কি করিতে হইবে, সেই সমস্ত নির্ধারণ করিয়া, যাবতীয় বিষয়ের কর্তব্য নির্ধারণ করা তোমার অবশ্য-কর্তব্য কর্ম। অতএব তুমি বিলম্ব না করিয়া, অনন্যমনা ও অনন্যকর্মা হইয়া সত্বর কার্যে প্রবৃত্ত হও। আমার এই উক্তির অপেক্ষা না করিযা, এ কার্যে প্রবৃত্ত হওয়াই তোমার উচিত ছিল। তোমাকে এরূপ কথা আর না বলিতে হয়, ইহা যেন তোমার মনে থাকে।' ইহা শ্রবণ করিয়া তিনি বলিলেন, 'প্রতাপচন্দ্রের মৃত্যুতে আমার মন স্থির না থাকায় এরূপ হইয়াছে, তজ্জন্য কিছু মনে করিবেন না; সত্বর যাহাতে সুবন্দোবস্ত হয়, অদ্যাবধি তদ্বিষযে প্রবৃত্ত হইলাম। যদিও আপনি বরাবর আমার প্রতি স্নেহ, মমতা ও বিশ্বাস করিয়া আসিতেছেন, তথাপি কি জানি সময়দোষে আমার প্রতি দ্বিধা কবিয়া, পাছে অপবের কথায় কর্ণপাত কবিয়া গোলমাল করেন, এই আশঙ্কায়, আপনাকে অনুবোধ করিতেছি, অন্য কোনও ব্যক্তির কথায় কর্ণপাত কবিবেন না ও বিচলিত হইবেন না। কারণ, তাহা হইলে কার্যক্ষতি হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।' তাঁহার এই কথা শ্রবণ কবিয়া রাণী বলিলেন, 'বিদ্যাসাগর বাবা! আমি অন্যের কথায় তোমার প্রতি অবিশ্বাস করিয়া, আমাব নাবালক প্রপৌত্রদিগের কি সর্বনাশ করিব? ইহা তুমি কদাচ মনে করিও না। তোমার যেরূপ ইচ্ছা ও বিবেচনা হয়, আমি তদনুসারে কার্য করিব; তদ্বিষয়ে আমি স্থির রহিলাম।'

এই সকল কথাবার্তার পর, অগ্রজ মহাশয়, আইন-পারদর্শী পরমবন্ধু দ্বারকানাথ মিত্র মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া, পাইকপাড়া স্টেট, কোর্ট অব ওয়ার্ডের তত্ত্বাবধানে সমর্পণ করা যুক্তিযুক্ত স্থির করিয়া, তৎকালীন লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর সার সিসিল বীডন মহোদয়ের সদনে গমন করিলেন। দুই এক বিষয়ের কথোপকথনের পর, পাইকপাড়ার রাজ-স্টেটের কথা উত্থাপন করিয়া, ঐ স্টেটের বর্তমান শোচনীয় অবস্থা বর্ণনা করিলেন। ইহা শ্রবণ করিযা লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর বাহাদুর বলিলেন, 'তোমার মত বন্ধু থাকিতে তাহাদিগের এরূপ শোচনীয় অবস্থা হওয়া, তোমার পক্ষে দূষণীয়। তুমি কিরূপে এতদিন ঐ সকল বিষয়ে উপেক্ষা করিয়া তাহাদিগকে ঋণগ্রস্ত হইতে দেখিলে?' তদুত্তরে তিনি বলিলেন, 'তাঁহাদের সময়দোষে ও কর্মদোষে বিষয় কর্ম-সম্বন্ধে সকল সময়ে আমার কথা না শুনিয়া, তাঁহারা ভোগ বাসনারই অনুবর্তী হইয়াছিলেন এবং এক্ষণেও যেরূপ অবস্থা

দেখিতেছি, তাহাতে আমার মতে এই বিষয় কোর্ট অব ওয়ার্ডে যাওয়া উচিত। তদ্ভিন্ন রক্ষার আর কোনও উপায় দেখি না। এ বিষয় আমার নিজের দ্বারা রক্ষা হওয়ার সম্ভাবনা অতি অল্প; আপনি নাবালকদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া, আপনারই একমাত্র কর্তব্যকর্ম বিবেচনায়, সমস্ত ক্লেশ স্বীকার করিয়া, এই বিষয়ের ভার গ্রহণ করুন। এ বিষয়ে নাবালকদের প্রপিতামহী রাণী কাত্যায়নীর সম্মতি করিয়া দিব, তদ্বিষয়ে কোন দ্বিধা করিবেন না; কারণ, রাণী কাত্যায়নী, আমাকে এ বিষয়ের কর্তব্যাবধারণের ভার দিয়াছেন। রাজপুত্রদিগকে সমভিব্যাহারে করিয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইলে, আপনি তাহাদের সমক্ষে আমাকে এইরূপ তিরস্কার করিবেন। এইরূপে নানাপ্রকার উপায় উদ্ভাবন করিয়া, পাইকপাড়া রাজ-স্টেট, কোর্ট অব ওয়ার্ডে দিবার ব্যবস্থা করুন।' এই কথার পর দাদা, রাণী কাত্যায়নীর সমক্ষে গমন করিয়া বলিলেন, 'এক্ষণে আমি রাজপুত্রদিগকে সমভিব্যাহারে করিয়া লেপ্টেনেণ্ট গবর্নরের নিকট যাইব।' এই কথাগুলি বলিবামাত্র অন্য কথার অপেক্ষা না করিয়া রাণী বলিলেন, 'তদ্বিষয়ে আমার সম্মতির আবশ্যক নাই। তুমি যাহা ভাল বুঝিবে, তাহাই করিবে।' অগ্রজ মহাশয়, রাজপুত্রদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া, লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর বাহাদুরের সমীপে উপস্থিত হইলেন। লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর বাহাদুর, সমাদরে সকলকে বসাইয়া, কুমার গিরিশচন্দ্র সিংহ বাহাদুরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'পণ্ডিত বিদ্যাসাগর তোমাদের পিতৃবন্ধু; ইনি থাকিতে তোমাদের বিষয়কর্মের বিশৃঙ্খলা ঘটিবার কারণ কি?' এই কথা বলিয়া অগ্রজকে বলিলেন, 'পণ্ডিত! আমার বোধ হয়, তুমি নিজ কর্মে ব্যস্ততাপ্রযুক্ত তোমার বন্ধুদিগের প্রতি উপেক্ষা করিয়া তাহাদের বিষয়-কর্মের অনুসন্ধান না লওয়ায় এবং তোমাদের পরমবন্ধু প্রতাপচন্দ্র সিংহকে সদুপদেশ প্রদান ও শাসন না করায়, তাঁহাদিগকে ঋণগ্রস্ত হইতে হইয়াছে এবং তাঁহাদিগের বিষয়কর্মের বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে। এতদ্ভিন্ন তাঁহাদিগের কর্মচারিগণের কার্য ও ব্যবহারে তুমি রীতিমত দৃষ্টি রাখ নাই বলিয়া, ঐ কর্মচারীরা ইহাদিগের যথেষ্ট ক্ষতি করিয়াছে। অতঃপর ইহাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি না রাখিলে, তোমাকে ইহাদিগের পিতৃবন্ধু বলিতে পারি না।' এইরূপ নানাপ্রকার তিরস্কার করিবার পর, সাহেব স্বীকার করিলেন যে, তিনি পাইকপাড়ার রাজ-স্টেট তাঁহার সাধ্যানুসারে কোর্ট অব ওয়ার্ডে সমর্পণ করিবার চেষ্টা পাইবেন। এই বলিয়া তাঁহাকে ও রাজপুত্রদিগকে বিদায় দিলেন।

তিনি বিদায় লইয়া রাজকুমারগণের সহিত বাসায় আসিয়া, তাঁহাদিগকে পাইকপাড়ায় পাঠাইয়া দিলেন। রাজকুমারগণ, রাণী কাত্যায়নীকে ছোট লাট ও বিদ্যাসাগরের কথোপকথনগুলি আনুপূর্বিক বর্ণন করিলেন। তচ্ছ্রবণে রাণী সমধিক যত্ন ও আগ্রহাতিশয়-সহকারে দাদাকে পাইকপাড়ার বাটীতে লইয়া গেলেন। রাণী কাত্যায়নী তাঁহাকে বলিলেন, 'বিদ্যাসাগর বাবা! তোমা ভিন্ন

আর কে আমাদিগের প্রতি এরূপ যত্ন ও স্নেহ করিয়া আমাদিগের বিষয় রক্ষা করিবে? তুমি বই আর আমাদের হিতৈষী কেহই নাই।' পরে বিদ্যাসাগর মহাশয়, বাবু দ্বারকানাথ মিত্র ও ছোট লাটের পরামর্শে চব্বিশ পরগণার কালেক্টার সাহেবের নিকট আবেদন করায়, তিনি তাহাতে নিজের মন্তব্য লিখিয়া, কমিসনর সাহেবের নিকট প্রেরণ করেন। কমিসনর সাহেব, তাঁহাব বিরুদ্ধে অভিপ্রায়সহ বোর্ডে প্রেরণ করায়, তৎকালীন অন্যতর মেম্বর ডাম্পিয়ার সাহেব, ঐ আবেদন-পত্র অগ্রাহ্য করিয়া, কমিসনর সাহেবের হাত দিয়া কালেক্টার সাহেবের নিকট প্রেরণ করেন। ইহা অবগত হইয়া, উঁহারা তিন জনে যুক্তি করিয়া পুনর্বার দরখাস্ত করায়, ঐরূপ অগ্রাহ্য হয়। ইহাতে দ্বারকানাথ মিত্র আইনপুস্তক ভালরূপ দেখিয়া ও অগ্রজের সহিত পবামর্শ করিয়া, ১৮৫৮ সালের ৪০ আইনের ১২ ধারা মতে দরখাস্ত লেখাইয়া, নাবালক গিরিশচন্দ্র বাহাদুর দ্বারা চব্বিশপরগণার জজসাহেবের নিকট দরখাস্ত দাখিল করেন। জজ সাহেব, সাবালক ও নাবালকগণের প্রতি সানুকূল হইয়া, উক্ত আইন অনুসারে দরখাস্ত মঞ্জুর করিয়া, কালেক্টার সাহেবের নিকট পাঠান। পূর্বের ন্যায় জজ সাহেবের হুকুম অগ্রাহ্য হয়। ইহা দেখিয়া অগ্রজ মহাশয়, পুনর্বার দ্বারকানাথ মিত্র মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া, দবখাস্ত দ্বারা জজ সাহেবকে অবগত করিলে, তিনি আদালত অবজ্ঞার কথা উল্লেখ করিয়া, কালেক্টার সাহেবকে লিখেন যে, আমি ডিস্ট্রীক্ট জজ; উক্ত পাইকপাড়া রাজ-স্টেট কোর্ট অব ওয়ার্ডে যাইবার হুকুম দিয়াছি। এ হুকুম অনুসারে কার্য না করিলে, আইন অনুসারে আদালত অবজ্ঞার দণ্ড পাইবে। এই সময় রাজ-স্টেটের কার্যের সুবন্দোবস্ত না থাকায় ও স্টেট ঋণজালে জড়িত থাকায়, কালেক্টারি খাজনা দাখিল হয় নাই এবং ত্বরায় দাখিল হইবার সম্ভাবনা ছিল না; সুতরাং ১৭৯৩ সালের লাটবন্দীর আইন অনুসারে সমস্ত জমিদারী বিক্রয় হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া, অগ্রজ মহাশয় ভয় পাইয়া, দারজিলিংস্থ বীডন সাহেবকে পত্র লেখেন। বীডন সাহেব, অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া জমিদারী রক্ষা করেন। তিনি দারজিলিং হইতে লিখেন যে, তোমার অনুরোধে এ যাত্রা পাইকপাড়া রাজ-স্টেট রক্ষা করিলাম। এরূপ কাহারও হয় না; অতঃপর এরূপ যেন না হয়।

কালেক্টার সাহেব, আদালত-অবজ্ঞার দণ্ডের ভয়ে, ত্বরায় কমিসনর ও বোর্ডকে অবগত করাইয়া ও সম্মতি লইয়া, পাইকপাড়ার রাজ-স্টেট, কোর্ট অব ওয়ার্ডে লইলেন ও সুবন্দোবস্ত করিলেন। কোর্ট অব ওয়ার্ডের সুবন্দোবস্ত অনুসারে, পাইকপাড়ার রাজ-স্টেট স্বল্পদিন-মধ্যে দুশ্ছেদ্য ঋণজাল ছিন্ন করিয়া মুক্তিলাভ করিল।

নাবালক রাজপুত্রদিগকে নিয়মানুসারে ডাক্তার সি. আই. ই. বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্রের অধীনে থাকিবার আদেশ হওয়ায়, রাণী কাত্যায়নী রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার ক্রন্দন দেখিয়া, অগ্রজ মহাশয় পুনরায় বীডন সাহেবকে

অনুরোধ করায়, তাঁহার আদেশমতে নাবালকগণ বাটীতে অবস্থিতি করিয়া বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। উপরি-উক্ত বৃত্তান্তটি পূর্বে দাদার নিকট শুনিয়াছিলাম, এবং এক্ষণে প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের কুটুম্ব বাবু তারিণীচরণ ঘোষ মহাশয় ও মেট্রোপলিটন বিদ্যালয়ের অন্যতম শিক্ষক বাবু গোপীকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির প্রমুখাত অবগত হইয়াছি। এই বিষয়ে পাথেয়াদি নানা কার্যে অগ্রজ মহাশয়ের দুই সহস্র মুদ্রার অধিক ব্যয় হয়। তিনি যখন যাহার উপকারার্থে পরিশ্রম করিতেন, তদ্বিষয়ে নানাস্থানে গমন জন্য যাহা ব্যয় হইত, তাহা কাহারও নিকট কখনও গ্রহণ করেন নাই। এরূপ কার্য না করিলে, পাইকপাড়ার রাজ-স্টেটের ও রাজকুমারদিগের যে কি অবস্থা ঘটিত, তাহা পাঠকবর্গ অনুমান করিয়া লইবেন।

খৃঃ ১৮৫৯ অব্দে তিনি যখন কান্দীতে বিদ্যালয় স্থাপন-মানসে গমন করেন তৎকালে তথায় বাবু লালমোহন ঘোষের পত্নী শ্রীমতী ক্ষেত্রমণি দাসী, অগ্রজের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে সংবাদ পাঠান। তাহাতে তিনি রাজাদিগকে বলেন, 'যিনি সাক্ষাৎ করিবেন, ইনি আপনাদের কে হন?' রাজারা বলিলেন, 'এ বাটীর ভাগিনেয়-বধূ লালমোহন ঘোষের পত্নী শ্রীমতী ক্ষেত্রমণি দাসী; ইনি কলিকাতানিবাসী মৃত জগদ্দুর্লভ সিংহের কন্যা। আপনি উঁহাকে বাল্যকালে কলিকাতায় দেখিয়াছিলেন। ইনি মধ্যে মধ্যে আপনার নাম করিয়া থাকেন।' তাহা শুনিয়া দাদা বলিলেন, 'আমি উঁহার সহিত দেখা করিব কি না? তোমাদের মত কি?' রাজারা বলিলেন, 'আপনি উঁহার সহিত অবশ্য দেখা করিতে পারেন। অনন্তর সাক্ষাৎ হইলে পর, ক্ষেত্রমণি বলিলেন, 'খুড়া মহাশয়! বাল্যকালে আমার পিত্রালয়ে আপনাদের বাসা ছিল। আপনি আমাকে কোলে করিয়া মানুষ করিয়াছেন, এবং কতই স্নেহ ও যত্ন করিতেন, বোধ করি তাহা আপনি বিস্মৃত হইয়া থাকিবেন। এক্ষণে আমি কষ্টে পড়িয়াছি, আমার স্বামীর যাহা আয় আছে, তৎসমস্তই তিনি ব্রাহ্মণভোজনাদি সৎকার্যে ব্যয় করিয়া থাকেন। এক্ষণে আমাদের অনেক ঋণ হইয়াছে তজ্জন্য বিশেষ ভাবিত হইয়াছি; এ কথা অন্যের নিকট প্রকাশ করি নাই। আপনি পিতৃব্য-তুল্য, আপনি আমার ভ্রাতা, ভুবনমোহন সিংহকে মাসে মাসে ত্রিশ টাকা মাসহারা দিতেছেন, তাহাতে তাঁহার সাংসারিক কষ্ট নিবারণ করিয়াছেন।' এই সকল কথা শুনিয়া অগ্রজের চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল, এবং তিনি বলিলেন, 'আমরা তোমার পিতামহ ও তোমার পিতার কতই খাইয়াছি। বাল্যকালে তোমার জননী ও পিতৃষ্বসা রাইদিদি, আমাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিয়াছেন। তাঁহাদের যত্নেই বাল্যকালে কলিকাতায় অবস্থিতি করিতে পারিয়াছিলাম।' তদবধি তিনি ক্ষেত্রমণিকে মাসিক দশ টাকা দিতেন, এবং ঋণ পরিশোধের জন্যও তৎকালে কিছু কিছু পাঠাইয়াছিলেন।

পূর্বে পাইকপাড়ার রাজাদের সহিত যখন তাঁহার প্রথম আলাপ হয়, তৎকালে

তিনি মধ্যে মধ্যে পাইকপাড়া যাইতেন। একদিন বৈকালে গাড়ীতে যাইতেছিলেন, রাজবাটীর নিকট একজন মুদী ডাকিতে লাগিল, 'ঈশ্বর-খুড়া, এদিকে কোথায় যাইতেছ?' তাহা শুনিয়া অগ্রজ মহাশয় গাড়ী থামাইলেন। সেই দরিদ্র মুদী বলিল, 'ঈশ্বর-খুড়া ভাল আছ?' তাহাতে অগ্রজ বলিলেন, 'হাঁ রামধন খুড়া।' রামধন, দাদাকে বসিবার জন্য দূর্বাঘাসের উপর একটা চট বিছাইয়া দিলে, তিনি তাহাতে বসিয়া, একটা খেলো হুঁকায় তামাক খাইতেছেন, এমন সময়ে, রাজাদের বাটীর কয়েকটি বাবু গাড়ীতে চড়িয়া হাওয়া খাইতে যাইতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া উহারা আশ্চর্যান্বিত হইলেন যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় সামান্য একজন ইতর মুদীর দোকানের সম্মুখভাগে রাস্তার ধারে বসিয়া, উহার সহিত গল্প ও হাস্য করিতেছেন। বাবুরা বেড়াইয়া যখন প্রত্যাগমন করেন, তিনি তখনও ঐ স্থানে বসিয়া আছেন দেখিয়া, বাবুরা মুখ ফিরাইয়া বাটী আইসেন। পরে তিনি ঐ মুদীর নিকট বিদায় লইয়া রাজাদের বাটী গমন করেন। রাজবাটীর কয়েকটি বাবু তাঁহাকে বলিলেন, 'মহাশয়! সামান্য লোকের দোকানে চটের উপর বসিয়াছিলেন কেন? আপনার অপমান বোধ হয় না?' ইহা শুনিয়া অগ্রজ বলিলেন, 'তোমাদের খানকয়েক চেয়ার আছে বলিয়া কি তোমরা বড় লোক? আমি দরিদ্র-লোকের বাটীতে বসিয়া যত সুখী হই, বড়-লোকের বাটীতে বসিয়া তত তৃপ্তিলাভ করিতে পারি না। আমার সহিত তোমাদের বসিতে যদি লজ্জা হয়, তাহা হইলে আমি আর আসিব না।' তাহা শুনিয়া তাঁহারা বলিলেন, 'মহাশয় ক্ষমা করুন।' দাদা বলিলেন, 'আমার পক্ষে ধনশালী ও দরিদ্র উভয়ই সমান।'

খৃঃ ১৮৬৪ অব্দে জানুয়ারি মাসে (১ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৪) পূজ্যপাদ প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয় পেন্‌সন লইয়া কাশীযাত্রা করিবার উদ্‌যোগ পাইলে, অলঙ্কার-শাস্ত্রের পদ শূন্য হয়। তর্কবাগীশ মহাশয়ের সহোদর রামময় চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, সংস্কৃত-কলেজে কাব্য, অলঙ্কার, জ্যোতিষ, স্মৃতি ও দর্শনের কিয়দংশ অধ্যয়ন করিয়া, সংস্কৃত-কলেজের উচ্চশ্রেণীর বৃত্তি প্রাপ্ত হন। রামময় চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, তৎকালে কাব্যে ও অলঙ্কারে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন; আর সংস্কৃত গদ্য-পদ্য-রচনায় তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তর্কবাগীশ মহাশয় ও অন্যান্য লোকে মনে করিয়াছিলেন যে, রামময়ই তাঁহার ভ্রাতার পদ পাইবার উপযুক্ত। কিন্তু এ পক্ষে মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ও ঐ পদ প্রাপ্তাভিলাষে আবেদন করেন। তৎকালে ন্যায়রত্ন, ষড়দর্শনে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। যদিও ইনিও সংস্কৃত-কলেজের ছাত্র নহেন, তথাপি কাব্য ও অলঙ্কারে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। একটি পদ শূন্য, কিন্তু উক্ত পণ্ডিত দুইজনেই পদপ্রার্থী। কাউএল সাহেব, কাহাকে ঐ পদে নিযুক্ত করিবেন, ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করেন যে, একটি পদ শূন্য আছে, উক্ত দুই পণ্ডিতের মধ্যে কে ঐ পদের উপযুক্ত লোক, তাহা নির্বাচন করিয়া দেন।

আমি কাহাকে ঐ পদ দিব, স্থির করিতে পারি নাই। তৎকালে ভাগ্যদেবী মহেশ ন্যায়রত্নের পক্ষে অনুকূল থাকায়, দাদা বলিলেন, 'অলঙ্কার-শ্রেণীতে কাব্য-প্রকাশ পড়াইতে হইলে, ন্যায় ভাল জানা আবশ্যক। মহেশ ন্যায়রত্ন রীতিমত অধ্যয়ন করিয়া, বিশেষরূপ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন। অতএব আমার মতে ন্যায়রত্ন ঐ কার্য পাইবার উপযুক্ত পাত্র।' কাউএল সাহেব, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথায়, ন্যায়রত্ন মহাশয়েব নামে রিপোর্ট করিয়া, ঐ পদে ন্যায়রত্ন মহাশয়কে (২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৬৪) নিযুক্ত করেন। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের উন্নতির মূল বিদ্যাসাগর মহাশয়। এই বৃত্তান্তটি কাশীতে জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয় ও প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহাশয়ের প্রমুখাৎ শুনিয়াছিলাম।

হোমিওপ্যাথি

বহুবাজার মলঙ্গানিবাসী দেশহিতৈষী সম্ভ্রান্তবংশোদ্ভব বাবু রাজেন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সহিত, অগ্রজ মহাশয়ের অত্যন্ত প্রণয় ছিল। এক দিবস উভয়ে কথোপকথন করিয়া স্থির করিলেন যে, ডাক্তার বেরিনি সাহেব কলিকাতায় আসিয়া, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা-ব্যবসায়ের চেষ্টা করিয়া, কৃতকার্য হইতে পারিতেছেন না। অতএব এ বিষয়ে উপেক্ষা না করিয়া, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা কিরূপ, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। কিয়ৎক্ষণ পরে দাদা বলিলেন, 'রাজেন্দ্র। তুমি এক্ষণে বিষয়কর্ম হইতে অবসর পাইয়াছ, অতএব তোমারই এবিষয়ে পরীক্ষা করা উচিত।' এইরূপ কথাবার্তার পর, রাজেন্দ্রবাবু, বেরিনি সাহেবের সহিত কথাবার্তা কহিয়া, তাঁহার উপদেশানুসারে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা অল্পদিনের মধ্যেই শিক্ষা করিলেন। প্রথমত রাজেন্দ্রবাবু মলঙ্গার নিজ বাটীতেই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন এবং কলিকাতা শহরে ও উপনগরসমূহে চিকিৎসার উদ্যোগ করিয়া কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। অনেকে বলিতে লাগিল, 'যদি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ভাল এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় আপনার পরমবন্ধু, তবে তাঁহাকে অগ্রে কেন না চিকিৎসা করেন?' এইরূপ নানা প্রকার যুক্তিযুক্ত বাদানুবাদের পর, রাজেন্দ্রবাবু, দাদার চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। কয়েক দিবসের পর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শিরঃপীড়া প্রভৃতি রোগের উপশম হইল। রাজেন্দ্রবাবু, অগ্রজ মহাশয়ের পরমবন্ধু রাজকৃষ্ণবাবুকে মলকণ্টকপীড়ায় কয়েক দিন ঔষধ সেবন করাইয়া ভাল করেন। ইহা দেখিয়া, অনেকেই রাজেন্দ্রবাবুর ঔষধ সেবন করিতে লাগিল। সৌভাগ্যক্রমে রাজেন্দ্রবাবু অনেক উৎকট ও অসাধ্য রোগ আরোগ্য করিতে লাগিলেন। অগ্রজও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শিক্ষা করিয়া, চিকিৎসা

আরম্ভ করিলেন এবং অনেক অনুগত ব্যক্তিদিগকে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা-ব্যবসায়ী করিবার জন্য, রাজেন্দ্রবাবুর নিকট পাঠাইতে লাগিলেন। ঐ সকল ব্যক্তিরা রাজেন্দ্রবাবুর দাতব্য-চিকিৎসালয়ে ভালরূপ শিক্ষা করিয়া, চতুর্দিকে গমন করিয়া, চিকিৎসা-ব্যবসা করিয়া উন্নতি লাভ করিয়াছেন। অগ্রজ মহাশয়, মধ্যম সহোদর দীনবন্ধু ন্যায়রত্নকে পুস্তক ও ঔষধের বাক্স দিয়া, বীরসিংহায় যাইয়া দেশেব লোককে চিকিৎসা করিতে বলেন। তিনি দেশে যাইয়া, অনন্যকর্মা ও অনন্যমনা হইয়া, চিকিৎসা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং কতকগুলি লোককে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। অদ্যাপি ইঁহার অনেক ছাত্র নানা স্থানে অবস্থিতি করিয়া চিকিৎসা করিতেছেন।

বাবু লোকনাথ মৈত্র, পূর্বে সামান্য বেতনে রাইটারি কর্ম করিতেন। তিনিও দুর্ঘটনাপ্রযুক্ত দাদার সাহায্যে রাজেন্দ্রবাবুব নিকট হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শিক্ষা করিলে পর, অগ্রজ মহাশয় পত্র লিখিয়া কাশীতে রাজা দেবনারায়ণ সিংহের নিকট পাঠাইয়া দেন। তথায় লোকনাথবাবু বিলক্ষণ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। একসময়ে কাশীর ম্যাজিস্ট্রেট আয়রন-সাইড মহোদয়ের পত্নীর অসাধ্য পীড়া হইয়াছিল। নানারূপ চিকিৎসার পর, পরিশেষে লোকনাথবাবুব হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ কবেন। তজ্জন্য লোকনাথবাবু, ঐ সাহেবের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন এবং সাহেব চাঁদা সংগ্রহ করিয়া, একটি দাতব্য হোমিওপ্যাথি চিকিৎসালয় স্থাপন কবিয়া, উক্ত লোকনাথবাবুকে চিকিৎসক নিযুক্ত করেন। পরে কাশীতে লোকনাথবাবুব নিকট অনেকেই চিকিৎসা শিক্ষা করিয়া, নানাস্থানে যাইয়া চিকিৎসা-ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন।

সুপ্রসিদ্ধ সি. আই. ই. ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়ের প্রথমে হোমিও-প্যাথি চিকিৎসায় আস্থা ছিল না। কিন্তু উক্ত মহেন্দ্রবাবু মধ্যে মধ্যে ভাবিতেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় ভারতে অদ্বিতীয় ব্যক্তি হইয়াও হোমিওপ্যাথির এত গোঁড়া কেন? এক দিবস অগ্রজের সহিত অনেক বাদানুবাদের পর, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা কিরূপ, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহার নিকট স্বীকার করেন। এক দিবস মহেন্দ্রবাবু ও দাদা ভবানীপুরে অনারেলবাবু দ্বারকানাথ মিত্র মহোদয়কে দেখিতে গিয়াছিলেন। তথা হইতে উভয়ে বাটী আসিবার সময় এক শকটে আইসেন। আমিও উঁহাদের সমভিব্যাহারে ছিলাম। গাড়ীতে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা-উপলক্ষে ভয়ানক বাদানুবাদ হইতে লাগিল; দেখিয়া শুনিয়া আমি বলিলাম, 'মহাশয়! আমাকে নামাইয়া দেন। আপনাদের বিবাদে আমার কর্ণে তালা লাগিল।' পরিশেষে উঁহাদের স্থির হইল যে, মহেন্দ্রবাবু পরীক্ষা না করিয়া, কথায় বিশ্বাস করিবেন না। অনন্তর মহেন্দ্রবাবু, দিন কয়েক পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, বর্তমান যাবতীয় চিকিৎসা-প্রণালীর মধ্যে হোমিওপ্যাথি-চিকিৎসা উৎকৃষ্ট; এই বিবেচনায় মহেন্দ্রবাবু এলোপ্যাথি চিকিৎসা পরিত্যাগ

করিয়া, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করেন। কলিকাতার মধ্যে মহেন্দ্রবাবুই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় সর্বাপেক্ষা প্রতিপত্তি ও সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়, প্রতি বৎসর থ্যাকার কোম্পানির দ্বারা অর্ডার দিয়া, বিলাত হইতে অনেক টাকার হোমিওপ্যাথিক পুস্তক আনাইয়া প্রচারজন্য অনেককে বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছেন। খৃঃ ১৮৭৭ অব্দ হইতে প্রতি বৎসর প্রায় দুই শত টাকার ঔষধ ও পুস্তক লইয়া বিতরণ করিতেন। অনেক আত্মীয় ব্যক্তি, যাহারা এলোপ্যাথির গোঁড়া ছিল এবং যাহাদের হোমিওপ্যাথিতে আস্থা ছিল না, হোমিওপ্যাথির উৎকর্ষ জানাইবার জন্য, তিনি বেঙ্গল হোমিওপ্যাথি ডিস্পেন্সারির স্বামী, তাঁহার আত্মীয়, বাবু লালবিহারী মিত্র মহাশয়ের নিকট হইতে উক্ত চিকিৎসা শিক্ষা ও পরীক্ষা করিতে দিতেন। তাঁহার এত সহ্যগুণ ছিল যে, এক দিবস উক্ত লালবিহারীবাবুর ডিস্পেন্সারিতে আলমারি হইতে একটি লৌহের কর্ক প্রেসার তাঁহার পায়ের বৃদ্ধ অঙ্গুলির উপর পতিত হয়; তাহাতে এত গুরুতর আঘাত লাগিয়াছিল যে, তাঁহাকে প্রায় মাসাবধি শয্যাগত থাকিতে হয়, কিন্তু আঘাত লাগিবার সময় পাছে লালবিহারীবাবুর মনে দুঃখ হয়, একারণ, তিনি মুখের বিকৃত ভাব প্রকাশ করেন নাই। সহজভাবে পুস্তকাদি দেখিয়া, বাটীতে প্রত্যাগমন করেন। মৃত্যুর পূর্বে এই লালবিহারীবাবুকে শেষ পত্র লিখিয়াছিলেন। হোমিওপ্যাথি পুস্তক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লাইব্রেরীতে যেরূপ দৃষ্ট হয়, এরূপ অপরের পুস্তকালয়ে দৃষ্ট হয় না; পূর্বে বেরিনি কোম্পানি ও অন্যান্য স্থান হইতে হোমিওপ্যাথি পুস্তক লইতেন। যে অবধি লালবিহারী বাবুর সহিত পরিচয় হয়, সেই অবধি অপর স্থানে লইতেন না।

দুর্ভিক্ষ

সন ১২৭২ সালে এ প্রদেশে অনাবৃষ্টি প্রযুক্ত কিছুমাত্র ধান্যাদি শস্য উৎপন্ন হয় নাই; সুতরাং সাধারণ লোকের দিনপাত হওয়া দুষ্কর হয়। ঐ সালের পৌষ-মাসে কোন কোন কৃষক যৎসামান্য ধান্য পাইয়াছিল তাহাও প্রায় মহাজনগণ আদায় করেন। কৃষকদের বাটীতে কিছুমাত্র ধান্য ছিল না। দুঃসময় দেখিয়া ভদ্রলোকেরা, ইতর লোককে কোন কোনও কাজকর্ম করান নাই; সুতরাং যাহারা নিত্য মজুরি করিয়া দিনপাত করিত তাহাদের দিনপাত হওয়া কঠিন হইল। জাহানাবাদ-মহকুমার অন্তঃপাতী ক্ষীরপাই, রাধানগর, চন্দ্রকোণা প্রভৃতি গ্রামে অধিকাংশ তাঁতির বাস। তাঁতিরা বস্ত্র-বয়ন ব্যতীত অন্য কোন কার্য করিতে

অক্ষম। সুতরাং যে অবধি বিলাতি কলের কাপড় হইয়াছে, তদবধি তন্তুবায়গণের অবস্থা ক্রমশ হ্রাস হইয়া আসিতেছিল। যেরূপ কাপড় ইহারা দুই টাকা চারি আনা জোড়া বিক্রয় করিত, সেইরূপ কলের কাপড় একটাকা আট আনা বা এক টাকা বার আনা জোড়া বিক্রয় হইতেছিল; সুতরাং তৎকালে ইহাদের বস্ত্র বিক্রয় হইত না। ঐ সময়ে টাকায় পাঁচ সের চাউল বিক্রয় হইত, তাহাও সকল সময়ে দুষ্প্রাপ্য। মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র এই তিনমাস অনেকেই ঘটী-বাটী ও অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া, কথঞ্চিৎ প্রাণধারণ করে; পরে চাউল-ক্রয়ে অপারক হইয়া, কেহ কেহ বুনো-ওল ও কচু খাইয়া দিনপাত করে এবং নানাপ্রকার কষ্টভোগ করিয়া, অনাহাবে অকালে কালগ্রাসে নিপতিত হয়। শত শত ব্যক্তি সমস্ত দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া, পেটের জ্বালায় কলিকাতায় প্রস্থান করে, ও তথায় পথে পথে ভিক্ষা করিয়া উদরপূর্তি করিত। ১২৭৩ সালের বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে এ প্রদেশের অর্থাৎ জাহানাবাদ মহকুমার প্রায় অশীতিসহস্র লোক অন্নাভাবপ্রযুক্ত কলিকাতায় যাইয়া, তথাকার অন্নসত্রে ভোজন করিত। তৎকালে কেহ জাতির বিচার করে নাই। জননী সন্তানকে পথে ফেলিয়া দিয়া, কলিকাতা প্রস্থান করেন। অনেক কুলকামিনী, জাত্যভিমান জলাঞ্জলি দিয়া জাত্যন্তরিতা হয়। চতুর্দিকেই হাহাকার শব্দ, কেহ কাহারও প্রতি দয়া করে নাই, সকলেই অন্নচিন্তায় ব্যাকুল হইয়াছিল।

আমাদের বীরসিংহাবাসী অধিকাংশ লোক প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি দশটা পর্যন্ত আমাদের দ্বারে দণ্ডায়মান থাকিত। তাহাদিগকে ভোজন না করাইয়া, আমরা ভোজন করিতে পারিতাম না। কোনও কোনও দিন রাত্রিতেও সন্নিহিত গ্রামের ভদ্রলোকগণ উদরের জ্বালায়, দ্বারে দ্বারে উপস্থিত হইয়া চীৎকার করিত, তাহাদিগকে খাইতে না দিলে, সমস্ত রাত্রি চীৎকার করিত। এইরূপ বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় মাসে, কোনদিন সত্তর, কোনদিন আশী জন লোক ক্ষুধায় প্রপীড়িত হইয়া চীৎকার করিত। এই সকল সংবাদ কলিকাতায় অগ্রজ মহাশয়কে লেখা হয়; তিনি উত্তর লিখেন যে, 'স্বগ্রাম বীরসিংহা ও উহার সন্নিহিত পাঁচ ছয়টি গ্রামের দরিদ্রগণকে প্রত্যহ ভোজন করাইতে পারিব। অন্যান্য গ্রামের লোককে কেমন করিয়া খাওয়াইতে পারি। যেহেতু আমি ধনশালী লোক নহি। অপরাপর গ্রামেব দরিদ্রদিগকে প্রত্যহ ভোজন করাইতে হইলে, অনেক ব্যয় হইবে। এমন-স্থলে জাহানাবাদের ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মিত্রকে আমার নাম করিয়া বলিবে যে, তিনি জাহানাবাদ মহকুমার দুর্ভিক্ষের কথা গবর্নমেণ্টে রিপোর্ট করিলে, আমি এখানে লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর সিসিল বীডনকে বলিয়া, সাহায্য করাইতে পারিব।' অগ্রজ মহাশয়ের আদেশ-পত্রানুসারে জাহানাবাদের ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মিত্রকে বিশেষ বলায়, তিনি মধ্যমাগ্রজ দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন সহ ঘাঁটাল, ক্ষীরপাই, রাধানগর, চন্দ্রকোণা, রামজীবনপুর প্রভৃতি গ্রাম সকল ভ্রমণ ও

পর্যবেক্ষণ করিয়া প্রজাগণের দুরবস্থার বৃত্তান্ত রিপোর্ট করেন। তথায় অগ্রজ, বীডন সাহেব ও অন্যান্য সাহেবকে অনুরোধ করায়, লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর বীডন সাহেব, গ্রামে গ্রামে অন্নসত্র স্থাপনজন্য ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট বাবুকে আদেশ করেন। বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র ক্ষীরপাই, চন্দ্রকোণা, রামজীবনপুর, শ্যামবাজার, জাহানাবাদ, খানাকুল প্রভৃতি কয়েকটি বিখ্যাত ও বহুজনাকীর্ণ গ্রামে গবর্নমেণ্টের অন্নসত্র স্থাপন করেন। কার্যদক্ষ বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র মহাশয়, অনন্যকর্মা ও অনন্যমনা হইয়া, এ প্রদেশের সম্ভ্রান্ত লোকের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণপূর্বক যথেষ্ট টাকা সংগ্রহ করিয়া, উক্ত অন্নসত্রের সাহায্যার্থ প্রদান করেন, এবং স্থানীয় সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে ঐ অন্নসত্রের তত্ত্বাবধায়ক করেন। প্রত্যহ উক্ত অন্নসত্রে সকলে স্থানীয় অভুক্ত দরিদ্রসমূহ ভোজন করিয়া প্রাণধারণ করিতে লাগিল। শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক ও অগ্রহায়ণ পর্যন্ত গবর্নমেণ্টের অন্নসত্রের কার্য চলিল। ইহাতে দরিদ্রলোকেরা ভোজন করিয়া প্রাণরক্ষা করিল। যাহারা পেটের জ্বালায় দেশ ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় প্রস্থান করিয়াছিল, তাহাদিগকে গবর্নমেণ্ট পথখরচাদি প্রদানপূর্বক দেশে পাঠাইয়া দেন।

অগ্রজ মহাশয়, নিজ জন্মভূমি বীরসিংহা ও তৎসংলগ্ন পাথরা, কেঁচে, অর্জুন-আড়ী, বুয়ালিয়া, কৌমারসা, রাধানগর, উদয়গঞ্জ, কুরাণ, মামুদপুর প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রামবাসী নিরুপায় লোকের প্রতি দয়া করিয়া, বীরসিংহার অন্নসত্র স্থাপন করেন। প্রথমে কাষ্ঠ-সংগ্রহের এই বন্দোবস্ত হয় যে, তিনজন করাতি প্রত্যহ তেঁতুল গাছ ক্রয় করিয়া ছেদন করিবে ও বার জন মজুর কাষ্ঠ চেলাইবে। বার জন ব্রাহ্মণ প্রাতঃকাল হইতে ক্রমিক খেচরান্ন পাক করিবে; কুড়ি জন স্কুলের ছাত্র ও স্থানীয় ভদ্রলোক পরিবেষন করিবে। দুইজন ভদ্রলোক ও দুইজন দ্বারবান প্রত্যহ ঘাঁটাল হইতে চাউল, ডাউল, লবণ ক্রয় করিয়া আনয়নজন্য নিযুক্ত হইল। অর্ধমণ চাউল-ডাউলের খেচরান্ন পাক হইতে পারে, এরূপ চারিটি বড় পিতলের হাঁড়া রাধানগরের চৌধুরী বাবুদের বাটী হইতে আনীত হয়, এবং কলিকাতা হইতেও বড় বড় কটাহ ও পিতলের হাঁড়ী আনীত হইয়াছিল। বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ও শ্রাবণ মাস পর্যন্ত যাহারা নিজবাটীতে ভোজন করিত, অতঃপর তাহাদিগকে বাটীতে ভোজ্যদ্রব্য না দিয়া, অন্নসত্রে ভোজনের আদেশ দেওয়া হইল। প্রথমত, গ্রামস্থ লোকদিগের ভোজন করিবার এই ব্যবস্থা হয় যে, যে ভদ্রলোক অন্নসত্রে ভোজন করিতে কুণ্ঠিত হইবেন, তাঁহারা লোকসংখ্যা হিসাবে সিদা পাইবেন। অগ্রজ মহাশয়, স্বয়ং এরূপ সিদার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া, কলিকাতা প্রস্থান করেন। শ্রাবণমাসে যৎকালে স্বতন্ত্র বাটীতে অন্নসত্র স্থাপিত হয়, ঐ সময়ে গ্রামস্থ লোকই ভোজন করিতে পায়। ভাদ্রমাস হইতে রাধানগর, কেঁচে, অর্জুন-আড়ী, কৌমারসা প্রভৃতি চতুর্দিকের লোক আসিয়া ভোজন করায়, ক্রমশ লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এই সমাচার কলিকাতায় অগ্রজ মহাশয়কে

বিস্তারিতরূপে লেখা হয়, তদুত্তরে তিনি লিখেন, ‘অভুক্ত যত লোক আসিবে, সকলকেই সমাদরপূর্বক ভোজন করাইবে; কেহ যেন অভুক্ত ফিবিয়া না যায়। ত্বরায় টাকা পাঠাইতেছি এবং আমিও সত্বর বাটী যাইতেছি।’ যে কয়েক মাস দেশে অন্নসত্র ছিল, সেই সময়ে তিনি মাসে প্রায় একবার করিয়া বাটী আগমন করিতেন।

অনেক নিরুপায় দরিদ্র লোক, ছোট ছোট বালকবালিকাগণকে ঐ অন্নসত্রে ফেলিয়া, স্থানান্তরে প্রস্থান করে। ঐ বালকবালিকাগণের রক্ষণাবেক্ষণজন্য কয়েক-জন লোক নিযুক্ত করা হয়। দশ মাসের গর্ভবতী কয়েকটি স্ত্রীলোক প্রত্যহ ভোজন করিত। অনেকের অনুরোধে পড়িয়া, উহাদের সাধ দেওয়া হয়। ঐ সাধ-ভক্ষণ-দিবস অন্নসত্রের সকলকেই দধি, মৎস্য, পায়স, মিষ্টান্ন প্রভৃতি ভোজন করান হয়। প্রসবের পর ঐ নবপ্রসূত সন্তানের দুগ্ধ ও প্রসূতিদের পথ্যের ব্যবস্থা হয়। কিছু দিনের পর, ঐ প্রসূতিদের মধ্যে একটি মৃত্যুমুখে নিপতিত হইলে, উহার ছেলের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য লোক নিযুক্ত হয়। ঐ সন্তানের ক্রমিক সতের বৎসর বয়ঃক্রম পর্যন্ত সমস্ত ব্যয় নির্বাহ করা হইয়াছিল। বিদেশীয় কয়েকজন লোক ভোজন করিতে করিতে অন্নসত্রে প্রাণত্যাগ করে, কিন্তু এক পঙ্‌ক্তিতে উভয় পার্শ্বের লোক মৃতদেহ প্রত্যক্ষ অবলোকন করিয়াও, কেহ ঘৃণা বা অশ্রদ্ধা করিয়া ভোজন করিতে ক্ষান্ত হয় নাই। ত্বরায় ঐ মৃতদেহ অপসারিত করা হইল। অন্নসত্র খুলিবার প্রথমাবস্থায় দেখা গিয়াছে যে, কেহ কেহ স্বীয় প্রাণসম সন্তানগণের হস্ত-ধারণ-পূর্বক, স্বয়ং সমস্ত খাইয়া ফেলিত; তৎকালে কেহ কাহারও প্রতি স্নেহ-মমতা করিত না, সকলেই সতত স্বীয় স্বীয় উদরের জ্বালায় বিব্রত ছিল। কিছুদিন পরে ঐ ভাব তিরোহিত হইয়াছিল। অন্নসত্রে ভোজনকারিণী স্ত্রীলোকদের মস্তকের কেশগুলি তৈলাভাবে বিরূপ দেখাইত। অগ্রজ মহাশয় তাহা অবলোকন করিয়া, দুঃখিত হইয়া তৈলের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, প্রত্যেককে দুই পলা করিয়া তৈল দেওয়া হইত। যাহারা তৈল বিতরণ করিত, তাহারা, পাছে মুচি, হাড়ী, ডোম প্রভৃতি অপকৃষ্ট জাতীয় স্ত্রীলোককে স্পর্শ করে, এই আশঙ্কায় তফাত হইতে তৈল দিত। ইহা দেখিয়া, অগ্রজ মহাশয় স্বয়ং উক্ত অপকৃষ্ট ও অস্পৃশ্য জাতীয় স্ত্রীলোকের মস্তকে তৈল মাখাইয়া দিতেন। নীচবংশোদ্ভবা স্ত্রীজাতির প্রতি অগ্রজের এরূপ দয়া দেখিয়া, তাহারা পরম আহ্লাদিতা হইয়াছিল এবং কর্মচারিগণ তাঁহার এরূপ দয়া অবলোকনে, তদবধি উহাদিগকে স্পর্শ করিতে ঘৃণা পরিত্যাগ করিল। পরিবেষনের সময়, দাদা স্বয়ং পরিবেষন কার্যে প্রবৃত্ত হইতেন দেখিয়া, উপস্থিত ভদ্র লোকেরাও পরিবেষন করিতেন।

অন্নসত্রে যাহারা ভোজন করিত, তাহারা অগ্রজের নিকট প্রকাশ করিয়া বলে, ‘মহাশয়! প্রত্যহ খেচরান্ন খাইতে অরুচি হয়, সপ্তাহের মধ্যে একদিন অন্ন ও মৎস্য হইলে আমাদের পক্ষে ভাল হয়।’ একারণ, প্রতি সপ্তাহে এক দিন অন্ন, পোনা

মৎস্যের ঝোল ও দধি হইত। ইহাতে ব্যয়বাহুল্য হওয়ায়, দাদা, অকাতরে যথেষ্ট টাকা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। পূর্বে দেশস্থ লোক মনে করিত যে, বিদ্যাসাগর বিদ্যোৎসাহী; একারণ, দরিদ্র বালকদের জন্য অবৈতনিক বিদ্যালয়, বালিকাবিদ্যালয় ও রাখাল-স্কুল স্থাপন করিয়াছেন, এবং দরিদ্রবর্গের রোগোপশমের জন্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু তিনি দরিদ্রগণের প্রতি এতদূর দয়ালু ছিলেন, তাহা কেহই জানিত না। এই অবধি সকলে তাঁহাকে বলিত যে, ইনি দয়াময় দয়ার সাগর। নীচজাতীয় স্ত্রীলোকদের মাথায় স্বয়ং তৈল মাখাইয়া দেন, ইনি তো মানুষ নন—সাক্ষাৎ ঈশ্বর। তৎকালে এদেশে সকলেই এই কথার আন্দোলন করিতে লাগিল।

গবর্নমেণ্টের অন্নসত্রে দরিদ্রদিগকে কর্ম করাইয়া খাইতে দিত; এজন্য কতকগুলি লোক কর্ম করিবার ভয়ে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অন্নসত্রে ভোজন করিতে আসিত; তজ্জন্য ক্রমশ লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এখানে পীড়িতদিগের চিকিৎসা হইত, এবং রোগিগণের পথ্যের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা ছিল। গ্রামস্থ সভ্যলোকের মধ্যে যাহাদের অবস্থা অতি মন্দ, তাহাদিগকে প্রত্যহ প্রাতে বেলা নয় ঘটিকা পর্যন্ত সিদা দেওয়া হইত। এতদ্ব্যতীত প্রায় কুড়িটি পরিবার প্রত্যহ সিদা লইতে লজ্জিত হইতেন; তন্নিমিত্ত তাহাদিগকে গোপনে নগদ টাকা দেওয়া হইত। খাতায় নাম লেখা ব্যতীত আরও পঁচিশ ছাব্বিশটি গৃহস্থ, রাত্রিতে গোপনে চাউল, ডাউল ও লবণ লইয়া যাইত। অগ্রজ মহাশয়, খাতায় উঁহাদের নাম লিখিতে নিবারণ করিয়া দেন। যে যে ভদ্র-পরিবারের বস্ত্র ছিল না, তাহারা প্রকাশ্যে বস্ত্র লইতে লজ্জিত হইবে, একারণ, প্রায় দুই সহস্র টাকার বস্ত্র গোপনে বিতরণ করেন। সন্ধ্যার পর অগ্রজ মহাশয়, স্বয়ং বগলে বস্ত্রগ্রহণ-পূর্বক মোটাচাদর গাত্রে দিয়া, বস্ত্র বিতরণ করিবার জন্য অনেক পরিবারের বাটীতে গমন করিতেন এবং বলিতেন, 'ইহা কাহারও নিকট ব্যক্ত করিবার আবশ্যক নাই।' তিনি ভদ্রলোককে অতি গোপনে দান করিতেন।

ইতিমধ্যে গড়বেতার অন্নসত্রের কর্মাধ্যক্ষ বাবু হেমচন্দ্র কর ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ সাহায্য-প্রার্থনায় অগ্রজ মহাশয়কে পত্র লেখায়, অগ্রজ মহাশয় আমার দ্বারা দরিদ্রভোজনের জন্য পঞ্চাশ টাকা আর উহাদের বস্ত্রের জন্য পঞ্চাশ টাকা একুনে একশত টাকা প্রেরণ করেন। এতদ্ব্যতীত ঐ সময় কোন কোন ভদ্রলোক পিতৃহীন অবস্থায় যাচ্ঞা করিতে আইসেন, তাহাদের মধ্যে কাহাকে পঞ্চাশ টাকা, কাহাকেও একশত টাকা, কাহাকেও দুইশত টাকা দান করেন। ২৮শে শ্রাবণ পৃথক বাটীতে অন্নসত্র স্থাপিত হয়, ১লা পৌষ ভোজনের পর অন্নসত্র বন্ধ করা হইয়াছিল। কিন্তু বিদেশীয় নিরুপায়গণ ৮ই পৌষ পর্যন্ত অন্নসত্রগৃহে উপস্থিত ছিল; একারণ, দুর্বল নিরুপায় প্রায় ষাট জনকে কয়েক দিন ভোজন করাইতে হইয়াছিল। অন্নসত্র শেষ হইলে কর্মচারী, পরিচারক, পরিচারিকা ও দ্বারবান প্রভৃতি সকলকে

রীতিমত বেতন দেওয়া হইয়াছিল। ভালরূপ পরিশ্রম করায়, তাহাদিগকে পুরস্কারও দেওয়া হয়। বিদ্যালয়ে যে সকল ব্রাহ্মণের বালক পরিবেষ্টা ছিল, তন্মধ্যে যাহারা নিতান্ত দরিদ্র, তাহাদিগকেও সন্তুষ্ট করিতে ক্ষান্ত হন নাই।

বিবিধ

যৎকালে অগ্রজ মহাশয় সংস্কৃত-কলেজের প্রিন্সিপাল-পদে নিযুক্ত ছিলেন, তৎকালে নানাকারণে ষোল দিন রাত্রিতে নিদ্রা হয় নাই, সমস্ত রাত্রি ছাদে বেড়াইতেন। তাঁহার পরমবন্ধু বাবু দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, অনেক এ্যালোপাথি ঔষধ সেবন করান, তথাপি নিদ্রা হইল না। অবশেষে অগ্রজের পরমবন্ধু, তৎকালের কবিরাজশ্রেষ্ঠ হারাধন বিদ্যারত্ন কবিরাজ মহাশয় মধ্যম-নারায়ণ তৈল ও ঔষধের ব্যবস্থা করেন এবং প্রায় দুই ঘণ্টা কাল তৈল মর্দন করাইবে এইরূপ বলিয়া দেন। দুই তিন দিন তৈল মাখাইলে পর, এক দিন তৈল মাখাইয়া গাত্র দলন করিতেছে, অমনি নিদ্রাকর্ষণ হইল; তজ্জন্য তিনি হারাধন কবিরাজ মহাশয়কে আন্তরিক ভক্তি করিতেন। অন্যান্য আত্মীয়লোকের পীড়া হইলে, উক্ত কবিরাজ মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করিতেন। যে সকল লোককে কবিরাজ মহাশয়ের নিকট পাঠাইতেন, তিনিও সেই সকল লোককে বিনা ভিজিটে দেখিতেন এবং বহুমূল্য ঔষধও প্রদান করিতেন। সন ১২৭২ সালে একবার উদরাময়ে ও উদরের বেদনায় কষ্ট পান; একারণ, কবিরাজ মহাশয় আদেশ করেন যে, যবের গাছ পোড়াইয়া এক বস্তা ছাই প্রেরণ করিলে, তাহা হইতে লবণ বাহির করিব; সেই লবণে যে ঔষধ প্রস্তুত হইবে, তাহাতে উপকার দর্শিবে। একারণ, দেশ হইতে যবের ভস্ম আনাইয়া দেওয়া হয়; তদ্দ্বারা যে ঔষধ প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা সেবনে তৎকালে উদরের পীড়ার অনেক লাঘব হয়।

রাজা দিনকর রাও কলিকাতায় আসিলে, অগ্রজ মহাশয় তাঁহাকে বেথুন সাহেবের স্থাপিত বালিকাবিদ্যালয় দেখাইতে লইয়া যান। তিনি দেখিয়া তুষ্ট হইয়া, বালিকাগণকে মিষ্টান্ন খাইতে তিনশত টাকা দেন। তৎকালে সার সিসিল বীডন সাহেব মহোদয় বলেন, অত টাকার মিষ্টান্ন খাইলে ইহাদের উদরাময় হইবে। তজ্জন্য অগ্রজ মহাশয়, ঐ টাকায় সকল বালিকাকে ঢাকাই সাড়ী ক্রয় করিয়া দেন। দুইখানি বস্ত্র অধিক হইল দেখিয়া, তিনি দুই পণ্ডিতকে প্রদান করেন। ঐ সময়ে দিনকর রাও, অগ্রজকে জিজ্ঞাসা করেন, 'এই বাটী প্রস্তুতের জন্য কে টাকা দেন ও এই ভূমিই বা কাহার দত্ত?' তাহা শুনিয়া দাদা বলিলেন, 'দেশহিতৈষী বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই ভূমি দান করিয়াছেন। তৎকালে এই ভূমির

মূল্য চৌদ্দ হাজার টাকা স্থির করিয়াছিল; একারণ, আমরা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের নাম বিস্মৃত হইতে পারিব না। আর মহামতি বেথুন সাহেব, এই বাটী নির্মাণের জন্য টাকা দিয়াছেন। তিনি এই টাকা দিবার সময় ও অন্যান্য স্থলে বলিতেন যে, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল।' ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করায় বলেন, 'যৎকালে গবর্নমেণ্ট ভারতবর্ষ হইতে সহমরণ-কুপ্রথা নিবারণের চেষ্টা করেন, তৎকালে বেথুন সাহেব, হিন্দুদের পক্ষাবলম্বন করিয়া অনেক প্রতিবাদ করেন। ঐ পাপের প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ এই বাটী নির্মাণ ও বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করেন।' উত্তরপশ্চিম প্রদেশের সম্ভ্রান্ত লোক ও রাজারা কলিকাতায় আগমন করিলে, অগ্রজ মহাশয় ঐ সকল ব্যক্তিকে বালিকাবিদ্যালয় দেখাইবার জন্য যত্ন পাইতেন। তাঁহার উদ্দেশ্য এই যে, তাঁহারা স্বদেশে যাইয়া বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করিবেন। এই বৃত্তান্তটি বেথুন বালিকাবিদ্যালয়ের পণ্ডিত মাখনলাল ভট্টাচার্য মহাশয়ের প্রমুখাৎ অবগত হইয়াছি।

সন ১২৭৩ সালের পৌষ মাস হইতে কয়েক মাস অগ্রজ মহাশয় অত্যন্ত অসুস্থ হইয়াছিলেন। তজ্জন্য পিতৃদেবকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইয়াও যাইতে অক্ষম হয়েন। অতএব আমাকে পিতৃদেবের নিকট যাইবার আদেশ করেন, এবং বলিয়া দেন যে, যদি তথায় তোমার অবস্থিতি করা আবশ্যক হয়, তাহা হইলে তাঁহার নিকট থাকিবে। ফলত, পিতৃদেব যেরূপ আদেশ করিবেন, তাহাই করিবে। অগ্রজের আদেশানুসারে আমায় কাশী যাইতে হইল। কয়েক দিন তথায় অবস্থিতি করিলে, তিনি আদেশ করেন যে, আমি যখন দুর্বল ও অসমর্থ হইব, তৎকালে তোমাদের মধ্যে কেহ নিকটে থাকিবে; সম্প্রতি এখানে তোমাদের কাহারও অবস্থিতি করিবার আবশ্যক নাই; সুতরাং আমাকে দেশে ফিরিয়া আসিতে হইল। বৃদ্ধ পিতৃদেবকে কাশী পাঠাইবার পর অবধি, অগ্রজের অত্যন্ত দুর্ভাবনা উপস্থিত হয়। তৎকালে তিনি সর্বদাই অন্যমনস্ক থাকিতেন এবং মধ্যে মধ্যে পিতৃদেবের জন্য অশ্রু বিসর্জন করিতেন। দুর্ভাবনায় রাত্রিতে তাঁহার নিদ্রা হইত না। এই সকল কারণে তাঁহার পীড়া আরও প্রবল হইয়াছিল।

সন ১২৭৪ সালের বৈশাখ মাসে অগ্রজ মহাশয়, কায়িক অত্যন্ত অসুস্থতা-প্রযুক্ত, চিকিৎসকদের উপদেশানুসারে জলবায়ু পরিবর্তনমানসে বীরসিংহায় আগমন করেন। তৎকালে একটি বিধবা নারী সাংসারিক ক্লেশ-নিবারণ-মানসে, স্বীয় পতির কয়েক বিঘা সকর ভূমি কোন এক ব্যক্তিকে বিলি বন্দোবস্ত করেন, ইহাতে তাঁহার দুই জন আত্মীয় ঐ নিরুপায়ার বিরুদ্ধে ন্যায়বিরুদ্ধ কার্যে প্রবৃত্ত হন। নিরুপায়া অবীরা, অগ্রজ মহাশয়ের শরণ লইলেন। ঐ বিধবার রোদনে অগ্রজ অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং অবিলম্বে উক্ত আত্মীয়দ্বয়কে আনয়নার্থে এক আত্মীয়কে প্রেরণ করিলেন। তন্মধ্যে এক ব্যক্তি উপস্থিত হইলে, অগ্রজ অনুরোধ করেন যে, এই পতিপুত্রবিহীনা তোমাদের আত্মীয়া, অতএব কয়েক বিঘা জমার জমি ত্যাগ

কর। তাহাতে তিনি বলিলেন, 'আমরা ইঁহার উত্তরাধিকারী; ইনি লোকান্তর গমন করিলে পর, আমরাই ঐ ভূমি পাইব। কিন্তু যাহাতে উহা আমরা আর না পাই, এই অভিপ্রায়ে ইনি জীবদ্দশাতেই সমস্ত বিষয় অন্যকে বন্ধক দিতেছেন; সুতরাং আমরা উপায়ান্তরাবলম্বনে প্রবৃত্ত হইয়াছি।' অগ্রজ বলিলেন, 'ইঁহার অবর্তমানে ঐ ভূমি তোমরা পাইবে সত্য, কিন্তু এক্ষণে ইনি কি খাইয়া প্রাণধারণ করেন, অগত্যা বন্ধক দিতেছেন; ইহাতে তোমাদের স্বত্বের কোনও হানি হইবে না। তোমরা সামান্য ভূমির জন্য অসৎপথ অবলম্বন করিতেছ কেন?' তাহাতে তিনি উহাব ভূমি ত্যাগ করিতে সম্মত না হইয়া প্রস্থান করেন। তৎক্ষণাৎ দাদা ঐ ভূমি বাহাল রাখাইয়া দেওয়াইলেন। এই সংবাদে বাটীর পরিবারবর্গের মধ্যে কেহ কেহ অগ্রজকে বিনীতভাবে অত্যন্ত দুঃখিতান্তঃকরণে অনুরোধ করেন, যেন ঐ অবীরা ভূমি না পায়। তাহাতে তিনি উত্তর করেন যে, এ বিষয়ে আমি কাহারও অনুরোধ রক্ষা করিব না। যাহাতে নিরুপায়া পতিপুত্রবিহীনা স্ত্রীলোক স্বীয় ভূমি-সম্পত্তি পুনর্গ্রহণে সমর্থা হন, আমি তদ্বিষয়ে আন্তরিক যত্নবান হইব। ঐ স্ত্রী-লোকের জন্য আমাকে যদি সকল কার্য পরিত্যাগ করিতে হয়, আমি তাহাতেও সম্মত আছি; তথাপি ঐ অসহায়া স্ত্রীলোকটির পক্ষ কদাচ পরিত্যাগ করিতে পারিব না। ইহা শুনিয়া উপস্থিত সকলে আশ্চর্যান্বিত হইলেন যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় অদ্য একটি দরিদ্রা স্ত্রীলোকের রোদনে এমন মুগ্ধ হইয়াছেন যে, গুরুতর লোকের উপরোধ রক্ষা করিলেন না। ঐ দরিদ্রার প্রতি ইঁহার অদ্ভুত দয়ার সঞ্চার হয়। আমরা মনে করিয়াছিলাম, এবার ঐ আত্মীয়েরা ভয়ে ঐ স্ত্রীলোকের জমি পরিত্যাগ করিবেন, কিন্তু উহারা তাহা না করিয়া পূর্বাপেক্ষা উহার প্রতি আরও শত্রুতা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তজ্জন্য অগ্রজ মহাশয়, নায়েবকে অনুরোধ করেন। অগ্রজের আদেশ পাইয়া, নায়েব পরম আহ্লাদিত হইয়া তাহাদিগকে ডাকাইয়া বলেন যে, তাঁহারা উত্তরকালে ঐ স্ত্রীলোকটির কোন সম্পত্তি বলপূর্বক অধিকার করিতে না পারেন। অবশেষে তাহারা অগত্যা তাহাদের কুটুম্ব মহাশয়ের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাহারা ঐ ভূমির তালুকদার বাবুদের কুটুম্ব; সুতরাং ঐ কুটুম্বেরা অবীরাকে ঐ ভূমি হইতে বেদখল করিবার জন্য যত্ন পাইতে লাগিলেন। অবীরার প্রমুখাৎ উক্ত সংবাদ শ্রবণ করিয়া, অগ্রজ মহাশয় তালুকদার বাবুকে পত্র লিখেন। উক্ত পত্র পাইয়াও তিনি পক্ষাবলম্বন করিয়া অবীরাকে বেদখল করিয়া, ধান্য রোপন করিতে আন্তরিক যত্নবান হন। তাহাতে অসহায়া বিধবা ১২৭৪ সালের আষাঢ় মাসে কলিকাতায় যাত্রা করেন এবং তথায় অগ্রজ মহাশয়কে আদ্যন্ত নিবেদন করিলে পর, তিনি আমায় পত্র লিখেন। ঐ পত্র লইয়া অবীরা জাহানাবাদে প্রস্থান করেন। কিন্তু মোক্তারগণ বলেন, বেদখল হইতে দেওয়া হইবে না, সাবেক দখল বজায় রাখিতে হইবে, সুতরাং বাটী প্রত্যাগমন করেন। আসিয়া দেখিলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় বাটী আগমন করিয়াছেন। উক্ত আত্মীয়েরা, অন্য দ্বারা

গড়বেতায় ঐ অবীরার নামে যে অভিযোগ করিয়াছিলেন, তাহার ধার্য দিনে বাদী, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভয়ে উপস্থিত না হওয়ায়, মকদ্দমা খারিজ হয়। অবীরার দখল কায়েম রহিল। অসহায়ার প্রতি এরূপ দয়া প্রকাশ করাতে, এ প্রদেশে অগ্রজ মহাশয়ের প্রতি দেশের লোকের গাঢ়তর ভক্তি জন্মিল।

১২৭৪ সালের জ্যৈষ্ঠমাসে বীরসিংহার বাটীর নূতন বন্দোবস্ত করেন। মধ্যম ও তৃতীয় সহোদরের এবং স্বীয় পুত্রের পৃথক পৃথক ভোজনের ব্যবস্থা করিয়া দেন। সকলেরই মাসিক ব্যয়ের নিমিত্ত যাহার যেরূপ টাকার আবশ্যক, সেইরূপ ব্যবস্থা হইল। এইরূপ করিবার কারণ এই, একত্র অনেক পরিবার থাকিলে কলহ হইবার সম্ভাবনা; বিশেষত বহুপরিবার একত্র অবস্থিতি করিলে সকলেরই সকল বিষয়ে কষ্ট হয়। ইতিপূর্বে ভগিনীদ্বয়ের পৃথক বাটী নির্মাণ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। বিদেশীয় যে সকল বালকগণ বাটীতে ভোজন করিয়া বীরসিংহা বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিবে, তাহাদের মাসিক ব্যয় নির্বাহের সমস্ত টাকা দিয়া, পাচক ও চাকর দ্বারা স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করেন। ১২৭৫ সালে আমায় স্বতন্ত্র বাটী প্রস্তুত করিয়া দেন। ইহার কিছু দিন পরে তাঁহার পুত্র নারায়ণের পৃথক বাটী প্রস্তুত হয় এবং নিজের নিকট জননীদেবীর অবস্থিতি করিবার ব্যবস্থা হয়।

বর্ধমান

অগ্রজ মহাশয় কায়িক অসুস্থতাপ্রযুক্ত ফরেশডাঙ্গায় বাটী ভাড়া করিয়া অবস্থিতি করেন। কয়েক মাস তথায় থাকিয়া কিছু সুস্থ হন; কিন্তু তথায় অবস্থিতি করিয়া বিশেষ উপকার না হওয়ায়, বর্ধমান যাইবার মানস করেন।

প্রায় ৪৫ বৎসর অতীত হইল, বর্ধমানের রাজা মহাতাপচন্দ্র বাহাদুরের সাল-গিরার সময় নিমন্ত্রিত তৎকালের বিখ্যাত বাবু রামগোপাল ঘোষ ও ভূকৈলাসের রাজা সত্যচরণ ঘোষাল মহোদয়েরা যৎকালে বর্ধমান যাত্রা করেন, ঐ সময় তাঁহা-দের সহিত অগ্রজ মহাশয়ও বর্ধমান-দর্শনমানসে গমন করিয়াছিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া তিনি প্রথমত, তাঁহাদের বাসায় অবস্থিতি করেন। কিয়ৎক্ষণ পরে রাজবাটী হইতে তাঁহাদের সিদা আসিল, এবং উঁহাদের সঙ্গে কত লোক আসিয়াছে গণনা করিয়া ভোজনের দ্রব্যাদি দেওয়া দেখিয়া, অগ্রজ প্রকাশ্যভাবে বলেন যে, আমি তোমাদের বাসায় অবস্থিতি বা ভোজন করিব না; এই বলিয়া বাবু প্যারী-চরণ মিত্রের ভবনে প্রস্থান করেন। তথায় তাঁহার বাটীতে মধ্যাহ্ন-কার্য সমাপন করিয়া উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে রাজবাটীর লোক আসিয়া বলিল, 'মহাশয়! বর্ধমানাধিপতি বাহাদুর আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে আমাদিগকে

পাঠাইয়াছেন। অতএব আপনি অনুগ্রহপূর্বক রাজবাটী গমন করুন।' তাহাদের কথা শুনিয়া, অগ্রজ উত্তর দেন যে, এসময় তাঁহার বাটীতে কার্যোপলক্ষে নানা স্থানের লোক উপস্থিত হইয়াছেন। একারণ, এসময় রাজবাটী যাইতে ইচ্ছা করি না। রাজকর্মচারীরা এই সংবাদ রাজার কর্ণগোচর করিলে, রাজা পুনর্বার কয়েক জন সম্ভ্রান্ত লোককে অগ্রজের নিকট প্রেরণ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, ঐ কয়েক জন সম্ভ্রান্ত লোকের অনুরোধে অগত্যা রাজবাটীতে গমন করেন। রাজা, অগ্রজ মহাশয়কে অবলোকন করিয়া বলেন, 'আপনি অতি বিখ্যাত ও সুপণ্ডিত। লাট সাহেব প্রভৃতি আপনাকে অত্যন্ত সম্মান করিয়া থাকেন।' রাজা, প্রায় দুই ঘণ্টাকাল নানা বিষয়ের গল্প করিলেন; অবশেষে অগ্রজ মহাশয় বিদায় লইলেন। রাজা পাঁচ শত টাকা ও এক জোড়া শাল বিদায় দেন। তাহা দেখিয়া দাদা বলিলেন, 'আমি কখনও কাহারও নিকট দান গ্রহণ করি না। কলেজে গবর্নমেণ্ট প্রদত্ত যাহা বেতন পাইয়া থাকি, তাহাতে আমার সাংসারিক ব্যয় নির্বাহ হইয়া থাকে। যাঁহারা টোল করিয়া শিক্ষা দেন, তাঁহাদের পক্ষে এরূপ বিদায় গ্রহণ করা উচিত।' ইহা শুনিয়া রাজা আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিলেন, 'এরূপ নিঃস্বার্থ নির্লোভ পণ্ডিত আমি কখনও দেখি নাই।' তদবধি রাজা তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন।

কিছু দিন পরে তিনি যৎকালে হুগলি, বর্ধমান, নদীয়া ও মেদিনীপুর এই জেলা-চতুষ্টয়ের স্কুলসমূহের এস্‌পিসিয়াল ইন্‌স্পেক্টারের পদে নিযুক্ত হইয়া ছিলেন, তৎকালে কয়েকবার বর্ধমানের বিদ্যালয় পরিদর্শনার্থে আগমন করেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে, যখন মিস কারপেণ্টার কলিকাতায় আগমন করেন, তৎকালেও লেপ্টেনেণ্ট গবর্নরের অনুরোধে অগ্রজ মহাশয়, মিস কারপেণ্টারকে কলিকাতার কয়েকটি বিদ্যালয় ও কয়েকজন কৃতবিদ্য লোকের অন্তঃপুরস্থ স্ত্রীলোকদিগের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়াছিলেন, এবং পরিশেষে ১৮৫৬ খৃস্টাব্দে এক দিবস মিস কারপেণ্টারকে সমভিব্যাহারে লইয়া, উত্তরপাড়ানিবাসী জমিদার বাবু বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রভৃতির স্থাপিত বালিকাবিদ্যালয় দেখাইতে গমন করেন। তথা হইতে প্রত্যাগমন সময়ে বগী গাড়ীতে আরোহণ করিয়া আসিতেছিলেন; মোড় ফিরিবার সময়, গাড়ী উলটিয়া পড়ে। বিদ্যাসাগর মহাশয় গাড়ী হইতে পড়িয়া অচেতন অবস্থায়, ঘোড়ার পায়ের নিকটে ভূমিতে নিপতিত ছিলেন। তথায় উপস্থিত দর্শকগণের মধ্যে কেহ সাহস করিয়া, সেই স্থান হইতে ঘোড়াকে সরান নাই। স্কুল-ইন্‌স্পেক্টার উড্‌রো সাহেব ও বিদ্যালয়সমূহের ডিরেক্টার য়্যাট্‌কিন্‌সন সাহেব তাহা দেখিয়া, ত্বরায় ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া সেই স্থান হইতে অপসারিত করেন। ঘোড়া না সরাইলে, ঘোড়ার পদাঘাতেই অপমৃত্যুর সম্ভাবনা ছিল। তাঁহাকে ভূমিতে পতিত ও হতজ্ঞান দেখিয়া, মিস কারপেণ্টারের চক্ষে জল আসিল। তিনি নিজের উৎকৃষ্ট বসনের দ্বারা দাদার গায়ের কাদা ও ধূলি সমস্ত পরিমার্জিত করিয়া দেন।

ঐ গাড়ী হইতে পতনাবধি অগ্রজ মহাশয়ের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। নানা প্রতীকারেও সম্পূর্ণরূপ আরোগ্য লাভ করিতে পারেন নাই। পরে তিনি কিছুদিন ফরেসডাঙ্গায় অবস্থিতি করেন। তথায় অবস্থিতি করিয়া বিশেষ ফলপ্রাপ্ত না হওয়ায়, পুনর্বার কলিকাতায় ফিরিয়া যান। অনন্তর স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য চিকিৎসকগণ কিছু দিনের নিমিত্ত কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া, তৎকালের স্বাস্থ্যকর স্থান বর্ধমানে অবস্থিতি করিতে উপদেশ প্রদান করেন। তৎকালে বর্ধমান অতি স্বাস্থ্যকর স্থান ছিল। প্রথমত, বর্ধমানবাসী বাবু প্যারীচরণ মিত্রের বাটীতে প্রায় এক মাস অবস্থিতি করেন।

ঐ সময় মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইংলণ্ড হইতে কলিকাতায় আসিয়া হাইকোর্টে প্রবিষ্ট হইবার উদ্যোগ করেন; কোন কারণে তাঁহার হাইকোর্টে প্রবিষ্ট হইবার বাধা জন্মিল। মাইকেল নিরুপায় হইয়া, বর্ধমানে প্যারীচরণ মিত্রের ভবনস্থিত অগ্রজ মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন। তথায় যাইয়া তাঁহার নিকট বিস্তর অনুনয় বিনয় করিলে পর, তিনি দয়ার্দ্র হইয়া চরিত্রসম্বন্ধে সার্টিফিকেট লিখিয়া, মাইকেলের হস্তে প্রদান করেন। অনন্তর অবিলম্বে অগ্রজ মহাশয় কলিকাতা আসিয়া যোগাড় করিয়া দেওয়াতে, মাইকেল, বারিস্টারের কর্মে প্রবিষ্ট হইলেন। প্রথমত, বিলাতে মাইকেলের ঋণ পরিশোধের জন্য ছয় হাজার টাকা প্রেরণ করেন। দ্বিতীয়ত, বারিস্টারের কার্যে বাধা জন্মিলে, দাদা স্বতঃপরত অনুরোধ দ্বারা বাধা খণ্ডাইয়া দেন। এতদ্ব্যতীত যখন যত টাকার আবশ্যক হইত, তাহা প্রদান করিতেন। একারণ, মাইকেল, অগ্রজের নিতান্ত অনুগত ছিলেন। দুর্ভাগ্যপ্রযুক্ত মাইকেল স্বল্পদিনের মধ্যেই লোকান্তরিত হন। মাইকেলের মৃত্যু-সংবাদে অগ্রজ মহাশয় অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন।

ঐ সময় তিনি মধ্যে মধ্যে জননীদেবী, বিদ্যালয় ও বিধবাবিবাহাদি কার্যকলাপ পরিদর্শনার্থে, পাল্কী করিয়া উচালনের রাজপথ দিয়া বর্ধমান হইতে বীরসিংহায় গমন করিতেন। কখন কখন উচালনে রাত্রিতে অবস্থিতি করিতেন। অনেক অনাথ দরিদ্র বালক সম্মুখে উপস্থিত হইত। অগ্রজ, তাহাদের দুঃখদর্শনে দুঃখিত হইয়া তাহাদিগকে কিছু কিছু প্রদান না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। প্রায় দুই তিন জন দরিদ্র বালক সমভিব্যাহারে করিয়া বাটী আগমন করিতেন। বাটীতে লোকের কোনও অসদ্ভাব ছিল না; তথাপি তাহাদিগকে অকারণ একটা কার্যের ভার প্রদান করিতেন এবং ঐ সকল লোকের মাসিক বেতন ধার্য করিতেন।

কয়েক দিবস বাটীতে অবস্থিতি করিয়া, পুনর্বার বর্ধমানে যাত্রা করিতেন। বর্ধমানে প্যারীবাবুর বাটীতে প্রায় এক মাস অবস্থিতি করিয়া, কিছু সুস্থ হইলেন দেখিয়া, বর্ধমানাধিরাজ বাহাদুরের কমলসায়রের পার্শ্বস্থ বাগান-বাটীতে অবস্থিতি করেন। কমলসায়রের চতুর্দিকেই দরিদ্র নিরুপায় মুসলমানগণের বাস। এই পল্লীর বালক-বালিকাগণকে প্রতিদিন প্রাতে জলখাবার দিতেন। যাহাদের অন্নকষ্ট

এবং পরিধেয় বস্ত্র জীর্ণ ও ছিন্ন দেখিতেন, তাহাদিগকে অর্থ ও বস্ত্র দিয়া কষ্ট নিবারণ করিতেন। এতদ্ভিন্ন কয়েক ব্যক্তিকে দোকান করিবার জন্য মূলধন দিয়াছিলেন। কি স্ত্রীলোক, কি পুরুষ, কি বালক-বালিকা, সকলেই তাঁহাকে আপনার ঘরের লোকের মত মনে করিত ও আন্তরিক ভালবাসিত, এবং পিতা ও বন্ধুর ন্যায় ভক্তি ও মান্য করিত। ঐ সময়ে অগ্রজ মহাশয়, কমলসায়রের সন্নিহিত একটি মুসলমান কন্যার বিবাহের সমস্ত খরচ প্রদান করিয়াছিলেন।

বর্ধমান হইতে আসিবার কালে কোনও কোনও বারে হাজিপুরের দোকানে অবস্থিতি করিতেন। পাল্কী নামাইলেই, ঐ স্থানের বহুসংখ্যক দরিদ্র বালক, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিত। বিদ্যাসাগর মহাশয় বাল্যকাল হইতে ছোট ছোট বালক-বালিকাগণকে আন্তরিক ভালবাসিতেন। উপস্থিত প্রায় শতাধিক বালককে মিঠাই খাইতে কিছু কিছু প্রদান না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন না। বালকেরা পয়সা পাইয়া পরম আহ্লাদিত হইয়া প্রস্থান করিত। তন্মধ্যে তামলিজাতীয় দ্বাদশবর্ষীয় একটি বালক চারিটি পয়সা পাইয়া, সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় ঐ বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি এই চারিটি পয়সায় কি করিবে?' তাহাতে সে উত্তর করিল, 'এই পয়সায় বন্দীপুরের হাট হইতে আম কিনিয়া এই হাজীপুরে বিক্রয় করিব; তাহা হইলে আট পয়সা হইবে। অদ্য এক পয়সার চাউল কিনিয়া ভাত রাঁধিয়া খাইব। কল্য পুনরায় বন্দীপুরের হাটে যাইয়া সাত পয়সার আম কিনিব, সেই আম এখানে বিক্রয় করিলে চৌদ্দ পয়সা হইবে, তাহা হইলে সেই পয়সার পোনা-মাছ কিনিয়া খাইব।' বালকের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া উহাকে সঙ্গে করিয়া বীরসিংহায় আনয়ন করেন। কয়েকদিন বাটীতে রাখিয়া, একটি ডালি দোকান করিবার উপযুক্ত টাকা দিয়া বিদায় করেন। এইরূপ উচালনের নফরকেও দোকান করিবার মূলধন প্রদান করেন। বিধবা হতভাগিনী স্ত্রীলোক, নাবালক সন্ততি সহিত আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইলেই, তাহাদের প্রতি তাঁহার কারুণ্যরসের উদ্রেক হইত। অনাথা স্ত্রীলোকের প্রতি কখনও তাঁহাকে বিরক্ত হইতে দেখি নাই। তিনি যতবার বাটী আসিতেন, প্রত্যেক বারেই উদয়গঞ্জের গঙ্গাধর দত্তের দোকান হইতে অন্তত পাঁচ শত টাকার বস্ত্র আনাইয়া, অনাথ স্ত্রীলোক দেখিলেই তাহাদিগকে প্রদান করিতেন। উদয়গঞ্জের গঙ্গাধর দত্ত, অগ্রজ মহাশয়কে বস্ত্র বিক্রয় করিয়া সঙ্গতি করিয়াছিলেন।

এক সময় অগ্রজ মহাশয়, বাটী হইতে বর্ধমান-গমনকালে সোজা পথে নামিয়া, কামারপুকুর হইতে এক আত্মীয়ের ভবনে গমন করেন। তথায় রাত্রি যাপন করিয়া প্রাতঃকালে দেখিলেন, তাঁহাদিগের বাটীর অবস্থা ভাল নয়; একারণ, তাঁহাদিগকে বলিলেন, 'তোমরা বাটীর অবস্থার উন্নতি কর, আমি ইহার জন্য টাকা দিব।' এই বলিয়া বর্ধমান গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া, আমায় ঐ

টাকা পাঠাইবার আদেশ করেন এবং এ বিষয় কাহারও নিকট ব্যক্ত করিতে নিষেধ করিয়া পত্র লিখেন।

পোলপাতুলের হরকালী চৌধুরী, প্রায় পঁচিশ বৎসর কাল কলিকাতায় আমাদের বাসায় পাকাদিকার্য সমাধা করিয়া, স্বীয় সংসার-প্রতিপালন করিয়া আসিতেছিলেন। উক্ত হরকালী, বর্ধমানের বাসাতেও পাক করিতেন। বর্ধমানে অনাথা স্ত্রীলোকগণ সর্বদা যাচ্ঞা করিতে আসিত। দাদা তাহাদের প্রতি দয়া করিয়া কাহাকেও বস্ত্র, কাহাকেও টাকা প্রদান করিতেন। কোনও কোনও স্ত্রীলোক বারম্বার আসিয়া, প্রতারণা করিয়া লইয়া যাইত। একদিবস উক্ত পাচক হরকালী, একটি স্ত্রীলোককে বলেন যে, 'মাগী, বিদ্যাসাগরকে কি তোরা নেদা আমগাছ পাইয়াছিস?' হরকালীর প্রমুখাৎ উক্ত কথা শুনিয়া, অগ্রজ মহাশয়, হরকালীকে বলেন, 'তুমি বহুকাল আমার বাটীতে আছ; তোমার বেতন কি বাকী আছে বল, ফেলিয়া দিই, এবং তুমি এই মুহূর্তেই আমার বাটী হইতে বিদায় হও। দরিদ্র লোককে আমি দান করিব, তোমার বাবার কি?' ইহা শুনিয়া হরকালী বলেন, 'ঐ বৃদ্ধা এক সপ্তাহ অতীত হয় নাই বস্ত্র ও টাকা লইয়াছে; তাহা আপনার স্মরণ নাই, এই কারণেই এরূপ বলিয়াছি। যাহা হউক, আমার অপরাধ হইয়াছে, এ যাত্রা আমায় ক্ষমা করুন।' তথাপি অগ্রজ, হরকালীকে না রাখিয়া, মাসিক দুই টাকা মাসহারার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া বিদায় দেন।

১৮৬৯ খৃঃ অব্দে অগ্রজ মহাশয়, প্যারীচরণ মিত্রের বাটীর সন্নিহিত রসিককৃষ্ণ মল্লিকের বাটী ভাড়া করিয়া অবস্থিতি করেন। সেই সময়ে বর্ধমানে দেশব্যাপক ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রাদুর্ভাব হয়। অগ্রজের বাসার অতি সন্নিকটে একটি মুসলমান-পল্লী ছিল। সেই পাড়ার লোকেরা অতি দরিদ্র। সকলেই জ্বরাক্রান্ত হইয়া কষ্ট পাইতেছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাদের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া, স্থির হইয়া থাকিতে পারিলেন না। নিজ বাসা-বাটীতে তিনি একটি ডিস্পেন্সারি খুলিলেন এবং ডাক্তার গঙ্গানারায়ণ মিত্র মহাশয়ের হস্তে তাহার ভার ন্যস্ত করিলেন। দেশ ব্যাপিয়া জ্বর হইতেছে, লোক ঔষধ ও অন্নাভাবে মরিতেছে দেখিয়া ও শুনিয়া, অগ্রজ মহাশয়, ত্বরায় কলিকাতায় যাইয়া, শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর গ্রে সাহেব বাহাদুরকে সমস্ত বিবরণ জানাইলেন। দাদার প্রমুখাৎ অবগত হইয়া, গ্রে সাহেব বর্ধমানে ডাক্তার প্রেরণ করেন এবং রিলিফ অপারেশনের কর্তৃপক্ষদিগকে পত্র লিখেন।

বর্ধমানের সিবিল সার্জন ডাক্তার মেণ্টন, এ বিষয়ে কোন রিপোর্ট করেন নাই শুনিয়া, গ্রে সাহেব বিরক্তিভাব প্রকাশ করেন এবং আট-দশ দিনের মধ্যে কয়েক জন আসিস্টাণ্ট সার্জন প্রেরণ করেন। মেণ্টন সাহেব, এই কথা শুনিয়া, অবিলম্বে ছুটি লইয়া ঐ স্থান হইতে প্রস্থান করেন। ডাক্তার ইলিয়ট বিলক্ষণ সহৃদয় ও কার্যদক্ষ ছিলেন। তিনি আসিয়া শহরের প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাত হইয়া, চারি-পাঁচটি

ডিস্পেন্সারি খুলিলেন এবং যে সকল রোগী বাটী হইতে ডিস্পেন্সারিতে ঔষধ লইতে আসিতে অক্ষম, তাহাদিগকে ডাক্তারবাবুরা বাটীতে গিয়া দেখিয়া আসিবেন, এরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। ডিস্পেন্সারির সঙ্গে অন্নসত্রের ব্যবস্থা হইল এবং এই অন্নসত্রে দুগ্ধ, সাগু প্রভৃতিও দিবার ব্যবস্থা হইল। বর্ধমান জেলার মধ্যে ম্যালেরিয়াজ্বরের ক্রমশ প্রাদুর্ভাব হইতেছে শুনিয়া, গ্রে সাহেব, বর্ধমান জেলার মফঃস্বলস্থ প্রত্যেক গ্রামে অনুসন্ধান লইতে আদেশ করেন। গ্রে সাহেব, ডাক্তার সাহেব ও জেলার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের রিপোর্ট পাইয়া, দুই-তিন ক্রোশ অন্তর গ্রামের লোকসংখ্যা বিবেচনা করিয়া, ঔষধালয় খুলিতে আজ্ঞা করেন। ডাক্তার ইলিয়ট, জেলার মধ্যে ঔষধ বিতরণের উত্তমরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, এবং অনেক নেটিভ ডাক্তার আনাইয়াছিলেন। এই সময়ে বিলাত-ফেরত ডাক্তার বাবু গোপালচন্দ্র রায়, বাবু ফকিরচন্দ্র ঘোষ, বাবু রসিকলাল দত্ত, বাবু কালীপদ গুপ্ত, বাবু বঙ্কুবিহারী গুপ্ত, এবং আসিস্টান্ট সার্জন বাবু দীনবন্ধু দত্ত ও বাবু প্রিয়নাথ বসু প্রভৃতি কয়েক জনকে মেডিকেল ইন্‌স্পেক্টার নিযুক্ত করিয়া, ইহাদের উপর পরিদর্শনের ভার দিলেন। ইহারা প্রতিসপ্তাহে স্ব-স্ব পরিদর্শনের রিপোর্ট সিবিল সার্জনকে প্রেরণ করিতেন এবং সিবিল সার্জন, স্বীয় মন্তব্যসহ উক্ত রিপোর্টগুলি একত্র করিয়া গবর্নমেণ্টে পাঠাইতেন। এই সময়মধ্যে ইলিয়ট, এই তিন জন সিবিল সার্জনের পদের রীতিমত বন্দোবস্ত করেন নাই এবং এই সুবৃহৎ ব্যাপার অতি সহজে বিনা বন্দোবস্তে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছিল। অদ্যাবধি বর্ধমানবাসীদিগের মধ্যে কেহই জানে না যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাদের এই মহোপকার করিয়া, তাহাদিগকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। গবর্নমেণ্টকে এইরূপ কার্যে প্রবৃত্ত করিয়াও, তিনি নিজে ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহার ডিস্পেন্সারি ব্যয় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ঔষধ বিতরণের সঙ্গে সঙ্গে সাগু, এরারুট বিতরিত হইতে লাগিল। দুর্বল রোগীর জন্য দুগ্ধ ও সুরুয়ার পয়সা দিবার ভার গঙ্গানারায়ণ বাবুর উপর অর্পিত হয়। তিনি রোগীদের বাটীতে যাইয়া দুগ্ধাদি বিতরণ করিতেন। এই কার্যের জন্য গবর্নমেণ্ট তাঁহাকে ধন্যবাদ দেন। দেখুন, সংবাদপত্রে না লিখিয়া, গোপনভাবে বিদ্যাসাগর মহাশয় বর্ধমান জেলার কি পর্যন্ত উপকার করিয়াছিলেন। দীনদরিদ্রগণ অবারিতভাবে ঔষধ ও পথ্য পাইয়াছিল। ডাক্তার গঙ্গানারায়ণ বাবু ঔষধ বিতরণের সঙ্গে সাগু, দুগ্ধ এবং সুরুয়ার জন্য পয়সা দিয়াছিলেন। শীতকাল উপস্থিত হইল; দরিদ্র লোকের বস্ত্রাভাব দেখিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয় দুই সহস্র টাকার বস্ত্র আনাইলেন। রোগী ব্যতীত অনেক দরিদ্র ব্যক্তি শীতবস্ত্র ও পরিধেয় বস্ত্র পাইয়াছিল। প্রবঞ্চনা করিয়া কেহ কেহ বস্ত্র লইয়া যায়, তাহা ভালরূপ ভেদাভেদজন্য নির্বাচন করিতে গিয়া, যেন কোন প্রকৃত দরিদ্র ব্যক্তি বঞ্চিত না হয়, এ বিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন।

ডিস্পেন্সারির সম্পূর্ণভার বাবু গঙ্গানারায়ণ মিত্রের উপর ছিল। তথাপি তিনি

বিদ্যাসাগর মহাশয়কে না জানাইয়া, কোনও কাজ করিতেন না। তাঁহার ঔদার্য ও বদান্যতা দেখিয়া, ডাক্তার গঙ্গানারায়ণ, রোগীদের জন্য ভাল ভাল ঔষধ আনাইতে লাগিলেন। কুইনাইনের অধিক আবশ্যকতা এবং উহা দুর্মূল্য দেখিয়া, ডাক্তার গঙ্গানারায়ণ, ইহার পরিবর্তে সিঙ্কোনা ব্যবহার করিবার জন্য একবার প্রস্তাব করেন; কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় ঐ ডাক্তারের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন, 'যখন পীড়া একই প্রকারের, তখন বড় লোক ও দরিদ্র ব্যক্তিনির্বিশেষে এক প্রকারই ঔষধ হওয়া উচিত।' তিনি শয্যাশায়ী ব্যক্তিগণের বাটীতে যাইয়া, তাহাদের শুশ্রূষার বন্দোবস্ত করিয়া দিতেন এবং অর্থ ও ঔষধ দিয়া তাহাদের দুঃখ মোচন করিতেন। পূর্বোক্ত কালে ভগবানবাবুও ভ্রমণশীল ডাক্তার ছিলেন। তিনি রোগীদের বাটীতে বাটীতে ঔষধ দিয়া বেড়াইতেন। ঐ ডাক্তারের পনের টাকা বেতন বিদ্যাসাগর মহাশয় দিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় দুই বৎসরকাল বর্ধমানে ছিলেন। তিনিও জ্বরাক্রান্ত হইতে পারেন, তাঁহার এ আশঙ্কা কখনও হয় নাই। বর্ধমানের লোকে বলিয়া থাকেন, 'বিদ্যাসাগর, নির্মল চরিত্রের লোক, তাঁহার রাগদ্বেষ দেখি নাই, তাঁহার শরীর দয়া ও স্নেহে পরিপূর্ণ। তাঁহার মাতৃভক্তি, পরদুঃখকাতরতা ও দানশীলতা অনুপমেয়। তাঁহাকে অপরের মনে কষ্ট দিতে দেখি নাই। তাঁহার সকল বিষয়েই উদারতা দেখিয়াছি।'

মধ্যে মধ্যে যখন তাঁহার পাচক-ব্রাহ্মণ থাকিত না, তখন রাত্রিকালে বাবু প্যারীচরণ মিত্রের বাটী হইতে তাঁহার আহারের সামগ্রী যাইত। এই সময়ে তিনি ভ্রান্তিবিলাস নামক একখানি পুস্তক লিখেন। বাবু প্যারীচরণ মিত্র মহাশয়ের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অত্যন্ত বন্ধুত্ব ছিল। সেই কারণে তিনি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র গঙ্গানারায়ণ বাবু প্রভৃতিকে বাৎসল্যভাবে দেখিতেন।

বিগত ১২৭৩ সালের দুর্ভিক্ষসময়ে যে সকল লোক অন্নসত্রে ভোজন করিয়াছিল, তাহারা এক্ষণে কি উপায় অবলম্বন করিয়া দিনপাত করিয়া থাকে, অগ্রজ মহাশয় ঐ সকল গ্রামস্থ দরিদ্র লোকের অবস্থা অবগত হইবার জন্য ব্যগ্র হইলেন; তজ্জন্য তাঁহাকে ঐ সকলের সবিশেষ পরিচয় দেওয়া হয় যে, উহাদের মধ্যে অনেকেই অতিকষ্টে একসন্ধ্যা ভোজন করিয়া থাকে। ইহা শ্রবণ করিয়া অগ্রজ মহাশয়, জননীদেবীকে বলেন, 'বৎসরের মধ্যে এক দিন পূজা করিয়া ছয়-সাত শত টাকা বৃথা ব্যয় করা ভাল, কি গ্রামের নিরুপায় অনাথ লোকদিগকে ঐ টাকা অবস্থানুসারে মাসে মাসে কিছু কিছু সাহায্য করা ভাল?' ইনি শুনিয়া জননীদেবী উত্তর করেন, 'গ্রামের দরিদ্র নিরুপায় লোক প্রত্যহ খাইতে পাইলে, পূজা করিবার আবশ্যক নাই। তুমি গ্রামবাসীদিগকে মাসে মাসে কিছু কিছু দিলে, আমি পরম আহ্লাদিত হইব।' জননীদেবীর মুখে এরূপ কথা শুনিয়া, অগ্রজ মহাশয়, অপরিসীম হর্ষ প্রাপ্ত হন এবং গ্রামের প্রধান প্রধান লোকদিগকে আনাইয়া বলেন যে,

'তোমরা সকলে ঐক্য হইয়া, গ্রামের কোন্ কোন্ ব্যক্তির অত্যন্ত অন্নকষ্ট ও কোন্ কোন্ ব্যক্তি নিরাশ্রয়, তাহাদের নাম লিখিয়া দাও, আমি মাসে মাসে উহাদের কিছু কিছু সাহায্য করিব।' গ্রামস্থ ভদ্রলোকেরা যে ফর্দ করিয়া দিলেন, সেই ফর্দ অগ্রজ মহাশয় স্বহস্তে লিখিয়া আমার নিকট প্রদান করিয়া বলিলেন, 'তুমি পূর্বাবধি যেরূপ নিরুপায় আত্মীয়দিগকে ও বিধবাবিবাহসম্পর্কীয় নিরুপায় ব্যক্তিদিগকে ফর্দানুসারে টাকা বিতরণ করিয়া আসিতেছ, সেইরূপ এই ফর্দানুসারে গ্রামস্থ নিরুপায় ব্যক্তিদিগকে মাসে মাসে টাকা দিবে এবং সময়ে সময়ে গ্রামস্থ ব্যক্তিদিগের অবস্থার বিষয় বিশেষরূপে আমায় লিখিবে।' দূরস্থ স্বসম্পর্কীয় বা বিধবাবিবাহকারী লোকদিগের বাটীতে লোক পাঠাইয়া, মাসিক টাকা প্রদান করা হইত। ঐ লোকের রীতিমত বেতন তাহাদিগকে দিতে হয় নাই; এরূপ দান সহজ নহে।

১২৭৪ সালের শ্রাবণ মাসে নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী আইসমালী গ্রামে গোপালচন্দ্র সমাজপতির সহিত বিদ্যাসাগরের জ্যেষ্ঠা কন্যা হেমলতা দেবীর বিবাহ হয়। বর অতি সৎপাত্র; অগ্রজ মহাশয় ইঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন।

এই সময় মধ্যম সহোদর দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সহিত জ্যেষ্ঠাগ্রজ মহাশয়ের সংস্কৃত-প্রেস ও উহার ডিপজিটারি লইয়া বিবাদ হয়। কিন্তু মধ্যমাগ্রজ মহাশয়কে ক্ষান্ত করিয়া দেওয়ায়, তিনি সংস্কৃত-প্রেসের ও উহার ডিপজিটারির দাবী পরিত্যাগ করিলেন।

সন ১২৭৫ সালের অগ্রহায়ণ মাসে গবর্নমেণ্টের আদেশে বাবু রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ইন্‌কম ট্যাক্স ধার্যের জন্য জাহানাবাদ মহকুমায় উপস্থিত হন। যে সকল সামান্য ব্যবসায়ীর আইনানুসারে ট্যাক্স ধার্য হইতে পারে না, তাহাদের প্রতি অন্যায়পূর্বক দুই নামে একত্র এক বিলে ট্যাক্স ধার্য করিতেছিলেন। কেহ কেহ এই গর্হিত আইনবিরুদ্ধ কার্যে সম্মত না হইলে, ভয়প্রদর্শন দ্বারা ঐ সকল লোককে সম্মত করাইতেন। সামান্য ব্যক্তিরা নিরুপায় হইয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে জানাইয়া, সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিল। ন্যায়বিরুদ্ধ কার্য হইতেছে অবগত হইয়া, তিনি খড়ার গ্রামে সমাগত আসেসর রমেশবাবুর নিকট যাইয়া বলেন, 'ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ী ব্যক্তিদিগকে একব্যবসায়ী লিখিয়া ট্যাক্স ধার্য করিলে অতি অন্যায় কার্য হয়।' রমেশবাবু বলিলেন, 'দুই নামে এক কাগজে এক বিলে না দিলে, অনেক সামান্য আয়ের ব্যবসায়ী লোক বাদ পড়ে, এরূপ হইলে গবর্নমেণ্টের আয়ের অনেক খর্বতা হয়।' অগ্রজ মহাশয়, আসেসর বাবুকে বলেন যে, 'গবর্নমেণ্টের আয়ের লাঘব হয় বলিয়া, এরূপ অন্যায় কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া কি আপনাদের উচিত হইতেছে?' রমেশবাবু, অগ্রজ মহাশয়ের উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া, তৎকালে তাঁহার নিকট উপস্থিত কতকগুলি সামান্য আয়ের ব্যবসায়ীকে ধমকাইয়া স্বীকার করাইলেন। মফঃস্বলে এরূপ আইনবিরুদ্ধ কার্য দেখিয়া, অবিলম্বে অগ্রজ মহাশয়

কলিকাতায় আসিয়া লেপ্টেনেণ্ট গবর্নরের কর্ণগোচর করিলেন, এবং স্বয়ং দেশস্থ লোকের হিতকামনায় বাদী হইলেন। লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর বাহাদুর, অগ্রজ মহাশয়ের প্রমুখাৎ উহা শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণনগরের মাজিস্ট্রেট মনরো সাহেবের কথা বলেন; কিন্তু অগ্রজ মহাশয়, হেরিসন সাহেবকে মনোনীত করেন। তদনুসারে ছোট লাট বাহাদুর, বর্ধমানের কালেক্টার হেরিসন সাহেব বাহাদুরকে কমিসনার নিযুক্ত করিয়া, মফঃস্বল তদন্ত জন্য প্রেরণ করেন। হেরিসন সাহেব, বাদী অগ্রজ মহাশয়ের সমভিব্যাহারে খড়ার, রাধানগর, ক্ষীরপাই, চন্দ্রকোণা, রামজীবনপুর, বদনগঞ্জ, জাহানাবাদ প্রভৃতি গ্রামে যাইয়া, সকল ব্যবসায়ীর খাতা ও কাগজপত্র অবলোকন করেন ও আসেসর রমেশবাবুর কৃত অন্যায় প্রমাণ হয়। অগ্রজ মহাশয়, বিপদগ্রস্ত দেশস্থ সাধারণের উপকারের জন্য, প্রায় দুই মাস কাল অনন্যকর্মা ও অনন্যমনা হইয়া, কেবল এই কার্যেই লিপ্ত ছিলেন। একারণ, দেশস্থ লোক উপকার প্রাপ্ত হইয়া, অগ্রজ মহাশয়ের বিশিষ্টরূপ গুণানুবাদ করেন। উহারা পূর্বে মনে করিত, যে, বিদ্যাসাগর কেবল বিদ্যোৎসাহী ও বিধবাবিবাহের প্রবর্তক। এখন দেশস্থ লোক ভালরূপ অবগত হইলেন যে, সকল বিষয়েই তিনি সমদৃষ্টি-নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। উক্ত কার্যে দুই মাস নিরন্তর লিপ্ত থাকায়, অগ্রজ মহাশয়ের দুই সহস্রাধিক টাকা ব্যয় হয়।

ঘাঁটাল ইন্‌কম ট্যাক্সের তদন্ত-সময়ে, তথাকার মুন্‌সেফ বাবু তারিণীচরণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি, অগ্রজ মহাশয়কে সানুনয়ে এই নিবেদন করেন যে, আমাদের ঘাঁটালে একটি মাইনার ইংরাজী বিদ্যালয় আছে, অদ্যাপি স্কুল-গৃহ না থাকা প্রযুক্ত, আমরা চাঁদা করিয়া ইষ্টক-নির্মিত বাটী প্রস্তুত করিতেছি। কিন্তু পাঁচশত টাকার অসদ্ভাবপ্রযুক্ত বাটী-নির্মাণ-কার্য সম্পন্ন হয় নাই। একারণ, অগ্রজ মহাশয় তৎকালে ঘাঁটাল স্কুল-গৃহ-নির্মাণার্থে পাঁচশত টাকা প্রদান করিয়াছিলেন। এরূপ দান দেখিয়া ও শুনিয়া, ঘাঁটাল-চৌকীর সম্ভ্রান্ত লোকেরা আহ্লাদিত হইয়া বলিয়াছিলেন যে, 'আমরা জমিদার, তথাপি দশ-বার টাকার ঊর্ধ্বে সাহায্য করিতে সাহস করি নাই; কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় অকাতরে পাঁচশত টাকা প্রদান করিলেন।'

হেরিসন সাহেবের তদন্তকার্য সমাধা হইলে পর, অগ্রজ মহাশয়, হেরিসন সাহেবকে বীরসিংহাস্থিত বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইয়াছিলেন। জননীদেবী, সাহেবের ভোজনসময়ে উপস্থিত থাকিয়া, তাঁহাকে ভোজন করাইয়াছিলেন। তাহাতে সাহেব আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিলেন যে, অতি বৃদ্ধা হিন্দু স্ত্রীলোক, সাহেবের ভোজনের সময় চেয়ারে উপবিষ্টা হইয়া কথাবার্তা কহিতে প্রবৃত্ত হইলেন। উপস্থিত সকলে ও সাহেব পরম সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। সাহেব হিন্দুর মত জননীদেবীকে ভূমিষ্ঠ হইয়া মাতৃভাবে অভিবাদন করেন। তদনন্তর নানা বিষয়ে কথাবার্তা হইল। জননীদেবী প্রবীণা হিন্দু স্ত্রীলোক; তথাপি তাঁহার স্বভাব অতি উদার, মন

অতিশয় উন্নত এবং মনে কিছুমাত্র কুসংস্কার নাই। কি ধনশালী, কি দরিদ্র, কি বিদ্বান, কি মূর্খ, কি উচ্চজাতীয়, কি নীচজাতীয়, কি পুরুষ, কি স্ত্রী, কি হিন্দু-ধর্মাবলম্বী, কি অন্যধর্মাবলম্বী সকলেরই প্রতি সমদৃষ্টি; ইহা জানিতে পারিয়া সকলেই চমৎকৃত হইলেন এবং পরম সন্তোষলাভ করিলেন। হেরিসন সাহেব, দাদাকে বলিলেন, 'মাতার গুণেই আপনি এরূপ স্বভাবত উন্নতমনা হইয়াছেন।' কথাবার্তার শেষে সাহেব, জননীকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনার কত টাকা আছে?' জননী উত্তর করেন, 'আমার টাকা নাই এবং টাকার আবশ্যকও নাই; যেরূপভাবে চলিয়া আসিতেছে, এইরূপভাবে চলিযা পুত্রকন্যা রাখিয়া যাইতে পারিলে, আমার সকল অভিলাষ পূর্ণ হইবে।'

সন ১২৭৫ সালের চৈত্রমাসে এক দুর্ঘটনা হয়। বীরসিংহাস্থ পৈতৃক বসত-বাটীর সমস্ত গৃহ নিশীথ-সময়ে অগ্নি লাগিয়া ভস্মীভূত হয়। শালগ্রাম ঠাকুরটি পর্যন্ত অগ্নির উত্তাপে দগ্ধ ও বিদীর্ণ হয়; মধ্যমাগ্রজ ও জননীদেবী প্রভৃতি নিদ্রিত ছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে তাঁহারা সকলেই রক্ষা পাইয়াছিলেন। কিন্তু দ্রব্যাদি কিছুমাত্র বাহির করিতে পারা যায় নাই। অগ্রজ, এই সংবাদ পাইবামাত্র দেশে আগমন করেন। জননীদেবীকে সমভিব্যাহারে কবিয়া কলিকাতা লইয়া যাইবার জন্য যত্ন পাইলেন, কিন্তু তিনি বলিলেন, 'আমি কলিকাতা যাইব না। কারণ, যে সকল দরিদ্র লোকেব সন্তানগণ এখানে ভোজন করিয়া বীরসিংহা বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে, আমি এস্থান পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তর প্রস্থান করিলে, তাহারা কি খাইয়া স্কুলে অধ্যয়ন করিবে? কে দরিদ্র বালকগণকে স্নেহ করিবে? বেলা দুই প্রহরের সময় যে সকল বিদেশস্থ লোক ভোজন করিবার মানসে এখানে সমাগত হন, কে তাঁহাদিগকে আদর-অভ্যর্থনাপূর্বক ভোজন করাইবে। যে সকল কুটুম্ব আগমন করিবেন, কে তাঁহাদিগকে যত্ন করিয়া ভোজন করাইবে?' জননী-দেবী কলিকাতা যাইতে সম্মত হইলেন না; তজ্জন্য তাঁহার স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করেন। এস্থলে জননীদেবীর দয়াশীলতার দুই এক কথা না লিখিয়া ক্ষান্ত থাকা যায় না। জননীদেবী, সর্বদা গ্রামস্থ অভুক্ত লোককে ভোজন করাইতেন। স্থানীয় প্রতিবাসীগণ পীড়িত হইলে, সর্বদা তাহাদের তত্ত্বাবধান করিতেন এবং ঐ বাস্তু ভিটা দেখিয়া রোদন করিতেন। সম্মুখে বর্ষাকাল, একারণ, অগ্রজ মহাশয় তাঁহার বাসার্থ সামান্য গৃহ প্রস্তুত করাইয়া দেন। বিদেশীয় যে সকল রোগীগণ চিকিৎসার জন্য আসিয়া বাটীতে অবস্থিতি করিত স্বয়ং তাহাদের আবশ্যকীয় দ্রব্য পাক করিয়া দিতেন, যে সকল দরিদ্র প্রতিবেশীর বস্ত্র না থাকিত, সময়ে সময়ে তাহাদিগকে যথেষ্ট বস্ত্র ক্রয় করিয়া দিতেন, এবং সময়ে সময়ে অনেকের আপদ-বিপদে যথেষ্ট অর্থ প্রদান করিতেন। জননীদেবীর দান-খয়রাতের জন্য যখন যাহা আবশ্যক হইত, অগ্রজ মহাশয় অবিলম্বে তাহা পাঠাইতেন। তিনি যাহাতে সন্তুষ্টা থাকেন, অগ্রজ মহাশয় সেই কার্য অবিলম্বে সম্পন্ন করিতেন। প্রতিবৎসরেই অগ্রজকে

অনুরোধ করিয়া, বীরসিংহা বিদ্যালয়ের অনেক ছাত্রের ও অন্যান্য অনেক দীন-দরিদ্রের কর্ম করিয়া দিতেন। বৎসরের মধ্যে নূতন নূতন অনেক কুটুম্ব ও গ্রামস্থ অনাথগণের মাসহারা করাইয়া দিতেন। জননীদেবীর ও পিতৃদেবের স্বর্ণালঙ্কারের প্রতি বিলক্ষণ দ্বেষ ছিল; তাঁহারা প্রায়ই বলিতেন, 'বাটীর স্ত্রীলোকদিগকে অলঙ্কার দিলে, বাটীতে ডাকাইতি এবং দস্যুর ভয় হইবে। স্ত্রীলোকদিগের মনে অহঙ্কারের উদয় হইবে, এবং তাহাদের গৃহস্থালীকার্যে সেরূপ যত্ন থাকিবে না, দীন-দরিদ্রদের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিবে। অলঙ্কার না করিয়া, ঐ টাকায় যথেষ্ট অন্নব্যয় করিতে পারিব। তাহাতে দরিদ্র বালকেরা আমাদের বাটীতে ভোজন করিয়া লেখাপড়া শিখিতে পারিবে।' জননীদেবী, বাটীর স্ত্রীলোকদিগকে পাতলা কাপড় পরিধান করিতে দিতেন না। কখন কখন কলিকাতা হইতে পাতলা কাপড় গেলে, অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করিতেন। বাটীর স্ত্রীলোকদের জন্য মোটা বস্ত্র ক্রয় করিয়া দিতেন, এবং পাকাদি সাংসারিক কার্য করিবার জন্য সর্বদা উপদেশ দিতেন। তিনি বিদেশীয় অনুপায় রোগীদের শুশ্রূষাদি কার্যে বিশেষরূপ যত্নবতী ছিলেন। কাহারও নিরামিষ ব্যঞ্জন, কাহারও মৎস্যের ঝোল প্রভৃতি স্বয়ং প্রস্তুত করিয়া দিতেন। তাঁহাকে এই কার্যে কখনও বিরক্ত হইতে দেখা যায় নাই। বাটীর অন্যান্য স্ত্রীলোকেরাও এই সকল বিষয়ে মাতৃদেবীর অনুকরণ করিতেন। বিবাহিতা বিধবাদের মধ্যে কেহ পীড়িত হইয়া চিকিৎসার জন্য বাটীতে আসিলে, অথবা অপর কেহ রোগগ্রস্ত হইয়া উপস্থিত হইলে, জননীদেবী তাহাদের মল-মূত্রাদি পরিষ্কার করিতেন; তাহাতে কিছুমাত্র ঘৃণাবোধ করিতেন না। এ প্রদেশের অনেকেই প্রায় বলিয়া থাকেন যে, অগ্রজ মহাশয় বাল্যকাল হইতে জননীদেবীর দয়া-দাক্ষিণ্যাদি গুণ সকল অধিকার করিয়াছেন। জননীদেবী, পরের দুঃখাবলোকনে রোদন করিতেন, অগ্রজও সাধারণ লোকের শোকতাপ দেখিয়া রোদন করিতেন। অধিক কি, সামান্য শৃগাল কুকুর মরিলেও দাদার নেত্রজল বহির্গত হইত। গ্রামে বিদ্যালয় সংস্থাপনের পূর্বে, গ্রামস্থ প্রায় সকল লোকই দরিদ্র ছিল, কেহ লেখাপড়া জানিত না, কেহ চাকরি করিত না; সকলেই সামান্য কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া দিনপাত করিত। সম্বৎসরের পরিশ্রমলব্ধ সমস্ত ধান্য পৌষমাসেই মহাজনগণ বলপূর্বক এককালেই লইয়া যাইতেন। গ্রামের প্রায় অনেক লোক এক-সন্ধ্যা আহার করিয়া অতিকষ্টে দিনপাত করিত। দয়াময়ী জননীদেবী, গ্রামস্থ অনেককেই টাকা ধার দিতেন; কিন্তু কাহারও নিকট পাইবার আশা রাখিতেন না।

তৎকালীন এডুকেশন গেজেটের সম্পাদক বাবু প্যারীচরণ সরকার ও বারাসত-নিবাসী বাবু কালীকৃষ্ণ মিত্র মহাশয়দ্বয়, অগ্রজের পরমবন্ধু ছিলেন। বিধবাবিবাহ ও বালিকাবিদ্যালয় প্রভৃতি দেশহিতকর কার্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রায় পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা ঋণ হইয়াছিল; একারণ. উক্ত সরকার ও মিত্র মহাশয় অত্যন্ত চিন্তিত

হইয়াছিলেন এবং এডুকেশন গেজেটে প্রকাশ করেন যে, বিদ্যাসাগর, দেশহিতকর কার্যে যথেষ্ট ঋণগ্রস্ত হইয়াছেন। অতএব তাঁহার বন্ধুবান্ধবের কর্তব্য যে, সকলে কিছু কিছু সাহায্য করিলে, বিদ্যাসাগর মহাশয় অক্লেশে ঋণ-দায় হইতে পরিত্রাণ পান। যাঁহার সাহায্য করিবার ইচ্ছা হইবে, তিনি এডুকেশন গেজেটের সম্পাদক প্যারীবাবুর নিকট প্রেরণ করিবেন। ইহা প্রকাশ করায়, অল্প দিনের মধ্যেই যথেষ্ট টাকা প্যারীবাবুর নিকট জমা হইল। ঐ সময় দাদা বাটী হইতে কলিকাতা আইসেন। তিনি এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, পত্রের দ্বারা সংবাদপত্রে প্রকাশ করেন যে, হে বন্ধুগণ! তোমরা আমায় রক্ষা কর, আমি কাহারও সাহায্য গ্রহণ করিব না। যিনি যাহা আমার উদ্দেশে প্যারীবাবুর নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, তিনি তাহা অবিলম্বে ফেরত লইবেন। আমার ঋণ আমিই পরিশোধ করিব। আমার ঋণের জন্য তোমাদিগকে কোন চিন্তা করিতে হইবে না। পূর্বাপেক্ষা আমার ঋণ অনেক কমিয়াছে; যাহা অবশিষ্ট আছে, আমিই শোধ করিতে পারিব। দেখ, বিদ্যাসাগরের তুল্য নিঃস্বার্থ নির্লোভ লোক প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

সন ১২৭৬ সালের আষাঢ় মাসে বীরসিংহায় একটি বিধবা ব্রাহ্মণকন্যার পাণি-গ্রহণ-কার্য সমাধা হয়। বর শ্রীমুচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, নিবাস ক্ষীরপাই; তৎ-কালে বর কেঁচ্‌কাপুর স্কুলের হেড পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত ছিলেন। কন্যা শ্রীমতী মনোমোহিনী দেবী, নিবাস কাশীগঞ্জ। অগ্রজ মহাশয় বাটী আগমন করিলে পর, ক্ষীরপাই গ্রামের সম্ভ্রান্ত লোক হালদার মহাশয়েরা অগ্রজের নিকট আসিয়া বলেন যে, মুচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের ভিক্ষাপুত্র, ইনি বিধবাবিবাহ করিলে আমরা অতিশয় দুঃখিত হইব। হালদারবাবুরা অতি কাতরতা পূর্বক বলিলে, দাদা তাঁহাদিগকে উত্তর করেন, 'আপনাদের অনুরোধে আমি এই বিবাহের কোন সংস্রবে থাকিব না। আপনারা উভয়কে উপদেশপ্রদান-পূর্বক সমভিব্যাহারে লইয়া যান। উঁহারা উভয়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কলিকাতা গিয়াছিলেন; তথা হইতে আসিয়া এখানে যে রহিয়াছেন, তাহা আমি জানিতাম না; শম্ভুর নিকট শুনিলাম, ইঁহারা কলিকাতায় গিয়া নারায়ণের পত্র লইয়া এখানে আসিয়া, শম্ভুকে ঐ পত্র দিয়াছেন। তাহাতেই সে ইহাদিগকে বাটীতে রাখিয়া, ইহাদের বিবাহের উদ্‌যোগ পাইতেছে। অদ্য আপনাদের সম্মুখেই বিদায় করা হইবে।' কিয়ৎক্ষণ পরে উহারা বাটী হইতে বহিষ্কৃত হইল বটে, কিন্তু উঁহারা হালদারদের অবাধ্য হইল। বীর-সিংহাস্থ কয়েকজন প্রাচীন লোক, মধ্যমাগ্রজ দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন, রাধানগর-নিবাসী কৈলাসচন্দ্র মিশ্র প্রভৃতি উহাদিগকে আশ্রয় দিয়া, বাটীর অতি সন্নিহিত অপর এক ব্যক্তির বাটীতে রাখিয়া, উহাদের বিবাহ-কার্য সমাধা করেন। এই বিবাহে অগ্রজ, আন্তরিক কষ্টানুভব করেন এবং প্রকাশ করেন, 'গতকল্য ক্ষীরপাই গ্রামের হালদার-দিগকে বলিয়াছিলাম যে, আমি এই বিবাহের কোনও সংস্রবে থাকিব না। কিন্তু

তোমরা তাঁহাদের নিকট আমাকে মিথ্যাবাদী করিয়া দিবার জন্য, এই গ্রামে এবং আমার সম্মুখস্থ ভবনে বিবাহ দিলে। ইহাতে আমায় যতদূর মনঃকষ্ট দিতে হয়, তাহা তোমরা দিয়াছ। যদি তোমাদের একান্ত বিবাহ দিবার অভিপ্রায় ছিল, তাহা হইলে ভিন্ন গ্রামে লইয়া গিয়া বিবাহ দিলে, এরূপ মনঃকষ্ট হইত না। যাহা হউক, আমি তাহাদের নিকট মিথ্যাবাদী হইলাম।' কনিষ্ঠ সহোদর ঈশানচন্দ্র উত্তর করিলেন, 'উক্ত হালদারবাবুদের সমক্ষে আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, শাস্ত্রানুসারে এই বিবাহ দেওয়া বিধেয় কি না? তাহাতে আপনি উত্তর করিলেন, ইহা শাস্ত্রসম্মত ও ন্যায়ানুগত বলিয়া আমি স্বীকার করি; কিন্তু হালদার-বাবুদের মনে দুঃখ হইবে।' ইহাতে ঈশান-ভায়া উত্তর করিলেন, 'লোকের খাতিরে, এই সকল বিষয়ে পরাঙ্মুখ হওয়া ভবাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে দূষণীয়।' ইহা শুনিয়া অগ্রজ মহাশয় ক্রোধভরে বলিলেন, 'অদ্য হইতে আমি দেশ পরিত্যাগ করিলাম।' তিনি কয়েকদিবস দেশে অবস্থিতি করিয়া বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, রাখাল-স্কুল, বালিকাবিদ্যালয়, দেশস্থ ও বিদেশস্থ লোকের ও বিধবাবিবাহকারীদের মাসহারা প্রভৃতির বন্দোবস্ত কবিয়া, কলিকাতা প্রস্থান করিলেন। মৃত্যুর পাঁচ-ছয় বৎসর পূর্বে বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, বালিকাবিদ্যালয়, প্রভৃতির পুনঃস্থাপন জন্য দেশে যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেন; কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্যবশত নানাকার্যে ব্যস্ততাপ্রযুক্ত ও অসুস্থতাজন্য দেশে শুভাগমন করিতে পারেন নাই।

বাঙ্গালা ১২৭৬ সালের পূর্বে, রাধানগর গ্রামবাসী জমিদার বাবু উমাচরণ চৌধুরী প্রভৃতির সহিত বৈঁছিনিবাসী জমিদার বিহারীলাল মুখোপাধ্যায়ের ঋণগ্রহণ ও বিষয়-কর্ম উপলক্ষে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত বিহারীবাবুর পরিচয়, প্রণয় ও বিশেষ হৃদ্যতা জন্মে। এক সময়ে বিহারীবাবু কলিকাতায় আসিয়া কথাপ্রসঙ্গে অগ্রজকে জিজ্ঞাসা কবিলেন, 'বিদ্যাসাগর মহাশয়! আমি অপুত্রক, স্ত্রীর মনে যদি কষ্ট হয়, একারণে, পুনরায় দারপরিগ্রহ করিতে আমার ইচ্ছা নাই। অতএব আমি পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিব অভিপ্রায় করিয়াছি, নতুবা আমার বিষয়-সম্পত্তি অকারণ নষ্ট হইয়া যাইবে এবং আমাদের নাম লোপ হইবে।' ইহা শ্রবণ করিয়া তিনি বলিলেন, 'যদি আমার মত গ্রহণ করেন, তবে আমার মতে দত্তকপুত্র না লইয়া, আপনার যাবতীয় সম্পত্তি দেশের হিতকর কার্যে সমর্পণ করুন। তাহাই কর্তব্য ও তাহাই পরমধর্ম, এবং তাহাই বহুকালস্থায়ী; কোন সভ্য রাজার সময়ে ইহার লোপ হইবে না। দাতব্য-বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় এবং অসহায় রোগীদিগের আহার ও থাকিবার স্থান দান করা এবং নিজ গ্রামের ও তাহার পার্শ্বস্থ গ্রাম-সমূহের অন্ধ, পঙ্গু ও অনাথ প্রভৃতি নিরুপায় লোকদিগের দুঃখমোচনে যাবতীয় সম্পত্তি নিয়োজিত করা প্রধান ধর্ম।' স্বর্গীয় বিহারীলালবাবু আহ্লাদের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই প্রস্তাবে অনুমোদন করিয়া, তাঁহাকে দ্বিতীয় উইলের আদর্শ প্রস্তুত করিতে অনুরোধ করেন। তদনুসারে তিনি একখানি নূতন উইল

প্রস্তুত করাইয়া, বহুদর্শী উকিল-বাবুদিগকে দেখান, পরে ঐ আদর্শ উইলখানি বিহারীবাবুকে দেন। তিনি উহা পাঠ করিয়া, পরম আহ্লাদিত হইলেন। সন ১২৭৭ সালের ২১শে শ্রাবণ ঐ উইল প্রস্তুত করিয়া যথারীতি রেজেস্টারি করাইলেন। ইহার কিছুদিন পরে বিহারীলালবাবুর মৃত্যু হইলে, ঐ উইলের শর্তানুসারে তাঁহার বনিতা শ্রীমতী কমলেকামিনী দেবী দাতব্য-স্কুল, ডিস্পেন্সারি ও হাসপাতাল জন্য সন ১২৮৪ সালের ৫ই শ্রাবণ, ১৮৭৭ খৃস্টাব্দের ২৭শে জুলাই এক লক্ষ ষাটি হাজার টাকা ঐ বৎসরের শেষ পর্যন্ত হুগলি জেলার কালেক্টারিতে আমানত করিলেন এবং ঐ বৎসর হইতে দাতব্য এণ্ট্রান্স স্কুল, ডিস্পেন্সারি ও হাসপাতালের কার্য আরম্ভ হয়। ঐ কার্য আজ পর্যন্ত অবাধে চলিয়া আসিতেছে। অপিচ, দাতার উইল অনুসারে ভোগাধিকারী ও স্থলাভিষিক্ত অভাবে, যাবতীয় সম্পত্তি গবর্নমেণ্ট নিজ হস্তে তত্ত্বাবধানের ভার লইয়া, দাতার ইচ্ছানুরূপ কার্য সকল নিষ্পন্ন করিবেন; এবং ঐ বিষয় প্রিভি কৌন্সেল পর্যন্ত যাইয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। উইলের কোন অংশ রহিত কি পরিবর্তিত হয় নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়, পরোপকারার্থে নিজ ধন ব্যয় করিতে যেরূপ কাতর ছিলেন না, অন্য ব্যক্তিকেও সেইরূপ কার্যে ব্রতী করিতেও তাঁহার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। স্বতঃপরত পরোপকারে যে ধর্ম, তাহা বিদ্যাসাগর মহাশয় অনুভব করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই বিবরণটি বৈঁচিগ্রাম-নিবাসী বাবু গোকুলচাঁদ বসু মহাশয়ের প্রমুখাৎ অবগত হইয়াছি।

সন ১২৭৬ সালের শ্রাবণের শেষে অগ্রজ মহাশয়, জননীদেবীকে কাশীবাস করিবার জন্য প্রেরণ করেন। জননীদেবী কাশীতে পিতৃদেবের নিকটে কতিপয় দিবস অবস্থিতি করেন; তদনন্তর অন্যান্য তীর্থস্থান পর্যটন করিয়া, পুনর্বার কাশীতে সমুপস্থিত হন। মাতৃদেবী, পিতৃদেবকে বলেন, 'এখন হইতে এস্থলে অবস্থিতি করা অপেক্ষা আমরা দেশে অবস্থিতি করিলে, অনেক অক্ষম দরিদ্র লোককে ভোজন করাইতে পারিব। দেশে বাস করিয়া প্রতিবাসিবর্গের অনাথ শিশুগণের আনুকূল্য করিতে পারিলে, আমার মনের সুখ হইবে। আমার মৃত্যুর এখনও বিলম্ব আছে, আমি আমার সময় বুঝিয়া আসিব।' আরও তৎকালে পিতৃদেবকে স্পষ্ট করিয়া বলেন যে, 'আপনাকে এখনও অনেক দিন বাঁচিতে হইবে, কায়িক অনেক কষ্ট পাইতে হইবে, এত তাড়াতাড়ি তীর্থস্থলে আগমন করা যুক্তি-সিদ্ধ হয় নাই। ফলত আপনার মত আমাকে কায়িক কোনও কষ্টানুভব করিতে হইবে না। আমাকে আপনার পরলোকযাত্রা করিবার অনেক পূর্বেই পরলোকে গমন করিতে হইবে, ইহা নিশ্চয় জানিবেন।'

জননীদেবী কাশীতে কয়েক দিবস বাস করিয়া পুনর্বার দেশে প্রত্যাগমন করেন। বাটীতে সমুপস্থিত হইয়া শ্রাদ্ধাদি-কার্য সমাপনান্তে আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব, ব্রাহ্মণগণ ও গ্রামস্থ লোকদিগকে ভোজন করাইলেন। বাটীতে যত দিন ছিলেন ততদিন প্রাতঃকাল হইতে সমস্ত পাক করিয়া দরিদ্রদিগকে ভোজন করাইয়া,

স্বয়ং যৎসামান্য আহার করিতেন। মোটা মলিন বস্ত্র পরিধান করিতেন। যে সকল অনাথ পীড়িত অগ্রজের দাতব্য-চিকিৎসালয়ে আসিত, তাহাদের শুশ্রূষাদিতে বিশিষ্টরূপ যত্নবতী ছিলেন। বাটীতে যে সকল বিদেশীয় বালকবৃন্দ ভোজন করিয়া স্কুলে অধ্যয়ন করিত, সেই সকল বালককে স্বয়ং পরিবেষন করিতেন। যে দিবস জননী স্থানান্তরে যাইতেন সেই দিবস বালকগণের ভোজনের সুবিধা হইত না। জননী বাটীর ও বিদেশের বালক সকলকে সমভাবে পরিবেষন করিতেন; কখনও ইতরবিশেষ করিতেন না। একারণ, এ প্রদেশে সকলেই অদ্যাপি জননীদেবীর প্রশংসা করিয়া থাকেন। দেশস্থ সকলে বলিয়া থাকেন যে কর্ত্রী ঠাকুরাণীর ঐ পুণ্যপ্রভাবেই বিদ্যাসাগর মহাশয় উঁহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। দেশের যে কোন জাতির গৃহে কোনরূপ বিপদ উপস্থিত হইলে বা কেহ মরিলে, জননী স্নান আহার পরিত্যাগ করিয়া, তাহাদের সঙ্গে রোদনে প্রবৃত্ত হইতেন। তিনি দরিদ্র-দিগকে ভোজন করানই প্রধান ধর্ম বলিয়া মনে করিতেন। যাহাতে অল্পবয়স্কা বিধবা বালিকার বিবাহ হয়, তিনি তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন। অল্প-বয়স্কা বিধবাকে দেখিলে, নেত্রজলে তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইত। অনেকে বলিয়া থাকেন, অগ্রজ মহাশয় সমস্ত মাতৃগুণ অধিকার করিয়াছেন। দাদাও ঐরূপ বালিকাকে বিধবা দেখিলে, চক্ষের জলে প্লাবিত হইতেন।

১৮৬৯ সালে বিদ্যাসাগর মহাশয় বেথুন বালিকাবিদ্যালয়ের সেক্রেটারির পদ পরিত্যাগ করেন।

নারায়ণের বিধবাবিবাহ

সন ১২৭৭ সালের ২৭শে শ্রাবণ বৃহস্পতিবার অগ্রজ মহাশযের একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, খানাকুল কৃষ্ণনগরনিবাসী শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিধবা-তনয়া শ্রীমতী ভবসুন্দরী দেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। অগ্রজ মহাশয়, বিধবা-বিবাহের প্রবর্ত্তক; এতাবৎকাল উদ্‌যোগ করিয়া, সর্বস্বান্ত হইয়া, অন্যান্য লোকের বিধবাবিবাহ দিয়া আসিতেছিলেন; আমাদের বংশে অদ্যাপি বিবাহের কারণ ঘটে নাই। এইজন্য সকল স্থানের লোকেই বলিত, বিদ্যাসাগর মহাশয় পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙেন, নিজের বেলায় ঠিক আছেন। এক্ষণে তাঁহার পুত্র নারায়ণের বিবাহ হওয়ায়, অগ্রজ মহাশয়কে আর কাহারও নিকট নিন্দার ভাজন হইতে হইল না। ঐ পাত্রীর জননী সারদা দেবী অতিশয় বুদ্ধিমতী। স্বীয় কন্যার পুনর্বার বিবাহ দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া কাশীবাস করিবার মানসে, প্রথমত আমার নিকট আগমন করেন। ইনি নিকষ কুলীনের বংশোদ্ভবা। কন্যার মাতুল,

চন্দ্রকোণানিবাসী নীলরতন চট্টোপাধ্যায়। কন্যার প্রথম বিবাহ কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দের বাটীতে হইয়াছিল। উক্ত সারদা দেবী, তনয়াসহ বীরসিংহায় আমার বাটীতে আগমন করিয়া, আমাকে উহার বিবাহের কথা ব্যক্ত করেন। তাঁহাদিগকে আমার বাটীতে রাখিয়া, অগ্রজকে ঐ সংবাদ দিই। অগ্রজ মহাশয়, অন্য এক পাত্র স্থির করিয়া, কিছুদিন পরে আমায় পত্র লিখেন, 'তুমি ঐ পাত্রীসহ পাত্রীর মাতাকে প্রেরণ করিবে।' ইতিমধ্যে নারায়ণ বাবাজী, কোন কার্যোপলক্ষে বীরসিংহায় আসিয়া, কথাবার্তাতে পরম প্রীতিলাভ করিয়া, আমার নিকট নিজের বিবাহের অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। কিন্তু জ্যেষ্ঠা-বধূদেবী প্রভৃতি এবিষয়ে অসম্মতি প্রকাশ করায়, উভয় পক্ষেব মন্তব্য-পত্র-সহ ঐ পাত্রী ও উহার মাতাকে কলিকাতায় অগ্রজের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। কয়েক দিন পরে নারায়ণও কলিকাতায় গমন করে। পরে এই পরিণয়-কার্য সম্পন্ন হইলে পর, জ্যেষ্ঠা-বধূদেবী পরম আহ্লাদিতা হইয়াছিলেন। সকলে কলিকাতায় উপস্থিত হইলে পর, উভয় পক্ষের সম্মতি ও আগ্রহাতিশয়ে পরম প্রীতি লাভ করিয়া-পরিণয়-কার্য সমাধা করাইয়া, অগ্রজ মহাশয় আমাকে যে পত্র লিখেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

'শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণং।

শুভাশিষঃ সন্তু—

২৭শে শ্রাবণ বৃহস্পতিবার, নারায়ণ, ভবসুন্দরীর পাণিগ্রহণ করিয়াছে। এই সংবাদ মাতৃদেবী প্রভৃতিকে জানাইবে।

ইতিপূর্বে তুমি লিখিয়াছিলে, নারায়ণ বিধবাবিবাহ করিলে আমাদের কুটুম্ব মহাশয়েরা আহার-ব্যবহার পরিত্যাগ করিবেন, অতএব নারায়ণের বিবাহ নিবারণ করা আবশ্যক। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, নারায়ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করিয়াছে; আমার ইচ্ছা বা অনুরোধে করে নাই। যখন শুনিলাম, সে বিধবাবিবাহ করা স্থির করিয়াছে এবং কন্যাও উপস্থিত হইয়াছে, তখন সে বিষয়ে সম্মতি না দিয়া প্রতিবন্ধকতাচরণ করা, আমার পক্ষে কোনও মতেই উচিত কর্ম হইত না। আমি বিধবাবিবাহের প্রবর্তক; আমরা উদ্যোগ করিয়া অনেকের বিবাহ দিয়াছি, এমন স্থলে আমার পুত্র বিধবাবিবাহ না করিয়া কুমারী-বিবাহ করিলে, আমি লোকের নিকট মুখ দেখাইতে পারিতাম না। ভদ্রসমাজে নিতান্ত হেয় ও অশ্রদ্ধেয় হইতাম। নারায়ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করিয়া, আমার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে এবং লোকের নিকট আমার পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতে পারিবে, তাহার পথ করিয়াছে। বিধবাবিবাহ-প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান

সৎকর্ম। এজন্মে যে ইহা অপেক্ষা অধিকতর আর কোনও সৎকর্ম করিতে পারিব, তাহার সম্ভাবনা নাই। এ বিষয়ের জন্য সর্বস্বান্ত হইয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাঙ্মুখ নহি। সে বিবেচনায় কুটুম্ববিচ্ছেদ অতি সামান্য কথা। কুটুম্ব মহাশয়েরা আহার-ব্যবহার পরিত্যাগ করিবে, এই ভয়ে যদি আমি পুত্রকে তাহার অভিপ্রেত বিধবাবিবাহ হইতে বিরত করিতাম, তাহা হইলে আমা অপেক্ষা নরাধম কেহ হইত না। অধিক আর কি বলিব, সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করাতে, আমি আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিয়াছি! আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি; নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবে, তাহা করিব; লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে কদাচ সঙ্কুচিত হইব না। অবশেষে আমার বক্তব্য এই যে, সমাজের ভয়ে বা অন্য কোন কারণে নারায়ণের সহিত আহার-ব্যবহার করিতে যাঁহাদের সাহস বা প্রবৃত্তি না হইবে, তাঁহারা স্বচ্ছন্দে তাহা রহিত করিবেন, সে জন্য নারায়ণ কিছু-মাত্র দুঃখিত হইবে, এরূপ বোধ হয় না, এবং আমিও তজ্জন্য বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট হইব না। আমার বিবেচনায় এরূপ বিষয়ে সকলেই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রেচ্ছ, অন্যদীয় ইচ্ছার অনুবর্তী বা অনুরোধের বশবর্তী হইয়া চলা, কাহারও উচিত নহে। ইতি ৩১শে শ্রাবণ।

শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মণঃ'

সন ১২৭৭ সালের ২রা ফাল্গুন, কাশীবাসী পিতৃদেবের পীড়ার সংবাদে অগ্রজ মহাশয় অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলেন এবং অবিলম্বে বীরসিংহাস্থ মধ্যম সহোদর ও আমাকে পত্র লিখিলেন যে, ত্বরায় আমি কাশীযাত্রা করিলাম। তোমরা জননী-দেবীকে সমভিব্যাহারে করিয়া, পত্রপাঠমাত্র কাশী যাত্রা করিবে। আমি ও মধ্যম সহোদর দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন মহাশয়, অগ্রজ মহাশয়ের আদেশ পত্র পাইবামাত্র, জননী-দেবীকে সমভিব্যাহারে লইয়া, বীরসিংহা বাটী হইতে কাশীধামে যাত্রা করিলাম। পিতৃভক্তিপরায়ণ অগ্রজ মহাশয়, দুই সপ্তাহ কাশীতে অবস্থিতি করিয়া, শুশ্রূষাদি-কার্যে নিরন্তর ব্যাপৃত থাকায়, পিতৃদেব ক্রমশ আরোগ্যলাভ করিতে লাগিলেন। কাশীর মদনপুরা বাঙ্গালী-টোলার মাতঙ্গীপদ ভট্টাচার্যের বাটী অতি সঙ্কীর্ণ ও জঘন্য স্থান; তজ্জন্য অগ্রজ মহাশয় সোনারপুরস্থিত সোমদত্তের একটি প্রশস্ত বাটী ভাড়া করিলেন। মাতঙ্গীপদ ভট্টাচার্য দেখিলেন, ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আমার বাটী পরিত্যাগ করিবেন; ইহার পুত্র বিদ্যাসাগর অন্য বাটী ভাড়া করিলেন। আমার বাটী পরিত্যাগ করিলে, আর বিদ্যাসাগরের পিতার নিকট পূর্বের ন্যায় প্রাপ্তির আশা রহিল না। ইহা দেখিয়া মাতঙ্গীপদ, পিতৃদেবকে অনেক উপদেশ দিতে

আরম্ভ করিলেন। পিতৃদেব, কাশীতে প্রাতঃকাল হইতে সমস্ত দিবস কেদারঘাটে জপতপ সমাপনান্তে, দেবালয় পর্যবেক্ষণপূর্বক সন্ধ্যার সময়ে বাসায় আগমন করিয়া, পাকাদিকার্য সম্পন্ন করিতেন। গৃহস্বামী মাতঙ্গীপদ ও তাঁহার পত্নী সমস্তই আত্মসাৎ করিত। পৌরোহিত্য-কার্যকলাপের সময়, পুরোহিত মাতঙ্গীপদ, হস্তে কুশ দিয়া, কৌশল-ক্রমে স্বর্ণমোহর দক্ষিণা লইয়া ক্রমশ যথেষ্ট স্বর্ণালঙ্কার প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সর্বদা নানাপ্রকার ক্রিয়া করাইয়া, তিনি বিস্তর উপায় করিতেন; কিন্তু স্বতন্ত্র বাটীতে বাসা করিলে, এরূপ বশীভূত করিয়া গ্রহণ করিতে পারিবেন না; এজন্য উক্ত পুরোহিত, পিতৃদেবকে নির্জনে বিস্তর উপদেশ দিয়া বলেন, 'তোমার পত্নী ও পুত্রগণ বাটী প্রস্থান করুন। তীর্থ-স্থানে স্ত্রী-পুত্র লইয়া গৃহী হইয়া অবস্থিতি করা অতি অকর্তব্য। তুমি আমার বাটীতে নিশ্চিন্ত হইয়া যেমন অবস্থিতি করিতেছ, সেইরূপই থাক। তোমার পুত্রগণ নাস্তিক, উহাদের সংস্রবে থাকা উচিত নয়।' পিতৃদেব, পুরোহিতকে উত্তর করিলেন, 'আমার পুত্র ঈশ্বর আমায় যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিয়া থাকে। সেই সৎপুত্র আমার কষ্ট দেখিয়া, পৃথক প্রশস্ত বাটীতে আমায় লইয়া গেলে যদি সন্তুষ্ট হয়, আমার তাহাই করা কর্তব্য। এক্ষণে আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, উপযুক্ত পুত্রের কথা রক্ষা করা আমার অবশ্য কর্তব্য।' ইহা বলিয়া, পুরোহিত ও তৎপত্নীর উপদেশে কর্ণপাত না করিয়া, অগ্রজ মহাশয়ের সহিত নূতন ভাড়াটিয়া ভবনে গমন করিলেন।

তৎকালে কাশীস্থ দলপতি ব্রাহ্মণগণ বাসায় উপস্থিত হইয়া অগ্রজকে বলেন যে, 'আপনার পিতা কাশীতে অনেক প্রকার কার্য করিয়াছেন। আমরা ইঁহার নিকট অনেক খাইয়াছি, অনেক টাকা ও তৈজসপত্রাদি সময়ে সময়ে গ্রহণ করিয়াছি। আপনার পিতা পরমধার্মিক ও ক্রিয়াবান। পিতৃপুণ্য-প্রভাবে আপনি জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন। আপনি আমাদিগকে পাঁচ-সাত হাজার টাকা দান করিয়া নাম ক্রয় করুন।' ইহা শুনিয়া অগ্রজ মহাশয় তাঁহাদিগকে উত্তর করেন, 'আপনারা পিতৃদেবের নিকট পাইয়া থাকেন, তাঁহাকে বলুন, তিনি আপনাদিগকে যেরূপ দিয়া থাকেন, সেইরূপই দিবেন, তাহার ব্যতিক্রম হইবে না।' ইহা শুনিয়া কাশীবাসী বাঙ্গালী দলপতিগণেরা বলেন, 'বড় লোক কাশী-দর্শনার্থে আগমন করিলে, আমরা তাঁহাদের নিকট যাইয়া বলিলেই, তাঁহারা আমাদিগকে প্রচুর অর্থ দান করিয়া থাকেন, তাহাতেই আমাদের কাশীবাস হইতেছে। তুমি নামজাদা লোক, তোমাকে অবশ্য দান করিতে হইবে।' ইহা শুনিয়া অগ্রজ মহাশয় উত্তর করেন যে, 'আমি কাশী দর্শন করিতে আসি নাই, পিতৃদর্শনের জন্য আসিয়াছি। আমি যদি আপনাদের মত ব্রাহ্মণকে কাশীতে দান করিয়া যাই, তাহা হইলে আমি কলিকাতায় ভদ্রলোকের নিকট মুখ দেখাইতে পারিব না। আপনারা যতপ্রকার কুকর্ম করিতে হয়, তাহা করিয়া, দেশ পরিত্যাগ-পূর্বক কাশীবাস করিতেছেন। এখানে আছেন বলিয়া, আপনাদিগকে যদি আমি ভক্তি বা শ্রদ্ধা করিয়া বিশ্বেশ্বর

বলিয়া মান্য করি, তাহা হইলে আমার মত নরাধম আর নাই।' ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণেরা বলেন, 'আপনি কি তবে কাশীর বিশ্বেশ্বর মানেন না?' ইহা শুনিয়া দাদা উত্তর করিলেন 'আমি তোমাদের কাশী বা তোমাদের বিশ্বেশ্বর মানি না।' ইহা শুনিয়া কেশেল ব্রাহ্মণেরা ক্রোধান্ধ হইয়া বলেন 'তবে আপনি কি মানেন?' তাহাতে অগ্রজ উত্তর করেন 'আমার বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা উপস্থিত এই পিতৃদেব ও জননীদেবী বিরাজমান। দেখ জননীদেবী আমাকে দশ মাস গর্ভে ধারণ করিয়া কতই কষ্ট ভোগ করিয়াছেন। বাল্যকালে আমাকে স্তনদুগ্ধ পান করাইয়া পরিবর্দ্ধিত করিয়াছেন। আমার জন্য কতই কষ্ট ভোগ করিয়াছেন, কতই যত্ন পাইযাছেন। আমি পীড়িত হইলে জননী, আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া, কিসে আমি আরোগ্য লাভ করি, নিরন্তর এই চিন্তায় নিমগ্ন হইতেন। পিতৃদেব কত কষ্ট স্বীকার করিয়া আমাকে লেখাপড়া শিখাইয়াছেন, বাল্যকালে অন্ন-বস্ত্র দিয়াছেন। পিতামাতার আন্তরিক যত্নেই আমি পরিবর্ধিত হইয়াছি। পিতা, বাল্যকালে আমাকে স্কন্ধে আরোহণ করাইয়া, লেখাপড়া শিক্ষার জন্য কলিকাতায় লইয়া গিয়াছিলেন। তথায় আমার পীড়া হইলে, মলমূত্রাদি পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং এতাদৃশ জনকজননীকেই আমি পরমেশ্বর জ্ঞান করি, এবং সেইরূপই আমি শ্রদ্ধা-ভক্তি করিয়া থাকি। ইঁহাদের উভয়কে সন্তুষ্ট রাখিতে পারিলেই, আমি আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিব। ইঁহাদিগকে অসন্তুষ্ট করিলে, বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইবেন। পিতামাতাকে অসন্তুষ্ট করিলে, সকল দেবতাই আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইবেন। দেখুন, আপনারা শ্রাদ্ধের সময় কি বলিয়া থাকেন। অর্থাৎ পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ, পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্বদেবতা।'

ব্রাহ্মণেরা কিছু না পাইয়া, ক্রোধান্ধ হইয়া প্রস্থান করেন। ১৫ই ফাল্গুন অগ্রজ মহাশয়, জননীদেবী, মধ্যম ও তৃতীয় সহোদরকে পিতৃদেবের শুশ্রূষাদিকার্য নির্বাহের জন্য রাখিয়া, স্বয়ং কলিকাতা গমন করেন। কয়েক দিনের মধ্যেই পিতৃদেব সম্পূর্ণরূপ আরোগ্য লাভ করেন। জননীদেবী, ফাল্গুন ও চৈত্র দুই মাস কাল কাশীবাস করিয়া, অগ্রজকে অনুরোধ করিয়া, কয়েকটি নিরুপায়া হতভাগিনী স্ত্রীলোকের অন্নকষ্ট নিবারণ করেন। তাহাতে ঐ অশীতিবর্ষবয়স্ক স্ত্রীলোকেরা পরমসুখে কাশীবাস করেন। জননীদেবী, ফাল্গুন ও চৈত্র দুইমাস কাল কাশীবাস করিয়া, বিষম বিসূচিকারোগে আক্রান্তা হইয়া, ১২৭৭ সালের চৈত্র-সংক্রান্তির দিবস স্বামী, পুত্র, পৌত্র ও দৌহিত্রাদি রাখিয়া কাশীলাভ করেন। জননীর মৃত্যু-সংবাদে অগ্রজ মহাশয় যৎপরোনাস্তি শোকাভিভূত হয়েন। দিবারাত্রি রোদন করিয়া সময়াতিপাত করিতেন। দশাহে যথাশাস্ত্র কলিকাতার অতি সন্নিহিত কাশীপুরস্থ গঙ্গাতীরে চন্দনধেনু করিয়া ঔর্ধ্বদৈহিক শ্রাদ্ধকার্য সমাধা করেন। শাস্ত্রানুসারে একবৎসর কাল শোকচিহ্নস্বরূপ স্বহস্তে নিরামিষ পাককরত এক-সন্ধ্যা

ভোজন করিয়া, শরীরধারণ করিতেন। চর্মপাদুকা, আতপত্র, পালঙ্ক প্রভৃতি সুখসেব্য (দ্রব্য ও বিষয়) গুলি এক বৎসরের জন্য পরিত্যাগ করিলেন। কয়েক-মাস বিষয়কার্য পরিত্যাগপূর্বক নির্জনে উপবিষ্ট হইয়া রোদন করিতেন। পিতৃ-দেবের শুশ্রূষাদি-কার্য-নির্বাহার্থে আমাকে কাশী পাঠান। জননী কাশীলাভ করিয়াছেন, একারণ, দাদা আপাতত কাশী যাইতে ইচ্ছা করিলেন না। কাশীর বাঙ্গালীদলস্থ ব্রাহ্মণদিগকে কিছু দান করেন নাই, তজ্জন্য তাঁহারা শত্রুতা করিয়া পুরোহিত মাতঙ্গীপদ ন্যায়রত্নকে পৌরোহিত্য-কার্য নিষ্পন্ন করিতে নিবারণ করেন; সুতরাং পিতৃদেব, রামমাণিক্য তর্কালঙ্কার মহাশয়কে নূতন পুরোহিত স্থির করিয়া, স্বীয় বাসায় স্থায়ী করেন। নচেৎ দলপতিরা নূতন পুরোহিতকে ভয় দেখাইয়া, ভাঙাইয়া দিবেন। পিতৃদেব, মধ্যে মধ্যে কার্যোপলক্ষে বেদপাঠী মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন। জননীর মৃত্যুর পর, অগ্রজ মহাশয় প্রায় দুই বৎসর কাল কাশী গমন করেন নাই।

বহুবিবাহ

অসুস্থতানিবন্ধন অগ্রজ মহাশয়, সন ১২৭৬।৭৭ দুই বৎসরকাল স্বাস্থ্যরক্ষার মানসে প্রায় বর্ধমানে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তথায় দেশব্যাপক ম্যালেরিয়া জ্বরের বিশেষ প্রাদুর্ভাবপ্রযুক্ত বর্ধমান পরিত্যাগপূর্বক, ১২৭৮ সালের বৈশাখ মাস হইতে কলিকাতার সন্নিহিত কাশীপুরের গঙ্গাতীরস্থ বাবু হীরালাল শীলের এক ভবনে মাসিক একশত পঞ্চাশ টাকা ভাড়া দিয়া, কয়েক বৎসর অবস্থিতি করেন।

এই সময়ে কলিকাতাস্থ সনাতন-ধর্মরক্ষিণী সভার সভ্য মহাশয়েরা, বহুবিবাহের নিবারণ-বিষয়ে বিলক্ষণ উদ্‌যোগী হইয়াছিলেন। তাঁহাদের নিতান্ত ইচ্ছা, এই অতি জঘন্য—নৃশংস প্রথা রহিত হইয়া যায়। এই প্রথা নিবারিত হইলে, শাস্ত্রের অবমাননা ও ধর্মের ব্যতিক্রম ঘটিবে কি না, এই আশঙ্কার অপনয়ন জন্য, সভার সভ্য মহোদয়েরা ধর্মশাস্ত্র-ব্যবসায়ী প্রধান প্রধান পণ্ডিতের মত গ্রহণ করিতেছিলেন এবং রাজদ্বারে আবেদন করিবার অপরাপর উদ্‌যোগ দেখিতেছিলেন। তাঁহারা সদভিপ্রায়-প্রণোদিত হইয়া, যে অতি মহৎ দেশহিতকর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, হয়ত সে বিষয়ে তাঁহাদের কিছু সাহায্য হইতে পারিব, এই ভাবিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়, 'বহুবিবাহ' নামক পুস্তক মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন। ইহা প্রকাশিত হইবার অব্যবহিত পরে, সন ১২৭৮ সালের ১লা শ্রাবণ প্রতিবাদী মুরশিদাবাদ-নিবাসী শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর কবিরত্ন, বরিশাল-নিবাসী শ্রীযুক্ত রাজকুমার ন্যায়রত্ন, শ্রীযুত ক্ষেত্রপাল স্মৃতিরত্ন, শ্রীযুত সত্যব্রত সামশ্রমী ও শ্রীযুত তারানাথ

তর্কবাচস্পতি মহাশয় প্রভৃতি কয়েকজন বিখ্যাত পণ্ডিত পুস্তক লিখিয়া প্রতিবাদ করেন যে, বহুবিবাহ শাস্ত্রসম্মত ;—শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে। সুতরাং দাদা, তর্কবাচস্পতি মহাশয় প্রভৃতি প্রতিবাদীদের প্রকাশিত মত খণ্ডন করিয়া, বহুবিবাহ যে অতি জঘন্য, অতি নৃশংস ব্যবহার ও শাস্ত্র-বিরুদ্ধ, ইহা হইতে অশেষবিধ অনর্থ সংঘটন হইতেছে, এই সমুদয় দেখাইয়া, যত্ন ও পরিশ্রম-সহকারে শাস্ত্রোদ্ধৃত বচনসমূহ সঙ্কলন করিয়া মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন।

শ্রীযুত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় দেশবিখ্যাত অধ্যাপক। ইনি পূজ্যপাদ অগ্রজ মহাশয়ের পরমবন্ধু ও পরম আত্মীয়। ইহাদের পরস্পর বাল্যকাল হইতে সদ্ভাব ছিল, ইহা সকলেই অবগত আছেন। এক্ষণে এতদুপলক্ষে এরূপ যে মনান্তর ঘটিবে, তাহা স্বপ্নের অগোচর। পাঁচ-ছয় বৎসর পূর্বে জঘন্য বহুবিবাহ নিবারণ-মানসে ব্যবস্থাপক-সমাজে যে আবেদন হয়, তাহা বাচস্পতি মহাশয় স্বয়ং আদ্যো-পান্ত পাঠ করিয়া স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। এক্ষণে ইহাতে সাধারণে বাচস্পতি মহাশয়ের প্রতি দোষারোপ করিতে পারেন ; কিন্তু এ বিষয় তর্কবাচস্পতি মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, 'বহুবিবাহ অতি কুপ্রথা, শাস্ত্রবিরুদ্ধ না হইলেও এই প্রথা হইতে জগতের নানাপ্রকার অনিষ্ট হইতেছে এবং আমাদের সমাজের ততদূর বল নাই যে, সমাজ হইতে এই কুপ্রথা নিবারণ হইতে পারে ; এই কারণে রাজদ্বারে আবেদনসময়ে ঐ আবেদন পত্রে স্বাক্ষর করি। কিন্তু তা বলিয়া ইহা যে শাস্ত্রবিরুদ্ধ, তাহা আমি বলিতে পারি না।' এই কারণে, দাদার সহিত তাঁহার বিচার হয়। এই বিচারে অগ্রজ মহাশয় বহুবিবাহ শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন করেন।

১৮৬৯ খৃঃ অব্দে মল্লিনাথের টীকাসহিত মেঘদূতের 'পাঠাদিবিবেক' মুদ্রিত করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের পাঠের জন্য ১৮৭০ খৃঃ অব্দে 'উত্তরচরিত' ও (১৮৭১ খৃঃ অব্দে) 'অভিজ্ঞানশকুন্তল' নাটকের স্বয়ং টীকা করিয়া মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন।

অগ্রজ মহাশয়, জননীদেবীর মৃত্যুর পর অবধি দেশে আগমন করেন নাই সত্য বটে ; কিন্তু জন্মভূমির লোকের হিতকামনায় দাতব্য-চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া দিয়াছেন. ডাক্তারখানায় সকলেই বিনা মূল্যে ঔষধ পাইয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত যে সকল ভদ্র-কুলাঙ্গনা ডাক্তারখানায় না যান, প্রত্যহ একবার তাহাদিগকে এবং গ্রামের কি ভদ্র কি অভদ্র সকলের বাটীতে রোগীগণকে দেখিতে যাইবার জন্য, বিনাভিজীটে ডাক্তারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ৭৭।৭৮।৭৯।৮০ এই কয়েক বৎসর দেশব্যাপক ম্যালেরিয়া-জ্বরের প্রাদুর্ভাব হইলে, ডাক্তারখানার যেরূপ ব্যয় নির্দিষ্ট ছিল, তদপেক্ষা চতুর্গুণ ব্যয়বাহুল্যের ব্যবস্থা করিলেন। দরিদ্র রোগীগণ পথ্যের দরুণ সাগু, মিছরী প্রভৃতি পাইত, অনাথ ব্যক্তিদিগের অন্নের ব্যবস্থা করিয়া

দিয়াছিলেন। দেশস্থ যে সকল নিরুপায়দিগকে মাসহারা দিতেন, তাহা যথাসময়ে পাঠাইতে বিস্মৃত হন নাই। কেবল ম্যালেরিয়া-নিবন্ধন বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ উপস্থিত হইতে না পারায়, অগত্যা বন্ধ করিতে বাধ্য হইলেন।

কর্মটাঁর

কলিকাতায় সর্বদা অবস্থিতি করিলে, দাদার শরীর সুস্থ হওয়া দুষ্কর। কারণ, প্রাতঃকাল হইতে নিরুপায় লোক আসিয়া, কেহ চাকরির জন্য, কেহ সুপারিস-পত্রের জন্য, কেহ মাসহারার জন্য, কেহ কন্যার বিবাহের সাহায্য-দান জন্য, কেহ পুস্তকের জন্য, কেহ বিনা বেতনে পুত্র বা আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতিকে বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট কবিয়া দিবার জন্য সর্বদা বিরক্ত করিয়া থাকেন। দ্বার অবারিত ছিল, লোকের প্রবেশ-নিবারণ-জন্য দ্বারে প্রহরী ছিল না। যাহার যখন ইচ্ছা, বিনা অনুমতিতে বাটী প্রবেশ করিয়া দেখা করিতে পারিত। সচরাচর বড় লোকের দ্বারে যেমন প্রহরী উপস্থিত দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহার সে আড়ম্বর ছিল না। সুতরাং প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি নয়টা পর্যন্ত, সর্বদা নানাপ্রকারের লোক আসিয়া বিরক্ত করিত। প্রাতঃকাল হইতে সমাগত অধিক লোকের সহ কথাবার্তা ও গল্প করিয়া, রাত্রিতে নিদ্রা হইত না; সুতরাং উদারময় হইয়া কষ্ট পাইতেন। ইত্যাদি কারণে আত্মীয় বন্ধু ও চিকিৎসকগণের পরামর্শানুসারে, সাঁওতাল পরগণার অন্তঃপাতী কর্মটাঁরে রেলওয়ে স্টেশনের অতি সন্নিহিত এক বাঙ্গালা-ঘর ক্রয় করেন। মধ্যে মধ্যে তথায় যাইয়া কিছু সুস্থ থাকিতেন; এজন্য তথায় অবস্থিতি করিতেন। ক্রমশ তথায় প্রতিবাসী সাঁওতালগণের সহিত তাঁহার উত্তমরূপ সদ্ভাব ও পরিচয় হইয়াছিল। সাঁওতালদের মধ্যে অনেকে তাঁহার বাগানে মজুরি কার্য্য করিতে আসিত; তাহাদের দৈনিক বেতন কিছু বেশী করিয়া দিতে লাগিলেন। সাঁওতালদের সংস্কার ছিল যে, বাঙ্গালীরা লোক ভাল নয়; কিন্তু দাদার উদারতা ও দয়া দেখিয়া, তাহারা সকলেই পরিতোষলাভ করিয়াছিল। ঐ স্থানীয় লোকের লেখাপড়া শিক্ষার জন্য, তথায় স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন; এই বিদ্যালয়ে আজও পর্যন্ত মাসিক কুড়ি টাকা ব্যয় করিয়া আসিতেছিলেন। প্রতি বৎসর পূজার সময় কর্মটাঁরের সাঁওতালদের জন্য সহস্র টাকার অধিক বস্ত্র ক্রয় করিয়া বিতরণ করিতেন। শীতকালে জঙ্গলপ্রদেশে অত্যন্ত শীত হয়। সাঁওতালদের গাত্রে শীতবস্ত্র নাই দেখিয়া, প্রতি বৎসর যথেষ্ট মোটা চাদর ও কম্বল ক্রয় করিয়া তাহাদিগকে বিতরণ করিতেন। শীতকালে যথেষ্ট কমলালেবু ও কলসী খেজুর প্রভৃতি নানা-প্রকার উপাদেয় দ্রব্য কলিকাতা হইতে ক্রয় করিয়া লইয়া যাইতেন, এবং সাঁওতালদিগকে নিকটে বসাইয়া ঐ সকল দ্রব্য খাওয়াইতেন।

সন ১২৭৯ সালের আষাঢ় মাসে অগ্রজ মহাশয়ের মধ্যমা দুহিতা শ্রীমতী কুমুদিনী দেবীর বিবাহ হয়। বর শ্রীঅঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়, নিবাস রুদ্রপুর, জেলা চব্বিশ পরগণা।

সন ১২৭৯ সালের মাঘ মাসে কাশী হইতে আমার বাটী যাইবার বিশেষ আবশ্যক হইলে, অগ্রজ মহাশয়কে পত্র লিখি যে, পনের দিবসের জন্য পিতৃদেবের শুশ্রূষাদি কার্য নিষ্পন্ন করেন, এরূপ কাহাকেও প্রেরণ করিবেন। পত্র পাইয়া তিনি ভাগিনেয় বেণীমাধব মুখোপাধ্যায়কে পাঠাইবার জন্য স্থির করেন। ঐ সময় তাঁহার জ্যেষ্ঠ জামাতা গোপালচন্দ্র সমাজপতি বহুদিন হইতে কায়িক অসুস্থ ছিলেন; তজ্জন্য দাদা তাঁহাকে জলবায়ু-পরিবর্তন মানসে কৃষ্ণনগর পাঠাইয়াছিলেন। তথায় সম্পূর্ণরূপ সুস্থ না হইয়া, কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। বেণী, কাশী যাইবেন শুনিয়া, গোপালচন্দ্র, অগ্রজ মহাশয়কে বলেন, আমিও বেণীর সঙ্গে কাশী যাইব। এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে, তিনিও সম্মত হইলেন। জামাতা, বেণীর সহিত কাশী গমন করেন। আমি উঁহাদিগকে রাখিয়া ২০শে মাঘ কলিকাতায় যাত্রা করি, তথায় দুই চারি দিবস অবস্থিতি করিয়া দেশে গমন করি।

সন ১২৭৯ সালে ২৩শে মাঘ অগ্রজের জ্যেষ্ঠ জামাতা গোপালচন্দ্র সমাজপতি, বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া কাশীপ্রাপ্ত হন। ইহাতে বেণীমাধব, কাশীতে ক্ষণমাত্র অবস্থিতি করিতে ইচ্ছা না করিয়া, কলিকাতায় সংবাদ লিখিলে, দাদা শোকে অভিভূত হইলেন। পরে আমাকে সংবাদ লিখিলেন যে, পত্রপাঠমাত্রেই কাশী যাইয়া বেণীকে পাঠাইয়া দিবে। আমি আদেশপত্র পাইবামাত্র কাশী যাইয়া, বেণীকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলাম।

দাদা, জ্যেষ্ঠ জামাতার মৃত্যুর পর, তাহার মাতা, ভগিনী ও ভ্রাতাকে কলিকাতায় আনিয়া, স্বতন্ত্র বাটীভাড়া করিয়া রাখিলেন। নিজ হইতে সমস্ত ব্যয় দিয়া, তাহাদের রীতিমত তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। বিধবা তনয়া, মৎস্য ও রাত্রিকালের অন্ন পরিত্যাগ করিলে, তিনিও কিছু দিনের জন্য ঐরূপ করিলেন, এবং কন্যার ন্যায় একাদশী করিতে আরম্ভ করিলেন। কিছুদিন পরে ঐ বিধবা-কন্যা হেমলতার অনুরোধে মৎস্য খাইতে আরম্ভ করিলেন এবং একাদশী করা বন্ধ করিলেন। ঐ কন্যার পুত্রদ্বয়কে এরূপভাবে লালনপালন ও শিক্ষিত করিলেন যে, উঁহারা পিতৃহীন হইয়াও উঁহাদিগকে একদিনের জন্যও কোন ক্লেশ অনুভব করিতে হইল না। ঐ কন্যার দেবরের পালন ও শিক্ষার বন্দোবস্ত করিলেন, এবং ঐ কন্যাকে শোকে অভিভূত দেখিয়া, উঁহার হস্তে সাংসারিক ব্যয়-নির্বাহের ও তত্ত্বাবধানের ভার দিলেন। তদবধি আজ পর্যন্ত ঐ কন্যা সাংসারিক সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিয়া আসিতেছেন। দাদার অভিপ্রায়ানুসারে দয়াদাক্ষিণ্যাদিসহ সংসারকার্যের তত্ত্বাবধান করায়, ঐ কন্যা তাঁহার সমধিক স্নেহের ভাজন হইয়াছিল।

কাশী

সন ১২৮০ সালের অগ্রহায়ণ মাসের প্রারম্ভে, পিতৃদেব অত্যন্ত পীড়িত হন। এই সংবাদ প্রাপ্তি-মাত্রেই অগ্রজ মহাশয়, কর্মটার হইতে কাশী গমন করেন। কাশীতে তিনি প্রায় দুই সপ্তাহ কাল অবস্থিতি করেন, অনেক শুশ্রূষাদি দ্বারা পিতৃদেব সম্পূর্ণরূপ আরোগ্যলাভ করেন। দাদার উপস্থিত-সময়ে, পিতামহীর একোদ্দিষ্ট-শ্রাদ্ধে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করান হয়। শ্রাদ্ধকালে তাঁহারা বেদপাঠ করিয়া থাকেন; তাহা শুনিবার জন্য অনেকেই আমাদের বাসায় উপস্থিত হইতেন। দাদা দেখিলেন যে, তাঁহারা বাঙ্গালী ব্রাহ্মণদের মতন ভোজন করিতে করিতে উচ্ছিষ্ট দ্রব্য বস্ত্রে বন্ধন করেন নাই। ইহারা ভোজনের সময় গ্রাসকালে একবার সকলে চীৎকার করিয়া, সঙ্গীতের ন্যায় শ্রুতি-সুখকর বেদপাঠ করিয়া ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন; তৎপরে আর কাহাকেও কথা কহিতে দেখা যায় নাই। আমাদের দেশীয় ব্রাহ্মণ-ভোজনের সময় যেরূপ গোলযোগ হয়, এখানে সে গোলের সম্পর্ক নাই, পাতে কেহ কোন দ্রব্য ফেলেন নাই, সকলেরই পাত পরিষ্কার; ইহা দেখিয়া দাদা পরম আহ্লাদিত হইলেন। তাঁহারা ভোজনান্তে আচমন করিয়া, পান ও দক্ষিণাগ্রহণ সময়ে কৃতিকে বেদপাঠ করিয়া আশীর্বাদ করিয়া থাকেন। আমরা যেরূপ দক্ষিণা দিতাম, দাদা তদপেক্ষা অধিক দক্ষিণা ব্যবস্থা করিয়া বলিলেন, 'আগামী বৈশাখমাসে মাতৃশ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণভোজনের সময় কাশী আসিব।'

মৃত মদনমোহন তর্কালঙ্কার, দাদার বাল্যবন্ধু ও সহাধ্যায়ী ছিলেন। এজন্য তাঁহার জননী বিশ্বেশ্বরী দেবীকে তিনি মাতৃ-সম্বোধন করিতেন। তর্কালঙ্কারের পত্নীর সহিত তাঁহার মনের মিল হইত না; সুতরাং সর্বদা বিবাদ হইত। একারণ, তর্কালঙ্কারের জননী, কলিকাতায় বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভবনে আসিয়া, দাদার নিকট রোদন করেন। তিনি তাঁহাকে অতি শীর্ণকায়া দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বলিলেন, 'মা! তোমার উপযুক্ত সন্তান লোকান্তরিত হইয়াছেন; এক্ষণে আপনার বধূর সহিত যেরূপ অসদ্ভাব দেখিতেছি, তাহাতে আপনার উহার সংস্রবে থাকা বিধেয় নহে; আমি আপনার জীবদ্দশায় মাসিক দশ টাকা দিতে পারি, আপনি কাশীতে অবস্থিতি করুন।' ইহা শুনিয়া তর্কালঙ্কারের জননী বিশ্বেশ্বরী দেবী আহ্লাদিত হইয়া, স্বতন্ত্র পাথেয় গ্রহণ-পূর্বক কাশীবাস করিলেন। তথায় থাকিয়া সবলকায় হইলেন এবং দশ বৎসর পরে পুনরায় দাদার নিকট অতিরিক্ত টাকা লইয়া কথকতা দিয়াছিলেন। তথায় আঠার বৎসর থাকিয়া, তর্কালঙ্কারের জননী কাশীলাভ করেন।

ভূতপূর্ব সংস্কৃত-কলেজের স্মৃতি-শাস্ত্রাধ্যাপক ভরতচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়ের গুরু-কন্যা বিন্ধ্যবাসিনী দেবী, স্বীয় কষ্টের কথা ব্যক্ত করিলে, অগ্রজ মহাশয় তাঁহার ক্লেশ-নিবারণের জন্য মাসিক চার টাকা মাসহারা বন্দোবস্ত করিয়া দেন। ইনি প্রায় দশ বৎসর মাসহারা পাইয়া কাশীলাভ করেন। ভরতচন্দ্র শিরমণি মহাশয়

ঐ সংবাদ পাইয়া তিনিও ঐ অনাথা বৃদ্ধা গুরু-কন্যাকে সাহায্য করিতেন। আমাদের দেশস্থ দীর্ঘগ্রামবাসী চট্টোপাধ্যায়দের বাটীর দুহিতা বিন্ধ্যবাসিনী দেবী, সম্ভ্রান্ত কুলীনস্বামী বর্তমানেও অন্নবস্ত্র না পাইয়া, কাশীবাস করিয়া শ্রমসাধ্য কার্য করিয়া দিনপাত করিতেন। ক্রমশ বার্ধক্যনিবন্ধন কার্য করিতে অক্ষম হইয়া দাদাকে বলেন, 'বাবা বিদ্যাসাগর। তোমার জননী আমাকে মাসে দুই টাকা করিয়া দিতেন, তাঁহার মৃত্যুর পর তোমার পিতা আমাকে আর দেন না; আমার বড়ই কষ্ট হইয়াছে।' অগ্রজ মহাশয় এই কথা শুনিয়া, মাসিক তিন টাকা মাসহারা ব্যবস্থা করেন। ইনি দ্বাদশ বৎসর মাসহারা পাইয়া কাশীলাভ করেন।

দাদার পরমবন্ধু পরমধার্মিক বাবু অমৃতলাল মিত্র মহাশয়, পীড়ানিবন্ধন শেষাবস্থায় কাশীবাস করেন। ইনি দেশহিতৈষী ও বিদ্যোৎসাহী লোক ছিলেন। ইনি কাশীবাস করিয়াও সর্বদা লোকের হিতাকাঙ্ক্ষায় ব্যাপৃত ছিলেন। ইনি প্রাচীন দুষ্প্রাপ্য পুস্তক সকল সংগ্রহ করিয়া, কলিকাতায় প্রেরণ করিতেন। পূর্বে যৎকালে দাদা কলিকাতায় রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন, তৎকালে কলিকাতা সভা-বাজারস্থ রাজবাটীতে যাইয়া, বাবু অমৃতলাল, বাবু আনন্দকৃষ্ণ ও শ্রীনাথবাবুর সহিত পরামর্শ করিতেন; কাশীতেও অমৃতবাবুর সহিত পরামর্শ করিতেন। উক্ত মহাশয়ের অনুরোধে, তাঁহার অনুগত শ্রীযুক্ত তারাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়কে মাসিক চার টাকা, আর বাপুদেব শাস্ত্রীকে মাসিক দুই টাকা মাসহারা প্রদান করিতেন।

পিতৃদেবের কেদারঘাটের আত্মীয় অশীতিবর্ষীয় রাধানাথ চক্রবর্তীকে অগ্রজ মহাশয়, মাসিক তিন টাকা মাসহারার বন্দোবস্ত করেন। কয়েক বৎসর যথাসময়ে টাকা পাইয়া, কিছুদিন হইল ইনি কাশীলাভ করিয়াছেন।

জননীদেবীর অনুরোধে, পিতৃদেবের পিতৃষ্বসার দুহিতা নিস্তারিণী দেবীকে মাসিক চার টাকার ব্যবস্থা করেন। ইনি প্রায় ত্রয়োদশবর্ষ টাকা পাইয়া কাশীপ্রাপ্ত হন।

পিতৃদেবের পুরোহিত রামমাণিক্য তর্কালঙ্কার মহাশয়কে মাসিক দশ টাকার ব্যবস্থা করিয়া, পরে অথর্ব হইলে আর পাঁচ টাকা বৃদ্ধি করিয়া দেন। ইনি প্রায় পনের বৎসর টাকা পাইয়া, ইহলোক হইতে পরলোকে গমন করেন।

পিতৃদেবের বেদপাঠী পুরোহিত চিন্তামণি ভট্টকে মাসিক তিন টাকা মাসহারা দিতেন। এইরূপ অনেকের মাসহারার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

দাদা, স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য পদব্রজে প্রত্যহ প্রাতে ও সায়ংকালে প্রায় দুই ক্রোশ ভ্রমণ করিতেন। ভ্রমণ করিতে যাইবার সময় সঙ্গে কুড়ি-বাইশ টাকার সিকি, দুয়ানি ও আধুলি লইতেন। পথে অনাথ, কুষ্ঠরোগী, কাণা, খঞ্জ, কালা, রুগ্ন দেখিলেই অবস্থানুসারে দান করিতেন। বাসায় যে সকল বৃদ্ধ ও দীন ব্যক্তি এবং যে সকল বৃদ্ধা ও ভদ্রকুলাঙ্গনা সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া কষ্টের কথা আবেদন করিতেন, তাহাদের প্রত্যেককে দুই টাকা এবং এক এক জোড়া বস্ত্র প্রদান

করিতেন। যে কয়েক দিবস কাশীতে অবস্থিতি করিতেন, প্রাতে পিতৃদেবের পাকাদিকার্য স্বহস্তে নির্বাহ করিতেন। বাল্যকালে দাদা স্বয়ং পাকাদিকার্য নির্বাহ করিয়া লেখাপড়া শিক্ষা করিতেন, বাল্যকালের অভ্যাস অদ্যাপি বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। কাশীতেও পাকাদিকার্য সমাধা করিয়া, পিতৃদেবের ভোজনান্তে পিতার উচ্ছিষ্ট পাত্রে প্রসাদ পাইতেন। ভোজনান্তে আমি পিতৃদেবকে মহাভারত শ্রবণ করাইতাম। কিন্তু দাদা যে কয়েক দিবস থাকিতেন, সেই কয়েক দিবস তিনি স্বয়ং মহাভারত শুনাইতেন। সন্ধ্যার পর দাদা, পিতৃদেবের প্রমুখাৎ পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ প্রভৃতির রীতিনীতি ও গল্প শ্রবণ করিতেন। ইহা সাধারণের নিকট প্রকাশ করিবার মানসে আমায় আদেশ করেন যে, পিতৃদেব সম্পূর্ণ সুস্থ হইলে তুমি পূর্বপুরুষগণের নাম, ধাম, আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি প্রভৃতি অবগত হইয়া, আমায় লিখিয়া পাঠাইবে। নানা কার্যে ব্যাপৃত থাকায়, অগত্যা উঁহাকে কলিকাতায় যাইতে হইত, তথায় যাইয়া নিশ্চিত থাকিতে পারিতেন না। পিতৃদেব আনারস, চাল্তা, ছোট উচ্ছে, প্রভৃতি যে সমস্ত দ্রব্য ভালবাসিতেন, কাশীতে ঐ সকল দ্রব্য দুষ্প্রাপ্য বলিয়া, দাদা সময়ে সময়ে কলিকাতা হইতে ঐ সমস্ত দ্রব্য পাঠাইতেন।

সন ১২৮১ সালের অগ্রহায়ণ মাসে অগ্রজ মহাশয়, উদরাময় ও শিরঃপীড়ায় অত্যন্ত ক্লেশানুভব করেন। সেই সময়ে স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্য কানপুরে গঙ্গাতীরে বাটী ভাড়া লইয়া অবস্থিতি করেন। তথায় কয়েক মাস অবস্থিতি করিয়া, সম্পূর্ণরূপ আরোগ্যলাভ করেন এবং তথা হইতে লক্ষ্ণৌ শহরে গমন করেন। তথায় বাবু রাজকুমার সর্বাধিকারী মহাশয়ের বাসায় কয়েক দিন যাপন করিয়া, প্রয়াগে গমন করেন; তথায় কতিপয় দিবস অতিবাহিত করিয়া, চৈত্র মাসের শেষে, বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুইটি পুত্রসহ কাশীধামে প্রত্যাগমন করেন। দাদা, কাশীতে যখন থাকিতেন, প্রায়ই স্বয়ং দশাশ্বমেধের ঘাটে বাজার করিতে যাইতেন। তজ্জন্য অনেকে বলিতেন, 'চাকর দ্বারা যে কাজ সমাধা হইবে, তাহা স্বয়ং সমাধা করিতে লজ্জা বোধ হয় না? এরূপ দেখিয়া আমাদিগের লজ্জা বোধ হয়।' দাদা বলিতেন, 'তবে আপনারা পথে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন না। পিতার জন্য বাজার করিতে আসিয়াছি, ইহাতে আমি পরম সন্তোষলাভ করিয়া থাকি। যাঁহারা না পারেন, তাঁহারা চাকরের দ্বারাই এ সকল কাজ করিয়া থাকেন। আমি বিষয়কর্মে লিপ্ত না থাকিলে, এখানে নিরন্তর থাকিয়া পিতার চরণ-সেবা করিয়া, আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিতাম।'

সন ১২৮১ সালের বৈশাখ মাসে জননীদেবীর একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধোপলক্ষে মহারাষ্ট্রীয় বেদপাঠী ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ করা হয়। নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণেরা সমাগত হইলে, কৃতীকে স্বয়ং ব্রাহ্মণদিগের পাদপ্রক্ষালন করিয়া দিবার প্রথা থাকায়, আমি ঐ কার্য সমাধা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। দাদা, ইহা দেখিয়া বলিলেন, 'তুমি

একাই কি এ কার্য নিষ্পন্ন করিবে? আমি কি কেহ নই?' এই বলিয়া দাদা, ঐ সকল ব্রাহ্মণদের পা ধোয়াইয়া দিতে লাগিলেন। ঐ সকল ব্রাহ্মণদের মধ্যে দুই-চারি জনের পায়ে ঘা থাকাপ্রযুক্ত তাহাতে পূঁজ নির্গত হইতেছিল; তাহা দেখিয়াও তিনি কিছুমাত্র ঘৃণাবোধ করেন নাই। অপরাপর দর্শকগণ দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিযাছিলেন, এরূপ মাতৃভক্তি অপর কোন সম্ভ্রান্ত লোকের দৃষ্ট হয় না।

কলিকাতানিবাসী বাবু শিবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, জালিয়াতি অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া দোষী সাব্যস্ত হন। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সার মর্ডাণ্ট ওরেন্স, তাঁহার প্রতি দ্বীপান্তব-প্রেরণ দণ্ডাজ্ঞাপ্রদানসময়ে যাবতীয় বঙ্গবাসীদিগকে জালিয়াৎ, মিথ্যাসাক্ষীদাতা প্রভৃতি বলিয়া দোষারোপ করেন ও নানা কটুবাক্য প্রয়োগ করেন। তাহাতে অগ্রজ মহাশয়, কলিকাতাবাসী ন্যূনাধিক পঞ্চসহস্র সম্ভ্রান্ত কৃতবিদ্য ভদ্রলোকদিগকে একযোগ করিয়া, সাব রাজা রাধাকান্ত দেবের বাটীতে বসিয়া, স্থিরভাবে কথাবার্তার পর কার্যশেষ করিয়া, সকলেব সহ একযোগে দরখাস্ত লিখিয়া স্বাক্ষর কবিলেন ও করাইলেন, এবং ঐ দরখাস্ত গবর্নর জেনারেলের মারফতে বিলাতে স্টেট-সেক্রেটারির নিকট পাঠান। ঐ দরখাস্ত অনুসারে স্টেট-সেক্রেটারি, গবর্নর জেনারেলকে লিখেন যে, আপনি সার মর্ডাণ্ট ওরেন্সকে সাবধান করিয়া দিবেন, অতঃপর যেন এরূপ অন্যায় কার্য আর না করেন। বঙ্গদেশে দাদাই একযোগের পথপ্রদর্শক হন।

ঐ সময় কলিকাতা সংস্কৃত-কলেজের প্রফেসার পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়, বায়ু-পরিবর্তন-মানসে কাশীধামে আগমন করিয়াছিলেন। দাদার সহিত তাঁহার বিশেষ আত্মীয়তা দেখিয়া, বাঙ্গালী-দল-সংক্রান্ত ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে অনুরোধ করেন যে, বিদ্যাসাগরের সহিত আমাদের মনান্তর হইয়াছিল, তাহা আপনি মধ্যস্থ হইয়া মীমাংসা করিয়া দেন। দলস্থ বাঙ্গালী ব্রাহ্মণদের অনুরোধে তিনি দাদাকে বলেন, 'কাশীবাসী দলস্থ ব্রাহ্মণদের সহিত আপনার বিরোধ মীমাংসা হইলে আমি পরম সুখী হইব।' ইহা শুনিয়া দাদা উত্তর করিলেন, 'কাশীর ভিক্ষুক, প্রতারক ব্রাহ্মণদের সহিত আমাকে কি নিষ্পত্তি করিতে হইবে? পিতৃদেব এখানে বাস করিবার মানসে আগমন করেন নাই, এখানে মৃত্যু-কামনায় আসিয়াছেন। কাশীস্থ দলসংক্রান্ত ব্রাহ্মণেরা আমায় ভয় দেখাইয়া প্রচুর অর্থ চাহেন; তাহা না দেওয়াতে ভয় দেখাইয়া জব্দ করিবেন বলিয়া থাকেন। পুরোহিত মাতঙ্গীপদ ন্যায়রত্নকে ভয় দেখাইয়া ত্যাগ করাইয়াছেন। একারণ, রামমাণিক্য তর্কালঙ্কার মহাশয়কে পুরোহিত নিযুক্ত করা হইয়াছে। কাশীর দুর্বৃত্তগণকে আমি ভালরূপ চিনি, ইহারা কাশীতে সমাগত ব্যক্তিদিগকে যথেচ্ছরূপে উৎপীড়ন করিয়া থাকেন। কিন্তু উঁহারা যাহাই করুন না কেন, আমি কাহারও অনিষ্ট করিব না। এক্ষণে তাঁহারা যদি স্বীকার করেন যে, আমরা অন্যায় কার্যগুলি করিব না, তাহা হইলে তাঁহাদের

সহিত আমার নিষ্পত্তি হইবে। আর তাঁহাদের সহিত আমার কি সম্পর্ক; আমি দান করিব, তাঁহারা গ্রহণ করিবেন, এই সম্পর্ক। এখানে পিতৃদেব, কার্যোপলক্ষে মহারাষ্ট্রীয় বেদপাঠী ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া থাকেন, ইঁহাদের আচার-ব্যবহার দেখিয়া আমার শ্রদ্ধা ও ভক্তি জন্মিয়াছে; কিন্তু আমাদের বাঙ্গালা হইতে যে সকল বাঙ্গালী-ব্রাহ্মণ কাশীবাস করিতেছেন, তন্মধ্যে অনেকেই দুষ্ক্রিয়াসক্ত, ধর্মাধর্মজ্ঞানশূন্য ও মূর্খ। শাস্ত্রজ্ঞ মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণগণ থাকিতে, ইঁহাদিগের প্রতি কেন আমার শ্রদ্ধা ও ভক্তি জন্মিবে?'

অগ্রজ মহাশয় এক দিবস কথাপ্রসঙ্গে পিতৃদেব মহাশয়কে বলেন, 'এতাবৎকাল ভাড়াটিয়া বাটীতে কলিকাতায় অবস্থিতি করিতেছি; কলিকাতায় বাটী না করিবার তাৎপর্য এই যে, যদি বীরসিংহা জন্মভূমি বিস্মৃত হই। এক্ষণে কলিকাতায় বাটী না করিলে, সময়ে এই এক মহৎ কষ্ট হয় যে, কতকগুলি পুস্তকের সেল্ফ আছে, মধ্যে মধ্যে এক বাটী হইতে অপর বাটীতে লইয়া যাইতে অনেক ক্ষতি হইয়া থাকে; ইত্যাদি কারণে স্থান ক্রয় করিয়া বাটী প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা করি, আপনার মত কি।' তাহাতে পিতৃদেব বলিলেন, 'তুমি পুস্তক রাখিবার উপলক্ষে বাটী প্রস্তুত করিবে, এ সংবাদে পরম সন্তোষলাভ করিলাম, ত্বরায় বাটী প্রস্তুতের উদ্যোগ কর।' দাদা পিতৃদেবের বিনা অনুমতিতে কখনও কোন কার্য করেন নাই।

দাদা এক দিবস কথাপ্রসঙ্গে পিতৃদেবকে বলেন, 'আয়ের হ্রাস হইয়াছে, যাহাদিগকে যাহা দিয়া থাকি তাহা বন্ধ করিতে পারিব না; ইত্যাদি নানা কারণে বড় দুর্ভাবনা হইয়াছে।' ইহা শুনিয়া পিতৃদেব, আমি ও বাবু অমৃতলাল মিত্র, আমরা তিন জনেই বলিলাম, 'যাহাকে যাহা দিয়া থাকেন, তাহার কিছু কিছু কম করিয়া দেন।' ইহা শুনিয়া দাদা বলেন, 'কেমন করিয়া তাহাদিগকে কমের কথা বলিব?' আমরা বলিলাম, 'পিতৃদেবকে মাসে ষাট টাকা পাঠান, অতঃপর চল্লিশ টাকা পাঠাইবেন। ভ্রাতৃবর্গের প্রত্যেককে মাসিক যাবজ্জীবন সত্তর টাকা দিবার স্বীকার আছেন, যতদিন আপনার আয়ের লাঘব থাকিবে, ততদিন আমাদের প্রত্যেককে মাসে চল্লিশ টাকা দিলে চলিবে। এই হিসাবে যত লোককে মাসিক যাহা দিয়া থাকেন, সকলেরই কমাইয়া দিবেন। ফর্দের শিরোভাগে আমাদের নাম দেখিলে, কেহ আপনাকে বিরক্ত করিতে পারিবে না। যখন পিতা ও ভ্রাতার কম হইল, তখন তাঁহারা কোন আপত্তি করিতে পারিবেন না।' সেই সময় হইতে আমাদের সকলেরই মাসিক বৃত্তি কমিয়াছিল; কিন্তু আয় বৃদ্ধি হইলে, আমায় মাসিক চল্লিশ টাকার পরিবর্তে ষাট টাকা দিয়া আসিতেছিলেন। আয় কম হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, 'বর্তমান ছোটলাট ক্যাম্বেল সাহেবের সহিত আমার মনান্তর হয়। মনান্তরের কারণ এই যে, কলিকাতা সংস্কৃত-কলেজের স্মৃতিশাস্ত্রাধ্যাপকের পদ পাইবার সময় আমার সহিত পরামর্শ

করিয়া, আমার উপদেশের বিরুদ্ধে ঐ পদ উঠাইবার আজ্ঞা দেন এবং প্রকাশ করেন যে, এ বিষয় তিনি আমাদের সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য করিয়াছেন। কিন্তু আমি ইহা দ্বারা সাধারণের ক্ষতি ও নিজের অপবাদ দেখিয়া ঐ বিষয় প্রকাশ করায়, তাঁহার সহিত মনান্তর হয়। এই কারণে, শিক্ষা-বিভাগে আমার পুস্তকের বিক্রয় কমিয়া যাওয়ায়, আয়ের অনেক হ্রাস হইয়াছে।'

একদিন কথাপ্রসঙ্গে পিতৃদেব মহাশয় ব্যক্ত করেন, 'তোমার প্রতি বাল্যকালে আমি সামান্য ব্যয় করিয়াছি। কিন্তু তুমি আমার জন্য বহুব্যয় করিতেছ, তজ্জন্য আমি মানসিক সুখানুভব করিয়া থাকি। কোন বিষয়ে আমার কোন কষ্ট নাই। তুমি আমার বংশে রাম-অবতার হইয়াছ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; তুমি ধর্মশীল, সত্যপরায়ণ, পিতৃভক্তি-পরায়ণ; কেবল আমার মনে কখন কখন সামান্য একটু কষ্টানুভব হইয়া থাকে।' ইহা শুনিয়া দাদা বলিলেন, 'কি, তাহা ব্যক্ত করুন। সাধ্য হয়, অবশ্য তাহা সম্পাদন করিতে ত্রুটি করিব না।' পরে পিতৃদেব বলেন, 'তোমার কনিষ্ঠ সহোদর ঈশান, পড়াশুনা ত্যাগ করিয়া বনে বনে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে, এই আমার আন্তরিক দুঃখের কারণ; তাহাকে ও তাহার পত্নীকে এখানে পাঠাইতে পারিলে, আমি পরম সুখী হইব।' ইহা শুনিয়া অগ্রজ বলিলেন, 'আমি যাইয়া তাহাকে পত্র লিখিয়া কলিকাতায় আনাইয়া পাঠাইবার চেষ্টা করিব, আপনিও তাহাকে এখান হইতে পত্র লিখুন।' পরে পিতৃদেব বলিলেন, 'শুনিতে পাই, তাহার অনেক ঋণ আছে, তাহা পরিশোধ করিয়া পাঠাইবে।' এই কথা শুনিয়া দাদা বলিলেন, 'ইতিপূর্বে একবার তাহার যথেষ্ট ঋণ পরিশোধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তৎকালে কোন কর্মের ভার দিব বলিয়াছিলাম; সে কোন কর্মে লিপ্ত থাকিতে ইচ্ছা করে নাই।' অতঃপর অগ্রজ মহাশয় কয়েক দিবস কাশীতে অবস্থিতি করিয়া কর্মটারে প্রত্যাগমন করেন, তথায় আট-দশ দিন থাকিয়া কলিকাতায় গমন করেন।

সন ১২৮২ সালের ৩০শে আষাঢ় মঙ্গলবার অগ্রজ মহাশয়ের তৃতীয়া কন্যা বিনোদিনী দেবীর বিবাহ হয়। বর, বাবু সূর্যকুমার অধিকারী। ইনি একুশ বৎসর বয়সের সময় হেয়ার-স্কুলের শিক্ষকতাকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। বিবাহের পর অগ্রজ মহাশয়, সূর্যবাবুকে ঐ পদ পরিত্যাগ করাইয়া, মেট্রোপলিটানে সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত করাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। এবিষয়ে সূর্যবাবু প্রথমত অসম্মতি প্রকাশ করেন; অনেক বাদানুবাদের পর, দাদার আগ্রহাতিশয় দেখিয়া ও অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া, তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হন। সূর্যবাবু, হেয়ার-স্কুলের কর্ম পরিত্যাগ করিয়া, মেট্রোপলিটানে সেক্রেটারির পদে নিযুক্ত হন।

১৮৬৫ সালে অগ্রজ মহাশয়, উত্তরপাড়ায় গাড়ী হইতে পড়িয়া যকৃতে আঘাত লাগায় যে বেদনা হইয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণরূপ ভাল হয় নাই; মধ্যে মধ্যে ঐ

স্থানে বেদনা হইত। এক্ষণে তাহা প্রবল হইয়া উঠিলে, অত্যন্ত যাতনায় অভিভূত হইলেন। অগ্রজের আত্মীয় ডাক্তার সূর্যকুমার সর্বাধিকারী মহাশয় যত্নপূর্বক চিকিৎসা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই রোগের উপশম হইল না, ক্রমশ যাতনার বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ভয়প্রযুক্ত বাসাবাটী পরিত্যাগ করিয়া, সুকিয়া স্ট্রীটে তাঁহার পরমবন্ধু বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভবনে যাইয়া অবস্থিতি করিলেন। রাজকৃষ্ণবাবু ও তাঁহার পুত্র সুরেন্দ্রবাবু এবং ভাগিনেয় বেণীমাধব ও ভ্রাতৃ-জামাতা নীলমাধব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সকলে শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে, ডাক্তারবাবু সূর্যকুমার সর্বাধিকারী মহাশয়, তৎকালের বিখ্যাত ডাক্তার পামর সাহেব মহোদয়কে রোগ-নির্ণয় করিতে আনয়ন করেন। তাহাতেও সম্পূর্ণরূপ আরোগ্যলাভ করিতে পারেন নাই সত্য, কিন্তু যাতনার অনেক হ্রাস হইয়াছিল। অবশেষে দাদার পরমবন্ধু ডাক্তার বাবু মহেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়, প্রায় একমাস কাল চিকিৎসা করিলে, তিনি সম্পূর্ণরূপ আরোগ্য লাভ করেন। অগ্রজ মহাশয়, সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ হইয়া, পিতৃদেবের আদেশ প্রতিপালনজন্য কনিষ্ঠ সহোদর ঈশান ও তৎ-পত্নীকে আনাইয়া, কাশীতে তাঁহার নিকটে প্রেরণ করিলেন এবং তাহার সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়া দিলেন। ঈশান, পরিবার-সহ সন ১২৮২ সালের ১৩ই শ্রাবণ কাশীতে উপস্থিত হইল। ইহাকে পিতার শুশ্রূষাদি কার্যে নিযুক্ত করিয়া, আমি কর্মটারে দাদার সহিত সাক্ষাৎ করি। কয়েক দিবস তথায় থাকিয়া দেখিলাম, তিনি তখনও সম্পূর্ণরূপ সবলকায় হইতে পারেন নাই। তিনি প্রাতঃকাল হইতে বেলা দশ ঘটিকা পর্যন্ত, সাঁওতাল রোগীদিগকে হোমিওপ্যাথি-মতে চিকিৎসা করিতেন এবং পথ্যের জন্য সাগু, বাতাসা, মিছরি প্রভৃতি নিজ হইতে প্রদান করিতেন। আহারাদির পর বাগানের গাছ পর্যবেক্ষণ করিতেন, আবশ্যকমতে একস্থানের চারাগাছ তুলাইয়া অন্য স্থানে বসাইতেন। পরে পুস্তক-রচনায় মনোনিবেশ করিতেন। অপরাহ্ণে পীড়িত সাঁওতালদের পর্ণ-কুটীরে যাইয়া তত্ত্বাবধান করিতেন। তাহাদের কুটীরে যাইলে, তাহারা সমাদরপূর্বক বলিত, 'তুই আসেছিস।' তাহাদের কথা অগ্রজের বড় ভাল লাগিত। আমায় তৎকালে বলেন, 'বড়লোকের বাটীতে যাওয়া অপেক্ষা, এ সকল লোকের কুটীরে যাইতে, আমার ভাল লাগে; ইহাদের স্বভাব ভাল, ইহারা কখনও মিথ্যাকথা বলে না ইত্যাদি কারণে এখানে থাকিতে ভালবাসি।' পরে আমায় বলেন যে, 'বীরসিংহা বিদ্যালয় দেশব্যাপক ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রাদুর্ভাবপ্রযুক্ত কিছুদিনের জন্য বন্ধ হইয়াছে।' আমি তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় উত্তর করিলেন, 'ম্যালেরিয়া-জ্বরনিবন্ধন বিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষকের মৃত্যু হইয়াছে দেখিয়া, ভয়প্রযুক্ত হেড মাস্টার বাবু উমাচরণ ঘোষ রিপোর্ট দেন যে, তিন শত ছাত্রের মধ্যে কোন দিন দুই জন, কোন দিন তিন জন উপস্থিত হয়; উহারা ক্ষণেককাল বেঞ্চে বসিয়া জ্বরে কাঁপিতে কাঁপিতে শয়ন করে। এরূপ

অবস্থায় এত অধিক ব্যয় করিয়া বিদ্যালয় রাখা যুক্তি-সঙ্গত নহে। এ অবস্থায় কোন শিক্ষকই তথায় যাইতে সম্মত নন; সকলেই ভয়ে ব্যাকুল। হেড মাস্টার ও দ্বিতীয় মাস্টার রোগে আক্রান্ত হইয়া চিকিৎসার মানসে কলিকাতায় আসিয়াছেন। তাহাদিগকে পুনর্বার যাইতে অনুরোধ করিলেও তাঁহারা ভয়ে যাইতে সাহস করেন নাই; সুতরাং যতদিন ম্যালেরিয়া থাকিবে, অগত্যা ততদিন বিদ্যালয় বন্ধ থাকিবে।'

কর্মটারে অগ্রজ মহাশয়কে কিছু সুস্থ দেখিয়া, আমি দেশে গমন করিলাম। পুনর্বার পিতৃদর্শনার্থে কাশী গমন করেন; তথায় প্রায় কুড়ি দিবস অবস্থিতি করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। ঐ বৎসর মাঘ মাসে পিতৃদেব অতিশয় পীড়িত হন। তারে বীরসিংহায় সংবাদ পাঠাইয়া, আমাকে কাশী যাইবার সংবাদ লিখিয়া, স্বয়ং ত্বরায় কাশী যাত্রা করেন। অগ্রজের আদেশ পাইবামাত্র, আমি কাশী যাত্রা করি। পিতৃদেব কিছু সুস্থ হইলে, দাদা, আমাকে ও জ্যেষ্ঠা ভগিনী মনোমোহিনীকে তথায় রাখিয়া, স্বয়ং কর্মটার হইয়া কলিকাতা প্রত্যাগমন করেন।

১৮৭২ সালের জুন মাসে হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানিউটিফণ্ড স্থাপিত হয়। অনরেবল জস্টিস বাবু দ্বারকানাথ মিত্র মহোদয় ও অগ্রজ মহাশয় উহার ট্রস্ট্রী মনোনীত হন। অল্পদিনের মধ্যেই এই ফণ্ডের বিশেষ উন্নতি করেন। অনরেবল দ্বারকানাথ মিত্রের মৃত্যুর পর, একা ট্রস্ট্রী-পদে থাকা উচিত নয় বিবেচনা করিয়া, অন্য ব্যক্তিকে ট্রস্ট্রী পদে মনোনীত করেন। হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানিউটিফণ্ডের ডাইরেক্টারদের বিসদৃশ কার্যকলাপ দেখিয়া, সবসক্রাইবার সমূহকে জানাইয়া, ১২৮২ সালের ফাল্গুন মাসে (২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৬) সকলেই ট্রস্ট্রী-পদ পরিত্যাগ করেন।

কিছুদিন পূর্বে এক গণককার বলিয়াছিলেন, সন ১২৮২ সালের ১৪ই চৈত্র হইতে জননীদেবীর মৃত্যুতিথিমধ্যে পিতৃদেবের মৃত্যু হইবে। ১৪ই চৈত্র একবার ভেদ হইয়া নাড়ী দমিয়া যায়; সুতরাং তারে সংবাদ দিয়া অগ্রজ মহাশয়কে আনানো হয়।

সন ১২৮৩ সালের ১লা বৈশাখ সূর্যাস্তসময়ে পিতৃদেব কাশীলাভ করেন। পিতার মৃত্যু দেখিয়া, দাদা রোদন করিতে লাগিলেন। তৎকালে বিস্তর আত্মীয় বন্ধুবান্ধব উপস্থিত ছিলেন। দাদা, জাঁকজমক ভালবাসেন না। উপস্থিত ভদ্র-লোক সমূহকে বিদায় দিলেন এবং প্রকাশ্যভাবে বলিলেন, 'আমাদের পিতাকে আমরাই বহন করিয়া লইয়া যাইব; অন্য ভদ্রলোকদিগকে ক্লেশ দিব না।' এই বলিয়া, তিন সহোদর ও কনিষ্ঠের শ্বশুর প্রতাপচন্দ্র কাঞ্জিলাল মহাশয়, এই চারি-জনে বহন করিয়া লইয়া যাই। পুরোহিত ও ভৃত্য ফুরসতকে সমভিব্যাহারে লওয়া হইয়াছিল। মণিকর্ণিকার ঘাটে দাহাদিকার্য সমাধা করিয়া, স্নান-তর্পণ সমাপনান্তে বাসায় প্রত্যাগমন করা হয়। দাদা, বাসায় উপস্থিত হইয়া ছেলে-

মানুষের মত রোদন করিতে লাগিলেন দেখিয়া, অনেকে আশ্চর্যান্বিত হইলেন যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় নীতিজ্ঞ ও পণ্ডিত লোক হইয়া, বৃদ্ধ পিতার জন্য এত শোকাভিভূত কেন?

২রা বৈশাখ প্রাতঃকাল হইতে দাদার ভেদ বমি হইতে লাগিল। অত্যন্ত দুর্বল হইতে লাগিলেন দেখিয়া. আমরা ভীত হইয়া বলিলাম, 'অদ্য কাশী পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতা যাইব।' প্রথমত, অগ্রজ মহাশয় শ্রাদ্ধাদিকার্য সমাধা করিয়া কলিকাতা যাইবেন, ইহা প্রকাশ করিলেন। কলিকাতা না যাইবার কারণ এই যে, ইতিপূর্বে পিতৃদেব এক উইল প্রস্তুত করিয়া, তাহা অগ্রজের হস্তে সমর্পণ করেন। উইলের মর্ম এই যে, আমার অন্তিমসময়ে জ্যেষ্ঠপুত্র নিকটে থাকিবে ও দাহাদিকার্য সম্পন্ন করিয়া, কাশীতেই আদ্যশ্রাদ্ধ করিবে। আমি যে সকল মহারাষ্ট্রীয় বেদজ্ঞ ও অন্যান্য হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইতাম, তাহা-দিগকে ভোজন করাইবে। তৎপরে স্বয়ং গয়ায় যাইয়া গয়াকৃত্য সমাধা করিবে। এই সকল কারণেই কলিকাতা যাইতে প্রথমত সম্মত ছিলেন না। পরে আমি ঐ সকল ব্রাহ্মণদিগকে আনাইয়া বলিলাম, 'দাদার পীড়া হইতেছে, অতএব দাদাকে অদ্যই কলিকাতা লইয়া যাইতে ইচ্ছা করি, মহাশয়দের এ বিষয়ে মত কি, প্রকাশ করিয়া বলুন।' অগ্রজের অবস্থা অবলোকন করিয়া, তাঁহারা সকলেই দাদাকে কলিকাতা যাইবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন এবং বলিলেন, অতঃপর সুস্থ হইয়া একবার আসিয়া, ব্রাহ্মণ-ভোজনাদি কার্য সম্পন্ন করিবেন। এ অবস্থায় কোন ঔষধ সেবন করিবেন না। কলিকাতায় যাইয়াও তাঁহার অশ্রুবিন্দু নিবারণ হয় নাই!

দশাহে যথাশাস্ত্র ঔর্ধ্বদৈহিককৃত্য সমাধা করেন। পরে এক সময়ে কাশী আগমন করিয়া, পিতার আদেশ প্রতিপালন করিতে বিস্মৃত হন নাই। উইল-অনুসারে কাশীতে কার্য সমাধা করিয়া, পিতৃভক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

সন ১২৮৩ সালের শীতকালে অগ্রজ, বাদুড়-বাগানের নূতন বাটীতে প্রবেশ করেন। ঐ বাটীতেই স্বকীয় লাইব্রেরী স্থাপন করিয়া, একাকী নিভৃতভাবে থাকিবেন, এই অভিপ্রায়েই বাটী নির্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় ছিল, পরিবারগণকে অন্য বাটীতে রাখিব; কিন্তু অন্য বাটী প্রস্তুত না হওয়াতে, সকল পরিবারগণকে ঐ বাটীতে আনয়ন করিলেন; আমরাও শ্রীচরণ-দর্শনে আগমন করিয়া যতদিন ইচ্ছা ঐ বাটীতেই থাকিতাম। এ বাটীতে প্রবেশ করিয়া অবধি, পরিবারবর্গের ও অন্যান্য সমাগত সম্ভ্রান্ত ও দীন-দরিদ্র ব্যক্তিদিগের আহারাদি বিষয়ে প্রচুর পরিমাণে ব্যয় করিতেন। সকলের প্রতি এরূপ সমভাবে প্রত্যহ ভোজন করানো, অপর কোন স্থানে দৃষ্ট হয় না। নিজের আহার বা পরিধেয় বস্ত্রাদির কোন পারিপাট্য ছিল না। দিবসে অন্ন আহার করিতেন এবং রাত্রিতে মুড়ি ও সামান্যরূপ মিষ্টান্ন জলযোগ করিয়া রাত্রি-যাপন করিতেন। এই বাটীতে

সাংসারিক-কার্যে ও আহার-ব্যবহারাদিতে অগ্রজের কনিষ্ঠা কন্যা, তাহার জ্যেষ্ঠা ভগ্নী হেমলতা দেবীর সহযোগিনী ছিল এবং দয়াদাক্ষিণ্যাদিগুণেও উক্ত হেমলতা দেবীর সহযোগিনী ছিল।

সন ১২৮৪ সালের বৈশাখ মাসে দাদার কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবীর বিবাহ হয়। বর, শ্রীযুক্ত কার্তিকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। কনিষ্ঠ জামাতাকে ও কন্যাকে দাদা অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। কনিষ্ঠ জামাতা কার্ত্তিকবাবুকে বাটীতে রাখিয়া, লেখাপড়া শিখাইতে লাগিলেন। কার্তিকবাবু সর্বদা বাদুড় বাগানস্থ ভবনে উপস্থিত থাকিয়া, সমাগত সকল সম্প্রদায়ের লোকের সহিত ভদ্রতা করিতেন; এজন্য অনেকেই কার্তিকবাবুকে ভালবাসিয়া থাকেন।

সন ১২৮৪ সালে অগ্রজ মহাশয়ের ছোট একটি ঘড়ি অদৃশ্য হয়; তাহার কোন অনুসন্ধান হইল না। এক দিবস রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহের পুত্র অগ্রজের নিকট আসিয়া বলেন 'মহাশয়, আপনার ছোট ঘড়িটি কোথায়? একবার দেখিব।' দাদা বলিলেন, 'সেই ঘড়িটি প্রায় পনের দিবস অতীত হইল চুরি গিয়াছে, আর পাওয়া যায় নাই।' ইহা শুনিয়া রাজকুমার বলিলেন, 'আপনার ঘড়ির সদৃশ একটি ঘড়ি লালমোহনবাবুর পুত্র, পাইকপাড়ার একটি মুদীর নিকট কুড়ি টাকায় বন্ধক দিয়াছেন।' ঐ মুদী, ঘড়িটি আমাকে দেখাইতে আসিয়াছিল; আমি তাহাকে বলিয়াছি যে, 'বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই ঘড়ি, ইহা কেমন করিয়া তোমার হস্তগত হইল?' সে বলিল, 'ইহা লালমোহনবাবুর পুত্র আমাকে দিয়াছেন।' ইহা শুনিয়া অগ্রজ মহাশয় নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। উপস্থিত অন্যান্য লোক বলিলেন, 'অমন ছোকরাকে পুলিশে ধরাইয়া দেওয়া উচিত।' তাহাতে দাদা বলিলেন, 'উহার মাতামহ আমাদের অনেক উপকার করিয়াছেন; এক্ষণে তাঁহার দৌহিত্রের এই সামান্য অপরাধ আমার ব্যক্ত করা উচিত নয়।' তৎক্ষণাৎ রাজপুত্রের সহিত পাইকপাড়া যাইয়া, সেই মুদীকে কুড়ি টাকা ও কিছু সুদ দিয়া ঘড়িটি মুক্ত করেন। অনন্তর সেই বালককে সমভিব্যাহারে আনিয়া বলিলেন, 'তোমার মাতামহের অনেক খাইয়াছি এবং বাল্যকালে তাঁহারা আমার অনেক দৌরাত্ম্য সহ্য করিয়াছেন। তোমার যখন যাহা আবশ্যক হইবে, তাহা তুমি আমাকে জানাইলে পাইবে। ক্ষণকালের জন্য আমি কখনও কোন কারণে তোমাদের প্রতি বিরক্ত হইব না।' ইহা শুনিয়া উপস্থিত ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত লোকেরা আশ্চর্যান্বিত হইলেন।

সন ১২৮৫ সালে দাদার আত্মীয় জনকয়েক ব্যক্তি, দাদার পত্র লইয়া পথে ষড়যন্ত্র করিয়া বীরসিংহায় পৌঁছিয়া, বীরসিংহার দাতব্য ডাক্তারখানার চিকিৎসক বাবু শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে দাদার পত্রাদি দেখাইলেন। ডাক্তারবাবু, ষড়যন্ত্রে পতিত হইবার ভয়ে বলিলেন, 'আমি ওরূপ কার্য করিতে অক্ষম।' এই বলিয়া তিনি কলিকাতায় আগমনপূর্বক, দাদার নিকট সমুদয় ষড়যন্ত্রের বিষয় জ্ঞাত করিয়া, পদ পরিত্যাগ করিলেন। দাদা, এই সমস্ত বিষয় পর্যালোচনা করিয়া

ডাক্তারখানা বন্ধ করিলেন, এবং তৎকালে উপস্থিত ডাক্তারখানার সমস্ত দ্রব্য উক্ত ডাক্তার মহাশয়কে প্রদান করিলেন।

১৮৪১ খৃঃ অব্দের শেষে পাঠ্যাবস্থা শেষ করিয়া সংস্কৃত-কলেজ পরিত্যাগ সময়ে, উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকগণ অগ্রজ মহাশয়কে বিদ্যাসাগর উপাধি প্রদান করেন।

১২৭৩ সালের দুর্ভিক্ষসময়ে, কাঙ্গালীরা দাদাকে 'দয়ার সাগর' উপাধি প্রদান করেন।

১৮৮০ সালে মহারাণী ভিক্টোরিয়া, কম্পানিয়ম অব ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার উপাধি প্রদান করেন।

সন ১২৯৪ সালের চৈত্রমাসে অগ্রজ মহাশয় বলিলেন, 'পিতৃদেব আমার প্রতি যে সমস্ত কার্যের ভার দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে তিনটি কার্য করা হয় নাই। প্রথমত, গয়াকৃত্য; আমি শারীরিক যেরূপ দুর্বল আছি, তাহাতে গয়াধামে গিয়া যে, নিজে ঐ সমস্ত কার্য সম্পন্ন করিতে পারিব, এরূপ বোধ হয় না। একারণ, তোমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া যাইব। তুমি সমস্ত কার্য নির্বাহ করিবে, আমি সঙ্গে থাকিব মাত্র। দ্বিতীয়ত, বীরসিংহা গ্রামে বাটীর উত্তরাংশে অনতিদূরে পিতামহের শ্মশানে একটি মঠ নির্মাণ করিয়া, তাহার চতুর্দিকে রেল দিয়া বেষ্টিত করা। তৃতীয়ত, বীরসিংহা গ্রামে পিতামহীদেবীর প্রতিষ্ঠিত অশ্বত্থ-বৃক্ষের মূলে আলবাল-বন্ধন ও তলে স্থানে স্থানে সাধারণের বসিবার উপযোগী প্রস্তর-নির্মিত বেঞ্চ স্থাপন।

অশ্বত্থ-বৃক্ষ

অগ্রজ মহাশয় আমায় বলিলেন, 'পিতামহীর প্রতিষ্ঠিত অশ্বত্থ-বৃক্ষ মধ্যে মধ্যে দেখিয়া থাক?' আমি উত্তর করিলাম, 'না মহাশয়।' দাদা বলিলেন, 'বৃক্ষ কিরূপ অবস্থায় আছে, এ বিষয়ের তত্ত্বাবধান না করা তোমার অন্যায়; অতএব তুমি বাটী যাইয়া ঐ বৃক্ষের তত্ত্বাবধান করিবে এবং বংশের মধ্যে কেহ যদি দেশাচারানুসারে বৈশাখ মাসে মূলে জল না দেয়, তুমি বৈশাখ মাসে প্রত্যহ জল সেচন করিবে।' পরে কথাপ্রসঙ্গে আমি বলিলাম, 'নবকুমার ডাক্তার, নাড়াজোলের রাজবাটীর হস্তীতে আসিয়া, ঐ হাতী দ্বারা শাখাগুলি ভগ্ন করে; এবং বৃক্ষটি ছেদন করিবার জন্য করাতি সংগ্রহ করিয়া বৃক্ষতলে উপস্থিত হয়; ঐ সংবাদ পাইয়া তথায় আমরা উপস্থিত হইলাম। বৃক্ষে করাত সংলগ্ন করিয়াছে দেখিয়া, উহাদিগকে তাড়াইয়া দিলাম। নবকুমার ডাক্তারকে বাটীতে আনয়ন

করিয়া তিরস্কার করিলে, সে ক্ষমা প্রার্থনা করিল। নবকুমার ডাক্তারের মৃত্যুর পর, আমার পুত্রদ্বয়ের পীড়ার জন্য কলিকাতায় এবং কাশীতে আমায় কিছুদিনের জন্য অবস্থিতি করিতে হইয়াছিল। যদিও মধ্যে মধ্যে বীরসিংহায় গিয়াছিলাম, কিন্তু ঐ বৃক্ষের আর তত্ত্বাবধান করা হয় নাই।' চৈত্র মাসে বাটী গিয়া, দাদার আদেশানুসারে ১২৯৪ সালের চৈত্র-সংক্রান্তিতে বৃক্ষের নিকটে গিয়া দেখি, বৃক্ষটিকে বেড়া দিয়া পুষ্করিণীর পাড়ের অন্তর্গত করিয়া লইয়াছে। বেড়ার দ্বার দিয়া বৃক্ষের নিকট গিয়া অন্তর হইতে জল দিয়া দেখিলাম যে, বৃক্ষের চতুর্দিকে ফণিমনসা অর্থাৎ এক প্রকার কণ্টক-বৃক্ষে আচ্ছন্ন। ঐ বৃক্ষটিকে নষ্ট করিবার মানসে উহার নিকটবর্তী স্থানে বাঁশ, তেঁতুলগাছ, প্রভৃতি রোপণ করিয়াছে। বাটী আসিবার সময় কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের বাটীতে গিয়া নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্নীকে বৃক্ষের চতুর্দিকের বেড়া খুলিয়া বৃক্ষতল পরিষ্কার করিয়া দিতে বলায়, অনেক বাদানুবাদের পর বেড়া খুলিয়া দিতেছি বলিয়া, আমাদিগকে নিজ ব্যয়ে বৃক্ষের তলীয় স্থান পরিষ্কার করিয়া লইতে বলেন। তাহার বেড়া ভাঙ্গিয়া দিবার পর, আমরা নিজ-ব্যয়ে বৃক্ষের তলীয় স্থান পরিষ্কার করিয়া লইলাম। ১২৯৫ সালের জ্যৈষ্ঠমাসে কয়েকজন অসচ্চরিত্র ব্যক্তির উত্তেজনায়, আমাদের পিতৃব্য পৌত্র আশুতোষ ও কেনারাম বন্দ্যোপাধ্যায়কে এবং আমাকে প্রতিবাদী শ্রেণীভুক্ত করিয়া, ঘাঁটাল ফৌজদারী আদালতে অভিযোগ করেন। বিচারপতি, প্রথমত মীমাংসার জন্য আদেশ করেন। তাহাতে বাদী কেশবচন্দ্র বলেন, 'বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং যদি এখানে আমার নিকট আসিয়া চাহিয়া লন, তবে দিতে পারি; নচেৎ পারি না।' দাদার পরমাত্মীয় ব্যক্তি বাদীর পক্ষ হইয়া, আমাদিগকে দণ্ড দেওয়াইবার জন্য অশেষ প্রয়াস পাইয়াও কৃতকার্য হন নাই। পিতামহীদেবী সাধারণ গোমনুষ্যদিগকে ছায়াদানমানসে অশ্বত্থ-বৃক্ষ ও তত্তলীয় ভূমি ক্রয় করিয়া, শাস্ত্রানুসারে যে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন তাহা প্রকাশ পাইল; সুতরাং আমরা মিথ্যাভিযোগ হইতে অব্যাহতি পাইলাম।

কয়েক মাস পরে ঐ নবকুমারের পত্নী কলিকাতায় দাদার নিকট আগমন করিয়া বলিলেন, 'আপনি অনেক ব্যক্তিকে মাসহারা দিতেছেন, আমাকে ত কিছুই দিতে হয় না। অতএব আপনি অনুগ্রহপূর্বক আমাদের চাপড়ার পাড়ে আপনার পিতামহীর প্রতিষ্ঠিত অশ্বত্থ-বৃক্ষটি আমাকে প্রদান করুন। উহা বহু-কালের গাছ; ঐ অশ্বত্থ-বৃক্ষের নিকট আমরা প্রায় নয়-দশ বৎসর বাগান করিয়াছি। ঐ গাছের আওতায় আমার বাগানের অনিষ্ট ঘটিতেছে।' তাহাতে দাদা বলেন, 'আমার পিতামহী পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিক পূর্বে ঐ বৃক্ষ ও তত্তলস্থ ভূমি রীতিমত টাকা দিয়া ক্রয় করিয়া, পথিকগণের আতপতাপ-নিবারণ-মানসে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। আর যিনি ঐ স্থান পিতামহীদেবীকে বিক্রয় করিয়াছেন, পিতৃদেব তাঁহার পরিবারকে প্রতিপালন করিয়াছেন। বাবার কাশী যাইবার পর,

তাঁহার অনুরোধে আমিও তাঁহার বৃদ্ধা পরিবার প্রসন্নময়ী দেবীকে মাসে মাসে দুই টাকা দিয়া থাকি। তোমার স্বামী জানিয়া শুনিয়া, পিতামহীর ঐ স্থান কেন ক্রয় করিয়াছে?' তাহা শুনিয়া ঐ স্ত্রীলোকটি বলিলেন, 'আমার স্বামীকে আপনি লেখাপড়া শিখাইয়া কর্ম করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাতেই তিনি আট-দশ বৎসর অতীত হইল, ঐ স্থান ক্রয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।'

ইহা শুনিয়া দাদা বলিলেন, 'তোমার স্বামী নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমি নিজ-ব্যয়ে লেখাপড়া শিখাইয়া, পরে কলিকাতাস্থ মেডিকেল কলেজে পড়াইয়াছিলাম; পরে সে নাড়াজোলের রাজার ডাক্তার হইয়া, হস্তিপৃষ্ঠে বীরসিংহায় আসিয়া, আমার পিতামহীর প্রতিষ্ঠিত অশ্বত্থ-বৃক্ষের কতকগুলি ডাল হাতির দ্বারা ভাঙাইলেন, এই ঘটনার পূর্বে আমার মৃত্যু হইলে সৌভাগ্য জ্ঞান করিতাম। পিতামহীর গাছের শাখা না কাটিয়া, আমার হাত-পা কাটিলে এত দুঃখ হইত না; পরে আবার উহার মূলে করাত লাগাইলেন এবং তুমি তাহার উপযুক্ত পত্নী, ঐ বৃক্ষে বেড়া দিয়া, বৃক্ষ নষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে উহার শিকড় কাটিয়া বাঁশবৃক্ষাদি রোপণ করিয়াছ, এবং আমার ভাইকে কয়েদ দিবার জন্য বিধিমতে প্রয়াস পাইয়াছিলে; এক্ষণে আবার আমার নিকট আসিয়া উদারতা ও সরলভাব দেখাইতেছ। তুমি মকদ্দমায় জয়লাভ করিলে কখনই আসিতে না; পরাজয় হইয়াছে, তজ্জন্যই আসিয়াছ। আমার ভাই যদি অন্যায় করিয়াছিল, তাহা হইলে নালিস না করিয়া পূর্বে কেন আমায় জানাইলে না?' ইহা শুনিয়া ঐ ডাক্তারের পত্নী বলিলেন, 'ঐ গাছের তলায় আপনার কতখানি ভূমি চাই, তাহা আপনি আমার নিকট চাহিয়া লউন।' এই কথায় দাদা বলিলেন, 'তুমি আমার নবাবের বেটি, আমি তোমার নিকট ভিক্ষা চাহি না। আমার হয় আমার থাকিবে, নতুবা যাইবে; তজ্জন্য তোমার নিকট ভিক্ষা চাহিব না।' ঐ স্ত্রীলোকটি কয়েক দিন অগ্রজের বাটীতে অবস্থিতি করিয়া, পরে তাঁহার নিকট পাথেয় বস্ত্রাদি লইয়া প্রস্থান করেন।

১২৯৬ সালের প্রারম্ভে বীরসিংহা ও তৎসন্নিহিত গ্রামবাসী, অগ্রজ মহাশয়ের প্রতিপালিত কয়েক ব্যক্তির উত্তেজনায়, নবকুমার ডাক্তারের জামাতা কেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আমাদের নামে দেওয়ানীতে নালিস করে; পরে ক্রমশ দাদা ভিন্ন আমাদের পিতামহীর পৌত্র-প্রপৌত্রাদির নামে অভিযোগ হইলে, আমি দেশ হইতে কলিকাতায় আসিয়া দাদাকে সমস্ত অবগত করিয়া বলিলাম, 'মহাশয়, আমি ঐ মকদ্দমায় লিপ্ত থাকিতে ইচ্ছা করি না; অনেকে বলেন, পিতামহী প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর অতীত হইল গঙ্গা-লাভ করিয়াছেন, তাঁহার অশ্বত্থ-বৃক্ষের জন্য মনান্তর করা উচিত নয়। কেহ কেহ বলেন, গাছটি ত্যাগ কর; এক সামান্য অশ্বত্থ-বৃক্ষের জন্য এত ব্যয় করার আবশ্যক কি? দূর হউক, গাছটা ত্যাগ করি; আমি ওসব হাঙ্গামে থাকিতে ইচ্ছা করি না।' ইহা শুনিয়া তিনি ক্রোধভরে

বলিলেন, 'তুই মর্, তাহা হইলে আমি স্বয়ং লাঠি হাতে করিয়া গাছের তলায় দাঁড়াইয়া ঐ গাছ রক্ষা করিব।' ইহা শুনিয়া তাঁহার প্রতিপালিত প্রিয়পাত্র বাবু নিজের উত্তেজনা স্বীকার করিয়া, আমাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, ঐ পত্র দেখাইলাম। দাদা, পত্র লইয়া তাঁহার আত্মীয় উকীলদিগকে দেখাইয়া ও পরামর্শ লইয়া দুই-তিন দিন পরে আমাকে বলিলেন, 'এ সকল তোমার কর্ম নয়, তুমি ঈশানের সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য করিবে। এ বিষয়ের জন্য সর্বস্বান্ত হইতে হয়, তাহাতেও পশ্চাৎপদ হইব না।' আমার মকদ্দমার সময়, নবকুমারের জামাতা কেশবচন্দ্র ও বাদিনীর কয়েক জন সাক্ষীর জবানবন্দীতে বিচারপতি বাবু অক্ষয়কুমার বসু, তাঁহাদের মিথ্যাসাক্ষী প্রভৃতি দোষ উল্লেখ করিয়া, বাদিনীর জামাতাকে মীমাংসা করিতে উপদেশ দেন। অনেক বাদানুবাদের পর, আমি মীমাংসা করিতে সম্মত ছিলাম না, ঈশানের অনুরোধে সম্মত হইলাম, সোলে-সুরত নিষ্পত্তি হইল। তিনি যে কেবল মাতৃভক্তি ও পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন এমত নহে, পিতামহীদেবীর প্রতিও আন্তরিক ভক্তি ছিল। তিনি নিজের স্বার্থসাধনোদ্দেশে কখনও আদালতে মকদ্দমা উত্থাপিত করেন নাই।

মলয়পুর

গবর্নমেণ্ট, বন্যা হইতে দামোদর-নদের পূর্বাংশের রেলপথ রক্ষার জন্য, নদীর পশ্চিমাংশের সেতু খুলিয়া দেন, এবং প্রায় দ্বাদশবর্ষ হইল, দামোদরের বেগের হানা বন্ধ হইয়া, জানকুলীর হানা দিয়া নদীর স্রোত পশ্চিমাংশে সরিয়া আসায়, দামোদর নদ, কেশবপুর প্রভৃতি স্থানের সীমার মধ্য দিয়া স্রোত বহিয়া চলিতেছে। সুতরাং বর্ষাকালে মলয়পুর প্রভৃতি বহুসংখ্যক গ্রাম বন্যার জলে প্লাবিত হওয়ায়, ধান্য জন্মে নাই। কয়েক বৎসর বন্যায় ধান্য না হওয়ায়, প্রজাবর্গ নিতান্ত নিঃস্ব হইয়াছে; বিশেষত ধান্যের ভূমি সকল বন্যায় বালুকাময় স্থান হইয়াছে। সুতরাং ক্রমশ গ্রামবাসীর মধ্যে অনেকেই পৈতৃক বাসস্থান পরিত্যাগপূর্বক, স্থানান্তরে বাস করিতে লাগিলেন। সন ১২৮৯ সাল হইতে ১২৯৭ সালের আশ্বিন মাস পর্যন্ত এই আট বৎসর কাল, উক্ত গ্রামবাসী জ্ঞাতি শ্রীঅধরচন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীযজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য, শ্রীনবরাম ভট্টাচার্য, মৃত হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবারসমূহ নিরুপায় হইয়া, প্রতি বৎসর বন্যার সময় প্রায় চারি মাস কাল কলিকাতায় দাদার বাটীতে অবস্থিতি করেন। দাদা, বিপদাপন্ন ও স্বয়ং-সমাগত ঐ সকল ব্যক্তিদিগকে সমাদর-পূর্বক গ্রহণ করিয়া, উহাদের মধ্যে প্রায় পঁচিশ জনকে নিজ বাটীতে রাখিয়া, ভরণ-পোষণ করিতে লাগিলেন; অবশিষ্ট লোকদিগকে কিছু কিছু নগদ টাকা দিতেন,

তদ্দ্বারা তাঁহারা অপর স্থানে ভোজন করিতেন। বন্যায় ভগ্ন-ভবন পুনঃ-সংস্করণ জন্য অনেককেই টাকা দিতেন। ক্রমিক চারি মাসকাল প্রত্যহ দুই বেলা প্রায় পঞ্চাশ জন লোককে বাটীতে ভোজন করাইতেন।

নিকট-জ্ঞাতি হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, কয়েকটি নাবালক পুত্র ও কুমারী কন্যা, বিধবা ভগিনী ও ভাগিনেয় রাখিয়া লোকান্তরিত হন। তাঁহার পরিবারবর্গের প্রতিপালনের কিছুমাত্র সংস্থান ছিল না; এজন্য অগ্রজ মহাশয়, মাসে মাসে পনের টাকা মাসহারা দিতেন। সাত শত টাকা দিয়া ইঁহার কন্যার বিবাহকার্য সমাধা করেন, এবং নূতন বাটী প্রস্তুত জন্য একশত টাকা প্রদান করিয়াছিলেন।

দাদা দুগ্ধ পান করিতেন না; কিন্তু প্রতি মাসে উপরি লোক ও বাটীর অপরাপর লোকের জন্য প্রায় আশি টাকার দুগ্ধ ক্রয় করিতেন। ভোজনের সময় প্রায় দেখি, যাহারা অপর স্থানে চাকরি করিতেছেন, তাহারা ভোজনের সময় দুই বেলা আসিয়া ভোজন করেন; কতকগুলি ছেলেকেও দেখিতে পাই তাহারা দাদার বাটীতে আহার করিয়া, বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া থাকে।

প্রতিবৎসর ৺দুর্গাপূজার সময় পাঁচ-ছয় হাজার টাকার বস্ত্র বিতরণ করিতেন। অপর সময়েও বাটীতে কাপড়ের দোকান সাজাইয়া রাখিতেন। অনাথ, দীন, দরিদ্র প্রভৃতি উপস্থিত হইলে, বিবেচনামতে প্রদান করিতেন। ইহাতেও প্রায় প্রতি বৎসর তিন-চারি হাজার টাকা ব্যয় হইত।

দাদা, নিজে প্রায় আঁব খাইতেন না; কিন্তু প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ এই তিন মাসে প্রায় পনের শত টাকার আঁব ক্রয় করিয়া, আত্মীয় লোকের বাটীতে পাঠাইতেন এবং বাটীস্থ লোক ও চাকর, চাকরাণী, মেথর প্রভৃতিকে আপনি দাঁড়াইয়া আঁব খাওয়াইতেন। ঐ সময়ে তাঁহার বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র ও অন্য যে সকল ব্যক্তি আসিতেন, তাঁহাদিগকে নিজের সমক্ষে বসাইয়া আঁব খাওয়াইতেন। আম্রপোস্তার হরিশ্চন্দ্র গুঁই ও শীতলচন্দ্র রায়ের দোকানে স্বয়ং যাইয়া আম্র ক্রয় করিতেন এবং উহাদের দোকানে প্রায় আধ ঘণ্টা বা তিন কোয়াটার বসিয়া, তাহাদের সহিত গল্প করিতেন। উহাদের দোকানের সম্মুখ দিয়া কোন বড়লোক গমন করিলে, তাঁহারা আশ্চর্যান্বিত হইতেন। এক সময়ে একটি বাবু বলেন, 'মহাশয়, ও স্থানে বসিবেন না, আপনি বড়লোক, উহারা সামান্য দোকানদার।' ইহা শুনিয়া দাদা হাস্য করিয়া বলিলেন, 'আমি বড়লোক অপেক্ষা ইহাদের নিকট বসিতে ও গল্প করিতে ভালবাসি।'

কালীঘাটনিবাসী বাবু ক্ষেত্রমোহন হালদার, বসতবাটী প্রভৃতি সমস্ত সম্পত্তি মহাজন ডিক্রিজারী করিয়া দেন-ডিক্রিতে বিক্রয় করিয়া লইবে জানিয়া, নিরুপায় হইয়া অগ্রজ মহাশয়ের নিকট আসিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ইঁহার রোদনে তিনি দুঃখিত হন এবং স্বহস্তে টাকা না থাকায়, অপরের নিকট চার শত টাকা ঋণ করিয়া, তাঁহার মহাজনের ঋণ পরিশোধ করিয়া দেন। দাদার ঐ টাকা

প্রাপ্তির আশা ছিল না। কিন্তু তিনি কিছুকাল পরে ঐ টাকা যখন পরিশোধের মানস করিয়াছিলেন, তখন মহাজনের প্রমুখাৎ অবগত হইলেন যে, উক্ত হালদার, ক্রমশ ঐ টাকা পরিশোধ করিয়াছেন।

বৈষ্ণবচরণ সরকার প্রভৃতি কয়েক শরিকের বসতবাটী দেন-ডিক্রিতে বিক্রয় হইবার উপক্রমকালে, তাহাদিগকেও ঐরূপ উদ্ধার করিয়াছিলেন। সে সময় উহাদের এরূপ দুরবস্থা হইয়াছিল যে, কেহই তাহাদিগকে বিশ্বাস করিয়া কিছু মাত্র ধার দেন নাই, তজ্জন্য উহারা দাদার শরণাগত হওয়াতে তিনি দয়ার বশবর্তী হইয়া, নিজহস্তে টাকা না থাকা প্রযুক্ত, তাঁহার এক পরম বন্ধুর নিকট হইতে আট শত টাকা ধার করিয়া, মহাজনকে দিয়া উহাদিগের বসতবাটী রক্ষা করেন।

উত্তরপাড়ায় গাড়ী হইতে পতনের দোষে দাদা, যকৃতে আঘাতপ্রাপ্ত হন; এই সূত্রে উদরাময় পীড়ার সূত্রপাত হয়। ১২৯১ সালের বৈশাখ মাস হইতে কার্তিক মাস পর্যন্ত পীড়া এত দূর প্রবল হয় যে, তাহাতে দাদার জীবন-সংশয় হয়। চিকিৎসক মহাশয়ের অভিপ্রায়ে আফিং খাইতে আরম্ভ করেন। প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় ত্রিশ ফোঁটা লডেনম ব্যবহার করিতে লাগিলেন, ইহাতে ত্বরায় ঐ পীড়ার উপশম হইল; কিন্তু দুই তিন মাস পরে পুনর্বার পীড়ার উদয় হইল। আফিংয়ের মাত্রায় উপকার না হওয়ায়, আফিং পরিত্যাগ করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন; কিন্তু কোন মতেই ত্যাগ করিতে পারিলেন না।

সন ১২৯৫ সালের শ্রাবণ মাসে তাঁহার পত্নী দিনময়ী দেবীর রক্তাতিসার পীড়ার উদয় হয়। দিন দিন পীড়ার বৃদ্ধি হইতে লাগিল, চিকিৎসার দ্বারা কোন ফললাভ না হওয়ায়, ভাদ্র মাসের ১লা বৃহস্পতিবার রাত্রি নয়টার সময় পতিপুত্র প্রভৃতি সমুদায় পরিবারবর্গের সমক্ষে কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। দাদা, শোকে অধীর হইয়াও স্বীয় ধৈর্য ও গাম্ভীর্যগুণে শোকদুঃখাদি প্রকাশ না করিয়া, একমাত্র পুত্র নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারা ঔর্ধ্বদৈহিকাদি কার্য সমাধার পর. কলিকাতায় শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া সমাধা করিলেন। ঐ বৎসর পৌষমাসে পুত্রের হাতে খরচপত্র দিয়া, দেশে আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদিগের ভোজন ও সম্বর্ধনাদি-কার্য করিবার জন্য বীরসিংহায় পাঠাইয়াছিলেন। নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বীরসিংহায় গিয়া, গ্রামস্থ সমুদায় স্ত্রী-পুরুষদিগকে ও নিকটবর্তী জমিদার ও সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া, রীতিমত সম্বর্ধনা করিয়াছিলেন। ইহাতে যথেষ্ট ব্যয় হইয়াছিল।

দাদার পরমবন্ধু ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সিবিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য বিলাতে পাঠান। তথায় অবস্থিতি করিয়া সুরেন্দ্রবাবু, সিবিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অধিক বয়স বলিয়া আপত্তি উত্থাপিত হইলে ও বিলাত হইতে সংবাদ আসিলে, বাবু দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আসিয়া, দাদাকে গোলযোগের কথা বলিলেন।

ইহা শুনিয়া তিনি অনারেবল বাবু দ্বারকানাথ মিত্র ও শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্র দত্ত মহাশয় প্রভৃতির সহিত পরামর্শ করিয়া, বিলাতে কোষ্ঠী প্রভৃতি কাগজপত্র প্রেরণ করিয়া আপত্তি খণ্ডন করিলেন, সুরেন্দ্রবাবু সিবিলিয়ান হইলেন। বঙ্গে আগমন-পূর্বক কার্যে প্রবিষ্ট হইলে, উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদিগের সহিত তাঁহার মিল না হওয়াতে, সুরেন্দ্রবাবু পদচ্যুত হন। পদচ্যুত হইবার পরে সুরেন্দ্রবাবু মেট্রোপলিটানে প্রফেসার নিযুক্ত হন।

একদিবস দাদা সুখাসীন হইয়া কথাবার্তা কহিতেছেন, এমন সময়ে দুই জন ধর্ম-প্রচারক ও কয়েকজন কৃতবিদ্য ভদ্রলোক আসিয়া উপবেশনপূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বিদ্যাসাগর মহাশয়! ধর্ম লইয়া বঙ্গদেশে বড় হুলস্থূল পড়িয়াছে, যাহার যা ইচ্ছা সে তাহাই বলিতেছে, এ বিষয়ের কিছুই ঠিকানা নাই; আপনি ভিন্ন এ বিষয়ের মীমাংসা হইবার সম্ভাবনা নাই।' এই কথায় দাদা বলিলেন, 'ধর্ম যে কি, তাহা মনুষ্যের বর্তমান অবস্থায় জ্ঞানের অতীত এবং ইহা জানিবারও কোন প্রয়োজন নাই।' ইহা শুনিয়া তাঁহারা আরও পীড়াপীড়ি করিলে, তিনি বলিলেন, 'আমি পরের জন্য বেত খাইতে পারিব না', এই বলিয়া গল্প আরম্ভ করিলেন।

'এক দিবস মৃত্যুরাজ, কর্মচারিগণসহ কাছারি খুলিয়া কার্যে প্রবৃত্ত হইলে, প্রহরী এক ব্যক্তিকে ধৃত করিয়া আনিলে, মৃত্যুরাজ তাহাকে বলিলেন, তুমি অমুকের উপাসনা না করিয়া, কি জন্য অমুকের উপাসনা করিলে? উপাসক বলিলেন, আমার অপরাধ নাই, অমুক ধর্ম-প্রচারক আমাকে যেরূপ উপদেশ দিয়াছেন, আমি তদনুসারে কার্য করিয়াছি। এই কথায় মৃত্যুরাজ, উপাসকের প্রতি পাঁচ বেতের আদেশ দিয়া, তাহাকে এক সন্নিহিত বৃক্ষতলে রাখিতে বলিলেন। এইরূপ তিন-চারি জন উপাসককে দণ্ড দিবার পর, আপনার মত একজন ধর্ম-প্রচারক আনীত হইলেন। ঐ ধর্মপ্রচারককে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, বিদ্যাসাগরের উপদেশানুসারে আমি অমুক উপাসনা করিয়াছি এবং অনুগামী ব্যক্তিদিগকেও ঐ উপাসনার উপদেশ দিয়াছি। মৃত্যুরাজ, প্রথমত তাঁহার নিজের হিসাবে পাঁচ বেত দিয়া, অনুগামী উপাসকদিগকে আনাইয়া, প্রত্যেকের হিসাবে পাঁচ-পাঁচ বেতের আদেশ দেন। এরূপ দুই-তিন জন প্রচারকের পর, আমিও মৃত্যুরাজের সম্মুখে নীত হইলাম। প্রথমত, আমাকে নিজের হিসাবে পাঁচ বেত দিয়া, প্রত্যেক উপাসক ও প্রত্যেক প্রচারকের হিসাবে পাঁচ-পাঁচ বেত হুকুম দিলেন। ইহাতে আমার শরীরে তিলার্ধ স্থান রহিল না; তথাপি বহুসংখ্যক বেত বাকী রহিল এবং অবশিষ্ট বেত শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যহ বেত খাইতে হইল।' এই কথার পর বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, 'আমার বোধ হয় যে, পৃথিবীর প্রারম্ভ হইতে এরূপ তর্ক চলিতেছে ও যাবৎ পৃথিবী থাকিবে, তাবৎ এই তর্ক থাকিবে; কস্মিনকালেও ইহার মীমাংসা হইবে না। তাহার দৃষ্টান্ত দেখুন,

মহাভারতে বেদব্যাস লিখিয়াছেন, বকরূপী ধর্মরাজ, এই মর্মে ধর্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলে, যুধিষ্ঠির উত্তর করিলেন :

'বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং।
ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥'

বীরসিংহ ভগবতী-বিদ্যালয়

সন ১২৯৬ সালের চৈত্র মাসে অগ্রজ মহাশয়, পত্র লিখিয়া আমায় কলিকাতায় আনাইয়া বলেন, 'দেশে ম্যালেরিয়াপ্রযুক্ত এতাবৎকাল স্কুল বন্ধ ছিল। এক্ষণে আর দেশে ম্যালেরিয়া নাই ; অতএব জন্মভূমির বালকগণের মোহান্ধকাব নিবারণ জন্য পুনর্বার বিদ্যালয় স্থাপনের ইচ্ছা করিতেছি।' কিন্তু তিনি কায়িক অসুস্থতা-নিবন্ধন স্বয়ং দেশে যাইয়া বিদ্যালয় স্থাপন করিতে অক্ষম হইয়া, আমায় বলেন, 'তোমাকে পূর্বেব মত কার্যেরই ভার গ্রহণ করিতে হইবে।' তাহাতে আমি বলিলাম, 'কাশী হইতে আসিবার পর আমার দুই পুত্র কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে, অবশিষ্ট পুত্রটিও জ্বরকাশ-রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। বিশেষত ১২৯৪ সালে পিতামহীর প্রতিষ্ঠিত যে অশ্বত্থ-বৃক্ষের তত্ত্বাবধানের ভার দিয়াছিলেন, তাহাতে যে সকল লোক মহাশয়ের দ্বারা প্রতিপালিত হইয়াছে, তাহারা সকলে ঐক্য হইয়া, ঐ বৃক্ষ-উপলক্ষে অকারণ আমাকে ফৌজদারীতে আসামী-শ্রেণী-ভুক্ত করিয়া, আমার নামে অভিযোগ করিয়াছিল। ঐ মকদ্দমায় অব্যাহতি পাইলে, দেওয়ানীতে আসামী হই। এইরূপে সকলের সহিত মনান্তর হইলে, আমি অন্য কার্যের ভার গ্রহণ করিতে অক্ষম। বিশেষত বিদ্যালয়ের বাটী নাই, নূতন বাটী প্রস্তুত করিতে হইবে। অগ্রে বাটী প্রস্তুত করিয়া, পরে বিদ্যালয় স্থাপন করা উচিত, নচেৎ অপরের বাটীতে বিদ্যালয় বসাইলে, কার্যের সুবিধা হইবে না।' এই কথা বলিয়া আমি দেশে যাই। সন ১২৯৭ সালের ২রা বৈশাখ, অগ্রজ মহাশয়, ভাগিনেয় চিন্তামণি মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি পাঁচ জনকে শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া, বীরসিংহায় বিদ্যালয় স্থাপন করেন। প্রথমত নিজ গ্রাম ও সন্নিহিত দুই-তিনখানি গ্রামের বালকেরা অধ্যয়নার্থে প্রবিষ্ট হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় পাঁচ জন শিক্ষক নিযুক্ত করত, পুনর্বার বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন দেখিয়া, দেশস্থ লোক পরম আহ্লাদিত হইলেন। শিক্ষক চিন্তামণিবাবু, দাদার বিনা অনুমতিতে কার্য করিয়াছিলেন। তাহা শুনিয়া চিন্তামণিবাবুকে পত্র দ্বারা ডাকাইয়া বলেন, 'তোমাদের দ্বারা বিদ্যালয়ের কার্য সম্পন্ন হইবে না, অতএব তোমাদের বেতনাদি গ্রহণ কর। বিদ্যালয় বন্ধ থাকিবে, আমি স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিব।' সুতরাং চিন্তামণি হতাশ হইয়া বাটী প্রতিগমন করেন। এই

সংবাদ শুনিয়া, আমি আষাঢ় মাসে দাদার সহিত সাক্ষাৎ করিতে কলিকাতা গিয়াছিলাম; তাহাতে তিনি আমাকে বলেন, 'তুমি যদি ভার গ্রহণ কর, তাহা হইলে স্কুল রাখিব, নচেৎ তুলিয়া দিব।' ইহা শুনিয়া অগত্যা ভার গ্রহণ করিয়া, বাটী আগমন কবিলাম। পুনরায় শ্রাবণ মাসে কলিকাতায় গমন করিলে, আর পাঁচ জন শিক্ষক নিযুক্ত করেন। বালকগণের বেতন ও অ্যাড্‌মিসন ফি না থাকায় এবং সুশৃঙ্খলা স্থাপন হওয়ায়, দিন দিন ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। শিক্ষকগণ-সহ আসিবার সময় কতকগুলি বেঞ্চ ও চেয়ার আমার সমভিব্যাহারে পাঠাইয়া দেন এবং বিদ্যালয়-সম্বন্ধে তাঁহার কৃত নিয়মাবলীও স্বাক্ষর করিয়া, আমার হস্তে প্রদান করেন। ইহা দেখিয়া ঘাঁটাল, জাড়া, ক্ষীরপাই, ঈড়পালা প্রভৃতি স্থানের বিদ্যালয় সকলের কর্তৃপক্ষগণ এবং ঘাঁটাল মুনসেফী আদালতের অনেকগুলি উকীল, ঈর্ষাপরবশ হইয়া কল-কৌশলে ঐ বিদ্যালয় উঠাইবার মানসে অগ্রজকে অনেক পত্র লিখেন। কিন্তু তিনি ঐ সকল অসম্বন্ধ-পত্র দেখিয়া, কিঞ্চিন্মাত্র ক্ষুব্ধ বা অসন্তুষ্ট না হইয়া, আমাকে দেশে পত্র লিখেন ও কলিকাতায় তাঁহার নিকটে আসিলে ঐ সকল পত্রগুলি আমাকে দেখাইয়া বলেন, 'শম্ভু, এই সকল কারণে তুমি ক্ষুব্ধ বা নিরুৎসাহ হইও না। আমি এই সকল অজ্ঞ ও ঈর্ষাপরবশ ব্যক্তিদিগের কথায় কর্ণপাত করি না। আমি পূর্বে বীরসিংহা-বিদ্যালয় স্থাপন করিলে, যেরূপ দেশের উন্নতি-সাধন জন্য যত্ন করিয়াছিলে, এইক্ষণেও সেইরূপ যত্ন করিতে ত্রুটি করিও না। আমার অভিপ্রায়, আমি ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইব না। আমি টাকা মাত্র দিব, কিন্তু তুমি অন্য সকল বিষয়ে সর্বেসর্বা অর্থাৎ শিক্ষক-নিয়োগ ও পদ-চ্যুতি বিষয়ে তুমি যাহা করিবে, আমি তাহাতেই সম্মত হইব।' কয়েক মাস পরে আর চারি জন শিক্ষক প্রেরণ করেন ও আমাকে পত্র লিখেন। শারীরিক অস্বাস্থ্য-নিবন্ধন অগ্রজ, পৌষমাসে ফরাসডাঙ্গার গঙ্গাতীরে বাবু গুরুপ্রসন্ন ঘোষ ও উমাচরণ খাঁয়ের বাটী ভাড়া লইয়া, তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় আগমনপূর্বক মেট্রোপলিটান কলেজ ও স্কুল কয়েকটির ও অন্যান্য বিষয় সকলের তত্ত্বাবধান করিয়া ফরাসডাঙ্গায় গমন করিতেন। বীরসিংহা-বিদ্যালয়ের অ্যাফিলিয়েসন ও অন্যান্য কার্য জন্য আমাকে আসিতে আদেশ করায়, আমি উপস্থিত হইলে পর; দাদা বলিলেন, 'ত্বরায় চিকিৎসালয় স্থাপন না করায়, আমি তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছি।' আমি বলিলাম, 'নিজ বাটী ভিন্ন অপরের বাটীতে চিকিৎসালয়ের কার্য চলিতে পারে না। অতএব আপনি ত্বরায় বালক-বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় ও বালিকাবিদ্যালয় এবং রাখাল-স্কুলের বাটী নির্মাণের ব্যবস্থা করুন। বাটী নির্মাণ হইবার পর পনের দিবস মধ্যে চিকিৎসালয় প্রভৃতি স্থাপন করিতে পারিব।' তিনি বলিলেন, 'শরীরে কিছু স্বাস্থ্য লাভ করিয়া ও ভারত ব্যবস্থাপক-সভায় সহবাস-সম্মতি আইনের সম্বন্ধে আমার অভিপ্রায়ানারূপ ব্যবস্থা লিখিয়া পাঠাইয়া, দেশে যাইয়া ঐ সকল কার্য সমাধা করিব।'

এক দিবস দাদাকে বলিলাম, 'মহাশয়! আমি আপনার জীবনচরিত লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি।' এই কথায় দাদা বলিলেন, 'পড় দেখি, শুনি।' তাঁহার আজ্ঞানুসারে জীবনচরিতের উপক্রমণিকা, শিশুচরিত সমগ্র ও স্থানে স্থানে দুই চারি পৃষ্ঠা শুনাইবার পর তিনি বলিলেন, 'লেখা ভাল হইয়াছে, কিন্তু দান ও সাহায্য বিষয়গুলি উঠাইয়া দিও, নতুবা অনেকে কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হইবেন।' কিন্তু আমি এই পুস্তক মুদ্রিত করিবার পূর্বে অনেককে জিজ্ঞাসা করায়, যাঁহারা ঐ বিষয় মুদ্রিত-করণে আপত্তি করিলেন, তাঁহাদের বিষয় উল্লেখ করিলাম না এবং যাঁহারা কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে ও সরলভাবে অনুমতি দিলেন, তাঁহাদের বিষয় মুদ্রিত করিলাম।

ইতিমধ্যে অর্ধোদয়-যোগে ফরাসডাঙ্গার বাসা-বাটীতে বহু লোকের সমাগম হওয়ায়, তাহাদের রীতিমত তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে কলিকাতায় বাদুড়বাগানের বাটীতে আত্মীয় ও কুটুম্ব ও কুটুম্বদিগের গ্রামবাসীরা এবং বীরসিংহা ও তৎসন্নিহিত কয়েকটি গ্রামবাসী কতকগুলি লোক অর্ধোদয়যোগ উপলক্ষে আসিয়া অবস্থিতি করিতেছিল। দাদার প্রতীক্ষা করিয়া, তাহারা বাদুড়বাগানের বাটী হইতে না যাওয়ায়, দাদার কনিষ্ঠ জামাতা কার্তিকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ফরাসডাঙ্গায় ঐ মর্মে পত্র লিখেন। এই সংবাদ পাইয়া অগ্রজ, ফরাসডাঙ্গার বাটীস্থিত আগত আত্মীয়দিগকে বিদায় দিয়া কলিকাতায় আসিলেন। বহু লোকের সমাগম দেখিয়া আমি বলিলাম, 'অর্ধোদয় না হইয়া আপনার পূর্ণোদয় হইয়াছে।' এই কথায় তিনি ঈষৎ হাস্য করিলেন। পাথেয় ও বস্ত্র দিয়া অধিকাংশ লোককে বিদায় করিলেন। দেশস্থ বিদ্যালয়ের অ্যাফিলিয়েসন-সম্বন্ধে আমাকে আপন নামে দরখাস্তাদি দাখিল করিতে আদেশ করেন; কিন্তু আমি তাহাতে সম্মত না হইয়া, দাদাকে অনুরোধ করায়, দাদা স্বীয় নামে দরখাস্তাদি লিখাইয়া, তাঁহার প্রিয়পাত্র মেট্রপলিটান বিদ্যালয়ের কর্মচারী বাবু ব্রজনাথ দের দ্বারা স্কুল-ইন্‌স্পেক্টারের নিকট প্রেরণ করেন। বিদ্যালয়ের মোহর ও নাম-করণের উল্লেখ হওয়ায়, আমাকে নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে বলেন। আমি উহা বিদ্যাসাগর ইন্‌স্টিটিউসন বলিয়া লিখিলাম। দাদা তাহা দেখিয়া বলিলেন, 'আমি তোমা অপেক্ষা ভাল লিখিতে পারি।' এই বলিয়া 'ভগবতী-বিদ্যালয়' এই নামটি লিখিয়া, আমাকে ও উপস্থিত ব্রজবাবু প্রভৃতিকে বলিলেন, 'শম্ভুর অপেক্ষা আমার লেখাটি ভাল হইল কি না?' আমি বলিলাম, 'মহাশয়। লেখা ভাল হইলে কি হইবে, উহাতে অনেক দোষ আছে; বিদ্যালয়টি আপনার নামে থাকিয়া কোন কারণে উঠিয়া গেলে, আপনার পুত্রের উপর দোষ বর্তিবে; কিন্তু জননীদেবীর নামে হইয়া উঠিয়া গেলে, লোকে বলিবে, বিদ্যাসাগর এমনি কুলাঙ্গার যে, মাতৃদেবীর কীর্তি লোপ করিল।' দাদা বলিলেন, 'আমি কি ইহার বন্দোবস্ত না করিব। তুমি ঐ সকল বিষয়ের জন্য দেশে একত্র আট বিঘা জমি স্থির করিয়া দাও, স্কুলের স্থায়িত্বের বিষয় তোমায়

ভাবিতে হইবে না। স্কুলের স্থায়িত্ব-সম্বন্ধে যাহা করিতে হইবে, তাহা আমার স্থির করা আছে।' এই বলিয়া উঁহার প্রিয়পাত্র ব্রজবাবুর প্রতি স্কুলের মোহর করাইবার ভার অর্পণ করিলেন। ব্রজবাবু, মোহর প্রস্তুত করাইয়া আমার হস্তে দেন। তদবধি বিদ্যালয়টি জননীদেবীর নামে 'ভগবতী-বিদ্যালয়' হইল। এই সময়ে ভগবতী-বিদ্যালয়ে চৌদ্দ জন শিক্ষক নিযুক্ত হয় এবং মাসিক দুই শত বাষট্টি টাকা ব্যয়ের বন্দোবস্ত হয়। তৎপরে আমাকে বলিলেন, 'স্কুলবাটীর জন্য দশ হাজার টাকা রাখ, এবং আবশ্যক হয়, আরও দুই তিন হাজার দিব।' আমি বলিলাম, 'দেশে গিয়া বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া দিলে ঐ টাকা লইব, এখন লইতে পারি না।'

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সরকার সি. আই. ই.-র সায়েন্স-আসোসিয়েসনের জন্য অগ্রজ মহাশয়, এক সহস্র টাকা দিয়াছিলেন।

ঘাঁটাল-প্রদেশ বন্যার জলে প্লাবিত হওয়ায়, ঐ প্রদেশবাসী বিপন্ন লোক-দিগের সাহায্য জন্য দাদা, মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট কর্নিস সাহেবের নিকট পাঁচ শত টাকা প্রেরণ করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী মহাশয় বিপদে পড়িয়া দাদার শরণাগত হইলে, দাদা তাঁহাব আত্মীয় ব্যক্তিদের নিকট ঋণ করিয়া, প্রসন্নবাবুকে ন্যূনাধিক পঞ্চ সহস্র টাকা দেন। উঁহার মৃত্যুর পব, দাদা নিজে ঐ ঋণ পরিশোধ করেন। অনেকের জন্য দাদাকে এরূপ করিতে হইয়াছে।

এক দিবস জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শীতকালে পাঁচ শত টাকা মূল্যের শালের জোড়া গায়ে দিয়া, বাদুড়বাগানের বাটীতে আসিয়া, লাইব্রেরী দেখিয়া দাদাকে বলিলেন, 'বিদ্যাসাগর মহাশয়! এত অধিক ব্যয় করিয়া পুস্তকগুলি বাঁধাইবার প্রয়োজন কি?' দাদা স্মিত-বদনে বলিলেন, 'মহাশয়। পাঁচ সিকার কম্বলে শীত নিবারণ হয়, আপনি কি জন্য পাঁচ শত টাকার শাল গায়ে দিয়াছেন?'

পৌষমাস হইতে দাদার পীড়া দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল ও বলের হ্রাস হইতে লাগিল এবং মানসিক অবস্থার অবনতি হইতে লাগিল। এই সকল দেখিয়া, চিকিৎসক ও বন্ধুগণ কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া, জলবায়ু পরিবর্তন জন্য সমধিক স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করিতে অনুরোধ করেন। এদিকে মেট্রোপলিটানের অবস্থা এরূপ ঘটিয়াছে যে, মধ্যে মধ্যে স্বয়ং মেট্রোপলিটানে উপস্থিত হইয়া সমস্ত বিষয় স্বয়ং তত্ত্বাবধান না করিলে কোনও মতেই চলে না; এই কারণে, সমধিক দূরবর্তী স্বাস্থ্যকর প্রদেশে যাইতে পারিলেন না। কিন্তু কলিকাতায় অবস্থিতি করাও চলিতেছে না; এমত অবস্থায় গঙ্গাতীরে ফরাসডাঙ্গায় দুইটি বাটী ভাড়া লইয়া ও নিত্য-ব্যবহারোপযোগী দ্রব্যসামগ্রী লইয়া, তথায় গমন করেন। মধ্যে মধ্যে মেট্রোপলিটানের ও অন্যান্য বিষয়-কর্মের জন্য কলিকাতায় আসিতে হইত। প্রথম মাসে কিঞ্চিৎ স্বাস্থ্য লাভ করিলেন; কিন্তু কন্যা ও দৌহিত্রাদি নিকটে না থাকায় ও মনের স্বচ্ছন্দতা না থাকায়, তাহাদিগকে ফরাসডাঙ্গায় লইয়া যান।

এই সময়ে পৌষের প্রারম্ভে, জাহানাবাদের অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট কয়াপাঠ বদনগঞ্জ-নিবাসী রামরাঘব মুখোপাধ্যায়, স্বকীয় কোনও বিষয়কর্মোপলক্ষে কলিকাতায় আসিয়া, ঈশানচন্দ্রের সহিত কথোপকথন-সময়ে আমার সহিত আলাপ হওয়ায়, তাঁহাকে দাদার নিকট পরিচিত করিয়া দিই। তিনি দাদার কোষ্ঠী লইয়া দেশে গমন করেন। তথায় গণনা করিয়া মৃত্যু-আশঙ্কা ব্যক্ত করিয়া, অযুত হোমের ও পঞ্চাঙ্গ-স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা করিয়া পত্র লিখেন। ফাল্গুন মাস হইতে ফরাসডাঙ্গা আর স্বাস্থ্যকর বোধ হইল না। উল্লিখিত গণনায় জলমগ্ন হইবার আশঙ্কা প্রভৃতি অবলোকন করিয়া, নিজের তাদৃশ বিশ্বাস না থাকায়, কেবল কন্যা প্রভৃতির অনুরোধে, পঞ্চাঙ্গ-স্বস্ত্যয়ন ও হোমের ব্যবস্থা করিয়া, কলিকাতায় বাদুড়-বাগানের বাটীতে পুরোহিত ও ব্রাহ্মণদিগকে নিযুক্ত করেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু ফলোদয় হইল না। উত্তরোত্তর পীড়া বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে, আর ফরাসডাঙ্গায় অবস্থিতি করা উচিত নয় এই বিবেচনায়, জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে কলিকাতায় আসিয়া চিকিৎসার উদ্‌যোগ পাইতে লাগিলেন। এই সময় এলোপ্যাথি ডাক্তার ও আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক মহাশয়েরা বলিলেন, 'অহিফেনের মাত্রা এত অধিক পরিমাণে থাকিলে আমাদের চিকিৎসায় উপকার দর্শিবে না।' কলুটোলা হইতে সেখ আবদুল লতীব হকিমকে আফিং পরিত্যাগ করাইবার জন্য আনাইলেন। ১৮ই আষাঢ় হইতে উক্ত হকিমের চিকিৎসা আরম্ভ হইল।

তাঁহার ব্যবস্থায় পীড়ার উপশম হইতে লাগিল; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে দুই দিন পরে হিক্কা প্রভৃতি উদয় হইয়া ২০শে আষাঢ় কম্পের সহিত জ্বরের উদয় হইল। ২১শে আষাঢ় জ্বরের হ্রাস হইল বটে কিন্তু হিক্কা প্রবল হইয়া হস্তপদ শীতল হইল; কিন্তু তথাপি উক্ত হিক্কা নিবারণ জন্য অপর ঔষধ ব্যবহার করিলেন না। ঐ দিবসেই হকিমের ঔষধে অহিফেন ভিন্ন অপর মাদকদ্রব্য-নিবন্ধন দুই-তিন দিন প্রলাপ হয়। এই সময়ে সমাগত ব্যক্তিদিগকে সাবেক অভ্যাস অনুসারে সমধিক সমাদর করিতে লাগিলেন এবং ঐ প্রলাপ-সময়ে নিজের কলেজ ও স্কুল-গুলির সম্বন্ধে নানাবিধ কথা কহিতে লাগিলেন। ২৩শে আষাঢ় পুনরায় হিক্কা, বেদনা প্রভৃতি পীড়ার লক্ষণগুলি প্রবল হইতে লাগিল এবং ঐ সময় নেবা রোগের আরম্ভ হইয়াছে দেখিয়া, হকিমের চিকিৎসা বন্ধ হইল। ক্লোরোডাইন সেবন করায় বেদনা ও হিক্কার হ্রাস হইল। উক্ত হকিম সাহেব উদারচরিত ভদ্রলোক; আন্তরিক যত্ন ও শ্রদ্ধাসহকারে চিকিৎসা করিয়াছিলেন। ২৪শে আষাঢ়, ডাক্তার হীরালালবাবু ও বাবু অমূল্যচরণ বসু পরীক্ষা করিয়া, ২৫শে আষাঢ় পরামর্শজন্য ডাক্তার ম্যাকোনেল সাহেবকে আনাইলেন। উক্ত সাহেব পরীক্ষা করিয়া অসাধ্য বিবেচনায়, বার্চ সাহেবের সহিত পরামর্শ করিতে হইবে বলিয়া, তাঁহাকে আনাই-বার উপদেশ দেন; কিন্তু ম্যাকোনেল সাহেব, এই পীড়া এলোপ্যাথি চিকিৎসার অসাধ্য বলায়, পরদিন ২৬শে আষাঢ় বেলা ৯টার সময় ডাক্তার শাল্‌জার সাহেব

আসিয়া ভালরূপ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, 'স্টমাকে ক্যান্‌সার হয় নাই, কেবল পাকস্থলীতে টিউমার হইয়াছে, কিন্তু উহা মারাত্মক নহে, তবে এই যে নেবা উৎপন্ন হইয়াছে ইহাই ইহার পক্ষে মারাত্মক হইবার সম্ভাবনা। ইহা চারি-পাঁচ দিনের মধ্যে উপশম হইলে হইতে পারে; কিন্তু ইহা অপেক্ষা পণ্ডিতের বয়োবার্ধক্য, শারীরিক দৌর্বল্য এবং জীর্ণশীর্ণতা এই তিন কারণেই পীড়া উপশমের সম্ভাবনা অতি অল্প।' এই কথা বলায় তাঁহাকে বিদায় দিয়া, বৈকালে ম্যাকোনেল ও ডাক্তার বার্চ উভয়ে আসিয়া ও পরীক্ষা করিয়া অসাধ্য বলায়, ডাক্তার হীরালালবাবু ও অমূল্যবাবুর এলোপ্যাথিক চিকিৎসা-নির্বন্ধ খণ্ডন করিয়া, শাল্‌জ্বার সাহেব দ্বারা চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়। শাল্‌জ্বার সাহেবের চিকিৎসায় বেদনা, হিক্কা, নেবা, প্রভৃতি লক্ষণগুলির হ্রাস হইতে লাগিল, কিন্তু কোষ্ঠবদ্ধ পীড়ার উদয় হইল। হিক্কার লক্ষণ পুনরায় বৃদ্ধি হইতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে অম্লপিত্ত কমিতে লাগিল। ডাক্তার শাল্‌জ্বার সাহেব প্রত্যহ তিন-চারি বার আসিতে লাগিলেন। কোন দিবস কিছু কমে, কোন দিবস বৃদ্ধি হয়। হিক্কা বন্ধ না হওয়ায়, রজনীগন্ধা ফুল বাটিয়া সেবন করানো হয়; তাহাতে যদিও হিক্কার অনেক হ্রাস হইয়াছিল, কিন্তু ঐ দিবসেই স্বল্প জ্বরের উদয় হয়। দিনে দিনে অল্পে অল্পে জ্বর বৃদ্ধি হইতে লাগিল। হিক্কা-সম্বন্ধে রজনীগন্ধা ফুলের আর কোনও ক্ষমতা রহিল না। মুখমণ্ডল প্রভৃতির ও জীবনের শ্রী কমিয়া আসিতে লাগিল।

ডাক্তার শাল্‌জার নিরাশ হইলেন এবং বলিলেন, 'তোমরা অপরের দ্বারা চিকিৎসা করাইতে পার এবং আবশ্যক হইলে, আমিও বন্ধুভাবে ও চিকিৎসকভাবে প্রত্যহ আসিতে ও দেখিতে পারি, তদ্বিষয়ে আমার মনে কিছুমাত্র আপত্তি বা অসন্তোষ নাই।' পর দিবস ৭ই শ্রাবণ বৈকালে, দাদা পূর্বে মধ্যে মধ্যে যে ঔষধ ব্যবহার করিতেন, সেই ঔষধ ব্যবহৃত হইতে লাগিল। ৯ই শ্রাবণ রাত্রিতে সামান্য পুরাতন মল নির্গত হয় ও ১০/১১ই শ্রাবণ তাঁহাকে সকলে কিঞ্চিৎ সুস্থ বলিয়া বোধ করিলেন। ঐ দিবস কনিষ্ঠ সহোদর ঈশান, ভালরূপ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, 'যাতনা প্রভৃতি পীড়ার লক্ষণগুলির হ্রাস হইয়াছে বটে, কিন্তু নাড়ীর ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে এবং আরও যে দুই-একটি লক্ষণ উদয় হইয়াছে, তাহাতে অদ্য আমার বিবেচনায় আর কিছুমাত্র আশা নাই। তরুণবয়স্ক হইলে অদ্যই মৃত্যুর সম্ভাবনা ছিল; কিন্তু পরিণতবয়স্ক বলিয়া ও শরীরের দৃঢ় গঠন বলিয়া, মৃত্যুর আরও দুই-তিন দিন বিলম্ব আছে।' শেষ কয়েক দিবস যদিও প্রত্যহ জ্বর বৃদ্ধি হইতে লাগিল তথাপি অল্প অল্প দাস্ত হওয়ায়, মৃত্যুর সময় পর্যন্ত তাঁহার জ্ঞানের ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

সচরাচর মৃত্যুর পূর্বে জ্বরবিচ্ছেদ হইয়া নাড়ী ত্যাগ হয়, কিন্তু ১৩ই শ্রাবণ অপরাহ্ণ হইতে জ্বর বৃদ্ধি হইতে লাগিল। রাত্রি নয়টার পর হইতে প্রতি মিনিটে নাড়ীর গতি এক শত ত্রিশ ও শ্বাসপ্রশ্বাসের সংখ্যা পঞ্চাশ-এর কম নহে। কিন্তু এই পীড়ায় অন্য সময়ে নাড়ীর স্বাভাবিক গতি ষাট-এর ঊর্ধ্ব নহে।

এই দিবস (১৩ই শ্রাবণ, ১২৯৮ ; ২৯শে জুলাই, ১৮৯১) রাত্রি একটা পনের মিনিটের পর জ্ঞানরাশির জ্ঞানলোপ পাইয়া দুইটা আঠার মিনিটের সময় তিনি এই অসার সংসার পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার আত্মীয়বর্গ তাঁহাকে নিজ-ব্যবহৃত পালঙ্কে শয়ন করাইয়া, তাঁহার একমাত্র পুত্র নারায়ণকে সমভিব্যাহারে লইয়া, তাঁহার আদরের জিনিস মেট্রোপলিটান কলেজে কিয়ৎক্ষণ রাখিয়া, বন্ধুবান্ধব সমভিব্যাহারে পুনরায় স্কন্ধে বহন-পূর্বক নিমতলার ঘাটে নামাইলেন, কিয়ৎক্ষণ পরে শ্মশানে গিয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপণ করিলেন। অনন্তর সকলে গঙ্গায় স্নানতর্পণাদি সমাপণ করিয়া, বাদুড়বাগানের বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন।



ভ্রমনিরাস

অর্থাৎ

শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

"বিদ্যাসাগর" নামক

নূতন জীবনচরিতের ভ্রমনিরাকরণ।

শ্রীশম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা।

২নং নবাবদি ওস্তাগরের লেন,

ইংরাজি-সংস্কৃত যন্ত্রে

শ্রীযজ্ঞেশ্বর মুখোপাধ্যায় দ্বারা

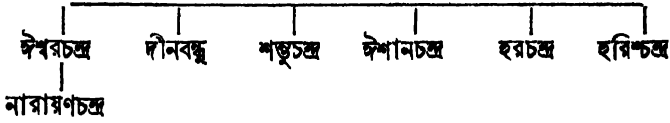
মুদ্রিত।

সন ১৩০২ সাল।

মূল্য ।৶০ ছয় আনা মাত্র।

১

শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রণীত 'বিদ্যাসাগর' প্রদর্শিত বংশাবলীর মধ্যে লিখিত আছে, যথা—



ভ্রমনিরাস

মৎপ্রণীত জীবনচরিতের ৮১ পৃষ্ঠার ৬ পংক্তিতে (এই গ্রন্থের ৫৮/৫৯ পৃষ্ঠার ৩৪ ও ১ পংক্তি) পাঠকগণ অবগত আছেন বিদ্যাসাগরেরা সাত ভাই। যথা—জ্যেষ্ঠ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। দ্বিতীয় দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন। তৃতীয় শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন। চতুর্থ হরচন্দ্র। পঞ্চম হরিশ্চন্দ্র। ষষ্ঠ ঈশানচন্দ্র। সপ্তম শিবচন্দ্র।

সম্ভবত চণ্ডীবাবু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরিবারের বিষয় ভালরূপ জানেন না। এইজন্যই বিদ্যাসাগরের একটি ভ্রাতার নাম লোপ করিয়াছেন, তাঁহার নাম শিবচন্দ্র।

ঈশানচন্দ্র, হরচন্দ্র ও হরিশ্চন্দ্রের অনুজ হইলেও ইহাকে অগ্রজভাবে সাজাইয়াছেন।

২

'নারায়ণচন্দ্র'

মৎপ্রণীত জীবনচরিতে নারায়ণ নাম আছে এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হস্তাক্ষর পত্রে ও উইলের ২৫ ধারায়, আর নারায়ণের হস্তাক্ষর পত্রেও নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় নাম লেখা আছে। চণ্ডীবাবু ইহাতে চন্দ্র পদ কেন যোগ করিয়াছেন? তাহা তাঁহার স্পষ্টরূপে বলা উচিত ছিল।

৩

চণ্ডীচরণ প্রণীত জীবনচরিতের ১৮ পৃষ্ঠার ১৩।১৪ পংক্তি

'যে যে দিন দিবাভাগে আহারের যোগাড় না হইত, ঠাকুরদাস, সেই সেই দিন ঐ দয়াময়ীর আশ্বাস বাক্য অনুসারে তাঁহার দোকানে গিয়া, পেট ভরিয়া ফলার করিয়া আসিতেন।'

বিদ্যাসাগর শৈশবচরিত হইতে চণ্ডীবাবু ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

মৎপ্রণীত জীবনচরিতে একদিন মাত্র ফলারের উল্লেখ আছে। বিদ্যাসাগর

মহাশয় কবি ছিলেন। একদিন স্থলে অধিকদিন লেখায় ঠাকুরদাসের গুণগরিমার আধিক্য হইবে বিবেচনায় এইরূপ লিখিয়াছেন। ঠাকুরদাস যে সেরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন না, তাহা বিশেষ না জানিলে পাঠকবর্গ আমার লেখার উপর বিশ্বাস করিবেন না তাহাও জানি, ভ্রম নিরাকরণ কর্তব্য বোধে ইহা লিখিলাম। আপনাদের যেরূপ ইচ্ছা হয়, তাহাই বিশ্বাস করিবেন।

পূজ্যপাদ ৺বিদ্যাসাগর মহাশয় পিতৃদেবের শুশ্রূষাদি কার্য সম্পাদনার্থ আমায় দীর্ঘকাল ৺কাশীধামে রাখিয়াছিলেন। তৎকালে অগ্রজ মহাশয় আমাকে অনুমতি করেন যে 'পিতৃদেব আর অধিক দিন জীবিত থাকেন, এমত বোধ হয় না। অতএব তুমি কথাপ্রসঙ্গে মধ্যে মধ্যে বাবার নিকট পূর্বপুরুষগণের বৃত্তান্ত লিখিয়া লইবে এবং পারত আমার শৈশব কালের বৃত্তান্ত বিশেষরূপ জানিয়া লিখিয়া লইবে' আমি তদনুসারে ক্রমশ পিতৃদেবেব নিকট বৃত্তান্তগুলি লিখিয়া লই। দুই প্রস্থ কাগজের এক প্রস্থ বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দিয়াছিলাম। অপর এক প্রস্থ কাগজ আমার নিকট রাখি। যৎকালে দাদা মহাশয় পীড়িত হইয়া ফরাশডাঙ্গায় অবস্থিতি করেন, তৎকালে ১২৯৭ সালে অর্ধোদয়ের সময় আমার প্রণীত 'বিদ্যাসাগর জীবনচরিত' দাদাকে শুনানো হয। তিনি শুনিয়া বলিলেন, 'আমাকে কাশী হইতে যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছ, তাহাতে স্থানে স্থানে দুই একটা তফাৎ আছে। দেশে যাইয়া ভ্রমগুলির সংশোধন করিয়া লইব।' কিন্তু দেশেও যাওয়া হয় নাই এবং সময়ের সুবিধাও হয় নাই; সুতরাং সংশোধনও হয় নাই। তাহাতে কেবল পূর্বপুরুষের বৃত্তান্ত ও দাদার আট বৎসর বয়স পর্যন্তের বৃত্তান্ত লেখা ছিল।

ঐ সময়ে অর্থাৎ সন ১২৯৭ সালে অর্ধোদয় দিবসে ফরাশডাঙ্গায় দাদার বাসায় কলিকাতা বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র বসু মহাশয় আমার কৃত 'বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত' শুনিয়া আমাকে বলেন, 'রচনা উত্তম হইয়াছে, বিশেষত যাঁহার জীবনচরিত তাঁহাকেও জীবিত অবস্থায় শ্রবণ করানো হইল, ইহা ছাপাইতে হইবে।' দাদার দাহকালে নিমতলার ঘাটে শ্মশানভূমে উল্লিখিত গিরিশবাবু উক্ত জীবনচরিত বঙ্গবাসীতে ছাপাইবার জন্য চাহিয়াছিলেন, এবং দাদার মৃত্যুর পর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন ও পূজ্যপাদ ৺প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয়ের কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীযুক্ত বাবু রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় খুড়া মহাশয় বাদুড় বাগানে অগ্রজ মহাশয়ের ভবনে উপস্থিত থাকিয়া মৎপ্রণীত ঐ জীবনচরিতের আদ্যোপান্ত নকল করিয়া লইয়া মুদ্রিত করিবার জন্য চাহিয়াছিলেন; কিন্তু আমার কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিসদৃশ ব্যবহারে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া আমার রচিত 'বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত' নিজের আয়ত্বাধীনে রাখিলেন এবং নবাব্‌দি ওস্তাগরের লেনস্থিত ছাপাখানায় মুদ্রিত করেন। এই হেতুবশত উক্ত ন্যায়রত্ন মহাশয় ও বাবু রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রভৃতি কয়েক মহাত্মা ভ্রাতা ঈশানচন্দ্র ও আমার প্রতি যেরূপ ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা পাঠক মহাশয়েরা

সহজেই বুঝিতে সমর্থ হইবেন। আমার প্রণীত পুস্তক সর্বাগ্রে মুদ্রিত হয়। তদনন্তর শ্রীযুক্ত বাবু নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বিদ্যাসাগর চরিত, স্বরচিত' নাম দিয়া অসম্পূর্ণ এক ক্ষুদ্র পুস্তক মুদ্রিত করেন। ইহার পর জন্মভূমিতেও যাহা যাহা ছাপা হইয়াছে, তাহা চণ্ডীবাবুর কৃত জীবনচরিতের ন্যায় আমার কৃত পুস্তকের কোন কোন স্থান অবিকল, কোন কোন স্থান ফেরফার করিয়া এবং কতকগুলি স্বকপোলকল্পিত করিয়া লিখিয়াছেন। তদ্বিষয়ে সন ১২৯৮ সালের ২৮শে পৌষ সোমপ্রকাশে যে প্রতিবাদ হয়, তদ্দৃষ্টে অনেকের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে।

৪

চণ্ডীচরণ কৃত জীবনচরিতের ২৮ পৃষ্ঠার ৮/৯ পংক্তি

'তাঁহার বাসগ্রাম পাতুলের সন্নিকটে কোটরী নামক গ্রামে।'

মৎপ্রণীত পুস্তকের ১৫ পৃষ্ঠা (এই গ্রন্থের ১১ পৃষ্ঠা ৩ পংক্তি)।

পাতুলের নিকট কোঠরা গ্রাম আছে। চণ্ডীবাবু কোটরী গ্রাম কোথায় পাইলেন ?

৫

চণ্ডীচরণকৃত জীবনীতে

'রাম গোপাল কবিরাজ'

আমার কৃত জীবনচরিত দেখিলে পাঠক বুঝিবেন, ঐ গ্রামের কবিরাজের নাম 'রামলোচন' ছিল, রামগোপাল নহে।

৬

২৯ পৃষ্ঠা ৬ পংক্তি

'লোকে কাপড় কাচিয়া রৌদ্রে দিলে তিনি ক্ষুদ্র কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা তাহাতে বিষ্ঠা লাগাইয়া দিতেন।'

মৎপ্রণীত পুস্তকের ১৫ পৃষ্ঠা ১৩ পংক্তি (এই গ্রন্থের ১১ পৃষ্ঠা ১৩ পংক্তি) দ্রষ্টব্য।

'বিদ্যাসাগর ৫।৬।৭।৮ বৎসর বয়ঃক্রমকালে প্রত্যুষে কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পাঠশালায় যাইবার সময়, প্রতিবেশী অনুগত মথুরামোহন মণ্ডলের মাতা পার্বতী ও তাহার পত্নী সুভদ্রাকে বিরক্ত করিবার মানসে, প্রায় প্রত্যহ তাহাদের দ্বারে মলমূত্র ত্যাগ করিতেন।' কিন্তু কখনই কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা বস্ত্রে বিষ্ঠা লাগাইয়া দিতেন না। ইহা দ্বারা চণ্ডীবাবু কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

কাশী হইতে অগ্রজ মহাশয়কে যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলাম তাহাতে উক্ত মণ্ডলের দ্বারে বাল্যকালে দুষ্টামী প্রযুক্ত মল ত্যাগের উল্লেখ ছিল। আমার কাগজে

উক্ত কথা লেখা দেখিয়া অগ্রজ বলেন, ওরূপ কেন লিখিয়াছ? তাহা শুনিয়া আমি বলিলাম, পিতামহী ও জননীদেবী প্রভৃতির প্রমুখাৎ ঐ বৃত্তান্ত ভালরূপ অবগত হইয়াছিলাম। তজ্জন্যই এরূপ লিখিত হইয়াছে।

৭

৩৪ পৃষ্ঠা ১৯/২০ পংক্তি

'ঈশ্বরচন্দ্রকে কলিকাতায় আনার সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরদাসের দুই টাকা বেতন বৃদ্ধি হইল। পূর্বে আট টাকা পাইতেন, এক্ষণে দশ টাকা বেতনের কর্মে নিযুক্ত হইলেন।'

মৎপ্রণীত জীবনচরিতের ১৯ পৃষ্ঠায় ২০ পংক্তিতে (এই গ্রন্থের ১৩ পৃষ্ঠা ২৬ পংক্তি) পিতৃদেবের দশ টাকা বেতনের উল্লেখ আছে। চণ্ডীবাবু কি প্রমাণে দুই টাকা বেতন বৃদ্ধির কথা লিখিয়াছেন ?

৮

৫০ পৃষ্ঠা

'মেদিনীপুর, বর্ধমান ও হুগলি জেলার নানা স্থানে এই কথা প্রচার হওয়ায় নানাস্থান হইতে লোক ঈশ্বরচন্দ্রকে কন্যাদান করিবার প্রস্তাব লইয়া আসিতে লাগিলেন।'

চণ্ডীবাবুর এই বর্ণনা জাঁকাল হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহার মধ্যে কোন সত্য নাই। তিন জেলার নানা স্থানে এই কথা প্রচার হওয়ায় নানা স্থান হইতে লোক ঈশ্বরচন্দ্রকে কন্যাদান কবিবার প্রস্তাব লইয়া আইসে নাই। কন্যাদান করিবার জন্য লোকের আগ্রহ জন্মিবে, ঈশ্বরচন্দ্র বা তদীয় পরিবারের সেরূপ অবস্থা হয় নাই; বরং প্রকৃত কথা এই যে, জগন্নাথপুর, রামজীবনপুর ও ক্ষীরপাই—এই তিন গ্রামই পূর্বের হুগলি জেলার অন্তর্গত ছিল, এক্ষণে ঐ তিন গ্রামই মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত। রামজীবনপুরের আনন্দচন্দ্র রায় বা অধিকারী, ঠাকুরদাসের খড়ুয়া ঘর, পাকা ঘর নহে, এই উল্লেখে তাঁহার পুত্রকে কন্যাদান করিলেন না। ঠাকুরদাস বড়মানুষ ছিলেন না বলিয়া তাঁহার সহিত কুটুম্বিতায় সম্মত হইলেন না। পরে রামমণি ঠাকুরাণী ও পিতামহী দুর্গাদেবী ক্ষীরপাই গ্রামে সম্বন্ধ স্থির করিলেন।

৯

৫৮ পৃষ্ঠা ১৯ পংক্তি হইতে ২৪ পংক্তি পর্যন্ত

'সে সময়ে সংস্কৃত কলেজের যাঁহারা অধ্যাপক ছিলেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেই ঈশ্বরচন্দ্রকে পুত্রনির্বিশেষে স্নেহ করিতেন ও তাঁহার কল্যাণ কামনা করিতেন।

গঙ্গাধর তর্কবাগীশ, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, সুপ্রসিদ্ধ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, হরনাথ তর্কভূষণ, শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি, সুবিখ্যাত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি অধ্যাপকগণ একবাক্যে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়াছেন।'

চণ্ডীবাবু যে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নামোল্লেখ করিয়াছেন, তাহা ভুল। কারণ বিদ্যাসাগর রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন করেন নাই। মধুসূদন তর্কালঙ্কার সংস্কৃত-কলেজের আসিস্টাণ্ট সেক্রেটারি ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সিরাস্তাদার পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৪১ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে পর বিদ্যাসাগর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ঐ পদে নিযুক্ত হন এবং ঐ ১৮৪১ অব্দে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ সংস্কৃত-কলেজে মধুসূদনের পদে নিযুক্ত হন; সুতরাং রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নিকট কি প্রকারে বিদ্যাসাগরের অধ্যয়ন করা সম্ভব হইতে পারে?

অপিচ চণ্ডীবাবু এস্থলে (৫৮ পৃষ্ঠা ২১ পংক্তি) প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ লিখিয়াছেন। আর তাঁহার পুস্তকের ৬৬ পৃষ্ঠার ৮ পংক্তিতে লিখিয়াছেন প্রেমচন্দ্র। চণ্ডীবাবুকে জিজ্ঞাসা করি একস্থলে চাঁদ ও অন্য স্থলে চন্দ্র কেন? ঐ সময়ে আমিও সংস্কৃত-কলেজে অধ্যয়ন করিতাম। এবিষয়ের যথাযথ বিবরণ মৎপ্রণীত পুস্তকে বিবৃত করিয়াছি। চণ্ডীবাবু যখন সংস্কৃত-কলেজে একবার যাইয়া এ বিষয়ের অনুসন্ধান লন নাই, তখন অন্য দূরবর্তী স্থলের ঘটনার কিরূপ অনুসন্ধান লইয়াছেন?

১০

৬৪ পৃষ্ঠা ১১ পংক্তি

'দুই মাসে আশী টাকা পাইয়া পিতার হাতে দিয়া বলিলেন'।

মৎপ্রণীত জীবনচরিতের ৪৫ পৃষ্ঠা (এই গ্রন্থের ৩৩ পৃষ্ঠা ২৩/২৪ পংক্তি) দেখুন। চণ্ডীবাবু লিখিয়াছেন যে বিদ্যাসাগর দুই মাসে আশি টাকা পাইয়াছেন, ইহা সত্য নহে। দুই মাসে বিদ্যাসাগর প্রতিনিধি থাকিয়া 'চল্লিশ' টাকা পাইয়াছিলেন। আমিও ঐ সময়ে সংস্কৃত-কলেজে অধ্যয়ন করিতাম। এতদ্ভিন্ন খাতাপত্র লিখিতে শিখিবার উদ্দেশ্যে পিতৃদেব আমাকে আয়ব্যয়ের হিসাব রাখিতে আদেশ করেন।

১১

৬৭ পৃষ্ঠা সর্ব নিম্নের পংক্তি হইতে ৬৮ পৃষ্ঠার প্রথম দুই পংক্তি পর্যন্ত

'হেয়ার-প্রদত্ত ভূমিখণ্ডের উপরে সংস্কৃত ও হিন্দু কালেজের বাটী নির্মাণ কার্য আরম্ভ হয়। ১৮২৫ খৃস্টাব্দে বর্তমান সংস্কৃত কালেজ ও হিন্দু স্কুলের বাটী নির্মাণ কার্য শেষ হইলে পর, ইংরাজী ও সংস্কৃত উভয়বিধ বিদ্যালয়ই ঐ বাটীতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইল।'

চণ্ডীবাবু উহার কিছুই অবগত নহেন। প্রকৃত পক্ষে ঐ ভূমিতে সংস্কৃত-

কলেজের জন্যেই ঐ বাটী নির্মিত হইয়াছিল। ঐ বাটীর পূর্ব ও পশ্চিমাংশে এক তালা গৃহগুলি সংস্কৃত-কলেজের অধ্যাপক মহাশয়দের বাসার জন্য নির্মিত, কিন্তু তাঁহারা ইংরাজ বা ম্লেচ্ছের বাটীতে থাকিতে অসম্মত হওয়ায় ঐ অংশগুলি খালি পড়িয়া থাকে। ঐ সময়ে হিন্দু কলেজের বাটী নির্মাণ হয় নাই। হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষগণ সংস্কৃত-কলেজের অধ্যক্ষগণকে বলিয়া উহাতে হিন্দু কলেজ স্থাপিত করেন।

১২

৬৯ পৃষ্ঠা ১৭ পংক্তি

'বিদ্যাসাগর মহাশয় বন্ধুবান্ধব পরিবেষ্টিত হইয়া অনেক সময়ে হেয়ার স্মরণার্থ সভায় উপস্থিত থাকিতেন।'

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত হেয়ার সাহেবের সহিত সদ্ভাবের পরিবর্তে বিদ্বেষ ভাব ছিল। এই কারণে তিনি ঐ সভায় যাইতেন না। যে সময়ে হেয়ার সাহেবের মৃত্যু হয়, তৎকালের সভাতেও বিদ্যাসাগর যান নাই। শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বয়স বাহাত্তর বৎসরের অতীত হওয়ায় 'না'য়ের পরিবর্তে 'হাঁ' বলিয়াছেন। হেয়ার সাহেবের মৃত্যুর সময়ে বিদ্যাসাগর ও রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরস্পর পরিচয় বা আলাপ ছিল না।

১৩

৭২ পৃষ্ঠা ২০ পংক্তি হইতে ২৪ পংক্তি পর্যন্ত

'মার্শেল সাহেব তখনই কোন প্রকারে তাঁহাকে সংবাদ দিবার উপায় করিতে' ইত্যাদি।

চণ্ডীবাবু বড়বাজার যাহা লিখিয়াছেন, তাহা ভুল। তৎকালে বহুবাজার পঞ্চাননতলায় হৃদয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীর সম্মুখে আনন্দ সেনের বাটীতে বাসা ছিল। ঐ মার্শেল সাহেব মহাশয় বহুবাজার মলঙ্গা নিবাসী বাবু রাজেন্দ্র দত্ত মহাশয়ের দ্বারা সংবাদ পাঠান। ইহা শুনিয়া পিতৃদেব বাটী যাইয়া বিদ্যাসাগরকে কলিকাতা আনয়ন করেন। সাহেব পূজ্যপাদ জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয়কে ঈশ্বরচন্দ্রের বয়সের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি সাতাশ বৎসর বয়স অতীত হইয়াছে সাহেবকে এইরূপ বলেন। প্রকৃতপক্ষে তৎকালে বিদ্যা-সাগরের অত বয়স নয়।

১৪

৭৪ পৃষ্ঠা ২৩ পংক্তি।

'বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রথমে দুর্গাচরণবাবুর নিকট ইংরাজী শিক্ষা আরম্ভ করেন। ইহার পর শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের নিকট কিছু দিন

ইংরাজী শিক্ষা করিয়াছিলেন। এই সূত্রে তাঁহার সহিত গভীর আত্মীয়তার সূচনা হয়; এবং সেই আত্মীয়তা চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকিয়া পরস্পরের হৃদয় সরস করিয়াছে। ইহার কিছু দিন পরে তিনি পনের টাকা বেতনে নীলমাধব মুখোপাধ্যায় নামক জনৈক যুবককে ইংরাজী শিখাইবার জন্য শিক্ষক নিযুক্ত করেন।'

মৎপ্রণীত জীবনচরিতের ৫১ পৃষ্ঠা (এই গ্রন্থের ৩৭ পৃষ্ঠা ২৩-২৮ পংক্তি) দেখিলেই সকলই অবগত হইবেন। চণ্ডীবাবু যাহা লিখিয়াছেন তাহা সত্য নহে। প্রথমে দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং বিদ্যাসাগরকে ইংরাজী ভাষা শিখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিছুদিন তাঁহার ছাত্র বাবু নীলমাধব মুখোপাধ্যায়ের নিকট বিদ্যাসাগর মহাশয় ইংরাজী অধ্যয়ন করেন। নীলমাধববাবু বিনা বেতনে পড়াইয়াছেন। চণ্ডীবাবু যে পনের টাকা বেতনের কথা লিখিয়াছেন তাহা মিথ্যা। উক্ত নীলমাধব মুখোপাধ্যায় রাজকৃষ্ণবাবুর পিসতুতো ভাই। ইঁহার নিকট দুই বা তিন মাস পড়িয়াছিলেন। পরে তৎকালীন হিন্দু কলেজের ছাত্র বাবু রাজনারায়ণ গুপ্তকে মাসিক পনের টাকা বেতন দিয়া প্রত্যহ প্রাতঃকাল হইতে বেলা নয়টা পর্যন্ত ইংরাজী ভাষা পড়িতেন। গুপ্ত বাবু পনের টাকা পাইতেন ও প্রাতে আমাদের বাসায় ভোজন করিতেন। রাজনারায়ণের বসু পদবী চণ্ডীবাবু যাহা লিখিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ ভুল। এ সম্পর্কে রাজনারায়ণ গুপ্তের ভ্রাতা জগচ্চন্দ্র গুপ্ত মধ্যে মধ্যে বিদ্যাসাগরের নিকট আসিতেন। বিদ্যাসাগর যখন ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করেন, তৎকালে শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের সহিত বিদ্যাসাগরের আলাপও ছিল না এবং তৎকালে রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে কখনও বিদ্যাসাগরের বাসায় আসিতে দেখি নাই। চণ্ডীবাবু এরূপ লিখিয়া যারপর নাই সত্যের অপলাপ করিয়াছেন।

১৫

৭৫ পৃষ্ঠা ৫ পংক্তি হইতে—

'তিনি সে সময় হেয়ারস্কুলে শিক্ষকতা-কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। ফোর্ট উইলিয়ম কালেজে হেড্ রাইটারের পদ শূন্য হইলে, বিদ্যাসাগর মহাশয় মার্শেল সাহেবকে অনুরোধ করিয়া দুর্গাচরণবাবুকে আশি টাকা বেতনে ঐ পদে নিযুক্ত করিয়া দেন' ইত্যাদি।

চণ্ডীবাবুর লেখা ঠিক হয় নাই, এজন্য নিম্নে বিশদরূপে প্রদর্শিত হইতেছে।

দুর্গাচরণবাবু হেয়ার স্কুলে শিক্ষকতা পদে নিযুক্ত থাকিয়া, হেয়ার সাহেবের অনুমতি লইয়া অবসর সময়ে মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন করিতেন। ১৮৪২ খৃঃ অব্দের ১লা জুন হেয়ার সাহেবের মৃত্যু হয়। হেয়ার সাহেবের মৃত্যুর পর ঐ বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানের ভার জোন্স নামক সাহেবের হস্তে অর্পিত হইলে, জোন্স দুর্গাচরণবাবুকে মেডিকেল কলেজে যাইতে অবসর দিলেন না, তজ্জন্য দুর্গাচরণবাবু

হেয়ার স্কুলের শিক্ষকতা কার্য পরিত্যাগ করিয়া, অনন্যকর্মা হইয়া মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন করেন। কিছু দিন পরে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে হেড রাইটারের পদ শূন্য হইলে বিদ্যাসাগর মহাশয় মার্শেল সাহেবকে অনুরোধ করিয়া দুর্গাচরণকে ঐ কার্যে প্রবিষ্ট করান।

১৬

৭৬ পৃষ্ঠা ১৮ পংক্তি

'কর্ম ত্যাগের সময়ে তাঁহার বেতন কুড়ি টাকা ছিল'।

কুড়ি টাকা নহে। তাঁহার (ঠাকুরদাসের) বেতন দশ টাকা ছিল। তাঁহার বেতন কখনও দশ টাকার উর্দ্ধ হয় নাই।

৭৬ পৃষ্ঠায় সর্বশেষ পংক্তি হইতে ৭৭ পৃষ্ঠার প্রথম দুই পংক্তি

'বাসায় আপনারা তিনটি সহোদর, দুইটি পিতৃব্যপুত্র, দুইটি পিসতুতো ভাই, একটি মাসতুতো ভাই, ও পুরাতন ভৃত্য শ্রীরাম মোট নয়জনের' ইত্যাদি।

চণ্ডীবাবু বিশেষ না জানিয়া ইহা লিখিয়াছেন। ঐ সময়ে তিনটি সহোদর যাহা লিখিয়াছেন তাহা ভুল। ঐ সময়ে আমরা চারি ভাই কলিকাতার বাসায় ছিলাম।

চণ্ডীবাবু দুটি পিসতুতো ভাই যে লিখিয়াছেন তাহা মিথ্যা, তৎকালে চারিটি পিসতুতো ভাই কলিকাতার বাসায় ছিলেন। তাঁহাদের নাম যথা—মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীরাম মুখোপাধ্যায়, ত্রিলোচন মুখোপাধ্যায়, ও চতুর্ভুজ মুখোপাধ্যায়। চণ্ডীবাবু মোট নয় জনের কথা যে লিখিয়াছেন ইহাও ভুল, কারণ তৎকালে বাসায় এতদপেক্ষা আরও অধিক লোক ছিলেন।

আমি স্বকৃত জীবনচরিতে চার জন পিসতুতো ভ্রাতার পরিবর্তে দুই জন লিখিয়াছি। চণ্ডীবাবু সুযোগ পাইয়া আমার ভুলটি লইয়া নিজের পুস্তকে জমা দিয়াছেন।

১৭

৭৭ পৃষ্ঠা ৪ পংক্তি হইতে ৬ পংক্তি পর্যন্ত

'বড়বাজারের বাসায় বহু পরিবারের স্থান সঙ্কুলান না হওয়াতে বিদ্যাসাগর মহাশয় এই সময়ে বহুবাজারের বিখ্যাত হৃদয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দের সদর-বাটী ভাড়া লইয়া বাস করিতে আরম্ভ করিলেন।'

বিদ্যাসাগর মহাশয় বড়বাজার হইতে বহুবাজারে বাসা তুলিয়া আনেন নাই। পিতা ঠাকুরদাস এই সময়ে প্রথমত বহুবাজারের আনন্দ সেনের বাটীতে প্রায় তিন বৎসর থাকিয়া পরে বিখ্যাত হৃদয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বৈঠকখানাতে

দুইটি ঘর ভাড়া লইয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। কিছুকাল পরে সমস্ত বৈঠকখানা মাসিক আট টাকায় ভাড়া লইয়াছিলেন। সুতরাং চণ্ডীবাবুর পূর্বোক্ত উক্তি সম্পূর্ণ অমূলক।

১৮

৭৮ পৃষ্ঠা ১৬ পংক্তি হইতে ১৭-১৮ পংক্তি পর্যন্ত

'সহসা এক দিন বিদ্যাসাগর মহাশয় শুনিলেন, এক অসহায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত জুনিয়ার বৃত্তি পাইয়া সংস্কৃত কালেজে বিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন।'

চণ্ডীবাবুর ইহা ভুল। কারণ তৎকালে কলেজে এইরূপ নিয়ম ছিল যে সংস্কৃত-কলেজের বাহির হইতে অপর স্থানের ছাত্র এস্‌কলার্শিপের পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইলে বৃত্তি পাইত। জুনিয়ারে এক জন আট টাকা ও সিনিয়রে একজন পারদর্শিতানুসারে পনের বা কুড়ি টাকা পাইবে এইরূপ ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু ঐ ছাত্ররা কলেজে অধ্যয়ন করিত না। সুতরাং এক অসহায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত জুনিয়ার বৃত্তি পাইয়া সংস্কৃত-কলেজে বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন ইহা ভুল।

১৯

৭৯ পৃষ্ঠা ১২ পংক্তি

'পনের টাকা ও দুই বৎসর পরে ১ম শ্রেণীরবৃত্তি কুড়ি টাকা প্রাপ্ত হইলেন।'

চণ্ডীবাবু ইহা যেরূপ লিখিয়াছেন তাহা ভুল। কারণ রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম বৎসরে পনের টাকা ও দুই বৎসর পরে না হইয়া এক বৎসর পনের তৎপর বৎসর কুড়ি টাকা বৃত্তি পান; তৃতীয় বৎসরেও কুড়ি টাকা প্রাপ্ত হন। সর্বসুদ্ধ তিন বৎসর বৃত্তি পাইয়াছেন।

২০

৮০ পৃষ্ঠা ৫ পংক্তি হইতে

'তাঁহারই চেষ্টায় তর্কালঙ্কার মহাশয় প্রথমে কলিকাতা বঙ্গ-বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদ প্রাপ্ত হন। তৎপরে যখন প্রায় বৎসরাধিক কালের জন্য বারাশত গভর্নমেণ্ট স্কুলের প্রধান পণ্ডিতের' ইত্যাদি।

মদনমোহন তর্কালঙ্কার নিজের যত্নে কলিকাতা বাঙ্গালা পাঠশালায় ও বারাশতের কার্যে প্রবিষ্ট হন। এই দুই কার্যে বিদ্যাসাগরের কোন যোগাড় বা যত্ন থাকে নাই; পরে বিদ্যাসাগরের যত্ন ও যোগাড়ে মদনমোহন তর্কালঙ্কার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সিবিল পড়ানো কার্যে ও সংস্কৃত-কলেজের সাহিত্যশ্রেণীর অধ্যাপকের কার্যে এবং ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

২১

৮০ পৃষ্ঠা ১৭ পংক্তি হইতে ২০ পংক্তি পর্যন্ত

'মাসিক কুড়ি টাকা সাহায্য দিবার ব্যবস্থা করিয়া পিতৃদেবকে বিষয়কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করাইয়া, অবশিষ্ট ত্রিশ টাকায় কলিকাতার বাসায় নয়-দশ জনের ভরণ পোষণ নির্বাহ করিয়া' ইত্যাদি।

মৎকৃত জীবনচরিতে এইরূপই লেখা আছে; বোধ হয় ঐ আমারই ভুল চুরি করিয়া চণ্ডীবাবুও তাঁহার পুস্তকে এই ভুল সন্নিবেশিত করিয়াছেন। ঐ সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজের মাসিক বেতন পঞ্চাশ ও দ্বিতীয় সহোদর দীনবন্ধুর সংস্কৃত-কলেজে মাসিক ছাত্রবৃত্তি কুড়ি একুনে সত্তর টাকা প্রতি মাসে পাইতেন; তন্মধ্যে প্রথমে পিতা ঠাকুরদাসকে কুড়ি টাকা দিতেন ইহা উভয় জীবনচরিতে ভুল হইয়াছে। এবং ইহাও প্রকাশ থাকে যে পিতা ঠাকুরদাসের মাসিক বেতন দশ টাকা মাত্র ছিল, কুড়ি টাকা নহে এবং ঠাকুরদাসের কর্ম ত্যাগের কিছুদিন পরেই শম্ভুচন্দ্র কলেজে প্রথমত, মাসিক আট টাকা বৃত্তি ও পরে মাসিক পনের টাকা বৃত্তি পাইতেন। দীনবন্ধু ন্যায়রত্নও কলেজ পরিত্যাগ করিয়া পঞ্চাশ টাকা বেতনে কর্ম করিতেন। এই সকল টাকা লইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় বাসাখরচ করিতেন এবং আবশ্যক মত পিতৃদেবকে টাকা পাঠাইতেন। এই সময়েই বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতি সংস্কৃত-প্রেস ও সংস্কৃত-প্রেস ডিপজিটারির সূত্রপাত করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়, মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন এই সকল কর্ম চালাইতে থাকেন।

২২

৮৩ পৃষ্ঠার শেষ হইতে ৮৪ পৃষ্ঠা

'আপনার অনুগ্রহ থাকিলে আমি কৃতার্থ হইব। আর আপনার নিকট থাকিলে, আমি নূতন নূতন উপদেশ পাইব।...এরূপ আত্মসম্মান-শূন্য তোষামোদ বাক্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মুখে দিয়া সহোদর বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁহার গৌরব হানি করিয়াছেন ইত্যাদি।...আমাদের অন্তর ইহাতে সায় দেয় না।'

শম্ভুচন্দ্রের কৃত জীবনচরিত হইতে উদ্ধৃত করিয়া চণ্ডীবাবু সমালোচনা করিয়াছেন।

চণ্ডীবাবু ভাবিয়াছিলেন যে, মার্শেল সাহেব একজন উচ্চপদস্থ এবং বিদ্যাসাগর নিম্নপদস্থ এবং পরে বিদ্যাসাগর নিম্নপদস্থ হইয়া ডায়রেক্টার অফ পবলিক ইনস্ট্রক্সন এমন কি ছোট লাটকে পর্যন্তও অতিরিক্ত সম্মান প্রদর্শন করেন নাই, সুতরাং মার্শেল সাহেবের প্রতি ঐরূপ সম্মান অসম্ভব। এইরূপ লেখায় চণ্ডীবাবু নিজের অজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়াছেন। কারণ বিদ্যাসাগর মহাশয় ঐ সময়ে অর্থাৎ অল্প

বয়সে মার্শেল সাহেবের নিকট বহুল উপদেশ লাভ করিয়া তাঁহার প্রতি গুরু বা জনক-জননীর ন্যায় ভক্তি প্রকাশ করিতেন। মার্শেল সাহেবও স্নেহচক্ষে তাঁহার প্রতি সর্বপ্রকারে ও সর্ববিষয়ে বাৎসল্যভাব প্রকাশ করিতেন। এরূপ অবস্থায় উভয়ের মধ্যে কাহারই পদমর্যাদার প্রভেদ জ্ঞান ছিল না। সুতরাং চণ্ডীবাবু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এরূপ উক্তিকে তোষামোদ বাক্য উল্লেখ করিয়া নিজের অর্বাচীনতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। মার্শেল সাহেব বিদ্যাসাগরকে কখনও ঈশ্বর, কখনও ঈশ্বরচন্দ্র বলিয়া ডাকিতেন এবং তিনিও আজ্ঞা বলিয়া উত্তর দিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এরূপ উক্তি গবর্নর জেনারাল রাজপ্রতিনিধির প্রতিও ঘটে নাই; তিনি আন্তরিক ভক্তির চিহ্নস্বরূপ তাঁহার প্রতিমূর্তি নিজ বাটীতে রাখিয়াছিলেন।

২৩

৮৪ পৃঃ ২৩ পংক্তি

'শুনা যায় যে বিদ্যাসাগর মহাশয় বাচস্পতি মহাশয়ের কর্ম কাজের সুবিধা করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন।'

চণ্ডীবাবু যে উহা লিখিয়াছেন, তাহা কোনমতে বিশ্বাসযোগ্য নহে, ইহা তাঁহার স্বকপোলকল্পিত মাত্র। কারণ, যে বাচস্পতি কলেজ পরিত্যাগ কালে জেলার জজ পণ্ডিতের কার্য বা সদরআমিনী পদ গ্রহণ করিতে স্বীকার না পাইয়া বেদান্ত অধ্যয়নার্থ কাশী যাত্রা করেন এবং তথায় পাঠ সমাপন করিয়া দেশে প্রত্যাগমন করিয়া চতুষ্পাঠী খুলিয়া নানাদেশ হইতে সমাগত বহু বিদ্যার্থীকে অন্ন দিয়া বিদ্যা দান করিতেন এবং ঐ ব্যয় নির্বাহার্থ নানাপ্রকার ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করিতেন; সেই বাচস্পতি যে নিজের চাকরির জন্য কাহারও উপাসনা বা কাহাকেও অনুরোধ করিবেন, ইহা তাঁহার কোষ্ঠীতে লিখে নাই। তিনি কেবল বিদ্যাসাগরের অনুরোধের বশবর্তী হইয়া কলেজের কর্ম করিতে স্বীকার করিয়াছিলেন।

২৪

৮৭ পৃষ্ঠা ৮ পংক্তি হইতে ১৮ পংক্তি পর্যন্ত

'তিনি অনিদ্রায় বহু কষ্টে রাত্রি যাপন করিয়া শেষে প্রাতে মার্শেল সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, 'আমার মা আমাকে বাড়ী যাইতে বলিয়াছিলেন, আমাকে বাড়ী যাইতেই হইবে। যদি বিদায় না দেন, আমি কর্ম পরিত্যাগ করিলাম, মঞ্জুর করুন, আমি বাড়ী যাইব।' সাহেব মাতৃভক্তির এই স্বর্গীয় দৃশ্যে মুগ্ধ হইয়া বলিলেন, 'তোমাকে কর্ম ত্যাগ করিতে হইবে না, আমি বিদায় দিতেছি, তুমি বাড়ী যাও।' তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় হৃষ্টচিত্তে বাসায় আসিয়া

আহারাদির আয়োজন করিলেন। আহারের পর ভৃত্য শ্রীরামকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিলেন। সে সময়ে প্রবল বর্ষাসমাগমে পথ অতি দুর্গম হইয়া উঠিয়াছে, বহু কষ্টে এক এক পা অগ্রসর হইতে হইতেছে, এইরূপ ক্লেশে কতকদূর অগ্রসর হইয়া সেদিন তারকেশ্বরের নিকট রাত্রিযাপন করিতে হইল।'

চণ্ডীবাবু যাহা লিখিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। কারণ, তারকেশ্বরের নিকট দিয়া আমাদের বাটী যাইবার পথ নহে। বিদ্যাসাগর মহাশয় কেবল একবার অতি শৈশবকালে পিতার সহিত কলিকাতায় আসিবার সময় তারকেশ্বরের নিকট রামনগর গ্রামে পিসীবাটী বলিয়া ঐ দিক দিয়া আসিয়াছিলেন।

চণ্ডীবাবু কিছুই না জানিয়া লিখিয়াছেন। সাতান্ন বা আটান্ন বৎসর পূর্বে যখন আমরা কলিকাতায় অধ্যয়নার্থ গতিবিধি করিতাম, তখন এখনকার মত তারকেশ্বর রেলওয়ে হয় নাই, ঘাঁটাল দিয়া যাইবার ষ্টীমার ছিল না; এখনকার মত নৌকায় গতিবিধিও ছিল না। তৎকালে আমরা কলিকাতা হইতে পদব্রজে বাটী যাইতাম। হাটখোলার ঘাটে পার হইয়া শালিখার বাঁধারাস্তায় মোসাট নামক গ্রাম পর্যন্ত যাইয়া, ঐ বাঁধা রাস্তা ত্যাগ করিয়া মাঠের পথে বরাবর পশ্চিম মুখে রাজবলহাট নামক গ্রামে উপস্থিত হইতাম। পরে দামোদর পার হইয়া প্রায় পাঁচ ক্রোশ পথ যাইলে পর পাতুল নামক গ্রামে উপস্থিত হইতাম। তাহা হইতে বীরসিংহা ছয় বা সাত ক্রোশ পশ্চিম।

কয়েক মাস অতীত হইল, চণ্ডীবাবু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত নারায়ণবাবুর সহিত ষ্টীমারে রাণীচক নামক স্থানে যান, তথা হইতে নৌকা করিয়া ঘাঁটাল গমন এবং তথা হইতে তিন ক্রোশ অন্তর বীরসিংহায় পৌছান। চণ্ডীবাবু শালিখার পথে কখনও ঐ দেশ পদব্রজে গমন করিলে ওরূপ লিখিতেন না।

দ্বিতীয়ত, এক অসম্ভব কথা এই লিখিয়াছেন যে, 'তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় হৃষ্টচিত্তে বাসায় আসিয়া আহারাদির আয়োজন করিলেন। আহারের পর ভৃত্য শ্রীরামকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিলেন।'

কলিকাতা বহুবাজার হইতে প্রায় সতের-আঠার ক্রোশ পথ অন্তরে তারকেশ্বর। বর্ষাকালে আফিসের ফেরত অপরাহ্নে সতের-আঠার ক্রোশ পথ কেহ যাইতে পারে ?

প্রকৃত কথা এই যে সাহেবের নিকট বিদায় লইয়া চারটার পর কলিকাতা হইতে জনাই গ্রামের নিকট চণ্ডীতলা নামক গ্রামে সরাইতে রাত্রিযাপন করিয়াছিলেন।

২৫

৮৭ পৃষ্ঠা ১৮ লাইন হইতে ৮৮ পৃষ্ঠার ১০ লাইন পর্যন্ত

'পর দিন শ্রীরামকে পথ চলিতে অসমর্থ দেখিয়া পথে ফলার করাইয়া ও কিছু পয়সা দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন। শ্রীরামের বাড়ী সেখান হইতে নিকটে, সে

অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রভুর আদেশমত বাড়ী গেল। ঈশ্বরচন্দ্রকে সে দিন যে কোন উপায়ে হউক বাটী পৌছিতেই হইবে। সেই দিন বিবাহ। তিনি জানিতেন, তিনি বাড়ী না গেলে, জননীর আর দুঃখের সীমা থাকিবে না। এই ভাবনার তাড়নায় তিনি ত্বরিতগমনে পথ চলিতে লাগিলেন। ক্রমে সেই ভীষণ কলেবর দামোদর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দামোদরে বর্ষার ঢল নামিয়াছে, একগাছি তৃণ পড়িলে শত খণ্ড হইয়া যায়। দুকূল ভাসাইয়া, প্রবল তরঙ্গ তুলিয়া, জলরাশি নৃত্য করিতে করিতে তীরবেগে ছুটিয়াছে। পারের নৌকা পরপারে, নৌকা আসিয়া তাঁহাকে লইয়া গেলে, সে দিন আর গৃহে যাওয়া হয় না, কেবল পার হওয়া হইবে মাত্র, তাহারও নিশ্চয়তা নাই। মাতৃভক্ত বিদ্যাসাগর কি করিলেন, পাঠক! শুনিতে চাও, ভাবিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে, ভয়ে হাত পা পেটের ভিতর প্রবেশ করে; উপন্যাসে কবি-কল্পনায় এরূপ ঘটনার অবতারণা সম্ভব হয়, কিন্তু সত্য সত্যই যে মানুষ এরূপ করিতে পারে, তাহা সহজে বিশ্বাস হয় না; কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় আব্দারে মায়ের আদেশ পালনের জন্য বর্ষার ভরা দামোদরের জলোচ্ছ্বাসে অঙ্গ ঢালিয়া দিলেন। যাহারা পারে যাইবে বলিয়া বসিয়া ছিল, তাহারা অনেকে নিষেধ করিল, কেহ কেহ বাধাও দিল, কিন্তু মাতৃ-আজ্ঞা পালনে বদ্ধপরিকর ঈশ্বরচন্দ্র কোন বাধাই মানিলেন না; সবলদেহ বীর-পুরুষ দামোদরের তরঙ্গ-সংগ্রামে জয়ী হইয়া পর পারে উঠিলেন।'

চণ্ডীবাবু বর্ষাকালে ভরা দামোদর সাঁতরাইয়া পার হওয়ার কথা যে লিখিয়াছেন, তাহা নিতান্ত অসঙ্গত। বোধ করি, চণ্ডীবাবু বর্ষাকালে রাজবলহাট গ্রামের সন্নিকটে দামোদর নদের অতি ভীষণমূর্তি কখনও স্বচক্ষে দেখেন নাই; তজ্জন্যই এরূপ অসম্ভব কথা লিখিয়াছেন। এরূপ মিথ্যা ও অসঙ্গত কথা লিখিয়া পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করার আবশ্যক কি? বন্যার সময় দামোদরের এত জল বৃদ্ধি হয় যে, ঐ নদের পশ্চিমে প্রায় চারি ক্রোশ পর্যন্ত মাঠ জলমগ্ন থাকে।

দ্বিতীয়ত, 'শ্রীরামের বাড়ী সেখান হইতে নিকটে, সে অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রভুর আদেশ মত বাড়ী গেল।'

ইহা চণ্ডীবাবুর নিতান্ত ভ্রম। শ্রীরামের বাটী সেখান হইতে নিকট নহে, তাহার বাটী পাতুল গ্রাম, পাতুল দামোদর পার হইয়া প্রায় পাঁচ ক্রোশ যাইতে হইবে। প্রকৃত কথা, শ্রীরাম পাতুল পর্যন্ত একত্র গিয়াছিল, সেদিন নিজ বাটী পাতুল গ্রামে রহিল। বিদ্যাসাগর তথা হইতে একা বাটী গেলেন।

২৬

১০৭ পৃষ্ঠা ২০ পংক্তি হইতে ২৫ পংক্তি পর্যন্ত

'সংস্কৃতভাষা শিক্ষা ও শাস্ত্রালোচনার যে প্রবল স্রোত এ দেশে প্রবাহিত হইয়াছে তাহার মূলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপক্রমণিকা ও পরবর্তী ব্যাকরণগুলি

বহুল পরিমাণে কার্য করিয়াছে। আবার যখন জানা গেল যে, সেই উপক্রমণিকার প্রথম পাণ্ডুলিপি এক রজনীর কয়েক ঘণ্টা মাত্র সময়ে রচিত হইয়াছিল, ('বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার বন্ধু শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে সংস্কৃত শিক্ষা দিবার সোপানরূপে উক্ত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি রচনা করিয়াছিলেন।') তখন বিস্ময়বিহ্বল হইয়া তাঁহার বিচিত্র শক্তির প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।'

চণ্ডীবাবু যে লিখিয়াছেন ইহা সত্য নহে। কারণ আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রথমে সংস্কৃত রিডারের ও সংস্কৃত হিতোপদেশের দুই এক গল্প পাঠ করিয়া মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পাঠ করেন। আমাদের বাসায় প্রত্যহ মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতেন। তৎকালে উপক্রমণিকা ব্যাকরণের পাণ্ডুলিপি হয় নাই। যদি রাজকৃষ্ণবাবু বলিয়া থাকেন, তাহা তাঁহার ভ্রম। রাজকৃষ্ণবাবুর মুগ্ধবোধ অধ্যয়নের পর অন্তত সাত বৎসর পরে উপক্রমণিকার সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ যৎকালে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল হন, তাহার আট-নয় মাস পরে উপক্রমণিকা লিখিয়া মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন।

২৭

১১৪ পৃষ্ঠা ৩ পংক্তি হইতে ৮ পংক্তি পর্যন্ত

'বিদ্যাসাগর মহাশয় যে সময়ে সংস্কৃত কালেজের দ্বিতল গৃহে বাস করিতেন, সেই সময়ে বাবু দ্বারকানাথ ভট্টাচার্যের সঙ্গে ৺দ্বারকানাথ মিত্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করিতে আসেন। আলাপে বিদ্যাসাগর মহাশয় পরিতুষ্ট হইয়া নব্য মিত্র মহাশয়কে বিদায় দিয়া দ্বারিকাবাবুকে [(চণ্ডীবাবু লিখিয়াছিলেন যে) ইনি 'বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিশেষ ভালবাসার পাত্র। ইনি এক্ষণে মহারাজা স্যর যতীন্দ্রমোহনের প্রধান কর্মচারী। ইঁহারই নিকট এই ঘটনাটি শুনিয়াছি।'] বলিয়াছিলেন, 'এ কাকে এনেছিলে হে, এ যে চোখে মুখে কথা কয়, আমাকে 'থ' করিয়া দিল। আমি ত জানিতাম, যেখানে আমি, সেখানে আর কেহ কথা কহিতে পারে না। এ যে আমার উপরে যায়।' এই সময় হইতে দ্বারকানাথ মিত্র মহোদয়ের সহিত তাঁহার আত্মীয়তার সূত্রপাত হয়।'

ইহা ভ্রমাত্মক। বিদ্যাসাগর প্রিন্সিপালের পদে নিযুক্ত হইবার বহু পূর্ব হইতে পূজার অবকাশে নৌকাপথে বাটী যাইবার সময় হারোপ ও আগুন্সী গ্রামে তৎকালীন সংস্কৃত-কলেজের ছাত্র তারকচন্দ্র চূড়ামণি ও রমানাথ তর্কালঙ্কারদিগের বাটিতে একদিন এক বেলা থাকিয়া বাটী যাইতেন। সেই সময়ে উঁহাদিগের প্রতিবেশী বালক দ্বারকানাথ মিত্রের সহিত আলাপ হয়। চণ্ডীবাবু! তখন আপনার দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য কোথায়? পরে বাবু দ্বারকানাথ মিত্র বহুবাজার

মলঙ্গায় তাঁহার মাতুল বাবু প্রেমচাঁদ নিয়োগীর বাসায় ও দোকানে আসিলে বহুবাজার পঞ্চাননতলায় আমাদের বাসায় আসিয়া সাক্ষাৎ করিতেন। হুগলি কলেজে অধ্যয়ন সময়ে যখন যখন দ্বারিকবাবু কলিকাতায় মাতুলের বাসায় আসিতেন, সেই সেই সময়ে তিনি আমাদের বাসায় যাইতেন। এবং বিদ্যাসাগরের প্রিন্সিপাল হইয়া দ্বিতল গৃহে অবস্থিতি সময়ে বাবু দ্বারকানাথ মিত্র মহাশয় ওখানে আসিয়া সাক্ষাৎ করিতেন।

২৮

১১৭ পৃষ্ঠার নিম্নের ৮ পংক্তি হইতে ১১৮ পৃষ্ঠার ১৫ পংক্তি পর্যন্ত

'বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুমূর্তিবিশিষ্ট ছিলেন। সংস্কৃত কালেজে যখন অধ্যক্ষরূপে বিরাজ করিতেন, তখন তাঁহাকে দেখিলে ছাত্র ও অধ্যাপক সকলেই সভয়-সম্মান সহকারে নত মস্তক হইতেন, কেহই তাঁহার সমক্ষে মাথা তুলিয়া উচ্চ কথা বলিতে সাহস করিতেন না। বালকেরা বিদ্যালয়ে তাঁহাতে কেমন এক দুরতিক্রমণীয় গাম্ভীর্য মূর্তিমান দেখিত, কিন্তু বিদ্যালয়ের বাহিরে বালকেরা তাঁহাকে আপনাদের দলের লোক-সঙ্গী বলিয়া মনে করিত। একদিন কোথায় এক বিশেষ কাজে গিয়া, আসিবার সময় বেলা অধিক হইয়া যায়। বাটী আসিয়া আহারাদি করিতে গেলে, যথাসময়ে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হওয়া অসম্ভব। পথে নিকটে পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয়দের ছাত্রাবাস। সেই বাসায় প্রবেশ করিলেন, একখানা ভিজা কাপড় পরিয়া পাতকুয়া হইতে কয়েক ঘটী জল তুলিয়া মাথায় ঢালিলেন, বালকেরা আহারে বসিয়াছিল, তাহাদের সঙ্গে বসিলেন, সকলের পাত হইতে এক এক থাবা ভাত লইয়া উদর পূর্ণ করিয়া সকলের অগ্রে উঠিলেন, সকলের অগ্রে বিদ্যালয়ে গিয়া উপস্থিত হইলেন। (পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয়ের নিকট এই ঘটনাটি শুনিয়াছি।) বালকেরা কয়েক মুহূর্তের জন্য তাঁহাকে সঙ্গে পাইয়া, তাহাদের আহার্য হইতে কিছু কিছু খাইতে দেখিয়া এবং দু চারিটা আমোদের কথা কহিতে পাইয়া কৃতার্থ হইয়া গেল। সেই অল্প সময় মধ্যে কত গল্প করিলেন, কত রং তামাশা করিয়া ক্ষণকাল মধ্যে অদৃশ্য হইলেন। কবিরত্ন মহাশয় বলিয়াছেন, বিদ্যালয়ে গিয়া দেখি, সেই বালস্বভাবসুলভ চপলতার মূর্তি বিদ্যাসাগর আর নাই, ক্ষণকাল পূর্বে বালকদের মধ্যে বালক বেশধারী যে বিদ্যাসাগরমূর্তি দেখিয়া আমরা পরম পুলকিত হইয়াছিলাম, পর মুহূর্তে শিক্ষক বেশধারী অধ্যক্ষপদারূঢ় সেই বিদ্যাসাগরমূর্তিই আমাদের মনে ভয়ের সঞ্চার করিয়া দিল। এইরূপ মূর্তি পরিবর্তনে যেরূপ আত্মশাসন ও সাধনের প্রয়োজন, তাহা সাধারণ লোকের পক্ষে সম্ভব নহে।'

নিজকৃত জীবনচরিতে এই বিষয় প্রকাশ করিবার পূর্বে চণ্ডীবাবুর জানা উচিত

ছিল, যে ঐ সময়ে তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয়ের অন্নপ্রাশন হইয়াছিল কি না? এবং বিদ্যাসাগর কোথায় কোন্ কাজে গিয়াছিলেন এবং কোথায় ঐ ছাত্রাবাস। ঐ ছাত্রাবাসের অধ্যক্ষের নাম কি? এই সকলের উল্লেখ করিয়া ঐ কয়েকজন ছাত্রের নামোল্লেখ করা উচিত ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় অপরিচিত ভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রবর্গের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়াছিলেন, এই অসম্ভব বৃত্তান্তটি পুস্তকে নিবদ্ধ করিয়া অনেক হিন্দুর মনে বিদ্যাসাগরের প্রতি অশ্রদ্ধার বীজ স্থাপন করিয়া চণ্ডীবাবুর কি ইষ্টসিদ্ধি হইল, তাহা তিনিই জানেন। আমরা কিন্তু কখনও এই বৃত্তান্তের অণুমাত্র শ্রবণ করি নাই। এমন কি, আমি তাঁহাকে পিতা-মাতা ভিন্ন অন্য কাহারও কখনও উচ্ছিষ্ট খাইতে দেখি নাই।

২৯

২০৮ পৃষ্ঠা ৬ হইতে ৮ পংক্তি পর্যন্ত

'বিদ্যাসাগর মহাশয় একখানি বগি গাড়ীতে বালী স্টেশন হইতে উত্তরপাড়া যাইতেছিলেন, উত্তরপাড়ার অতি নিকটে পথে একস্থানে মোড় ফিরিবার সময়ে গাড়ীখানি উল্টাইয়া পড়ে।' ইত্যাদি—

চণ্ডীবাবু যাহা লিখিয়াছেন তাহা নহে, অর্থাৎ উত্তরপাড়া যাইবার সময় গাড়ী হইতে পড়েন নাই। ইং ১৮৬৬ সালে উত্তরপাড়া হইতে প্রত্যাগমন কালে বগী গাড়ী আরোহণ করিয়া আসিতেছিলেন; মোড় ফিরিবার সময়ে গাড়ী উল্টাইয়া পড়াতে পতিত হয়েন।

চণ্ডীবাবু উত্তরপাড়া যাইবার সময় গাড়ী হইতে পতিত হইয়াছিলেন লিখিয়াছেন। যাইবার সময় বা আসিবার সময় ইহার তদন্ত না করিয়া কেন লিখিলেন? একবার উত্তরপাড়া যাইয়া জমীদার ৺বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের ভবনে যাইলে সকলই জানিতে পারিতেন, এবং ভিজিট পুস্তক দেখিয়া বুঝিতে পারিতেন।

৩০

২৩১ পৃষ্ঠা ২ পংক্তি হইতে ২৩২ পৃষ্ঠার ৩ পংক্তি পর্যন্ত

'পুস্তক রচনা করিলেন বটে কিন্তু এখনও প্রচার করেন নাই। পুস্তক রচনা করিয়া সর্বাগ্রে পিতার নিকট গেলেন, পিতাকে গিয়া বলিলেন, 'দেখুন আমি শাস্ত্রাদি হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া বিধবাবিবাহের পক্ষ সমর্থনের জন্য এই পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়াছি। আপনি শুনিয়া এ বিষয়ে আপনার মত না দিলে আমি ইহা প্রকাশ করিতে পারি না।' ঠাকুরদাস পুত্রকে বলিলেন, 'যদি আমি এ বিষয়ে মত না দিই, তবে তুমি কি করিবে?' ঈশ্বরচন্দ্র বলিলেন, 'তাহা হইলে আমি আপনার জীবদ্দশায় এ গ্রন্থ প্রচার করিব না। আপনার দেহত্যাগের পর

আমার যেরূপ ইচ্ছা হইবে সেইরূপ করিব।' পিতা পুত্রকে বলিলেন, 'আচ্ছা কাল একবার নির্জ্জনে বসিয়া মনোযোগ সহকাবে সমস্ত শুনিব, পরে আমাব যাহা বক্তব্য তাহা বলিব।' পরদিন বিদ্যাসাগর মহাশয পিতাব নিকট বসিযা গ্রন্থখানি আদ্যো-পান্ত পাঠ করিলেন। পিতা সমস্ত শ্রবণ করিয়া বলিলেন :—'তুমি কি বিশ্বাস কর, যাহা লিখিয়াছ তাহা শাস্ত্রসম্মত হইয়াছে?' পুত্র বলিলেন, 'হাঁ তাহাতে আমার অণুমাত্র সন্দেহ নাই।' উদারহৃদয় ঠাকুবদাস অমনি বলিলেন, 'তবে তুমি এ বিষয়ে বিধিমতে চেষ্টা করিতে পার, আমার তাহাতে আপত্তি নাই।' পিতার আদেশ পাইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় পুলকপূর্ণ হৃদয়ে জননী সদনে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'মা, তুমি ত শাস্ত্র টাস্ত্র কিছু বুঝিবে না, আমি বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে এই বইখানি লিখিয়াছি, কিন্তু তোমার মত না পেলে এ বই আমি ছাপাইতে পারি না। শাস্ত্রে বিধবাবিবাহেব বিধি আছে।' সবলতাব সৌম্যমূর্তি উন্নতমনা সহৃদয়া জননী ভগবতী দেবী অমনি বলিলেন, 'কিছুমাত্র আপত্তি নাই, লোকেব চক্ষুঃশূল, মঙ্গল কর্মে অমঙ্গলের চিহ্ন, ঘরের বালাই হইয়া নিরন্তব চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে যাহাদের দিন কাটিতেছে, তাহাদিগকে সংসারে সুখী করিবাব উপায় কবিবে, এতে আমাব সম্পূর্ণ মত আছে। তবে এক কাজ করিবে, যেন ওঁকে (কর্তাকে) বলিও না।' পুত্র বলিলেন, 'কেন মা, বলিব না?' জননী বলিলেন, 'তাহা হইলে উনি বাধা দিতে পারেন। কারণ তুমি বিধবাবিবাহের গোলযোগ তুলিলে ওঁর অনেক ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা।' বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, 'বাবা মত দিয়াছেন।' করুণারূপিণী দেবী ভগবতী এই সংবাদ শুনিবামাত্র আরও দশগুণ উৎসাহিত হইয়া বলিলেন, 'তবে বেশ হয়েছে—তবে আর ভয় কি?'

মৎকৃত বিদ্যাসাগর জীবনচরিতের ১১০ পৃষ্ঠার ২৪ পংক্তি হইতে ১১২ পৃষ্ঠার ৫ পংক্তি পর্যন্ত এবং ঐ পুস্তকের ১১৪ পৃষ্ঠার ৮ পংক্তি হইতে ২০ পংক্তি পর্যন্ত। (এই গ্রন্থের ৮০ পৃষ্ঠা ৬ পংক্তি হইতে ২৬ পংক্তি এবং ৮৩ পৃষ্ঠার ১৩ পংক্তি হইতে ২৪ পংক্তি।)

এক দিবস পিতৃদেব ও বিদ্যাসাগর বীরসিংহার বাটীতে চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন, এমত সময়ে জননীদেবী একটি বালিকার বৈধব্য উল্লেখ করিয়া চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া বলিলেন, তুই এতদিন যে শাস্ত্র পড়িলি, তাহাতে বিধবাদের কোন উপায় নাই কি? ইহা শুনিয়া পিতৃদেব বলিলেন, ঈশ্বর! ধর্মশাস্ত্রে বিধবাবিবাহের কি কি ব্যবস্থা আছে? অগ্রজ উত্তর করিলেন, শাস্ত্রে প্রথমত ব্রহ্মচর্য, অভাবে সহমরণ বা বিবাহ। পিতৃদেব বলিলেন, রাজ আজ্ঞায় সহমরণ প্রথা নিবারিত হইয়াছে। কলিতে ব্রহ্মচর্য সহজ নহে, সুতরাং বিবাহই একমাত্র উপায়। অতএব তুমি পুনরায় ভাল করিয়া শাস্ত্র দেখিয়া ইহা শাস্ত্রসিদ্ধ করিবার জন্য যত্নবান হও। এবং এবিষয়ে প্রবৃত্ত হইলে লোকের নিন্দাবাদে বা অপর কোন কারণে পশ্চাৎপদ হইবে না; এমন কি তোমার পিতা-মাতা আমরা নিবারণ

করিলেও ক্ষান্ত থাকিবে না। পুস্তক প্রচার হইবার অল্পদিন পরে পিতৃদেব কলিকাতায় বহুবাজারে পঞ্চাননতলার বাসায় ডাক্তার নবীনচন্দ্র মিত্র ও অগ্রজের সহিত কথোপকথনে হাস্যবদনে বলিলেন, ঈশ্বর আর তোমাকে আমার শ্রাদ্ধ করিতে হইবে না। ইহা শুনিয়া অগ্রজ সহাস্যমুখে বলিলেন, খরেদরে এক আঁঠু অর্থাৎ ভাল মন্দ সুখ্যাতি অখ্যাতি দুই আছে। পিতৃদেব বলিলেন, বাবা ধরেছ ছেড়ো না, প্রাণ পর্যন্ত স্বীকার করিও। এই অভিপ্রায়েই পূর্বে বীরসিংহার চণ্ডীমণ্ডপে আমরা উভয়েই তোমাকে বলিয়াছিলাম।

অতএব চণ্ডীবাবু যাহা লিখিয়াছেন তাহা তাঁহার স্বকপোলকল্পিত। কিন্তু আমি যাহা লিখিলাম, ইহাই প্রকৃত ঘটনা।

৩১

২৩৬ পৃষ্ঠা ১১ পংক্তি

'উক্ত ব্যবস্থাপত্র সংস্কৃত কালেজের অধ্যাপক মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশের নিজের রচিত ও স্বহস্তে লিখিত।'

মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ সংস্কৃত-কলেজে কখনও অধ্যাপক থাকেন নাই, ইহা মিথ্যা। চণ্ডীবাবু একবার সংস্কৃত-কলেজে যাইয়া হাজিরা বহি দেখিয়া মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ মহাশয় উক্ত বিদ্যালয়ে অধ্যাপক ছিলেন কি না, অবগত হইতে পারিতেন। তাহা হইলে এত ভ্রমে পতিত হইতেন না। মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্তবাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সভাসদ্, এবং কলিকাতা মাদ্রাসা কলেজের পণ্ডিত ছিলেন।

৩২

২৮৪ পৃষ্ঠা ১২ পংক্তি হইতে ১৪ পংক্তি

'মহাত্মা রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ কলিকাতার অধিকাংশ ইংরাজীতে কৃতবিদ্য লোক বরের পাল্কির সঙ্গে পদব্রজে গিয়াছিলেন।'

শ্রীশ বাবু পাল্কীতে বিবাহ করিতে আইসেন নাই। বাবু রামগোপাল ঘোষ মহাশয়ের বড় জুড়ি গাড়ীতে আইসেন। ঐ গাড়ীতে রামগোপাল বাবু প্রভৃতি ছিলেন।

৩৩

২৮৪ পৃষ্ঠা ২২ পংক্তি

'মেদিনীপুরের তদানীন্তন গবর্ণমেণ্ট উকিল হরনারায়ণ দত্ত বলিয়াছিলেন যে,' ইত্যাদি।

তৎকালে মেদিনীপুর গবর্নমেণ্টের উকীল হরনারায়ণ দত্ত মহাশয় ছিলেন না। তৎকালে বাবু চন্দ্রনাথ দেব মহাশয় গবর্নমেণ্টের উকীল ছিলেন। পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের মধ্যম সহোদর শ্রীযুক্ত বাবু মদনমোহন বসুর বিবাহের সময় উক্ত উকীল বাবু চন্দ্রনাথ দেব মহাশয় তথা হইতে আসিয়া সভাস্থ হইয়াছিলেন। আমার এরূপ লেখায় যদি চণ্ডীবাবুর সন্দেহ হইয়া থাকে, তাহা হইলে মেদিনীপুরের জজ আদালতের রেকর্ড আপনার দেখা উচিত যে, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসুর ভ্রাতার বিবাহ সময়ে মেদিনীপুরের জজ আদালতে গবর্নমেণ্টের উকীল কে ছিলেন। অথবা সংবাদ লিখিয়া সাধারণের ভ্রম জন্মাইবার প্রয়োজন কি ? নভেল লিখিতে প্রবৃত্ত হন নাই যে যাহা ইচ্ছা তাহাই লিখিবেন।

৩৪

২৯৬ পৃষ্ঠা ১৮ পংক্তি হইতে ২৯৯ পৃষ্ঠার ১২ পংক্তি পর্যন্ত

'পুত্র নারায়ণচন্দ্র ১২৭৭ সালের ২৭ শ্রাবণ, একবিংশ বর্ষ বয়ংক্রমকালে খানাকুল কৃষ্ণনগরনিবাসী শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের একাদশবর্ষীয়া বিধবা কন্যার পাণিগ্রহণ করেন'। ইত্যাদি—

চণ্ডীবাবু উক্ত শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দুহিতার যে একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম লিখিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। বিবাহের সময় শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যার বয়স তৎকালে প্রায় ষোড়শ বর্ষ। চণ্ডীবাবু কাহার নিকটে এগার বৎসরের বলিয়া শুনিয়াছেন। তাঁহার নামোল্লেখ করা কর্তব্য ছিল।

৩৫

২৯৮ পৃষ্ঠা ২০ পংক্তি হইতে ২৯৯ পৃষ্ঠা পর্যন্ত

'কিন্তু তৃতীয় সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন, এবং এ কথা বিদ্যাসাগর মহাশয় ও বিদ্যারত্ন মহাশয় উভয়েই সর্বদা সর্বসমক্ষে স্বীকার করিয়াছেন। বিদ্যারত্ন মহাশয় অনুরাগভরে দীর্ঘকালের জন্য তাঁহার নানাবিধ কার্যে সহকারিতা করিয়া আসিয়া এবং তাঁহার জীবনী-বিষয়ক নানা ঘটনা আশৈশব অবগত থাকিয়াও বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ভাল করিয়া চিনিতে পারেন নাই, ইহা অপেক্ষা গভীর আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে! যদি তিনি চিনিতে পারিতেন, তাহা হইলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবাবিবাহবিষয়ক অনুষ্ঠানে সহকারিতা করিয়া পরিশেষে কোন্ সাহসে বিধবাবিবাহের অনুষ্ঠান হইতে নারায়ণবাবুকে বিরত করিবার জন্য তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন? যখন দীর্ঘকালের জন্য জ্যেষ্ঠের কার্যে

সহকারিতা করিয়া সহোদর বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই, তখন দেশের লোক যে নানা ছন্দোবন্ধে তাঁহার নিন্দা রটনা করিবে এবং তাঁহার প্রকৃত মর্যাদা বুঝিতে অক্ষম হইবে, ইহা আর বিচিত্র কি।'

চণ্ডীবাবু লিখিয়াছেন যে আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে চিনিতে পারি নাই, একথা সম্পূর্ণ সত্য। কারণ নারায়ণবাবুর বিবাহের পূর্বে মুচীরামের বিবাহের সময় উক্ত বিবাহ ন্যায্য ও শাস্ত্রসম্মত স্বীকার করিয়াও বিধবাবিবাহবিদ্বেষী ক্ষীরপাইনিবাসী হালদারবাবুদের অনুরোধে পশ্চাৎপদতার ও কাপুরুষতার পরিচয় দিয়া ক্ষান্ত হয়েন নাই বরং ঐ সময়ে তিনি ঐ বিবাহের প্রতি যারপরনাই বিদ্বেষ ভাব প্রদর্শন করিয়াছেন। চণ্ডীবাবু নিজে যখন এরূপ বিধবাবিবাহে বিদ্যাসাগরের বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তখন পাঠকবর্গ এবং চণ্ডীবাবু এবিষয়ের সত্যতা সম্বন্ধে কিছুই সন্দেহ করিতে পারেন নাই। তখন আমি কিরূপে বুঝিব যে বিদ্যাসাগর নারায়ণের বিধবাবিবাহের প্রবৃত্ত হইবেন।

দ্বিতীয়ত, আমি যে যে কারণে ঐ কন্যার সহিত নারায়ণের বিবাহ স্থগিত রাখিতে লিখিয়াছিলাম, বিদ্যাসাগর সকল কারণের উত্তর ঐ পত্রে (প্রকাশিত পত্রে) লিখেন নাই, লিখিলে তাহাও প্রকাশ করিতাম। তিনি কেবল নারায়ণের বিবাহেরই কথা লিখিয়াছেন, অপর কথার উত্তর দেন না। আমি যে যে কারণে ঐ বিধবার সহিত নারায়ণের বিবাহ দেওয়া অনুচিত বলিয়া লিখিয়াছিলাম, তাহা নিম্নে প্রকটিত হইতেছে।

ঐ কন্যার সম্বন্ধ, অগ্রজ মহাশয় অন্য এক পাত্রের সহিত স্থির করিয়াছিলেন, সে ব্যক্তি অতি ভদ্র লোক, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে সম্ভ্রমের সহিত কর্ম করিতেন। তিনি ঐ কন্যার সহিত বিবাহকার্য সম্পাদনার্থ অলঙ্কারাদি প্রস্তুত করাইতে ছিলেন। তাঁহাকে বঞ্চনা করিয়া নারায়ণের সহিত বিবাহ দিলে সে ব্যক্তি কি মনে করিবেক।

তৃতীয়ত, পূজ্যপাদ জ্যেষ্ঠা বধূ দেবী অত বড় মেয়ের সহিত বিবাহ দিতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং নারায়ণের বিবাহ পক্ষে অভিপ্রায় অর্থাৎ উভয় পক্ষের অভিপ্রায় লেখা হইয়াছিল।

চতুর্থত, অপরাপর আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের কথাও একই পত্রে লিখিয়াছিলাম। দাদার নিকটে কোন বিষয়ের গোপন করি নাই।

আত্মীয় কুটুম্বদের প্রতিকূলে এরূপ কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া সহজ নহে। বিবাহ রাত্রে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কোন স্বজাতীয় আত্মীয় স্ত্রীলোক বর কন্যার বরণ করিতে সম্মত হইলেন না এবং ইহাও প্রকাশ পাকে যে, তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের মত বিদ্বান ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোক আমার নয়নগোচর হয় নাই। কারণ নারায়ণের বিবাহ সময়ে বরণ করিবার সময় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কোন আত্মীয় স্ত্রীলোক বরণ করিতে সম্মতা হইলেন না দেখিয়া, বাচস্পতি মহাশয় তৎক্ষণাৎ

নিজের বাটী গিয়া আপন পত্নীকে আনয়ন পূর্বক বর-কন্যার বরণ কার্য সমাধা করাইলেন। এ কারণ, বাচস্পতি মহাশয়ের উপর আমাদের অচলা ভক্তি।

৩৬

৩৩৩ পৃষ্ঠার শেষ ২ পংক্তি হইতে ৩৩৪ পৃষ্ঠার ৬ পংক্তি পর্যন্ত এবং ৩৩৪ পৃষ্ঠার শেষে

'এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এরূপ সংকল্প ছিল যে বহুবিবাহ বিষয়ক গ্রন্থের ইংরাজীতে অনুবাদ করিবেন এবং একটিবার ইংলণ্ডে গমন পূর্বক কোটি কোটি প্রজাপুঞ্জের জননীস্থানীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়া সদনে বঙ্গের অসংখ্য রমণীর কাতরতাপূর্ণ অশ্রুজল অঞ্জলি পূরিয়া রাজ্ঞী-সম্ভাবণার্থে অর্পণ করিবেন এবং ভারতেশ্বরীকে তাঁহার এ কথাও জিজ্ঞাসা করিবার বড় সাধ ছিল যে, যে দেশে পুণ্যশ্লোকা পরম সাধ্বী রমণীর মণি ভিক্টোরিয়া রাজত্ব করেন সে দেশে নারীজাতির এত দুর্দশা কেন? ভগবানের কৃপায় শক্তিশালিনী অবলা কি দুর্বলার দুঃখ দূর করিতে বিমুখ হইয়াছেন। (বিদ্যাসাগর-পুত্র শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নিকট এই ঘটনাটি শুনিয়াছি এবং তাঁহার বহুবিবাহ গ্রন্থোক্ত আক্ষেপোক্তিতেও তাহার আভাস পাওয়া যায়। নারায়ণবাবু বলেন :—বাবা বলিয়াছিলেন, ইংলণ্ডে গিয়া বহুবিবাহ গ্রন্থ সুন্দর করিয়া ছাপাইয়া মহারাণীর হাতে দিয়া বলিব যে 'মেয়ে রাজার দেশে মেয়েদের দুঃখ ঘুচে না কেন?'

পূর্বোক্ত গল্পটির সত্যতা পক্ষে কোন প্রমাণ আজ পর্যন্ত পাই নাই। দাদা বিলাত গিয়া এরূপভাবে বহু বিবাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিবেন এই কথা আমার নিকট বা অপর কোন ব্যক্তির নিকট বলিয়াছিলেন তাহারও কোনও প্রমাণ নাই। অধিকন্তু তিনি বিলাত যাওয়ার পক্ষে ছিলেন বলিয়াও বিশ্বাস করিতে পারি না, কারণ তিনি বলিতেন, বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে কাঁদাইয়া বিলাত যাওয়া উচিত নয়। বিশেষত যাহারা বিলাত হইতে আসিয়া থাকে, তাহারা পিতা-মাতার বাধ্য থাকে না ও সংসর্গে থাকে না।

৩৭

৩৫৪ পৃষ্ঠার ১৭ পংক্তি হইতে ৩৫৫ পৃষ্ঠার ৪ পংক্তি পর্যন্ত

'বালক-বিদ্যালয়, বালিকা-বিদ্যালয়, রাখাল-স্কুল প্রভৃতি জ্ঞান বিতরণের সকল দ্বারগুলিই অবৈতনিক। সকলেই সর্বত্র বিনা-বেতনে ও বিনা ব্যয়ে বিদ্যা উপার্জন করিতে লাগিল। এই সকল বিদ্যালয়ের ছাত্র ও ছাত্রীগণের পুস্তক, কাগজ, কলম, শ্লেট, পেন্‌সিল, প্রভৃতিতে মাসে মাসে প্রায় তিনশত টাকার অধিক ব্যয় হইত। বিদ্যাসাগর-সুহৃৎ ৺প্যারীচরণ সরকার মহাশয় তাঁহার রচিত পুস্তকগুলি বিনামূল্যে বীরসিংহের বিদ্যালয়ের ব্যবহারার্থ বিতরণ করিতেন। এতদ্ভিন্ন ঐ সকল

বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের বেতন ও অন্যান্য খরচ সর্বসমেত তিনশত-চারশত টাকা পড়িত। প্রথম প্রথম এই সমগ্র ব্যয় নিজেই বহন করিতেন, তৎপরে যখন তাঁহারই উদ্যোগে এডেড্ স্কুল সমূহের (Grant-in-Aid) সৃষ্টি হইল, তখন কিছুকালের জন্য বীরসিংহ স্কুলও গভর্ণমেণ্ট হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই বিদ্যালয় এক্ষণে সেই প্রাতঃস্মরণীয়া বিদ্যাসাগর জননী ভগবতী দেবীর নামে পরিচিত। বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত সেই বিদ্যামন্দির 'ভগবতী বিদ্যালয়' নামে অভিহিত হইয়া অদ্যাপি জীবিত আছে এবং বীরসিংহ অঞ্চলের বালকগণের শিক্ষালাভে সহায়তা করিয়া আসিতেছে। বিদ্যাসাগর-পুত্র নারায়ণবাবু সে বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে যত্নের ত্রুটি করেন না।'

'প্রথম প্রথম এই সমগ্র ব্যয় নিজেই বহন করিতেন, তৎপরে যখন তাঁহারই উদ্যোগে এডেড্ স্কুল সমূহের (Grant-in Aid) সৃষ্টি হইল, তখনই কিছু কালের জন্য বীরসিংহ স্কুলও গভর্ণমেণ্ট হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিল।' ইহা ভ্রম। বিদ্যাসাগর বা তাঁহার পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বীরসিংহা ইংরাজী-সংস্কৃত বালক বিদ্যালয়ে কখনও গভর্ণমেণ্টের সাহায্য লয়েন নাই, এবং ছাত্রদিগকেও বেতন দিতে হইত না। ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কাশীবাসী হইবার পর ছাত্রেরা কিছুদিন স্কুলের বেতন দিয়াছিল। ইহার অল্প দিনের মধ্যে ম্যালেরিয়া জ্বর নিবন্ধন ঐ স্কুল উঠিয়া যায়। পুনরায় বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর প্রায় দুই বৎসর পূর্বে জননী ভগবতী দেবীর নামে পুনরায় অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এ স্থলে প্রকাশ থাকে যে কেবল বালিকাবিদ্যালয়ই গবর্নমেণ্ট হইতে এড পাইত।

চণ্ডীবাবুর এই পুস্তক ইংরাজী ১৮৯৫ সালে লিখিয়াছেন। কিন্তু ১৮৯৪ সালে নারায়ণবাবু তাঁহার পিতা বিদ্যাসাগরের স্থাপিত ভগবতী বিদ্যালয় উঠাইয়া দিয়াছেন। সুতরাং চণ্ডীবাবুর লিখিত বিষয় সম্পূর্ণ সত্য নহে।

৩৮

৩৮৭ পৃষ্ঠা ১১ পংক্তি হইতে ৩৮৮ পৃষ্ঠার ১০ পংক্তি পর্যন্ত

'এখন আর কি আছে? সে কালে বর বাসর ঘরে প্রবেশ করিতে না করিতে তাকে তার ক'নে খুঁজিয়া লইতে হইত।' ইত্যাদি—

আমাদের দেশে বিবাহরাত্রে বাসর ঘরে কন্যা খোঁজার রীতি নাই এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ঐ রাত্রে খুঁজিতে হয় নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিবাহের সময় আমি নীতবর ছিলাম। আমার বেশ মনে আছে, আমাদের দেশে বিবাহের পরদিবস আকাটা পুকুরে স্নানের পূর্বে স্ত্রীলোকেরা কন্যাকে লুকাইয়া রাখিয়া বরকে কন্যা খুঁজিতে বলে। বর যত এঘর ওঘর খুঁজিতে থাকে, স্ত্রীলোকেরা তত কৌতুক করিতে থাকে। বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্বন্ধে তাহাই হইয়াছিল; রীতি-

বহির্ভূত হয় নাই। বোধ করি, চণ্ডীবাবু হিন্দুমতের কার্যকলাপ বিস্মৃত হইয়া থাকিবেন। এখনকার ছেলেদের অপেক্ষা পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে ছেলেদের সলজ্জতা অনেক বেশি ছিল। সুতরাং বিদ্যাসাগর মহাশয় তখনকার ছেলে হইয়া এরূপ ধৃষ্টতা করিবেন, তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে।

৩৯

৩৯২ পৃঃ ৮ পংক্তি হইতে ১০ পংক্তি পর্যন্ত

'এই ডাকাইতির পর হইতেই পাঠকের পূর্ব পরিচিত সর্দার শ্রীমন্ত গৃহ-রক্ষক-রূপে নিযুক্ত হইয়াছিল।'

ডাকাইতি হইবার পর গোঁসাই ও ফকিরদাস এই দুইজনকে নিযুক্ত করা হয়, ইহার এক বৎসর পরে চিন্তামণি ও পরাণ নামক দুই সর্দার নিযুক্ত হয়। তৎপরে শ্রীমন্ত সর্দার নিযুক্ত হইয়া বাটীতে ছিল, পরে বিধবাবিবাহের সময় হইতে শ্রীমন্ত কয়েক বৎসর দাদার নিকট রক্ষক নিযুক্ত হয়, সুতরাং ডাকাইতির পর হইতে শ্রীমন্ত সর্দার নিযুক্ত হয় নাই।

৪০

৩৯২ পৃঃ ২১ পংক্তি

'বীরসিংহ গ্রামে অবৈতনিক ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে'—ইত্যাদি।

সর্বপ্রথমে বীরসিংহা স্কুলে বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পড়ানো আরম্ভ হয়, অনেক পরে ইংরাজী আরম্ভ হয়। বলা বাহুল্য, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পড়ানোর আরম্ভ হইতেই পাঠশালাগুলি উঠিয়া যায়। সুতরাং বীরসিংহাতে ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাঠশালাগুলি উঠিয়া যাওয়ার কথাটি ঠিক নহে।

৪১

৩৯৭ পৃষ্ঠার ১১ পংক্তি হইতে ১৪ পংক্তি পর্যন্ত

'হ্যারিসন সাহেব যখন ইন্‌কম ট্যাক্সের কার্যভার প্রাপ্ত হইয়া মেদিনীপুর জেলায় গমন করিয়াছিলেন, সেই সময় তিনি একবার বীরসিংহ ও তন্নিকটবর্তী গ্রাম সকল পরিদর্শন করিতে গমন করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় সে সময়ে বাটীতে ছিলেন।'

হেরিসন সাহেব ইন্‌কম ট্যাক্সের কার্যভার প্রাপ্ত হইয়া মেদিনীপুর জেলায় গমন করিয়াছিলেন, ইহা ভুল। পাঠকবর্গ মৎপ্রণীত বিদ্যাসাগর জীবনচরিতের

১৯৮।১৯৯।২০০ পৃষ্ঠা (এই গ্রন্থের ১৪৩-১৪৫ পৃষ্ঠা) পর্যন্ত দেখিলে সমস্ত ভ্রম নিবারিত হইবেন।

প্রকৃত কথা এই যে, সন ১২৭৫ সালে ইন্‌কম ট্যাক্সের কার্যভার প্রাপ্ত রমেশ-চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় হুগলি জেলার অন্তঃপাতী জাহানাবাদ মহকুমায় আগমন করেন। তৎকালে ঘাঁটাল ও চন্দ্রকোণা থানা, হুগলি জেলা ও মহকুমা জাহানা-বাদের অন্তর্গত ছিল। ইহার অনেকদিন পরে উক্ত দুই থানা মেদিনীপুর জেলার অন্তর্বর্তী হইয়াছে।

রমেশবাবু, যে সকল সামান্য ব্যবসায়ী লোকের আইনানুসারে ট্যাক্স ধার্য হইতে পারে না, তাহাদের প্রতি অন্যায় করিয়া পৃথক পৃথক ব্যবসায়ী দুই ব্যক্তির এক ব্যবসা বলিয়া এক বিলে ট্যাক্স ধার্য করিতেছিলেন। এই আইনবিরুদ্ধ কার্যে স্থানীয় অনেকে সম্মত না হইলে আসেসর বাবু ভয়প্রদর্শন দ্বারা ঐ সকল লোককে সম্মত করান। তৎকালে বিদ্যাসাগর মহাশয় দেশে ছিলেন। দেশস্থ লোক নিরুপায় হইয়া এই সংবাদ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কর্ণগোচর করিয়াছিল। বিদ্যা-সাগর মহাশয় ন্যায়বিরুদ্ধ কার্য হইতেছে শুনিয়া খড়ার নামক গ্রামে যাইয়া আসেসর রমেশবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তাহাতেও রমেশবাবু অন্যায় কার্য করিতে বিরত না হইয়া বরং পূর্বাপেক্ষায় ভয় দেখাইয়া কার্যসাধন করিতে লাগিলেন। দরিদ্রলোকের প্রতি অন্যায় হইতেছে দেখিয়া বিদ্যাসাগর তাহাদের হিতকামনায় স্বয়ং বাদী হইয়া এই বিষয় লেপ্টনেণ্ট গবর্নর বাহাদুরের কর্ণগোচর করেন। তৎকালীনের ছোটলাট বাহাদুর তৎকালের বর্ধমানের কালেক্টর হেরিসন সাহেব মহোদয়কে কমিসন নিযুক্ত করিয়া তদন্ত জন্য প্রেরণ করেন। হেরিসন সাহেব বাদী বিদ্যাসাগর মহাশয় সমভিব্যাহারে জাহানাবাদ মহকুমার অন্তঃপাতী খড়ার, ঘাঁটাল, রাধানগর, ক্ষীরপাই, চন্দ্রকোণা, রামজীবনপুর, বদনগঞ্জ, জাহানা-বাদ প্রভৃতি গ্রামে যাইয়া সকল ব্যবসায়ীর খাতা প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ করেন। পরিশেষে অগ্রজ মহাশয় সাহেবকে নিমন্ত্রণ করিয়া বাটীতে আনয়ন করিয়াছিলেন। আমিও সেই সময়ে হেরিসন সাহেব ও দাদার সহিত উল্লিখিত খড়ার, রাধানগর, চন্দ্রকোণা গ্রামে গমন করিয়াছিলাম।

৪২

৩৯৮ পৃঃ ১৯ পংক্তি

'ঈশ্বরচন্দ্রকে ও সারি সারি দণ্ডায়মান অপর তিনটি পুত্রকে দেখাইয়া বলিলেন।'

চণ্ডীবাবু লিখিয়াছেন যে, সারি সারি দণ্ডায়মান অপর তিনটি পুত্রকে দেখাইয়া বলিলেন। ইহা ঠিক নহে। কারণ, হেরিসন সাহেব যখন আমাদের বাটী যান, এবং জননীদেবীর সহিত ঐরূপ কথোপকথন হয়, তখন সারি সারি অপর তিনটি

পুত্র দণ্ডায়মান ছিলেন না, দুইটি পুত্র মাত্র দণ্ডায়মান ছিলেন। কারণ, কনিষ্ঠ ঈশানচন্দ্র তখন বিদেশে ছিলেন। এ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় অনেক পত্র আমায় লিখিয়াছিলেন তন্মধ্যে একখানি পত্র নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

শ্রীশ্রীহরিঃ—

শুভাশিষঃ সন্তু,

তোমার পত্র পাইয়া সবিশেষ অবগত হইলাম যাহারা দুইজনে আট টাকা দিয়া এক সার্টিফিকেট লইয়াছে তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দিবে যেন তাহারা কোনক্রমে একযোগে কর্ম করি বলিয়া দরখাস্ত না দেয। তাহাদিগকে কহিবে যদি তাহাদিগকে ফৌজদারীতে সোপর্দ করে তাহাতে ভয় পাইবার অবশ্যকতা নাই ডেপুটি মেজিস্ট্রেট তলপ করিলে তাহারা দুই নামের আট টাকার সার্টিফিকেট দেখাইয়া বলে, আমরা টেক্স দিয়াছি ও সার্টিফিকেট পাইয়াছি আর আমাদের উপর টেক্সের দাওয়া হইতে পারে না। যদি হাকীম তাহাতে ক্ষান্ত না হইয়া জরিমানা করেন জরিমানার টাকা দাখিল করিয়া দিতে বলিবে আমি ঐ টাকার দায়ী রহিলাম আর তাহাদিগকে কহিবে যেন পূর্বপ্রাপ্ত দুই নামের সার্টফিকেট ও আট টাকার নূতন সমন কোনমতে হাতছাড়া না করে। আমি গবর্ণমেণ্টে জানাইয়াছি তদারকের হুকুম হইয়াছে, আমি ও তদারকের নিমিত্ত নিযুক্ত ব্যক্তি সত্বর পঁহুছিতেছি একথা সকলের নিকট প্রচার করিবার প্রয়োজন নাই। তাহাদিগকে কহিবে আমি নিশ্চিন্ত নাই যাহাতে তাহাদের নিষ্কৃতি হয় অবিলম্বে তাহার পথ হইবে তাহারা যেন ভয় না পায়। কোন্ দিন আমরা যাইব কল্য তাহা অবধারিত হইবেক ইতি ১৯ ডিসেম্বর।

শুভার্থিনঃ

(স্বাক্ষর) শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মণঃ।

৪৩

৩৩৯ পৃঃ ১০ পংক্তি হইতে ১৩ পংক্তি

'আহার করাইয়া শেষে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী সাহেবকে বলিলেন, 'দেখ বাছা! তুমি যে কাজ লইয়া আসিয়াছ—এ বড় কঠিন কাজ, খুব সাবধান হইয়া এ কাজ করিবে, যেন গরিব দুঃখী লোক প্রাণে মারা না যায়।'—ইত্যাদি।

চণ্ডীবাবু উল্লিখিত কথা যাহা লিখিয়াছেন, তাহা আদৌ হয় নাই। একথা তিনি কাহার নিকট শুনিয়াছেন, তাহার নাম কেন ব্যক্ত না করেন। আমি তৎকালে উপস্থিত ছিলাম। আর আর যাঁহারা ঐ সময়ে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে এখন কেহ জীবিত নাই।

৪৪

৪০০ পৃষ্ঠা ১৩ পংক্তি হইতে ১৫ পংক্তি পর্যন্ত

'মা, পাইকপাড়া রাজাদের বাড়ীতে একজন খুব ভাল প'টো এসেছে, তোমার একখানি ছবি তুলাইয়া লইতে চাই।'—ইত্যাদি।

পাইকপাড়ার রাজবাটীতে জননীদেবীর ছবি তুলাইতে যাইবার কথা যে লিখিয়াছেন ইহা মিথ্যা। কারণ বিদ্যাসাগর মহাশয় ছবি তুলাইবার জন্য মাতাকে সঙ্গে করিয়া হডসেন সাহেবের বাটী গিয়াছিলেন।

৪৫

৪০১ পৃঃ ১৭ পংক্তি হইতে ২০ পংক্তি পর্যন্ত

'এই প্রবীণা গৃহিণী মূর্তিপূজার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন না'

চণ্ডীবাবু যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ অলীক কথা। জননীদেবী মধ্যে মধ্যে গ্রাম্য দেবতার পূজা দিতেন, এবং বিদেশস্থ ছেলেদের উদ্দেশে শুভচনীর পূজা মানসিক করিতেন এবং পিতৃশ্রাদ্ধও করিতেন। তাঁহারই আগ্রহাতিশয়ে বাটীতে জগদ্ধাত্রী পূজা হইত, তিনি ভক্তিপূর্বক পূজার আয়োজন করিতেন ও পুষ্পাঞ্জলি দিতেন। এতদ্ভিন্ন কালীঘাট প্রভৃতি তীর্থপর্যটনে যাইতেন।

৪৬

৪০৬ পৃঃ ৬ পংক্তি হইতে ২১ পংক্তি পর্যন্ত

'বিদ্যাসাগর মহাশয় সহোদরদিগকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন এবং সর্বদা তাঁহাদের এবং তাঁহাদের পরিবারবর্গের সুখ চিন্তা করিতেন। তাঁহার জীবদ্দশায় সহোদর-দিগের কাহাকেও পরিজনসহ কোনও দিন ক্লেশ পাইতে হয় নাই, কিন্তু সহোদরেরা যে তাঁহার প্রতি সর্বদা সমুচিত ভ্রাতৃভাবাপন্ন ছিলেন, এরূপ বোধ হয় না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মধ্যম সহোদর ৺দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন মহাশয় একবার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নামে এক মকদ্দমা উপস্থিত করেন। কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত-যন্ত্র ও তৎসংক্রান্ত পুস্তকালয়ের অংশের প্রার্থী হইয়া আদালতে অগ্রসর হন। বলপূর্বক কিংবা অন্যায় করিয়া কেহ তাঁহার সম্পত্তি গ্রহণ করিবে, ইহা তিনি কোন মতেই সহ্য করিতে পারিতেন না। মকদ্দমা করা যখন স্থির হইল, তখন আদালতে না গিয়া সালিসী দ্বারা নিষ্পত্তির জন্য কেহ কেহ পরামর্শ দিলেন, তদনুসারে দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর উভয়ে এক টাকা মূল্যের একখানি স্ট্যাম্প কাগজে একরার পত্র লিখিয়া স্বাক্ষর করিয়া দিলেন। সেই একরার পত্রে মাননীয় জজ দ্বারকানাথ মিত্র ও শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গামোহন দাস

-মহাশয়কে সালিসী মান্য করিয়া তাঁহাদিগের উপর সমগ্র বিচার ভার অর্পণ করিলেন।'—ইত্যাদি।

অগ্রজ মহাশয়ের মৃত্যুর পর যখন আমি তাঁহার জীবনচরিত পুস্তক মুদ্রিত করি, তৎকালে তাঁহার উইলের অন্যতম একজিকিউটার ৺কালীচরণ ঘোষ মহাশয়কে বলিয়াছিলাম, দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সালিসী বিচার সময়ে আপনি লেখক থাকায় আপনি সমস্তই অবগত আছেন, অতএব তাঁহার জীবন-চরিতে এ বিষয়ে কি করিব। এই কথায় তিনি বলেন, ভ্রাতায় ভ্রাতায় সামান্য কথায় বিরোধ উপস্থিত হইলে আপনিই এক কথায় বিরোধ মিটাইয়া দিয়াছেন, ও বিষয়ের আর কি লিখিবেন। এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে, আমি বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া ক্রমিক বিয়াল্লিশ বৎসরকাল অনন্যকর্মা ও অনন্যমনা হইয়া তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিয়াছি, এজন্য তিনি আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। সাধারণের প্রতি তাঁহার যেরূপ দয়া গুণ ছিল, তাহাতেই আমি তাঁহাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর জ্ঞান করিতাম। আমার উপর তিনি কখনও বিরক্ত হন নাই। দেশে দাদার সকল কার্যের ভারই আমার প্রতি অর্পিত ছিল। যদি আমার প্রতি বিরক্ত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার সকল কার্যের ভার আমার হস্তে কখনও অর্পণ করিতেন না। দেশস্থ সকলেই জানিত, আমিই বিদ্যাসাগরের প্রিয়পাত্র ছিলাম। অনেকে ঐ বিষয় লিখিতে আমায় নিবারণ করিয়াছিলেন; কেবল কনিষ্ঠ সহোদর ঈশানচন্দ্রের নির্বন্ধাতিশয়ে মৎকৃত বিদ্যাসাগর জীবনচরিতের ১৯৮ পৃষ্ঠায় (এই গ্রন্থের ১৪৩ পৃষ্ঠার ১৫-১৮ পংক্তি) লেখা হইয়াছিল। এক্ষণে চণ্ডীবাবুর উল্লিখিত বর্ণনা অবলোকন করিয়া অগত্যা প্রকৃত বিষয় প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম।

চণ্ডীবাবু এ স্থলে সহোদরেরা এরূপ বহুবচনান্ত পদ প্রয়োগ করিয়া সত্যের অপলাপ করিয়াছেন। গ্রন্থ লিখিতে বসিয়া সত্যের অপলাপ করা অন্যায়। বিদ্যা-সাগর মহাশয় মধ্যে মধ্যে বলিতেন যে, ভ্রাতায় ভ্রাতায় সদ্ভাব থাকিতে থাকিতে পরস্পর পৃথক হওয়া উচিত। কিন্তু দেশের লোক তাহা করে নাই। যখন পরস্পর অত্যন্ত মনান্তর ঘটে ও পরস্পর মুখ দেখাদেখি থাকে না, তখন অগত্যা আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সর্বস্বান্ত হয়। ইহা তিনি অনেক সময়ে অনেকের নিকট গল্প করিতেন এবং অনেক সময়ে অনেককে সদ্ভাব থাকিতে থাকিতে পৃথক হইবার জন্য উপদেশ দিতেন। সন ১২৭৫ সালে বিদ্যাসাগর মহাশয় অসুস্থতা নিবন্ধ আরোগ্য লাভের জন্য বীরসিংহার বাটীতে গমন করেন। তথায় দেখিলেন, প্রত্যহ এক বাটীতে বহুলোক একত্র ভোজন করায় সকলেরই বিশেষ অসুবিধা এবং টাকাও যথেষ্ট ব্যয় হয়; এবং অধিক লোক থাকায় ভোজনের পারিপাট্য থাকে না; এই হেতু বিদ্যাসাগর মহাশয় মধ্যম সহোদর দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন, শম্ভুচন্দ্র, ঈশানচন্দ্র ও জননী-দেবীকে বলেন, পূর্বের বন্দোবস্ত আমার মতে ভাল নয়। কারণ, দেখিতেছি সকলেরই ইহাতে কষ্ট হইয়া থাকে। অতএব আমার মত এই, যাহার যেমন

টাকার আবশ্যক তাহাকে সেইরূপ টাকা যথাসময়ে দিব এবং সকলেরই পৃথক বাটী নির্মাণার্থ যাহা ব্যয় হইবে, তাহাও আমি দিব। পৃথক বাটী হইলে উত্তর-কালে পরস্পর নির্বিরোধে দিনপাত করিতে পারিবে।

ইহা শুনিয়া দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন বলেন, আপনি নানাপ্রকার দেশহিতকর কার্যে ব্রতী হইয়াছেন। এ অবস্থায় পৃথক হইলে পর নানাপ্রকার গোলযোগ ঘটিতে পারে, এবং সহোদরগণেরও একতা থাকিবে না। এই হেতু আমি বলি, এক্ষণে পৃথক হওয়া উচিত নহে। কনিষ্ঠ ঈশানচন্দ্র, জ্যেষ্ঠা বধূদেবী ও জননীদেবী প্রভৃতি ও সমস্ত আত্মীয়স্বজন এ বিষয়ে আপত্তি করিলেন। বিশেষত জ্যেষ্ঠা বধূদেবী ও নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে বলিলেন, ঘর করিতে বিবাদ ও নানা কথা উঠে, তা বলিয়া ঘর ভাঙা উচিত নহে। পৃথক হইলে গৃহস্থ ছারখার হয়। ইহাতে তোমার ও আমাদের বিশেষ হানি দেখিবে। আমি উহাদিগের ঐ কথায় কর্ণপাত করিলাম না। কেবল আমিই জ্যেষ্ঠাগ্রজ মহাশয়কে তুষ্ট করিবার জন্য সম্মতি দিলাম, এবং পৈতৃক ভদ্রাসন পরিত্যাগ করিলাম। আমার বাটী প্রস্তুত জন্য দাদা তেরশত টাকা ক্রমশ প্রদান করেন। অতঃপর সকলকেই পৃথক করিলেন। ঐ সময়ে সকলের মাসিক ব্যয়ের, তাঁহার স্বহস্তলিখিত ফর্দ ও পত্র যাহা আমার নিকট পাঠাইয়াছিলেন, তাহার মধ্যে ফর্দ ও কয়েকখান পত্র এস্থলে প্রকাশিত হইল। ঈশান তৎকালে কলিকাতায় পঠদ্দশায় থাকেন, এজন্য তাঁহার স্ত্রীকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দেন।

কিছুদিন পরে তাঁহার স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাদিগকে আনিয়া কলিকাতায় রাখেন। তাঁহার প্রথমা কন্যার বিবাহের পর আমাকে ও দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন মধ্যম দাদাকে কলিকাতায় আনাইয়া দীনবন্ধুকে বলিলেন, তুমি বিষয় সম্বন্ধে আমায় নিন্দা করিয়াছ? এবং সংস্কৃত-প্রেস ও উহার ডিপজিটারি আমাদের উভয়ের সম্পত্তি বলিয়া থাক? এবং ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়কে ঐ ডিপজিটারি দান বা ন্যাস সম্বন্ধে তুমি নানাপ্রকার কথোপকথন করিয়া থাক? এবং শুনিতে পাই যে উভয়ের টাকা হইতে বাসা ও দেশে সংসার চলিয়াছিল এবং ছাপাখানারও সূত্রপাত হইয়া ছাপাখানা ও ডিপজিটারি প্রস্তুত হইয়াছে, সকলের নিকট বলিয়া থাক। জ্যেষ্ঠাগ্রজের এই সকল কথা শুনিয়া দীনবন্ধু বলেন, বিধবাবিবাহাদি কার্যনিবন্ধন আপনার প্রায় পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা ঋণ আছে, অন্যান্য লোকে যখন ত্রিশ বা পঁচিশ হাজার টাকা পণ দিয়া সংস্কৃত ডিপজিটারি লইতে উমেদার, তখন ব্রজবাবুকে বিনা পণে কেন দেওয়া হইল? অন্যকে দিলে পণের টাকায় মহাশয়ের ঋণের অনেক লাঘব হইত। ইহাই আমি লোকের নিকট বলিয়াছি। আপনি যেরূপ উদার-প্রকৃতি তাহাতে সমস্ত বিষয়ই নষ্ট করিতে পারেন। তাহা হইলে বিধবাবিবাহ ও বিদ্যালয় প্রভৃতি দেশ-হিতকর কার্য কিরূপে চালাইবেন? আর দেখুন, আমি এস্কেলার্শিপের ও চাকরির টাকা আপনার হস্তেই দিয়া আসিয়াছি এবং আপনার

আজ্ঞানুসারে সমস্ত কার্য নির্বাহ করিয়া আসিয়াছি। কেবল ডেপুটী মাজিস্ট্রেট হইয়া আপনাকে টাকা দিই নাই, কারণ, আপনি নিষেধ করিয়া বলিয়াছিলেন, বীরসিংহায় দাতব্য চিকিৎসালয় ও নাইট স্কুল হিসাবে মাসিক চল্লিশ টাকা যাহা লাগিবে তাহা দিবে। এই কারণেই, ঐ সময় হইতেই আপনাকে টাকা দিই নাই।

সংস্কৃত-প্রেস ও ডিপজিটারি আপনার একার সম্পত্তি নহে, সুতরাং উহাতে আপনার একলার স্বত্ব নাই। ইহাতে আমার স্বত্ব আছে। কারণ আমাদের উভয়ের অর্থে ও পরিশ্রমে ঐ দুই সম্পত্তি অর্জিত হইয়াছে।

ইহাতে বিদ্যাসাগব মহাশয় উত্তর করিলেন, আমি উহা ব্রজবাবুকে দিয়াছি। দীনবন্ধু উত্তব করিলেন, আপনার অংশের উপর আপনি যদৃচ্ছা ব্যবহার করিতে পারেন, আমার অর্ধেক অংশ আপনি দান করিতে পাবিবেন না। ইহা শুনিয়া বিদ্যাসাগর বলেন, তোমাকে অর্ধেক দিতে পারি না, কারণ চারি ভাই ও পিতা-মাতা বর্তমান অতএব ঐ সম্পত্তি যুক্তি অনুসারে ছয় ভাগ হইতে পারে।

পরিশেষে আদালতে না গিয়া দুই সহোদবে তৎকালের মাননীয় জজ ৺দ্বারকানাথ মিত্র ও শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গামোহন দাস মহাশয়দ্বয়কে সালিস নিযুক্ত করেন। দীনবন্ধু ন্যায়রত্নেব সাক্ষী আমি ও আমার পিতৃব্য-পুত্র পীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায় সাক্ষ্য দিবার জন্য কলিকাতায় উপস্থিত হইলাম।

আমি সাক্ষ্য দিবাব ভয়ে পৃথক পৃথক দুই সহোদরকে আপোসে নিষ্পত্তি করিবার জন্য অনুনয় বিনয় করিলাম। দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন আমার অনুনয়ে বা অনুরোধে দাবী পরিত্যাগ কবেন এবং দীনবন্ধু মাসিক টাকা না লওয়ায় বিদ্যাসাগর মহাশয় মধ্যমা বধূদেবীকে মাসিক ব্যয় নির্বাহার্থ গোপনে টাকা প্রদান করেন। মধ্যমাগ্রজ উহা জানিতে পারিয়া ঐ টাকা ফেরৎ দেওয়াইলেন। ইহাতে অগ্রজ মহাশয় অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া সংসার পরিত্যাগ করিয়া বৈবাগ্য আশ্রয় করিবেন এই ভয় প্রদর্শন করিয়া জনক-জননীকে, সহোদরদিগকে, পত্নীকে ও অন্যান্য বন্ধু-দিগকে বৈরাগ্য ও সংসার ত্যাগসূচক এক এক পত্র প্রেরণ করেন। ইহাতে আমি ও পিতৃদেব মহাশয়, মধ্যম দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন মহাশয়কে নির্বন্ধসহ অনুরোধ করায় দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন দাদা মহাশয় মাসিক ব্যয় নির্বাহার্থ টাকা লইতে স্বীকার পাইলেন ও লইতে লাগিলেন। ইহাতে বিদ্যাসাগর দাদা মহাশয়ের মানসিক ক্ষোভ নিবারিত হইল, তদনন্তর তিনি শান্তভাবাপন্ন হইয়া স্ত্রী ও পুত্রাদি লইয়া সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে লাগিলেন, এবং দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন মৃত্যুকাল পর্যন্ত বিদ্যা-সাগর দাদা মহাশয়ের অনুগত থাকিয়া দিনপাত করিয়াছিলেন।

দীনবন্ধু ন্যায়রত্নের দাবী পরিত্যাগের অব্যবহিত পরক্ষণেই ঐ সালিসদ্বয়ের ও মান্যবর ৺বাবু শ্যামাচরণ দে মহাশয় প্রভৃতির সমক্ষে জ্যেষ্ঠাগ্রজ মহাশয় আমাকে বলিলেন, তোমার ঐ সম্পত্তিতে কোনও দাবী দাওয়া আছে কিনা? আমি

উত্তর করিলাম আমার কোন দাবী নাই। অপর কোন হিসাবে কোন দাবী আছে? আমি কহিলাম অন্য কোন বিষয়েও কোন দাবী দাওয়া রাখি না। ইহা শুনিয়া দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, কেমন নির্বোধ দেখ! বিধবাবিবাহাদি নানা কার্যের দরুণ দাদার আদেশে শম্ভু নিজ নামে প্রায় পাঁচ হাজার টাকা ঋণ করিয়াছে। এই কথায় বাবু শ্যামাচরণ দে মহাশয় বলিলেন, বিষয়ের দাবী ত্যাগ করিলে, ঐ দেনা কিরূপে পরিশোধ করিবে। অদ্য হইতে তোমাদের দুই ভ্রাতার ঐ সম্পত্তির সহিত কোন সংশ্রব রহিল না। জ্যেষ্ঠাগ্রজ বলিলেন, ঐ ঋণের বিষয় আমরা ঘরে বুঝিব। আমিও তাঁহার কথায় সায় দিলাম। শ্যামাচরণবাবু উত্তর করিলেন, আমাদের সমক্ষে ইহাকে নিঃসত্ব করিলে এবং দেনার বেলায় বলিলে ঘরে বুঝিব। আমরা কি বলিয়া এরূপ কথায় সায় দিই।

তদনন্তর বাটী গিয়া আমার হস্ত হইতে বালিকাবিদ্যালয় সমূহের, বিধবা-বিবাহের, স্কুল ডাক্তারখানা প্রভৃতি সমস্ত কার্যের নিমিত্ত যে সকল দেনা হইয়াছিল, তাহা নিজ হিসাবে লইয়া আমাকে উত্তমর্ণদিগের নিকট হইতে মুক্ত করিয়া দিলেন; এবং সমস্ত কার্যভার হইতে আমাকে অবসর দিয়া নিজ হস্তে লইলেন। ইহার কয়েক দিন পরে অর্থাৎ ইন্‌কম ট্যাক্সের আসেসর রমেশবাবুর প্রজাদের প্রতি অত্যাচার নিবারণ সম্বন্ধে বিশেষ অসুবিধা হওয়ায় বিদ্যাসাগর দাদা মহাশয় আমাকে অনুরোধ করিয়া তাঁহার দেশের সমস্ত কার্যের ভার পুনর্বায় আমার হস্তে অর্পণ করিলেন। ইহার পূর্ব ও পরে দাদা মহাশয় আমাকে যে সকল পত্র ও ফর্দ দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কয়েকখানি প্রকাশিত হইল।

এসময়ে সালিসদ্বয় ও শ্যামাচরণ দের সমক্ষে বিদ্যাসাগর অগ্রজ মহাশয় বলিলেন, কনিষ্ঠ ঈশানচন্দ্র ঐ সম্পত্তিতে দাবী করিতে অনিচ্ছুক; অতএব এস্থলে তাঁহার উপস্থিতির আবশ্যক নাই। একারণ, তাঁহাকে আসিতে নিবারণ করিয়াছি।

গৃহস্থ—	১৪৪	মাসহারা—	১৫৬
শ্রীধর—	৩	বড় পরিবার—	৫৫
শম্ভুচন্দ্র বন্দ্যো—	৫	মেজো পরিবার—	৬০
সেজো বৌ—	১০	দিগম্বরী ও মন্দা—	৫
ছোট বৌ—	৮	ভৈরবী দেবী—	২
বেণীমাধব—	২	বিন্ধ্যবাসিনী দেবী—	১
হারাধন—	৩	কালীকান্ত চট্টো—	৪
তত্ত্বাবধায়ক—	৩	হরদাস তর্কালঙ্কার—	৪
মুহুরী—	৩	তারাচরণ মুখো—	৮
ভাণ্ডারী—	৫	রামেশ্বর মুখো—	৪
পাচিকা—	২	কালিদাস মুখো—	৪

৩ চাকর—	২॥০			শ্যামাচরণ ঘোষাল—	৪৲
২ দাসী—	২৲			নীলাম্বর ন্যায়ালঙ্কার—	৫৲
২ দ্বারবান্—	১৫॥০	মদন—	১৲		
খোরাকী—	৬০৲	রমানাথ—	১৲		১৫৬৲
বাজে খরচ—	১০৲	গোবিন্দ—	॥০		
আগন্তুক—	১০৲				
	১৪৪৲				

গৃহস্থ— ১৪৪৲
মাসহারা—১৫৬৲

৩০০৲

(পৃথক হইবার পর আমার ডেপুটী ইনস্পেক্টরী কার্য হইবার প্রস্তাব হইতেছে শুনিয়া আমাকে এই পত্র লিখেন।)

প্রিয়তম,

তুমি এক্ষণে আমার একমাত্র ভরসা স্থান এই বিবেচনা করিয়া চলিবে ও সকল কর্ম করিবে আমি যতশীঘ্র পারি বাটী যাইতেছি স্ত্রীলোকের বা ইতরজনের বাক্যে ক্ষুব্ধ বা বিচলিত হইবে না কোন কারণে বা কাহারো কথায় আমি কখন তোমার উপর বিরক্ত হইব ইহা মনেও স্থান দিবে না যাহাতে তোমার মান ও প্রতিপত্তি থাকে সে বিষয়ে আমি ক্ষণকালের নিমিত্ত অনবহিত হইব না ইহা নিশ্চিত জানিবে ইতি রবিবার।

(স্বাক্ষর) শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

শ্রীশ্রীহরিঃ—

শুভাশীষঃ সন্তু—

৭০০৲ সাতশত টাকার নোট পাঠাইতেছি আষাঢ় মাসের হিসাবে বিলি করিবে।

মাতাঠাকুরাণী—	৩০৲	স্কুল—	২২০৲
দীনবন্ধু—	৭০৲	ডাক্তারখানা—	২২৲
শম্ভুচন্দ্র—	৭০৲	স্ব-মাসহারা—	৭০৲
ছোট বৌ—	৮৲	গ্রাম মাসহারা—	৫৫৲
মনোমোহিনী—	১৫৲		
দিগম্বরী—	৫৲		৩৬৭৲

মন্দাকিনী—	৫৲	মাতামহীদেবীর	
সর্ব্বেশ্বর—	১৫৲	একোদ্দিষ্ট—	১০০৲
	২১৮৲		৪৬৭৲
			২১৮৲
			৬৮৫৲

স্ব-সম্পর্কীয় মাসহারা দুই টাকা অধিক যাইতেছে ঐ দুই টাকা পাতুলের উমা মাসীকে দিবে তিনি আষাঢ় অবধি মাস মাস দুই টাকা পাইবেন খরচ বাদে অবশিষ্ট পনেব টাকা মজুদ রাখিবে আগামী মাসে ঐ পনের টাকা বাদে পাঠাইব। ভৈববকে বলিবে সত্বব মাসহারা বিলি করিয়া অবিলম্বে বিধবাবিবাহের মাসহারার বহি লইয়া কলিকাতায় আইসে পস্‌পুরে টাকা দিয়া তথা হইতে আসিতে বলিবে। মাতাঠাকুরাণী প্রভৃতি ঝড় বৃষ্টির দিন প্রস্থান করিয়াছেন অবিলম্বে তাহাদেব পঁহুছ সংবাদ দ্বারা নিরুদ্বেগ করিবে ইতি ১৮ শ্রাবণ।

শুভার্থিনঃ

(স্বাক্ষর) শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

মাতামহীদেবীর একোদ্দিষ্টের টাকা মাতৃদেবীর হস্তে দিবে।

(স্বাক্ষর) শ্রীঈশ্বর

শ্রীশ্রীহরিঃ—

প্রিয়তম,

আমি শারীরিক অসুস্থ ও টাকাও অত্যন্ত টানাটানি এজন্য টাকা পাঠাইতে বিলম্ব হইয়াছে যাহা হউক এক্ষণেও সমুদায় টাকা পাঠাইতে পারিলাম না কেবল বিদায়ের দরুণ একশত দশ ১১০৲ টাকা পাঠাইতেছি পঁহুছ সংবাদ লিখিবে। বিবাহের হিসাবে টাকা বৈশাখের ৪।৫ নাগাইদ পাঠাইব তোমার কষ্ট হইতেছে সন্দেহ নাই কিন্তু নিতান্ত অসুবিধা বশতঃ তোমাকে কষ্ট দিতে হইতেছে। দীনবন্ধু আমাকেও লিখিয়াছেন ডিস্পেন্সরী ও নাইট স্কুল হিসাবে ৪০৲ টাকা দিবেন। অতএব তাঁহাকে লিখিয়া মার্চ মাস অবধি তাঁহার নিকট হইতে টাকা আনাইয়া লইবে পূর্ব কয় মাসের শ্রীরামের বেতন আমি দিব। পিতৃদেব সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছেন কি না সবিশেষ লিখিবে। যদি তিনি ত্বরায় সুস্থ হইতে না পারেন পাল্কী করিয়া কলিকাতায় পাঠাইবে কোন মতে অন্যথা করিবে না। কয় দিবস হইল গোপাল বাটী গিয়াছে তাহার পঁহুছ সংবাদ লিখিবে। জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ, এপ্রিল এই চারি মাসের বালিকাবিদ্যালয়ের পণ্ডিতেরা অর্ধ বেতন পাইবেন

মে মাস হইতে সম্পূর্ণ বেতন দিব। উদয়রাজপুরে ১ মে হইতে পুনবায় বালিকা-বিদ্যালয় বসাইবে। বালিকাবিদ্যালযের পূর্বোক্ত হিসাবে টাকা বৈশাখের ১০ নাগাইদ পাঠাইব ইতি তাং ২৯ চৈত্র।

শুভার্থিনঃ
(স্বাক্ষব) শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মণঃ

শ্রীশ্রীহরিঃ—
শবণম্—

শুভাশিষঃ সন্তু—

ভৈবব দ্বারবানের হস্তে ৭৮০৲ সাতশত আশী টাকা পাঠাইতেছি নিম্নলিখিত মতে বিলি করিবে।

৪৪৪

বাটী—
অগ্রহায়ণ—
মাতাঠাকুবাণী— ৩০৲
শম্ভুচন্দ্র বন্দ্যো— ৬০৲
ছোট বৌ— ৮৲
সর্বেশ্বব বন্দ্যো—১৫৲
২ দ্বাববান্— ১৫৲
———
১২৮৲

স্কুল—
কার্তিক— ১৩৮৲
অগ্রহায়ণ— ১৭৮৲
———
৩১৬৲

ডাক্তাবখানা—
কার্তিক— ২২৲
অগ্রহায়ণ— ২২৲
———
৪৪৲

স্ব-সম্পর্কীয় মাসহারা—
কার্তিক— ৯২৲
অগ্রহায়ণ— ৮২৲
———
১৮৪৲

———
৬৭২৲

গ্রামস্থ মাসহারা—
কার্তিক— ৫৫৲
অগ্রহায়ণ— ৫০৲ ১১০৲
———
৭৮২৲

কার্তিক মাসের বাটীর খরচের হিসাবে ১৩০৲ টাকা পাঠাইয়াছিলাম তন্মধ্যে ২৲ দুই টাকা মজুদ আছে ঐ দুই টাকা দিলেই সমুদয়ে ৭৮২৲ টাকা হইবেক। স্কুলের টাকার মধ্যে শিবচন্দ্র এখানে ৪০৲ টাকা লইয়াছেন এজন্য কার্তিক মাসের হিসাবে ১৩৮৲ টাকা মাত্র পাঠাইলাম।

বাটীব হিসাবে তোমার যে দেনা আছে আগামী মাসে তন্মধ্যে কতক টাকা পাঠাইব। মাতাঠাকুরাণীকে কহিবে ঈশানের হিসাবে তিনি কিছু চাহিয়াছিলেন· তাহাও আগামী মাসে দিব, ইতি ১৬ পৌষ।

শুভার্থিনঃ

(স্বাক্ষর) শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

শ্রীশ্রীহরিঃ—

শুভাশিষঃ সন্তু—

৪৮০৲ চারিশত আশী টাকার নোট পাঠাই নিম্নলিখিত বিনিয়োগ করিবে।

পৌষমাস

বাটীর খরচ—	২২৮৲	গ্রামস্থ মাসহারা—	৫৫৲
স্বসম্পর্কীয়		স্কুল—	১২০৲
মাসহাবা—	৬৮৲	ডাক্তারখানা—	২২৲
বাটীব খবচ—		স্বসম্পর্কীয় মাসহারা—	
মাতৃদেবী—	৩০৲	গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—	৩৲
দীনবন্ধু—	৭০৲	শ্যামাচরণ ঘোষাল—	৫৲
শম্ভুচন্দ্র—	৭০৲	নীলাম্বর ন্যায়ালঙ্কার—	৫৲
ছোট বৌ—	৮৲	বিন্ধ্যবাসিনী দেবী—	১৲
মনোমোহিনী—	১৫৲	হরদাস তর্কালঙ্কার—	৪৲
মন্দাকিনী—	১০৲	রাধামণি দেবী—	১৲
সর্বেশ্বর—	১৫৲	হারাধন বন্দ্যো—	৩৲
	———	তারাচরণ মুখো—	১০৲
	২১৮৲	রামেশ্বর মুখো—	৫৲
		কালিদাস মুখো—	৪৲
		প্রসন্নময়ী দেবী—	২৲
		বরদা দেবী—	২৲
		মোক্ষদা দেবী—	২৲
		তারাসুন্দরী দেবী—	১০৲
		গোবিন্দচন্দ্র অধিকারী—	৫৲
		ভৈরবী দেবী—	২৲
		ভগবতী দেবী—	২৲
		নৃত্যকালী দেবী—	২৲
			———
			৬৮৲

মনোমোহিনী ও মন্দাকিনীর নাম স্বসম্পর্কীয় মাসহারাব মধ্য হইতে উঠাইয়া বাটীব খরচের ফর্দ মধ্যে নিবেশিত হইল তুমিও সেখানে সেইরূপ করিয়া লইবে। শিবচন্দ্র এখানে তাঁহার টাকা লইয়াছেন তাহা বাদে স্কুলেব ১২০৲ টাকা পাঠাইলাম।

পত্রেব পঁহুছ সংবাদ লিখিবে। দীনবন্ধু টাকা লইতে সম্মত হইয়াছেন এজন্য টাকা পাঠাইলাম। যদি তিনি বাটীতে না লিখিয়া থাকেন মেজো বৌ লইতে সম্মত হইবেন না এজন্য লিখিতেছি যদি না লিখিয়া থাকেন তথাপি তাঁহাকে লইতে বলিবে আমি দীনবন্ধুর হস্তের লিপি পাইযাছি ইতি ২১ মাঘ।

শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ

(স্বাক্ষর) শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মণঃ

সমুদযে ৪৮৩৲ টাকা তিন টাকা পাঠাইবার সুবিধা নাই এজন্য ৪৮০৲ পাঠাইলাম অন্য সকলকে সম্পূর্ণ দিবে তুমি ৩৲ টাকা কম লইবে। দুই মাস পবে একখান ১০৲ টাকার নোট পাঠাইব তাহা হইলে তোমার বাকী মাসিক ৩৲ টাকা পাইবে। যদি দ্বারবানেবা সেখানে না থাকে ঠিকা লোক কবিয়া মাসহাবাব টাকা পাঠাইয়া দিবে তাহাতে যাহা খরচ লাগে আপাততঃ তুমি দিবে পরে আমি দিব।

(স্বাক্ষর) শ্রীঈ

শ্রীশ্রীহরিঃ—

শুভাশিষঃ সন্তু—

চূড়ামণির হস্তে ৬৭৩৲ ছয়শত তিয়াত্তর টাকা পাঠাইতেছি নিম্নলিখিত মত বিনিয়োগ করিবে।

মাতাঠাকুরাণী—	৩০৲
দীনবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়	৭০৲
শম্ভুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৭০৲
ছোট বৌ—	৮৲
মনোমোহিনী—	১৫৲
মন্দাকিনী—	১০৲
সর্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫৲
স্বসম্পর্কীয় মাসহারা—	৬৮৲
গ্রামস্থ মাসহারা—	৫৫৲
স্কুল—	২১০৲

তোমার বাটীর দরুণ দেনা একবারে দেওয়া সুবিধা হইবেক না ক্রমে ক্রমে দিব। যে বিবাহের কথা লিখিয়াছ তাহাতে আমার সম্পূর্ণ মত, দুই-তিনটি উত্তম পাত্র উপস্থিত আছে। আমার নিকট উপস্থিত হইলে দেখিয়া শুনিয়া অনায়াসে বিবাহ দিতে পারিব। অতএব কন্যার মাতাকে সংবাদ দিয়া যত সত্ত্বর সুবিধা হয় তাহাদিগকে পাঠাইবে তাহাদের আসা স্থির হইলে আমাকে সংবাদ লিখিবে আমি তোমার

ডাক্তারখানা— ২২৲
শম্ভুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
বাটীর দেনা হিঃ—১০০৲
৬৭৩৲

নিকট লোক পাঠাইব এবং কোন স্থানে কিরূপে তাহাদিগকে পাঠাইবে তাহাও লিখিব। ছত্রগঞ্জ স্কুলের চাঁদা কত বাকী আছে জানিলে পাঠাইতে পারিব। একবার সমুদায় পরিশোধ করিয়া তৎপরে মাস মাস পাঠাইয়া দিব অতএব স্কুলের কর্তৃ-পক্ষকে জিজ্ঞাসা করিয়া সংবাদ লিখিবে। চন্দ্রকোণার কালী মুখো টাকা পাইয়াছেন জানিবে ইতি ৩১ চৈত্র।

শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ
(স্বাক্ষর) শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ।

যদি ব্রাহ্মণ জাতি ভদ্রগৃহের বিধবা কন্যা বিবাহের নিমিত্ত উপস্থিত হয় তাহাদের সবিশেষ পরিচয় সমেত আমাকে সংবাদ লিখিবে উপস্থিত কন্যাটির বিবাহ সত্বর সম্পন্ন হইতে পারিবে আর কয়টি পাত্র উপস্থিত আছেন তাঁহারা নিজ ব্যয়ে বিবাহ করিবেন কন্যার সুযোগ করিয়া দিলেই হয় ইতি।

৪৭

৪০৮ পৃষ্ঠা ১৯ পংক্তি হইতে ২৩ পংক্তি পর্যন্ত

'এই ঘটনাতে দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন বিফলচেষ্ট হইয়া কিছু কাল সহোদরের সাহায্য গ্রহণ স্থগিত রাখেন, কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিজের মুখে শুনিয়াছি যে তিনি অতি গোপনে মধ্যম ভ্রাতৃবধূর অঞ্চলে সংসার খরচের টাকা বাঁধিয়া দিয়া বলিয়া দিতেন—'মা এই নাও, দীনোকে বলো না, আমি জানি, তোমাদের ক্লেশ হইতেছে, এই টাকায় সংসার খরচ চালাইবে।'

চণ্ডীবাবু! বিশেষ না জানিয়া লেখা বড় দোষ। শ্রীমতী মধ্যমা বধূদেবীকে বিদ্যাসাগর অগ্রজ মহাশয় মাসিক ব্যয় নির্বাহার্থ স্বয়ং টাকা দিতে গিয়াছিলেন সত্য বটে কিন্তু তিনি টাকা গ্রহণ করিয়া মধ্যমাগ্রজের আদেশানুসারে ঐ টাকা ফের়ত দেন। তৎকালে তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বলিয়াছিলেন যে, যখন মহাশয়ের মধ্যম সহোদর টাকা গ্রহণ করেন নাই, তখন আমি কি বলিয়া টাকা লইতে পারি। ইহা শুনিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় টাকা ফেরত আনিয়াছিলেন। পাঠকবর্গের গোচর করিবার জন্য ইতিপূর্বে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হস্তাক্ষর পত্র প্রকাশ করা হইয়াছে।

৪৮

৪০৯ পৃষ্ঠা ১৩ পংক্তি হইতে ১৮ পংক্তি পর্যন্ত

'পরবর্তী সপ্তাহে দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন ডেপুটীর কর্মে নিযুক্ত হইয়া বরিশাল যাত্রা করিলেন। সেখানে খেয়ালের বশবর্তী হইয়া জজ-সাহেবের এক পোষা হরিণশিশু

বধ করিয়া কয়েক জনে ভক্ষণ করেন। এই ঘটনায় ন্যায়রত্নের চাকুরি লইয়া টান পড়িল। বিদ্যাসাগর মহাশয় বহু চেষ্টায় তাঁহাকে বিপদ হইতে মুক্ত করিয়া গৃহে আনিলেন। চাকুরির অধ্যায় এই খানেই শেষ।'

অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন পণ্ডিতপ্রবর ৺দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন মহাশয় যথার্থ একজন দেশহিতৈষী, বিদ্যোৎসাহী, পরম দয়ালু ও অমায়িক লোক ছিলেন। চণ্ডীবাবু! বিশেষ না জানিয়া শুনিয়া কয়েক জন অনভিজ্ঞ লোকের কথায় কেমন করিয়া ইহা লিপিবদ্ধ করিলেন। দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন বরিশালের জজ সাহেবের পোষা হরিণশিশু বধ করিয়া 'কয়েক জনে ভক্ষণ করেন' নাই। বরিশালে তাঁহার নামে হরিণশিশু বধ জন্য তাঁহার চাকুরি লইয়া টান পড়ে নাই। এবং 'বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহু চেষ্টায় তাঁহার বিপদমুক্তির' কথা সত্য নহে। আর চণ্ডীবাবুর কথানুযায়ী 'চাকুরির অধ্যায়' বরিশালেই সমাপ্ত হয় নাই। ধন্য রে দেশ! ধন্য রে মিথ্যার প্রভাব! ধন্য চণ্ডীবাবু! দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন যে সময়ে বরিশালে ডেপুটী মাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত ছিলেন, তৎকালে সুপ্রসিদ্ধ ও পরম শ্রদ্ধাস্পদ হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গামোহন দাশ মহাশয় বরিশালের জজ আদালতের উকীল ছিলেন। দীনবন্ধু ন্যায়রত্নের সহিত উক্ত দুর্গামোহনবাবুর বিশেষ সদ্ভাব ছিল। দীনবন্ধু ন্যায়রত্নের চরিত্রের কথা বাবু দুর্গামোহন দাশ মহাশয় ভালরূপ অবগত আছেন। দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন অতি সুখ্যাতির সহিত প্রায় দুই বৎসর কাল ডেপুটী মাজিস্টরী কর্ম করেন। প্রকৃত কথা এই যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত দীনবন্ধু ন্যায়রত্নের কোন বিষয়ের তর্ক উপস্থিত হয়, একারণ, তেজস্বী দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যত্নে যে ডেপুটী মাজিস্ট্রেটের কর্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, ঐ কর্মে রেজাইন দেন এবং বরিশালেই অবস্থিতি করিয়া ঐ জেলায় মফঃস্বলে নিজ ব্যয়ে নিরন্তর ভ্রমণ করিয়া স্থানীয় লোককে নানা প্রকার উপদেশ প্রদান পূর্বক স্থানে স্থানে অনেক বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়াছিলেন। তৎকালের স্থানীয় স্কুলসমূহের বিদ্যোৎসাহী ইনস্পেক্টার মহামান্য মার্টিন সাহেব মহোদয় দীনবন্ধু ন্যায়রত্নের অলৌকিক অধ্যবসায় ও ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া উচ্চপদাভিষিক্ত সাহেবদিগের গোচর করেন এবং ন্যায়রত্নকে জীদ করিয়া বিহারের স্কুল সমূহের ডেপুটী ইনস্পেক্টারের পদে নিযুক্ত করিয়া দেওয়ান। পরে তথা হইতে দেশে আসিয়া হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করিয়া সাধারণের যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন এবং দেশস্থ অনেককে উপদেশ দিয়া ঐ চিকিৎসায় প্রবৃত্ত করিয়াছেন। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বে কলিকাতায় অবস্থিতি করিয়া কেবল হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করিতেন এবং অনেক ভদ্র লোককে ঐ চিকিৎসায় প্রবৃত্ত করান। কি প্রাতে কি মধ্যাহ্নে কি সায়ংকালে কি নিশীথ সময়ে রোগীর বাটীতে উপস্থিত থাকিতেন। এমন কি এক এক সময়ে দরিদ্র রোগীর নিশীথ সময়ে বাক্স বহিবার লোক না থাকিলে স্বয়ং বাক্স মাথায় করিয়া দরিদ্র রোগীর ভবনে উপস্থিত হইতেন ইত্যাদি কারণে জ্যেষ্ঠাগ্রজ বিদ্যাসাগর ন্যায়রত্নের উপর সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হইয়া ঔষধ ও হোমিওপ্যাথিক পুস্তক প্রদান করিতেন। ন্যায়রত্ন

মৃত্যুর, দুই মাস পূর্বে শুনিলেন জন্মভূমির দরিদ্র লোক বিষম ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হইয়া অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছে, তাহাদের চিকিৎসা করিবার জন্য দেশে গমন করেন। তথায় দিবারাত্র পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া চিকিৎসা করিতেন, অপরাহ্ণে চার টার সময় স্বয়ং পাক করিয়া আহার করিতেন। পরে ন্যায়রত্ন ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হইয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন এবং ঐ পীড়াতেই মানবলীলা সম্বরণ করেন।

৪৯

৪০৯ পৃষ্ঠা ২৩ পংক্তি হইতে শেষ পর্যন্ত

'গৃহ দাহের পর যখন বাটী গিয়াছিলেন, সেই সময় গ্রামের কেহ কেহ তাঁহাকে ইষ্টক নির্মিত বাটী নির্মাণ করিতে অনুরোধ করেন, তিনি স্বাভাবিক হাসিভরা মুখে বলেন, 'গরিব বামণের ছেলের পাকা বাড়ী, লোকে শুনলে হাসবে যে। কোন-রকমে মাথা রাখিবার একটু স্থান হইলেই চলবে।' (বীরসিংহবাসী শ্রীযুক্ত গোপীনাথ সিংহের নিকট এই উক্তিটি শুনিয়া আসিয়াছি। কলিকাতায় তখনও বাটী নির্মাণের কল্পনাও ছিল না।)

চণ্ডীবাবু! বীরসিংহা গ্রামের মধ্যে কেহ গোপীনাথ সিংহ নাই। তবে বিদ্যাসাগর অগ্রজ মহাশয়ের স্টেটের একজিকিউটার পাথরা গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষীরোদনাথ সিংহ মহাশয়ের পিতার নাম শ্রীযুক্ত গোপীনাথ সিংহ। দাদা দেশে যাইলে আমি প্রায় সর্বক্ষণ দাদার নিকট থাকিতাম। ফলত গৃহদাহের পর ইষ্টকাদি নির্মিত বাটীর উল্লেখ হয় নাই। ঐ সময়ে গোপীনাথ সিংহকে আসিতে দেখি নাই। ঐ সময়ে দাদা ও অপরাপর আত্মীয় বন্ধুবান্ধব আমারই নূতন বাটীতে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। ঐ উক্তি চণ্ডীবাবুর স্বকপোলকল্পিত।

৫০

৪১০ পৃষ্ঠা প্রথমের ৪ পংক্তি

'সেখানে জননীর ও অন্যান্য সকলের বাসের উপযোগী গৃহাদি প্রস্তুত করাইতে যে ব্যয় পড়িল, সে সমস্ত ব্যয়ভার গ্রহণ করিলেন; কিন্তু পূর্বোল্লিখিত হ্যারিসন সাহেব কর্তৃক প্রশংসিত সুন্দর গৃহখানি আর প্রস্তুত হইল না।'

কেবল জননীদেবীর সামান্য একটিমাত্র খড়ুয়া ঘরের নিমিত্ত যৎকিঞ্চিৎ প্রদান করিয়াছিলেন। গৃহদাহের পূর্ববৎসর শম্ভুচন্দ্রের এক বাটী নির্মিত হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় দেশে গিয়া ঐ বাটীতেই অবস্থান করেন। গৃহদাহের কয়েক মাস পূর্বে নারায়ণবাবুরও স্বতন্ত্র এক বাটী প্রস্তুত কার্য আরম্ভ হয়, গৃহদাহ সময়ে উহার নির্মাণ কার্য সমাধা হয় নাই। দীনবন্ধুও নিজ ব্যয়ে বাঁশ খড় ক্রয় করিয়া

দগ্ধ গৃহের ছাদনাদি কার্য নির্বাহ করিয়া ঐ গৃহে পুনরায় প্রবেশ করেন। গৃহদাহের পূর্বে সহোদর ঈশানচন্দ্রের ঐ পৈতৃক বাসস্থানে স্বতন্ত্র গৃহ থাকে নাই। দাহের পরও তাহার জন্ত গৃহ হয় নাই এবং এখনও নাই। চণ্ডীবাবু। 'অন্যান্য সকলের বাসের' ইত্যাদি যে লিখিয়াছেন তাহা কোন্ কোন্ লোকের, প্রকাশ করিয়া লিপিবদ্ধ করা উচিত ছিল।

৫১

চণ্ডীবাবুর কৃত জীবনচরিতের ৪১২-৪১৪ পৃষ্ঠার অর্ধ পংক্তি পর্যন্ত

'ক্ষীরপাই-নিবাসী মুচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তি, মনোমোহিনী নাম্নী একটি বিধবা কন্যার পাণিগ্রহণেচ্ছু হইয়া কলিকাতায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শরণাপন্ন হন। তদনুসারে বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই বিবাহ সমাপন মানসে বাটী গমন করেন। তিনি বাটী পৌছিলে ক্ষীরপাই-বাসী হালদার মহাশয়েরা এবং অন্যান্য অনেক সম্ভ্রান্ত লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মুচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবাহ বিষয়ে নিরপেক্ষ থাকিতে অনুরোধ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় সহজে এরূপভাবে এক ব্যক্তিকে সহায়তা হইতে বঞ্চিত করিতে সম্মত হইবার লোক ছিলেন না। কিন্তু যাঁহারা ইতিপূর্বে বহুবার বিধবাবিবাহেব অনুষ্ঠানে সহায়তা করিয়াছেন, এরূপ বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত লোক বহুবিধ কারণ দর্শাইয়া এই কার্যের সহায়তায় বিরত থাকিতে বহু সাধ্য সাধনা করায়, অগত্যা বিদ্যাসাগর মহাশয় ঐ বিবাহে কোন সংস্রব রাখিবেন না বলিয়া অঙ্গীকার করেন। সমাগত ভদ্রমণ্ডলী হৃষ্টচিত্তে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। এই সম্বন্ধে সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখিয়াছেন :—'বীরসিংহাস্থ কয়েকজন প্রাচীন লোক, মধ্যমাগ্রজ দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন, রাধানগর নিবাসী কৈলাসচন্দ্র মিশ্র প্রভৃতি উহাদিগকে (বর কন্যাকে) আশ্রয় দিয়া, (বিদ্যাসাগরের) বাটীর অতি সন্নিহিত অপর এক ব্যক্তির বাটীতে রাখিয়া, উহাদের বিবাহ-কার্য সমাধা করেন।' (সহোদর শম্ভুচন্দ্র প্রণীত জীবনচরিত পৃষ্ঠা ২০৪। [বর্তমান গ্রন্থের পৃষ্ঠা ১৪৭ দ্রষ্টব্য] ১২৭৬ সালের আষাঢ়ে এইটি ঘটিয়াছিল।) আমাদের বক্তব্য এই যে, 'বীরসিংহার কয়েকজন প্রাচীন' কি এক দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন? আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছি যে সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন উক্ত প্রাচীনমণ্ডলীর একজন প্রধান ছিলেন। এমন কি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনভিমতে ও অজ্ঞাতসারে তাঁহার বাটীর সম্মুখস্থ বাটীতে মুচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবাহ দিবার সাহস বিদ্যারত্ন ভিন্ন অন্য কাহারও পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এতদূর অগ্রসর হইতে সাহসী হওয়া যেমন তেমন লোকের পক্ষে সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। আর অগ্রজানুগত বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সহায়তা না থাকিলে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনভিপ্রেত কার্য বীরসিংহে সহজে সম্পন্ন হইতে পারিত না। আমরা বীরসিংহ হইতে যে সংবাদ

আনিয়াছি, তাহাতে প্রকাশ যে :—'শম্ভুচন্দ্রই উদ্যোগী হইয়া বিবাহ দিয়াছিলেন।' (বীরসিংহ নিবাসী শ্রীযুক্ত গোপীনাথ সিংহ মহাশয়ের উক্তি। তিনি নিজে বর্তমান এবং নিজে আমার নিকট এই সাক্ষ্য দিয়াছেন।) উদ্যোগ কর্তাদের অগ্রণী হইয়া, মৃত মধ্যমাগ্রজের স্কন্ধে সমগ্র দোষভাগ অর্পণ করা বিদ্যাসাগর-সহোদরের পক্ষে ভাল হয় নাই। বিদ্যারত্ন মহাশয় স্বরচিত বিদ্যাসাগর-জীবন-চরিতে বলিতেছেন :—'এই বিবাহে অগ্রজ, আন্তরিক কষ্টানুভব করেন,···তোমরা তাঁহাদের নিকট আমাকে মিথ্যাবাদী করিয়া দিবার জন্য, এই গ্রামে এবং আমার সম্মুখস্থ ভবনে বিবাহ দিলে।' (শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত জীবনচরিত ২০৪ পৃঃ [বর্তমান গ্রন্থের ১৪৭-১৪৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]।) বিদ্যাসাগর মহাশয় এই ঘটনায় এরূপ দারুণ মর্মবেদনা পাইয়াছিলেন যে সে রাত্রিতে অনাহারে থাকিয়া বিবাহের পরদিন প্রাতঃকালে অনাহারে ক্ষুব্ধচিত্তে প্রিয় জন্মভূমি, সাধের বাড়ী ঘর চিরদিনের জন্য ত্যাগ করিয়া কলিকাতা যাত্রা করিলেন। আসিবার সময়ে সহোদরদিগকে ও সম্ভ্রান্ত গ্রামবাসীদিগকে বলিয়া আসিলেন, 'তোমরা আমাকে দেশত্যাগী করাইলে!' গদাধর পাল, গোপীনাথ সিংহ প্রভৃতি বিদ্যারত্ন কর্তৃক বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হইয়াও বিবাহে উপস্থিত হন নাই, বিদ্যাসাগর মহাশয় এ সংবাদে কথঞ্চিৎ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। স্বদেশবৎসল ও জন্মভূমির সুসন্তান ঈশ্বরচন্দ্রকে গৃহ-বহিষ্কৃত ও চিরনির্বাসিত করিয়া বিদ্যারত্ন মহাশয় প্রভৃতি বীরসিংহের যে কি অনিষ্টসাধনই করিয়াছিলেন তাহা বর্ণনায় শেষ হইবার নহে! যেদিন তিনি ম্লানবদনে ও অশ্রুপ্লাবিতবক্ষে জননী জন্মভূমির ক্রোড়শূন্য করিয়া প্রান্তর-প্রান্তে অদৃশ্য হইয়াছিলেন, সেই দিনই বীরসিংহের সর্বনাশ সাধন হইয়া-ছিল। এই অপকর্মের অনুষ্ঠাতৃগণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হৃদয়ে যে কি তীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহা বুঝাইবার নহে। তাহার কিঞ্চিন্মাত্র তাঁহারই উক্তিতে প্রকাশ পাইবে। শেষ দশায় কলিকাতায় অবস্থানকালে যখন ক্ষুদ্রপল্লী বীরসিংহের গ্রাম্যচিত্র সকল তাঁহার স্মৃতি-পথে উদিত হইত, তখন প্রাণটি দেহ ত্যাগ করিয়া স্মৃতি-শিবিকারোহণে বীরসিংহ অভিমুখে ছুটিত, তখন অজস্রধারে অশ্রু বর্ষণ করিতেন, এরূপ অশ্রু জল আমরা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি। অশ্রুস্নাত হইয়া দারুণ মনঃক্ষোভের পরিচায়ক দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিতেন 'আর সব শেষ হইয়াছে।'

মুচিরামের বিবাহে বিদ্যাসাগরের দেশ পরিত্যাগ সম্বন্ধে পাথরা গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত গোপীনাথ সিংহের প্রমুখাৎ অবগত হইয়া চণ্ডীবাবু যাহা লিখিয়াছেন তাহা ভ্রান্ত। বক্তা পাথরা নিবাসী গোপীনাথ সিংহের কথাগুলি কতদূর গ্রহণীয় তাহা চণ্ডীবাবুর বিবেচনা করা উচিত ছিল। এস্থলে গোপীনাথ সিংহের পরিচয় দেওয়া উচিত, ইনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্টেটের একজিকিউটার শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষীরোদনাথ সিংহের পিতা।

বীরসিংহা হইতে সংবাদ লইয়া চণ্ডীবাবু যে সকল লিখিয়াছেন, সে সমস্ত নিম্নে সমালোচিত হইল।

চণ্ডীবাবু লিখিয়াছেন, যে ক্ষীরপাই গ্রামের হালদার বাবুরা 'বহুবার বিধবা-বিবাহের অনুষ্ঠানে সহায়তা করিয়াছেন।' ক্ষীরপাই নিবাসী ৺হারাধন চট্টো-পাধ্যায়ের বিধবা কন্যার বিবাহ সভায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শ্বশুর ৺শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্য মহাশয় গ্রামের প্রধান লোক বলিয়া মালা গ্রহণ করেন এই অপরাধে, ঐ গ্রামের সম্রান্ত হালদার বাবুরা দলের আঁটাআঁটী করিয়া ঐ মালা লওয়া অপরাধে উক্ত শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্যকে প্রায়শ্চিত্ত করান। সুতরাং হালদার বাবুদিগকে বিধবাবিবাহের সহায় বলিয়া সাধারণকে বঞ্চনা করিয়াছেন।

আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একান্ত বশীভূত। তাঁহার আদেশের বশবর্তী হইয়া পাত্রী মনোমোহিনী দেবীকে নিজ বাটী হইতে বহিষ্কৃতা করিয়া দিলে কনিষ্ঠ সহোদর ঈশানচন্দ্রের ও রাধানগর নিবাসী ৺কৈলাসচন্দ্র মিশ্র মহাশয়ের উপদেশানু-সারে দীনবন্ধু ন্যায়রত্নের পুত্র ৺গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পাত্রী মনোমোহিনীকে আমার বাটীর সম্মুখে দুই চারি বিঘা ভূমি তফাতে ৺সনাতন বিশ্বাসের বাটীতে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া রাখেন। অগ্রজ মহাশয়ের অসন্তোষের ভয়ে আমি আর ঐ বিষয়ে লিপ্ত রহিলাম না এবং ঐ বিবাহে যাই নাই। আমি ও রাধানগরের চৌধুরী বাবুদের নায়েব উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বক্ষণ বিদ্যাসাগর অগ্রজের নিকট ছিলাম। আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অভিপ্রায় অনুসারে লোক দ্বারা সনাতন বিশ্বাসকে ডাকাইয়া আনি। সনাতন বিশ্বাস উক্ত মনোমোহিনীকে বাটী হইতে বহিষ্কৃতা করিতে স্বীকার না পাওয়ায় উমেশচন্দ্র সনাতন বিশ্বাসকে বলিলেন, তোমরা ইঁহার মাসহারা খাও, একটা কথা শুনিলে না। তাহাতে সে উত্তর করিল। আমরা পুরুষানুক্রমে কৈলাস মিশ্রের বাটীতে চাকরি করিয়া আসিতেছি। তিনি নিজে আমাকে এইমাত্র বলিলেন, তুমি মেয়েটিকে বাটীতে রাখ, কাহারও কথায় বহিষ্কৃত করিও না। আমি কল্য সন্ধ্যার পূর্বে আসিয়া এই বিধবার বিবাহ দিব। আমি কোন মতে তাঁহার কথার অবাধ্য হইতে পারিব না। বরং যে কয়েক টাকা মাসহারা দিয়াছেন তাহা ফেরত দিতে প্রস্তুত আছি। এই বলিয়া সনাতন বিশ্বাস চলিয়া গেল। ঈশান ও গোপাল চাঁদা করিয়া বিবাহের সমস্ত আয়োজন করিয়া, কৈলাস মিশ্র বিশ্বাসদের বাটীতে উপস্থিত হইলে, দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন প্রভৃতিকে ও গ্রামবাসীদিগকে এবং স্কুলের শিক্ষকদিগকে সন্ধ্যার সময় বিবাহের নিমন্ত্রণ করেন। গদাধর পাল ও অন্যান্য জনকয়েক গ্রামবাসী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অসন্তোষের ভয়ে বিবাহ স্থলে যান নাই। বাকী সকলেই বিবাহ স্থলে গিয়া বিবাহ কার্য সমাধার পর স্ব স্ব আলয়ে প্রতিগমন করেন।

পরদিন প্রাতঃকালে ঈশানচন্দ্র দাদার নিকট উপস্থিত হইলে দাদা বলিলেন, ঈশান তুমি কেন বিবাহ দেওয়াইলে, ইহাতে আমার বড় অপমান হইয়াছে।

ঈশান উত্তর করিল, কৈলাস মিশ্র ও আমি গত পরশু আপনাকে যখন জিজ্ঞাসা করিলাম যে, এই বিধবা বিবাহ ন্যায্য কি না? তাহাতে আপনি উত্তর করিলেন, ইহা শাস্ত্রসম্মত ও ন্যায়ানুগত বলিয়া আমি স্বীকার করি, কিন্তু হালদার বাবুদের মনে দুঃখ হইবে। ইহাতে কনিষ্ঠ সহোদব ঈশানচন্দ্র উত্তর করিলেন, লোকের খাতিরে এই সকল বিষয়ে পরাঙ্মুখ হওয়া ভবাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে দূষণীয়। ইহা শুনিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় ক্রোধভরে বলিলেন, 'তুই কি এখনও সেইরূপ দুর্মুখ আছিস এবং এইরূপই কি চিরকাল থাকিবি?' আরও এইরূপ দুই-চারি কথার পর বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, আমি আর দেশে আসিব না.।

বিদ্যাসাগর মহাশয় কয়েক দিবস দেশে অবস্থিতি করিয়া বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, রাখাল স্কুল, বালিকা বিদ্যালয়, দেশস্থ, বিদেশস্থ, সম্পর্কীয় লোকের ও বিধববিবাহ কারীদের মাসহারা প্রভৃতির বন্দোবস্ত করিয়া আমার প্রতি পূর্ববৎ ভারার্পণ করিয়া কলিকাতায় আসিলেন। চণ্ডীবাবু! কিরূপে, অনাহারে থাকিয়া ঐ বিবাহের পরদিনেই কলিকাতায় যাইবার কথা লিখিলেন? দাদা যে কয়েক দিন বীরসিংহায় আমার বাটীতে অবস্থিতি করিয়া সকল বিষয়ের বন্দোবস্ত করেন, সে কয়েক দিনের মধ্যে গোপীনাথ সিংহ এক দিনও আমার বাটীতে দাদার নিকট উপস্থিত থাকেন নাই। বিশেষত বহুকাল হইতে ঐ গোপীনাথ সিংহের সহিত আমার সদ্ভাব নাই। তাঁহার নিকট জ্ঞাতি প্রতাপচন্দ্র সিংহ আমার নিকট বিধবা-বিবাহাদি কার্যের পরিচারক ছিল, উহার সহিত গোপীনাথ সিংহের তৎকালে নানা কারণে মনান্তর থাকে। এই জন্যও গোপীনাথ সিংহ আমার বাটীতে আসিতেন না। উহাকে কর্মচ্যুত করিবার জন্য লোক দ্বারা আমাকে বলান, কিন্তু আমি বিনা দোষে বিদ্যাসাগরের রক্ষিত লোককে কর্মচ্যুত করি না। তৎকালীন গোপীনাথ সিংহের প্রতিপক্ষ তাঁহার জ্ঞাতি ৺জুড়ান সিংহ মহাশয়ের দৌহিত্র ৺ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ প্রথম বিধবাবিবাহ সময় হইতে যাবজ্জীবন বিধবাবিবাহ স্থলে উপস্থিত হইতেন, এবং অনেক বিষয়ে অধ্যক্ষতা করিয়া আমাদের শ্রমের যথেষ্ট লাঘব করিতেন: দেশে বিধবাবিবাহ স্থলে ৺জুড়ান সিংহের পৌত্র শ্যামাচরণ সিংহকেও সঙ্গে লইয়া যাইতেন। আমাদের দেশে ঐ সময় পর্যন্ত কখনও কোনও বিবাহস্থলে গোপীনাথ সিংহ উপস্থিত হন নাই। এমন কি বীরসিংহায় রামব্রহ্ম পাঠকের বিবাহস্থলেও উপস্থিত হন নাই। কিন্তু কোন কারণবশত আপনাকে বিধবাবিবাহের দলভুক্ত বলিয়া মুখে পরিচয় দিতেন। মুচিরামের বিবাহের পর আমার সহিত বিদ্যাসাগর অগ্রজ মহাশয়ের কিরূপ ব্যবহার ছিল, পাঠকবর্গ উদ্ধৃত পত্র সকল পাঠ করিয়া বুঝিতে পারিবেন।

এস্থলে ইহাও প্রকাশ থাকে যে, মুচিরামের সহিত বিধবা মনোমোহিনী দেবীর পরিণয় কার্য উপলক্ষে অগ্রজ মহাশয় অসন্তোষ প্রকাশ করেন, ঐ বিবাহের সংঘটন কার্য প্রথমত, শ্রীযুত নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারা হয়। নারায়ণ এই

উপলক্ষে 'কলিকাতা হইতে আমাকে যে পত্র লেখেন, তাহার মর্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

'ক্ষীরপাই-নিবাসী মুচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায মনোমোহিনী নাম্নী একটি বিধবা কন্যা সঙ্গে করিয়া এখানে বিবাহ করিবার মানসে আসিয়াছিলেন। পিতৃদেব মহাশয় আপাতত ইহাদিগকে বাটী যাইতে বলিলেন। পিতৃদেব ঘরায় বীরসিংহার বাটীতে যাইবেন, তথায় যাইয়া যাহা হয় করিবেন। ইহারা ক্ষীরপাই যাইতে ভয় পায়, যেহেতু তথায় অনেকেই বিধবাবিবাহেব দ্বেষ্টা। কিন্তু ইহারা আপনাকে না জানাইয়া এখানে আসিয়াছিলেন, এজন্য আমার পত্র সহ আপনার নিকট যাইতেছেন। পিতৃদেব যে পর্যন্ত বাটী না যান, সেই পর্যন্ত যাহাতে ইহারা নিরাপদে থাকিতে পায়, তদ্বিষয়ে ব্যবস্থা করিবেন।'

শ্রীশ্রীহরিঃ

শরণম্‌—

শুভাশিষঃ সন্তু—

তিনশত টাকা পাঠাই ফর্দ অনুসারে বিনিয়োগ করিবে। স্কুলের টাকা আষাঢ় শ্রাবণ দুই মাসের এককালে আট দশ দিন পরে প্রেরিত হইবে। কয়দিন হইল বিশেষ কারণ বশতঃ কলিকাতায় আসিয়াছিলাম অদ্য বর্ধমান চলিলাম। বর্ধমানে যে বাসা হইয়াছে সেখানে মাতাঠাকুরাণীর থাকার সুবিধা হইবেক না তাঁহাকে বাটী পাঠাইতে হইবেক অতএব একখান পাল্কী ও আট বেহারা ও প্রতাপ সিংহকে বর্ধমান পাঠাইবে আর ভৈরব আমার নিকট থাকিলে ভাল হয় অতএব তাহাকে আপন কাপড় চোপড় লইয়া ঐ সঙ্গে আসিতে বলিবে বেহারা আসিতে কোনমতে বিলম্ব না হয় ইতি ৪ সেপ্টেম্বর।

শুভার্থিনঃ

(স্বাক্ষর) শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মণঃ

শ্রীশ্রীহরিঃ

শরণম্‌—

শুভাশিষঃ সন্তু—

তোমার পত্র পাইয়া সবিশেষ সমস্ত অবগত হইলাম আমি আর ছয় সাত দিন পরে বর্ধমান হইতে উঠিয়া কলিকাতায় যাইব তথা হইতে পত্র লিখিলে কৃষ্ণনগরের বিধবা কন্যা ও তাহার মাতাকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিবে। তোমার পত্রের লিখিত অন্যান্য বিষয়ের উত্তর কলিকাতায় গিয়া লিখিব ইতি ৭ জ্যৈষ্ঠ।

শুভার্থিনঃ

(স্বাক্ষর) শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মণঃ

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্—

শুভাশিষঃ সন্তু—

অতঃপর যে সকল বিধবা কন্যার বিবাহ হইবেক তাহাতে আমি কিছুই খরচ করিব না স্থির করিয়াছি অতএব কৃষ্ণনগরের কন্যার মাতাকে স্পষ্ট বাক্য বলিবে আমি কেবল পাত্র স্থির করিয়া দিব পাত্র খরচ করিয়া বিবাহ করিবেন এবং আপন সঙ্গতি অনুরূপ অলঙ্কার দিবেন যদি ইহাতে সম্মত থাকেন তবেই তাঁহাকে ও তাঁহার কন্যাকে কলিকাতায় পাঠাইবে নতুবা প্রয়োজন নাই। এ কথা লিখিবার অভিপ্রায় এই যে অনেকের এরূপ সংস্কার আছে কলিকাতায় যে কন্যার বিবাহ হয় সে অনেক স্বর্ণ অলঙ্কার পায় যদি তাঁহারও সে সংস্কার থাকে তবে সেই সংস্কার অনুযায়ী অলঙ্কার তাঁহার কন্যা না পাইলে তিনি নিঃসন্দেহ দুঃখিত হইবেন। এজন্য অগ্রে সকল কথা পরিষ্কার হইয়া থাকা উচিত।...

আমি কলিকাতায় গিয়া তোমাকে সংবাদ লিখিব। এই পত্রের প্রথম ভাগে যে সকল কথা লিখিলাম কৃষ্ণনগরের কন্যার মাতা তাহাতে সম্পূর্ণ সম্মত থাকেন তবে যে স্থানে তাঁহাদিগকে পাঠাইতে বলিব তথায় পাঠাইয়া দিবে ইতি ২১ জ্যৈষ্ঠ।

শুভার্থিনঃ
(স্বাক্ষর) ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্—

শুভাশিষঃ সন্তু—

...কৃষ্ণনগরের কন্যাকে পাঠাইবে যে লোক সঙ্গে আসিবে তাহাকে বলিয়া দিবে তাহাদিগকে রাজকৃষ্ণবাবুর বাটীতে পঁহুছাইয়া দেয় ইতি ১০ আষাঢ়।

শুভার্থিনঃ
(স্বাক্ষর) শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

শ্রীশ্রীহরিঃ—

প্রিয়তম—

তোমার পত্রে বিবাহবৃত্তান্ত পাঠ করিয়া পরম আহ্লাদিত হইলাম ব্যয় অধিক হইয়াছে বটে কিন্তু যেরূপে কার্য নির্বাহ করিয়াছ তাহাতে ইহাকে কোনমতেই অধিক ব্যয় বলা যায় না কেবল তোমার ক্ষমতা ও পরিশ্রমেই এরূপ সুশৃঙ্খলরূপে সমুদায় সমাধা হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। টাকার চেষ্টা দেখিতেছি সংগ্রহ হইতে অধিক বিলম্ব হইবেক না। এত টাকা ডাকে পাঠান পরামর্শ সিদ্ধ

নহে অতএব তুমি একজন পাইক লইয়া আসিবে এবং টাকা লইয়া যাইবে। আমি অদ্যাপি সম্যক্ সুস্থ হইতে পারি নাই। ইতি তাং

শুভার্থিনঃ
(স্বাক্ষর) শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মণঃ।

শ্রীশ্রীহরি :—
শরণম্—

শ্রীচরণারবিন্দেষু—

প্রণতিপূর্বকং নিবেদনম্—

আপনকার আজ্ঞাপত্র পাইয়া সবিশেষ সমস্ত অবগত হইলাম। আমি যে দিন কর্মটাবে আসিব স্থির করিয়া আপনাকে পত্র লিখিলাম কিন্তু কার্যগতিকে আসিতে অনেক বিলম্ব হইয়াছিল। ৬ আশ্বিন আসিবার সময় শ্রীযুক্ত কালিদাস ভট্টাচার্য মহাশয়ের বরাত চিঠি লিখিয়াছিলাম। অদ্য কার্যানুরোধে পুনরায় কলিকাতা যাইতে হইল। পিতামহ দেবের শ্রাদ্ধকার্য সম্পন্ন হইবার সংবাদ অনুগ্রহপূর্বক কলিকাতায় লিখিবেন। আমি অদ্যাপি সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে পারি নাই সুস্থ হইলেই আপনকার শ্রীচরণ দর্শন করিব। আপনি অতিশয় দুর্বল হইয়াছেন এই সংবাদে অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়াছি। শম্ভুচন্দ্র যাইতেছেন ইঁহার প্রমুখাৎ সকল সংবাদ জ্ঞাত হইবেন। ইনি আপনকার নিকটে থাকিলে আমি অনেক অংশে নিশ্চিন্ত থাকি। ইনি সেখান হইতে আসিলেই আমার অত্যন্ত ভয় ও উদ্বেগ জন্মে। বিশেষতঃ ইঁহার অনুপস্থিতিতে আপনাকে এ অবস্থায় পাক করিতে হইতেছে। ইনি যাইতেছেন আর দুর্ভাবনা রহিল না। ইনি সাধ্যানুরূপ পিতৃসেবা করিয়া আপনাকে চরিতার্থ করিতেছেন। আমার অদৃষ্টে সে সৌভাগ্য ঘটিতেছে না। নানা কারণে এরূপ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি যে কোনও বিষয়ে ইচ্ছানুরূপ কর্ম করিতে পারি না। নতুবা আমিই আদ্যোপান্ত আপনকার নিকটে থাকিয়া চরণসেবা করিতাম ইতি।

(স্বাক্ষর) ভৃত্য শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মণঃ

শ্রীশ্রীহরিঃ—
শরণম্—

শুভাশিষঃ সন্তু—

তুমি ও পূজ্যপাদ পিতৃদেব উভয়ে স্বচ্ছন্দ শরীরে আছ এই সংবাদে নিরুদ্বেগ ও আহ্লাদিত হইলাম। তুমি পিতৃদেবের নিকট থাকিলে আমার আর তাঁহার জন্য কোনও চিন্তা ও উদ্বেগ থাকে না। তাঁহার চরণারবিন্দে আমার সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত নিবেদন করিবে এবং জানাইবে তদীয় শ্রীচরণারবিন্দের আশীর্বাদ

প্রভাবে আমি এখানে আসিয়া অনেক ভাল আছি এবং যেরূপ দেখিতেছি তাহাতে কিছুদিন এ স্থানে থাকিলে বিলক্ষণ সুস্থ ও সবল হইতে পারিব। গঙ্গামণি দিদির টাকা পাঠাইতে বিস্মৃত হইয়াছে। অদ্য কলিকাতায় পত্র লিখিয়া দিলাম পৌষ মাসের টাকার সঙ্গে তাঁহার দুই মাসের টাকা পাঠাইবেক। ততদিন টাকা না পাঠাইলে তাঁহার অতিশয় কষ্ট হইবেক অতএব তুমি তহবিল হইতে তাঁহাকে ৮ আট টাকা দিবে পৌষ মাসে টাকা আসিলে তহবিল ভর্তি করিবে। শ্রীযুক্ত পুরোহিত ভট্টাচার্য মহাশয়কে আমার প্রণাম জানাইবে। ১৪ পেৌষ যাহাতে কাশীতে উপস্থিত হইতে পারি তাহার চেষ্টা করিব। এখনও অনেক দিন বিলম্ব আছে। তুমি ১০।১২ দিন অন্তর পিতৃদেবের সংবাদ লিখিবে ইতি ১৭ অগ্রহায়ণ।

(স্বাক্ষর) শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ।

আমার ঠিকানা কেবল 'কানপুর' এই মাত্র লিখিবে ঠাণ্ডী সড়ক বা অন্য কিছু লিখিলে পত্র পাইতে বিলম্ব হয় ইতি—

শ্রীশ্রীহরিঃ—
শরণম্—

শুভাশিষঃ সন্তু—

তুমি অবিলম্বে কলিকাতায় আসিবে। তুমি আসিলে স্কুলের উপরিতন শ্রেণীর ব্যবস্থা করিব। বেঞ্চ গড়িতে দিয়াছি আর ৭।৮ দিনে প্রস্তুত হইবেক। যদি বিষ্ণুপুরিয়া ভাল তামাক ওখানে উপস্থিত থাকে এক টাকার কিনিয়া আনিবে ইতি ১১ শ্রাবণ ১২৯৭ সাল।

শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ
(স্বাক্ষর) শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

কমিটি—

শ্রীশম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন—প্রেসিডেণ্ট—
শ্রীশ্রীরামচন্দ্র লাহা
শ্রীগোবিন্দচন্দ্র পাল } মেম্বর
শ্রীরামচরণ ঘোষ
শ্রীচিন্তামণি মুখো—মেম্বর ও সেক্রেটারি

কমিটির মতে স্কুলের কাজ চলিবেক; মতভেদ স্থলে আমায় জানাইতে হইবেক।

(স্বাক্ষর) শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা
২২ শ্রাবণ ১২৯৭

৫২

৪১৪ পৃষ্ঠা ১ পংক্তি হইতে ৪ পংক্তি পর্যন্ত

'এই সময়ে একবার 'বীরসিংহ-জননীর পত্র' বলিয়া একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা (সেই স্বাক্ষর বিহীন পুস্তিকা নারায়ণবাবুর রচিত ও প্রেরিত বলিয়া, জানা গিয়াছে।) তাঁহার হস্তগত হয়। সেই পুস্তিকান্তর্গত কাতরতার ভাবে তাঁহার কোমল হৃদয় আর্দ্র হয়; বহুক্ষণ ক্রন্দন করিয়া বাটী যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। তদনুসারে বাটী মেরামত কার্যও আরম্ভ হয়,' ইত্যাদি।

ইহা সত্য নয়। কারণ বিদ্যাসাগর মহাশয় দেশের যাবতীয় কার্যভার আমার উপর ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। বাটী মেরামতের জন্য কখনও কিছুই আদেশ করেন নাই। গৃহদাহের পর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অবস্থিতির জন্য স্বতন্ত্র কোন বাটী প্রস্তুত হয় নাই। 'বীরসিংহ-জননীর পত্র' যে তিনি পাইয়া ক্রন্দন করিয়া বাটী যাইবার অভিপ্রায় করিয়াছিলেন তাহাও দাদার প্রমুখাৎ কখনও শ্রবণ করি নাই। জন্মভূমি বীরসিংহা হইতে যে যা পত্র লিখিত, প্রায় সমস্ত পত্রাদি আমাকে দেখাইতেন, বীরসিংহ-জননীর কথা অগ্রজের প্রমুখাৎ কখনও আমি শ্রবণ করি নাই। মধ্যমাগ্রজ টাকা গ্রহণ করিবার পর, দেশে যাইয়া পাকা বিদ্যালয়-গৃহ নির্মাণ এবং জনক-জননীর নামে দুইটি জলাশয় খাত, পিতামহের শ্মশানের উপর মন্দির নির্মাণ এবং পিতামহীর প্রতিষ্ঠিত অশ্বত্থ বৃক্ষের মূলস্থান পাকা বান্ধান, ইত্যাদি কার্য সমাধা করিবার মানস করিয়াছিলেন। জলাশয় দুইটিতে দুইটি অনাথ আশ্রম করিবার ইচ্ছা ছিল, ঐ অনাথ আশ্রমের মধ্যে জননীদেবীর আশ্রমে দশটি অভুক্ত স্ত্রীলোক ও পিতৃদেবের আশ্রমে দশ জন অভুক্ত ব্যক্তি প্রত্যহ আহার করিবে। কিন্তু নানা কারণে ব্যস্ততা প্রযুক্ত দেশে যাইতে পারেন নাই, এজন্য ঐ স্কুলগৃহ নির্মাণার্থ আমাকে ভার দেন কিন্তু আমি বলিয়াছিলাম, আপনি একবার যাইয়া বন্দোবস্ত করিয়া দিলে ভার লইতে পারি, এজন্য দেশে যাইতে সম্মত হইয়াছিলেন। কিন্তু আট-দশ বৎসরের মধ্যে তাঁহার দেশে যাওয়া ঘটিয়া উঠে না। দাদা ঐ সময়ে আমাকে বলিয়াছিলেন স্কুলগৃহ নির্মাণের জন্য টাকা মজুত রাখিয়াছি, কপাট জানালা প্রস্তুত করিতে কলিকাতায় সুকিয়া স্ট্রীটস্থ হেমচন্দ্র মিশ্রকে ফর্দ করিয়া দিয়াছি। এবং এস্থলে ইহাও প্রকাশ থাকে যে—মৃত্যুর প্রায় এক মাস পূর্বে আমার প্রতি দাদা মহাশয় আদেশ করেন, তুমি হেড মাস্টার রামজীবনকে পত্র লিখ, তিনি যেন নারায়ণের বাটীতে যে কয়েকটি ঐ ক্লাস বসান হইতেছে অতঃপর স্কুলের ঐ সকল ক্লাস তথায় না রাখেন। ঐ ক্লাস কয়েকটি ধর্মদাস ডাক্তার ও ধর্মদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের চণ্ডীমণ্ডপে লইয়া যান। ঐ আদেশানুযায়ী আমার পত্র প্রাপ্তি মাত্র হেড মাস্টার রামজীবনবাবু ক্লাস কয়টি তুলিয়া ঐ দুই স্থানে লইয়া যান। দাদার মৃত্যুর কিছুদিন পরে হেড মাস্টারকে কলিকাতায়

আনাইয়া কিছুদিন গোলমালে রাখা হয়, উক্ত ফ্রি স্কুলের ছাত্রদের বেতন ধার্য করিতে আদেশ হয় ক্লাসগুলিকে ঐ ঐ স্থান হইতে আনাইয়া নারায়ণবাবুর বাটীতে স্থাপিত করা হয় এবং আমার বাটীতে যে কয়টি ক্লাস ছিল তাহাও উঠাইয়া নারায়ণবাবুর বাটীতে আনা হয়। (এই ঘটনার কয়েক মাস পরে উইল দাখিল করিয়া প্রবেট লওয়া হয় সুতরাং ঐ সময়ের কে কর্তা বা মালিক তাহা আমার জ্ঞানের অগোচর)।

৫৩

৪২০ পৃষ্ঠা ২৪ পংক্তি হইতে ৪২২ পৃষ্ঠার ১৩ পংক্তি পর্যন্ত

'দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন লিখিয়াছিলেন ;—'এই লিপি দৃষ্টে নিতান্ত দুঃখিত হইলাম, আমাদের যেরূপ সম্বন্ধ, তাহাতে আমার এ দগ্ধ দেহ ভূমিসাৎ বা ভগ্নাবশেষ না হইলে বিদায় লইতে বা দিতে পারি না। তবে নিশ্চিন্ত হইয়া নিভৃতভাবে থাকিলে সুস্থ শরীরে দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া জগতের আরও বিস্তর উন্নতি সাধন করিতে পারিবেন এই ভাবিয়া সচ্ছন্দমনে আপনকার নিভৃতভাবে অবস্থানের অনুমোদন করিতেছি।'…

'বিদ্যাসাগর মহাশয় মুচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবাহ ব্যাপারে বিরক্ত হইয়া কলিকাতা প্রত্যাগমন করিলে পর, সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় সন ১২৭৬ সালের ২০ কার্তিক তারিখে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পত্রোত্তরে যে পত্র লিখিয়াছিলেন সেই পত্রের অংশ :—'মহাশয়ের পত্র পাঠ করিয়া অবধি মৃত্যুতুল্য হইয়াছি, আপনি যে আর দেশে আসিবেন না ও মৃত্যু কামনা করিতেছেন, ইহা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় ও দেশের লোকের দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। কারণ মহাশয় হইতে দেশের লোকের শ্রীবৃদ্ধি ও দুঃখ নিবারণ হইতেছে। মহাশয় আমাদের প্রতি আক্ষেপ করিতে পারেন, এতাবৎ কাল আমাদিগকে খাওয়াইয়া মানুষ করিয়াছেন, আমরা আপনার অবাধ্য হইলে, অবশ্যই দুঃখ হইতে পারে,…যে দাদা আমাকে খাওয়াইয়া মানুষ করিয়াছেন, যে দাদা আমার কথার উপর সমস্ত বিশ্বাস করিয়াছেন, যে দাদা আমাবই জানেন না, যে দাদা আমার মানের জন্য স্ত্রীর সহিত মনান্তর করিয়াছেন, (প্রজারঞ্জনের জন্য শ্রীরামচন্দ্রই সীতার নির্বাসন ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।) যে দাদা আমার কষ্ট হইবে ভাবিয়া স্বতন্ত্র বাটী প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন, যে দাদার প্রসাদে এতাবৎকাল এদেশে (বীরসিংহে) একাধিপত্য করিয়াছিলাম, সেই দাদার সহিত যে আমি নানা প্রকার অসদ্ব্যবহার করিয়াছি ;…।' তৎপরে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ১২ই অগ্রহায়ণ তারিখের পত্রে বৈরাগ্যমার্গ অবলম্বনের অভিপ্রায় অবগত হইয়া তদুত্তরে সন ১২৭৬ সালের ২রা পৌষ যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ :—'আপনার ১২ই অগ্রহায়ণের রেজিস্টারি পত্র ১৮ অগ্রহায়ণ পাইয়া আমাদের হৃৎকম্প হইল। নানা কারণে মহাশয়ের মনে

বৈরাগ্য জন্মিয়াছে আর ক্ষণকালের জন্য সাংসারিক কোন বিষয়ে লিপ্ত থাকিতে বা কাহারো সহিত কোন সংস্রব রাখিতে ইচ্ছা নাই। ইহাতে অতিশয় দুঃখিত ও মৃতকল্প হইয়াছি। ...এক্ষণে আমার প্রার্থনা যদি কোন বিষয়ে অপরাধী হইয়া থাকি, তাহা হইলে, মহাশয় আমাকে শাসন করিতে পারেন। আমি এতাবৎ কাল মহাশয়েরই অনুগত ও আশ্রিত আছি, বোধ করি পিতৃদেব ও মাতৃদেবী অপেক্ষা মহাশয়ের প্রতি অধিক ভক্তি করিয়া আসিতেছি। বরং এতাবৎকাল দেশে অবস্থিতি করায় পিতৃদেব ও মাতৃদেবী আমার ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া যদি কোন উপদেশ দিতেন, তাহা না শুনায় মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের সহিত আমাব মনান্তর ঘটিত। আমি স্বপ্নেও ক্ষণকালের জন্য মহাশয়ের অনিষ্ট চিন্তা করি নাই। মহাশয় আমার কথায় বিশ্বাস করিতেন তাহাতে অপর লোক ও ভ্রাতৃবর্গ ও মহাশয়ের পত্নী ও পুত্র কখন কখন মহাশয়েরও প্রতি বিরক্ত হইতেন। ...এক্ষণে মহাশয় সংসারাশ্রম ত্যাগ করিতে যে উদ্যত হইয়াছেন, তাহা কেবল আমার দুর্ভাগ্য প্রযুক্তই হইতেছে তাহার সন্দেহ নাই।'

'এই সকলের দ্বারা বেশ স্পষ্টরূপেই বুঝা যাইতেছে যে বিদ্যাসাগর মহাশয় স্ত্রী পুত্র ও সহোদরগণের দ্বারা সংসার জীবনে সুখী হইতে পারেন নাই। কেবল সুখী হইতে পান নাই তাহা নহে, অনেক স্থলে নিতান্ত অসুখী হইয়া মনের ক্লেশে দিন যাপন করিয়াছেন, কিন্তু এই সকল অশান্তিকর ব্যাপারের মধ্যেও কখনও কাহারও সুখ সাধনে বিমুখ ছিলেন না।'

চণ্ডীবাবু আমার ও দীনবন্ধু ন্যায়রত্নের লিখিত পত্রের কোনও কোনও অংশ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার কৃত 'বিদ্যাসাগর' পুস্তকে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তজ্জন্য সাতিশয় দুঃখিত হইলাম। এইরূপে উদ্ধৃত করা ন্যায়সঙ্গত হয় নাই। পাঠকবর্গ সমগ্র পত্র দেখিতে পাইলে সদসদ্বিচার করিতে সমর্থ হইতেন।

দ্বিতীয়ত, বিদ্যাসাগর জ্যেষ্ঠাগ্রজ মহাশয় জনক-জননী ও সোদরগণ প্রভৃতিকে পত্র লিখিয়াছেন যে, 'নানাকারণে আমার মনে সম্পূর্ণ বৈরাগ্য জন্মিয়াছে। আর আমার ক্ষণকালের জন্যেও সাংসারিক কোন বিষয়ে থাকিতে বা কাহারও সহিত কোন সংস্রব রাখিতে ইচ্ছা নাই।' চণ্ডীবাবু ও তাঁহার লিখিত বীরসিংহার বিশ্বস্ত সাক্ষীগণকে জিজ্ঞাসা করা যায় যে, কেবল ক্ষীরপাই নিবাসী মুচিরামের বিবাহ দরুণ বা অন্য কারণে বিদ্যাসাগরের মনে বৈরাগ্য জন্মিল। যদি কেবল মুচিরামের বিবাহ দরুণ বৈরাগ্যোদয় হইয়া থাকে তাহা হইলে 'নানা কারণে' না লিখিয়া কেবল মুচিরামের বিবাহ দরুণ আমার মনে বৈরাগ্যোদয় হইয়াছে লিখিলেই পর্যাপ্ত হইত।

চণ্ডীবাবুর বিচারে আমিই যদি মুচিরামের বিবাহ দিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেশত্যাগী করিয়াছি, তাহা হইলে, বিদ্যাসাগর মহাশয় দেশের তাঁহার যাবতীয় কার্যভার আমার হস্তে কেন ন্যস্ত করেন? এবং মুচিরামের বিবাহের পর আমাকেই

কেন নানা বিষয়ে পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিতেন ? বিবাহ সম্পাদনার্থ কন্যা পাঠাইবার জন্য আমাকেই কেন পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিতেন। প্রকৃত কথা এই যে, মধ্যম সহোদর মকদ্দমায় ফারখৎ করিয়া মাসিক ব্যয় নির্বাহার্থ মাসহারার টাকা গ্রহণ না করায় তাঁহার মনে বড় কষ্ট হইয়াছিল এবং মকদ্দমা দরুণ লোকে নানা কথা কহিত তজ্জন্যই তাঁহার মনে ঐরূপ ভাবের উদয় হইয়াছিল। পরে পিতৃদেব মহাশয়ের ও আমার অনুরোধের বশবর্তী হইয়া মধ্যম সহোদর টাকা লইতে আরম্ভ করিলে পর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মানসিক কষ্ট নিবারণ হয় এবং দেশে যাইবার ইচ্ছা করেন।

৫৪

৪২৮ পৃষ্ঠার ৪ পংক্তি হইতে ৪২৯ পৃষ্ঠার ৫ পংক্তি পর্যন্ত

'বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই জীবনব্যাপী বিবিধ প্রকারের দুঃখ কষ্টের মধ্যে দু একটি সুখের বিষয় ছিল। শেষ দশায় কলিকাতায় কন্যাগুলিকে লইয়া যখন বাদুড়বাগানের বাটীতে বাস করিতেন, সেই সময়ে তাঁহার বালক দৌহিত্রেরা তাঁহার পরম আরামের স্থল হইয়াছিল। সাহিত্য-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ও তদীয় কনিষ্ঠ সহোদর জ্যোতিশ্চন্দ্র সমাজপতি তখনও বালক, ইঁহাদিগকে লইয়া এবং কনিষ্ঠা কন্যার পুত্রদিগকে লইয়া সর্বদা আনন্দে কাল যাপন করিতেন। শ্রীমান সুরেশচন্দ্রের মুখে শুনিয়াছি, এক এক দিন সন্ধ্যার সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বসিবার ঘরে পরিবারস্থ সকলে মিলিত হইতেন। কন্যারা এক এক কোণে এক এক জন দাঁড়াইতেন, দৌহিত্রগুলি কেহ বা দক্ষিণে কেহ বা বামে কেহ বা সম্মুখে কেহ বা পশ্চাতে দাঁড়াইত। বিদ্যাসাগর মহাশয় সকলকে লইয়া গল্প করিতেন। মধ্যে মধ্যে সকলেই চর্বিত তাম্বুলের উমেদার হইতেন, সকলকে একেবারে দেওয়া সম্ভব হইত না, তাই পর্যায়ক্রমে পরে পরে পান দিতেন। তাঁহার প্রসাদী পান পাওয়াটা কন্যা ও দৌহিত্রদের একটা বিশেষ সম্মান ও লাভের ব্যাপার ছিল। প্রসাদের প্রার্থী হইবামাত্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিতেন, আচ্ছা একটু বিলম্ব কর, পানে 'সম্বরা' দেই। তাহার অর্থ এই যে পান খাইতে খাইতে একবার তামাক খাইতে হইবে, পানে 'সম্বরা' দিয়া পবে গুণানুসারে পরে পরে সকলকে পান দিতেন। ইঁহাদিগের মধ্যে সর্ব কনিষ্ঠ শিশু দৌহিত্র গুজে (রামকমল) তাঁহার পরম প্রিয় পাত্র ছিল। এইরূপ পারিবারিক সান্ধ্যসমিতিতে এই শিশুই প্রধান নটের কার্য করিত। বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহাকে উপহার দিবার জন্য নূতন সিকি, দুয়ানী, আধুলী ও টাকা সর্বদাই নিকটে রাখিতেন। সে বালক চাহিবামাত্র তাহাকে দিতেন। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, 'দাদা তুমি কাকে ভাল বাস ?' শিশু বলিত, 'দাদামশাই, তোমাকেই

খুব ভালবাসি, আর তোমার চেয়ে তোমার ঐ নূতন নূতন সিকি দুয়ানীকে বেশী ভালবাসি।' বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিতেন, 'সকলেই তাই করে, তবে তুমি বোঝ না তাই বলে ফেল, অন্যেরা ও কথা স্বীকার করে না।'

'বৈরাগ্যের ভাবপূর্ণ পত্রাদি লিখিয়া আত্মীয় স্বজন সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করার পর যখন বিদ্যাসাগর মহাশয় কিয়ৎ পরিমাণে শান্তচিত্তে নির্জনে বাস সম্ভোগ করিতেছিলেন,...'

চণ্ডীবাবু লিখিয়াছেন 'তাঁহার প্রসাদী পান পাওয়াটা কন্যা ও দৌহিত্রদের একটা বিশেষ সম্মান ও লাভের ব্যাপার ছিল ইত্যাদি। ইহা সত্য নহে। কেবল কনিষ্ঠা কন্যার পুত্র গুজে (বা রামকমল) হাত পাতিলে তিনি চর্বিত তাম্বূল ছোট দৌহিত্রকে দিতেন। চণ্ডীবাবু কেন ইহা লিখিলেন, তাহা তিনিই জানেন।

৫৫

৪৩৫ পৃঃ ৬ পংক্তি হইতে ৭ পংক্তি পর্যন্ত

'তাঁহার সর্বশেষ উইলের যে যে অংশ সাধারণের জানিবার উপযোগী তাহাই এখানে প্রদত্ত হইল।'

উইল অখণ্ডরূপে উল্লিখিত হইলে অনেক বিষয় প্রকাশ হইয়া পড়িবে এই কারণে চণ্ডীবাবু সম্পূর্ণ উইল উদ্ধৃত করেন নাই। উইলে যে যে অংশ সাধারণের জানা বিশেষ আবশ্যক, চণ্ডীবাবু উইলের সেই সেই অংশ তাঁহার পুস্তকে প্রকাশ করেন নাই। মৎপ্রণীত জীবনচরিত মুদ্রাঙ্কন সময় উক্ত উইলের জাবেতানকল আনাইয়াছিলাম। তৎকালে নানাকারণে কনিষ্ঠ ঈশানচন্দ্র কোনমতে উহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিতে দিলেন না। কিন্তু চণ্ডীবাবু আংশিক মুদ্রিত করায় অগত্যা সমগ্র উইল হাইকোর্টের প্রবেট সহ মুদ্রিত করিতে বাধ্য হইলাম। এই পুস্তকে সমগ্র উইল প্রবন্ধসহ মুদ্রিত হইল।

৫৬

৪৫০ পৃষ্ঠা ১৮ পংক্তি হইতে ২১ পংক্তি পর্যন্ত

'তাঁহার এতাদৃশ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে কত স্থানে কত পরিবারের সহিত সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহার সামান্য রূপ বর্ণনারও স্থান সঙ্কুলান হওয়া সম্ভব নহে। তিনি বন্ধু সেবার জন্য কান্দী ও কৃষ্ণনগর, বর্ধমান ও বরিশাল, কলিকাতা ও কাশী, ঢাকা ও মেদিনীপুর সর্বত্র ছুটাছুটি করিতে পারিতেন' ইত্যাদি।

চণ্ডীবাবুর যখন যাহা মনে উদয় হইয়াছে, তখন তাহাই লিখিয়াছেন। বিদ্যাসাগর বন্ধু-বান্ধবের জন্য ঢাকা, বরিশাল বা মেদিনীপুর এই তিন স্থানে কখনও যান নাই। বরিশাল, ঢাকা, মেদিনীপুর জেলায় যাইবার প্রমাণ কি অনুগ্রহপূর্বক লিখিয়া বাধিত করিবেন।

৫৭

৪৫৬ পৃষ্ঠা ১৬ পংক্তি হইতে ৪৫৭ পৃষ্ঠার ১ পংক্তি পর্যন্ত

'শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্নের বিবাহের পরদিন কুশণ্ডিকাদি কোন প্রকার অনুষ্ঠান তখনও সম্পন্ন হয় নাই। সেই সকল অনুষ্ঠানের আয়োজন হইতেছে—বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজেই সে সকলের আয়োজন পর্যবেক্ষণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে কৃষ্ণনগর হইতে ডাকযোগে সংবাদ আসিলে যে বাবু ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় সাংঘাতিক পীড়ায় শয্যাগত। বাঁচিবার সম্ভাবনা অল্প, তাই কাতরবচনে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট বিদায় চাহিয়াছেন। সুহৃদানুগত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সকল অনুষ্ঠান পড়িয়া রহিল, তিনি তৎক্ষণাৎ ডাক্তার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া কৃষ্ণনগর যাত্রা করিলেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, পুত্রের বিবাহের পরবর্তী অনুষ্ঠান সকলের সুসম্পাদনের আয়োজন করিতে করিতে বন্ধুজনের বিপৎপাতের সংবাদ পাইবামাত্র গৃহের অনুষ্ঠানাদি উপেক্ষা করিয়া এরূপ দূরস্থানে গমন করিতে পারা তাঁহার মত হৃদয়বান লোকের পক্ষেই সম্ভব।' ইত্যাদি।

নারায়ণবাবুর কুশণ্ডিকার দিন বিদ্যাসাগর মহাশয় কুশণ্ডিকা কার্য সমাধা পর্যন্ত যে ছিলেন, তাহা কুশণ্ডিকা কার্যে ব্যাপৃত বিশ্বস্ত ব্যক্তিদিগের মুখে শুনিয়াছি। বিবাহ কার্য ৺কালীচরণ ঘোষ মহাশয়ের ভবনে সম্পন্ন হইয়াছিল, জ্যেষ্ঠা বধূদেবী বিবাহ বাটী যান নাই।

৫৮

৪৬০ পৃষ্ঠা প্রথম ৫ পংক্তি

'স্বনামখ্যাত পণ্ডিত ৺দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে বিদ্যাসাগর মহাশয় সহোদরাধিক স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। ইঁহাদের মধ্যে পারিবারিক সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হইয়াছিল। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের পিতা শ্রীযুক্ত হরানন্দ ভট্টাচার্য মহাশয় বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের ভগ্নীপতি, সেই সূত্রে বিদ্যাসাগর মহাশয়ও তাঁহাকে ভগ্নীপতি সম্পর্কেই সম্ভাষণ করিতেন।'

চণ্ডীবাবু শ্রীযুক্ত হরানন্দ ভট্টাচার্য মহাশয়ের সম্পর্কে যাহা লিখিয়াছেন তাহা সত্য নহে। কারণ, হরানন্দ ভট্টাচার্য বাল্যকালে আমার সহাধ্যায়ী ছিলেন। তিনি বাল্যকালে আমার সহিত সংস্কৃত-কলেজে ব্যাকরণ, কাব্য ও অলঙ্কারশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি যখন ব্যাকরণ শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেন, ঐ সময়ে, মধ্যে মধ্যে আমাদের বাসায় যাইতেন এবং মধ্যে মধ্যে আমাদের বাসায় অবস্থিতিও করিতেন। হরানন্দ আমার সম্পর্কে বিদ্যাসাগরকে দাদা বলিতেন ও দীনবন্ধু ন্যায়রত্নকে মেজদাদা বলিতেন। তিনি দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের সম্পর্কে আমাদের

বাসায় যাইতেন না। আমার সহাধ্যায়ী তৎকালে প্রায় সকলেই বিদ্যাসাগরকে দাদা বলিতেন তন্মধ্যে এখনও কয়েকজন জীবিত আছেন, যথা—ভবানীপুর জেলে-পাড়াস্থ প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও জেনারাল এসেমব্লিজের সংস্কৃত প্রফেসার শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর ভট্টাচার্য।

৫৯

৪৮১ পৃষ্ঠা ১২ লাইন হইতে ১৪ লাইন পর্যন্ত

'বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই মৃত ব্যক্তিকে ক্রোড়ে লইয়া অনেকক্ষণ রোদন করেন।' ইত্যাদি—

মৎপ্রণীত জীবনচরিতের ১৮১ পৃষ্ঠা (এই গ্রন্থের ১৩১ পৃষ্ঠা ১৪-১৭ পংক্তি) দ্রষ্টব্য।

চণ্ডীবাবু যাহা লিখিয়াছেন তাহা ভুল। আমি যাহা লিখিয়াছি তাহা ঠিক। বীরসিংহায় অন্নছত্রের সম্পূর্ণ ভার আমার হস্তেই ছিল। আমাকে প্রতিদিনের ঘটনা লিখিতে হইত। ভোজন করিতে করিতে দুই চারিজন মরিয়াছিল সত্য, আশপাশের লোকের যদি ঘৃণা জন্মে এই জন্য সেই পংক্তি হইতে উঠাইয়া অপর স্থানে মৃত ব্যক্তিকে সরাইয়া রাখা হইত। দাদা যে সময়ে দেশে অন্নছত্র পর্যবেক্ষণ করেন, তৎকালে ভোজন করিতে করিতে কেহ মরে নাই।

৬০

৫০৭ পৃষ্ঠা ২৫ পংক্তি হইতে ২৭ পংক্তি পর্যন্ত

'বিদ্যাসাগর মহাশয় সর্বপ্রথমে ডাক্তার শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে পরে রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুরকে উক্ত পত্রিকার সম্পাদকীয় ভার অর্পণ করেন।'

বিদ্যাসাগর মহাশয় ৺শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদকের ভার কখনও অর্পণ করেন নাই। চণ্ডীচরণবাবু যাহা লিখিয়াছেন তাহা সত্য নহে। কারণ ৺হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পর ৺শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় হিন্দু পেট্রিয়ট সংবাদপত্র চালাইতেন। হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিরুপায় পরিবারবর্গ উক্ত সংবাদপত্র ও প্রেসাদি বিক্রয়ের জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু কৃতকার্য হইতে না পারিয়া পরিশেষে ৺হরিশ্চন্দ্র-বাবুর বৃদ্ধা জননীদেবী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট আগমন করিয়া রোদন করেন। দয়ার্দ্রচিত্ত বিদ্যাসাগর বৃদ্ধার রোদনে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া ঐ বর্ষীয়সীকে সান্ত্বনা করেন। বিদ্যাসাগর প্রথমত, উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় কারণ অনেক সম্ভ্রান্ত লোককে অনুরোধ করেন। কেহই ঐ সম্পত্তি ক্রয় করিতে সম্মত হয়েন নাই। পরিশেষে ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুরোধের বশবর্তী হইয়া পাঁচ সহস্র মুদ্রায় ঐ সম্পত্তি ক্রয় করেন। উল্লিখিত

ডাক্তার বাবু শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় হিন্দু পেট্রিয়টে সাহেবদের বিরুদ্ধে কোন বিষয় লিখিয়াছিলেন, তজ্জন্য তৎকালের ছোট লাট সার সিসিল বীডন সাহেব মহোদয় উহা পাঠ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বিদ্যাসাগরকে বলেন। বিদ্যাসাগর হিন্দু পেট্রিয়টের স্বত্বাধিকারী বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহকে ঐ কাগজ চালাইবার ভার তাঁহার হস্তে দিতে অনুরোধ করেন। শম্ভুচন্দ্রবাবু গতিক ভাল নয় দেখিয়া স্বয়ংই হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদকতা ভার পরিত্যাগ করেন।

উইলের নকল

শ্রীশ্রীহরি—

শরণম্

১। আমি স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া স্বচ্ছন্দচিত্তে আমার সম্পত্তির অন্তিম বিনিয়োগ করিতেছি। এই বিনিয়োগ দ্বারা আমার কৃত পূর্বান সমস্ত বিনিয়োগ নিরস্ত হইল।

২। চৌগাছা নিবাসী শ্রীযুত কালীচরণ ঘোষ পাথরা নিবাসী শ্রীযুত ক্ষীরোদনাথ সিংহ আমার ভাগিনেয় পসপুর নিবাসী শ্রীযুত বেণীমাধব মুখোপাধ্যায় এই তিন জনকে আমার এই অন্তিম বিনিয়োগ পত্রের কার্যদর্শী নিযুক্ত করিলাম তাঁহারা এই বিনিয়োগ পত্রের অনুযায়ী যাবতীয় কার্য নির্বাহ করিবেন।

৩। আমি অবিদ্যমান হইলে আমার সমস্ত সম্পত্তি নিযুক্ত কার্যদর্শীদিগের হস্তে যাইবেক।

৪। এক্ষণে আমার যে সকল সম্পত্তি আছে কার্যদর্শীদিগের অবগতি নিমিত্ত তৎসমুদয়ের বিবৃতি এই বিনিযোগ পত্রের সহিত গ্রথিত হইল।

৫। কার্যদর্শীরা আমার ঋণ পরিশোধ ও আমার প্রাপ্য আদায় করিবেন।

৬। আমার সম্পত্তির উপস্বত্ব হইতে আমার পোষ্যবর্গ ও কতকগুলি নিরুপায় জ্ঞাতি কুটুম্ব আত্মীয় প্রভৃতির ভরণপোষণ ও কতিপয় অনুষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহ হইয়া আসিতেছে এই সমস্ত ব্যয় এককালে রহিত করিয়া আপন আপন প্রাপ্য আদায়ে প্রবৃত্ত হইবেন আমার উত্তমর্ণেরা সেরূপ প্রকৃতির লোক নহেন কার্যদর্শীরা তাঁহাদের সম্মতি লইয়া এরূপ ব্যবস্থা করিবেন যে এই বিনিয়োগ পত্রের লিখিত বৃত্তি প্রভৃতি প্রচলিত থাকিয়া তাহাদের প্রাপ্য ক্রমে আদায় হইয়া যায়।

৭। এক্ষণে যে সকল ব্যক্তি আমার নিকট মাসিক বৃত্তি পাইয়া থাকেন আমি অবিদ্যমান হইলে তাঁহাদের সকলের সেরূপ বৃত্তি পাওয়া সম্ভব নহে। তন্মধ্যে যাহারা আমার বিষয়ের উপস্বত্ব হইতে যেরূপ মাসিক বৃত্তি পাইবেন তাহা নিম্নে নির্দিষ্ট হইতেছে।

প্রথম শ্রেণী—

পিতৃদেব শ্রীযুত ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—	৫০৲ পঞ্চাশ টাকা
মধ্যম সহোদর শ্রীযুত দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন—	৪০৲ চল্লিশ টাকা
তৃতীয় সহোদর শ্রীযুত শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন—	৪০৲ চল্লিশ টাকা
কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীযুত ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—	৩০৲ ত্রিশ টাকা
জ্যেষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী মনোমোহিনী দেবী—	১০৲ দশ টাকা
মধ্যমা ভগিনী শ্রীমতী দিগম্বরী দেবী—	১০৲ দশ টাকা
কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী মন্দাকিনী দেবী—	১০৲ দশ টাকা
বনিতা শ্রীমতী দীনময়ী দেবী—	৩০৲ ত্রিশ টাকা
জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী হেমলতা দেবী—	১৫৲ পনর টাকা
মধ্যমা কন্যা শ্রীমতী কুমুদিনী দেবী—	১৫৲ পনর টাকা
তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী বিনোদিনী দেবী—	১৫৲ পনর টাকা
কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবী—	১৫৲ পনর টাকা
পুত্রবধূ শ্রীমতী ভবসুন্দরী দেবী—	১৫৲ পনর টাকা
পৌত্রী শ্রীমতী মৃণালিনী দেবী—	১৫৲ পনর টাকা
জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র শ্রীমান সুরেশচন্দ্র সমাজপতি—	১৫৲ পনর টাকা
কনিষ্ঠ দৌহিত্র শ্রীমান যতীন্দ্রনাথ সমাজপতি—	১৫৲ পনর টাকা
দৌহিত্রী শ্রীমতী রাজরাণী দেবী—	১৫৲ পনর টাকা
কনিষ্ঠা ভ্রাতৃবধূ শ্রীমতী এলোকেশী দেবী—	১০৲ দশ টাকা
শাশুড়ী শ্রীমতী তারাসুন্দরী দেবী—	১০৲ দশ টাকা
জ্যেষ্ঠা কন্যার শাশুড়ী শ্রীমতী স্বর্ণময়ী দেবী—	১০৲ দশ টাকা
জ্যেষ্ঠা কন্যার ননদ শ্রীমতী ক্ষেত্রমণি দেবী—	১০৲ দশ টাকা
মাতৃদেবীর মাতুলকন্যা শ্রীমতী উমাসুন্দরী দেবী—	৩৲ তিন টাকা
মাতৃদেবীর মাতুলদৌহিত্র গোপালচন্দ্র চট্টোর বনিতা—	৩৲ তিন টাকা
পিতৃস্বসৃপুত্র ত্রিলোচন মুখোপাধ্যায়ের বনিতা—	৩৲ তিন টাকা
পিতৃদেবের পিতৃস্বসৃ কন্যা শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী—	৩৲ তিন টাকা
বৈবাহিকী শ্রীমতী সারদা দেবী—	৫৲ পাঁচ টাকা
মদনমোহন তর্কালঙ্কারের মাতা—	৮৲ আট টাকা
শ্রীযুত মদনমোহন বসুর বনিতা শ্রীমতী নৃত্যকালী দাসী—	১০৲ দশ টাকা
শ্রীযুত মধুসূদন ঘোষের বনিতা শ্রীমতী থাকমণি দাসী—	১০৲ দশ টাকা
বারাসত নিবাসী শ্রীযুত কালীকৃষ্ণ মিত্র—	৩০৲ ত্রিশ টাকা
কালীকৃষ্ণ মরিয়া গেলে তাহার বনিতা শ্রীমতী উমেশমোহিনী দাসী—	১০৲ দশ টাকা
শ্রীরাম প্রামাণিকের বনিতা শ্রীমতী ভগবতী দাসী—	২৲ দুই টাকা

দ্বিতীয় শ্রেণী—

মাতৃস্বসৃ পুত্র শ্রীযুত সর্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়—	১০৲	দশ টাকা
ভাগিনেয়ী শ্রীমতী মোক্ষদা দেবী—	৫৲	পাঁচ টাকা
জ্যেষ্ঠা ভগিনীর ননদ শ্রীমতী তারামণি দেবী—	৫৲	পাঁচ টাকা
পিতৃস্বসৃকন্যা শ্রীমতী মোক্ষদা দেবী—	২৲	দুই টাকা
মাতৃদেবীর মাতৃস্বসৃপুত্র শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ ঘোষাল—	৫৲	পাঁচ টাকা
মাতৃদেবীর মাতুলপুত্র তারাচরণ মুখোর পরিবার—	৮৲	আট টাকা
মাতৃদেবীর মাতৃস্বসৃপুত্র শ্রীযুত কালিদাস মুখো—	৫৲	পাঁচ টাকা
মাতৃদেবীর পিতৃস্বসৃপুত্র রামেশ্বর মুখোর পরিবার—	৫৲	পাঁচ টাকা
মাতৃদেবীর মাতুলকন্যা শ্রীমতী বরদা দেবী—	২৲	দুই টাকা
বারাশত নিবাসী নবীনকৃষ্ণ মিত্রের বনিতা শ্রীমতী শ্যামাসুন্দরী দাসী—	১০৲	দশ টাকা
মদনমোহন তর্কালঙ্কারের কন্যা শ্রীমতী কুন্দমালা দেবী—	১০৲	দশ টাকা
মদনমোহন তর্কালঙ্কারের ভগিনী শ্রীমতী বামাসুন্দরী দেবী—	৩৲	তিন টাকা
বর্দ্ধমানের প্যারীচাঁদ মিত্রের বনিতা শ্রীমতী কামিনী দাসী—	১০৲	দশ টাকা

৮। যদি কার্যদর্শীরা দ্বিতীয় শ্রেণীনিবিষ্ট কোন ব্যক্তিকে মাসিক বৃত্তি দেওয়া অনাবশ্যক বোধ করেন অর্থাৎ আমার দত্ত বৃত্তি না পাইলেও তাঁহার চলিতে পারে এরূপ দেখেন তাহা হইলে তাঁহার বৃত্তি রহিত করিতে পারিবেন।

৯। আমার দেহান্ত সময়ে আমার মধ্যমা তৃতীয়া ও কনিষ্ঠা কন্যার যে সকল পুত্র ও কন্যা বিদ্যমান থাকিবেক কোনও কারণে তাহাদের ভরণপোষণ বিদ্যাভ্যাস প্রভৃতির ব্যয় নির্বাহের অসুবিধা ঘটিলে তাহারা প্রত্যেকে দ্বাবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্যন্ত মাসিক ১৫৲ পনর টাকা বৃত্তি পাইবেক।

১০। আমার দেহান্ত সময়ে আমার যে সকল পৌত্র ও দৌহিত্র অথবা পৌত্রী ও দৌহিত্রী বিদ্যমান থাকিবেক তাহাদের মধ্যে কেহ অন্ধত্ব পঙ্গুত্ব প্রভৃতি দোষাক্রান্ত অথবা অচিকিৎস্য রোগগ্রস্ত হইলে আমার বিষয়ের উপস্বত্ব হইতে যাবজ্জীবন মাসিক ১০৲ দশ টাকা বৃত্তি পাইবেক।

১১। যদি আমার মধ্যমা অথবা কনিষ্ঠা ভগিনীর কোনও পুত্র উপার্জনক্ষম হইবার পূর্বে তাঁহার বৈধব্য ঘটে তাহা হইলে যাবৎ তাঁহার কোনও পুত্র উপার্জনক্ষম না হয় তাবৎ তিনি আমার বিষয়ের উপস্বত্ব হইতে সপ্তম ধারা নির্দিষ্ট বৃত্তি ব্যতিরিক্ত মাসিক আর ২০৲ কুড়ি টাকা বৃত্তি পাইবেন।

১২। যদি শ্রীমতী নৃত্যকালী দাসীর কোনও পুত্র উপার্জনক্ষম হইবার পূর্বে তাঁহার বৈধব্য ঘটে তাহা হইলে যাবৎ তাঁহার কোনও পুত্র উপার্জনক্ষম না হয় তাবৎ তিনি আমার বিষয়ের উপস্বত্ব হইতে সপ্তম ধারা নির্দিষ্ট বৃত্তি ব্যতিরিক্ত মাসিক আর ১০৲ দশ টাকা বৃত্তি পাইবেন।

১৩। কার্যদর্শীরা আমার বিষয়ের উপস্বত্ব হইতে নীলমাধব ভট্টাচার্যের বনিতা শ্রীমতী সারদা দেবীকে তাঁহার নিজের ও পুত্রত্রয়ের ভরণপোষণার্থে মাস মাস ৩০ ত্রিশ টাকা আর তাঁহার পুত্রেরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে যাবজ্জীবন মাস মাস ১০ দশ টাকা দিবেন। তিনি বিবাহ করিলে অথবা উৎপথবর্তিনী হইলে তাঁহাকে উক্ত উভয় বিধেয় মধ্যে কোনও প্রকার বৃত্তি দিবার আবশ্যকতা নাই।

১৪। আমি অবিদ্যমান হইলে আমার বিষয়ের উপস্বত্ব হইতে যে অনুষ্ঠানে যেরূপ মাসিক ব্যয় হইবেক তাহা নিম্নে নির্দিষ্ট হইতেছে।

জন্মভূমি বীরসিংহ গ্রামে আমার স্থাপিত বিদ্যালয়	—১০০ একশত টাকা
ঐ ঐ গ্রামে আমার স্থাপিত চিকিৎসালয়	—৫০ পঞ্চাশ টাকা
ঐ ঐ গ্রামের অনাথ ও নিরুপায় লোক	—৩০ ত্রিশ টাকা
বিধবা বিবাহ—	—১০০ একশত টাকা

১৫। যদি শ্রীযুত জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ পালিত শ্রীযুত গোবিন্দচন্দ্র ভড় এই তিনজন আমার দেহান্ত সময় পর্যন্ত আমার পরিচারক নিযুক্ত থাকে তাহা হইলে কার্যদর্শীরা তাহাদের প্রত্যেককে এককালীন ৩০০ তিনশত টাকা দিবেন।

১৬। কার্যদর্শীরা বিষয় রক্ষা লৌকিক রক্ষা কন্যা দান প্রভৃতির আবশ্যক ব্যয় স্বীয় বিবেচনা অনুসারে করিবেন।

১৭। এই বিনিয়োগপত্রে যাঁহার পক্ষে অথবা যে বিষয়ে যেরূপ নির্বন্ধ করিলাম যদি তাহাতে তাঁহার পক্ষে সুবিধা অথবা সে বিষয়ের সুশৃঙ্খলা না হয় তাহা হইলে কার্যদর্শীরা সকল বিষয়ের সবিশেষ পর্যালোচনা করিয়া যাঁহার পক্ষে অথবা যে বিষয়ে যেরূপ নির্বন্ধ করিবেন তাহা আমার স্বকৃতের ন্যায় গণনীয় ও মাননীয় হইবেক।

১৮। এক্ষণে আমার সম্পত্তির যেরূপ উপস্বত্ব আছে যদি উত্তরকালে তাহার খর্বতা হয় তাহা হইলে যাহাকে বা যে বিষয়ে যাহা দিবার নির্বন্ধ করিলাম কার্যদর্শীরা স্বীয় বিবেচনা অনুসারে তাহার ন্যূনতা করিতে পারিবেন।

১৯। আবশ্যক বোধ হইলে কার্যদর্শীরা আমার সম্পত্তির কোন অংশ বিক্রয় করিতে পারিবেন।

২০। আমার রচিত ও প্রচারিত পুস্তক সকল শম্ভু চন্দ্রের (সংস্কৃত যন্ত্রের) পুস্তকালয়ে বিক্রীত হইতেছে আমার একান্ত অভিলাষ শ্রীযুত ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় যাবৎ জীবিত ও উক্ত পুস্তকালয়ের অধিকারী থাকিবেন তাবৎকাল পর্যন্ত আমার পুস্তক সকল ঐ স্থানেই বিক্রীত হয় তবে এক্ষণে যেরূপ সুপ্রণালীতে পুস্তকালয়ের কার্য নির্বাহ হইতেছে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিলে ও তন্নিবন্ধন ক্ষতি বা অসুবিধা বোধ হইলে কার্যদর্শীরা স্থানান্তরে বা প্রকারান্তরে পুস্তক বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

২১। কার্যদর্শীরা একমত হইয়া কার্য করিবেন মতভেদস্থলে অধিকাংশের মতে কার্য নির্বাহ হইবেক।

২২। নিযুক্ত কার্যদর্শীদিগের মধ্যে কেহ অবিদ্যমান অথবা এই বিনিয়োগ পত্রের অনুযায়ী কার্য করিতে অসম্মত হইলে অবশিষ্ট দুই জন তাঁহার স্থলে অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন। এইরূপে নিযুক্ত ব্যক্তি আমার নিজের নিয়োজিত ব্যক্তির ন্যায় কার্য ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

২৩। যদি নিযুক্ত কার্যদর্শীরা এই বিনিয়োগ পত্রের অনুযায়ী কার্যভার গ্রহণে অসম্মত বা অসমর্থ হন তাহা হইলে যাঁহারা এই বিনিয়োগ পত্র অনুসারে বৃত্তি পাইবার অধিকারী তাঁহারা বিচারালয়ে আবেদন করিয়া উপযুক্ত কার্যদর্শী নিযুক্ত করাইয়া লইবেন। তিনি এই বিনিয়োগ পত্রের অনুযায়ী সমস্ত কার্য নির্বাহ করিবেন।

২৪। যাবৎ আমার ঋণ পরিশোধ না হয় তাবৎকাল পর্যন্ত এই বিনিয়োগ পত্রের নিয়মঅনুসারে নিযুক্ত কার্যদর্শীদিগের হস্তে সমস্ত ভার থাকিবেক। ঋণ পরিশোধ হইলে ঐ সময়ে যাঁহারা শাস্ত্রানুসারে আমার উত্তরাধিকারী থাকিবেন তাঁহারা আমার সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইবেন এবং সপ্তম নবম দশক একাদশ দ্বাদশ ত্রয়োদশ চতুর্দশ ও পঞ্চদশ ধারার নির্দিষ্ট বৃত্তি প্রভৃতি প্রদান পূর্বক উপস্বত্ব ভোগ করিবেন। ঐ উত্তরাধিকারীরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে কার্যদর্শীরা তাহাদিগকে সমস্ত বুঝাইয়া দিয়া অবসৃত হইবেন।

২৫। আমার পুত্র বলিয়া পরিচিত শ্রীযুত নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় যারপর নাই যথেচ্ছাচারী ও কুপথগামী এজন্য ও অন্য অন্য গুরুতর কারণবশতঃ আমি তাঁহার সংস্রব ও সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়াছি এই হেতু বশতঃ বৃত্ত নির্বন্ধস্থলে তাঁহার নাম পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং এই হেতু বশতঃ তিনি চতুর্বিংশ ধারা নির্দিষ্ট ঋণ পরিশোধ কালে বিদ্যমান থাকিলেও আমার উত্তরাধিকারী বলিয়া পরিগণিত অথবা দ্বাবিংশ ও ত্রয়োবিংশ ধারা অনুসারে এই বিনিয়োগ পত্রের কার্যদর্শী নিযুক্ত হইতে পারিবেন না। তিনি চতুর্বিংশ ধারা নির্দিষ্ট ঋণ পরিশোধ কালে বিদ্যমান না থাকিলে যাঁহাদের অধিকার ঘটিত তিনি তৎকালে বিদ্যমান থাকিলেও তাঁহারা চতুর্বিংশ ধারার লিখিত মত আমার সম্পত্তির অধিকারী হইবেন। ইতি তাং ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৮২ সাল ইং ৩১ মে ১৮৭৫ সাল।

(স্বাক্ষর) শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মোকাম কলিকাতা।

ইসাদী।

শ্রীরামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
শ্রীরাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়
শ্রীগিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন

শ্রীশ্যামাচরণ দে
শ্রীনীলমাধব সেন
শ্রীযোগেশচন্দ্র দে

শ্রীবিহারীলাল ভাদুড়ী
শ্রীকালীচরণ ঘোষ

সর্ব সাকিম কলিকাতা।

চতুর্থ ধারার উল্লিখিত সম্পত্তির বিবৃতি—

(ক) সংস্কৃতযন্ত্রের তৃতীয় অংশ—

(খ) আমার রচিত ও প্রচারিত পুস্তক—

বাঙ্গালা—

(১) বর্ণপরিচয় দুই ভাগ
(২) কথামালা
(৩) বোধোদয়
(৪) চরিতাবলী
(৫) আখ্যানমঞ্জরী দুই ভাগ
(৬) বাঙ্গালার ইতিহাস ২য় ভাগ
(৭) জীবনচরিত
(৮) বেতাল পঞ্চবিংশতি

বাঙ্গালা—

(৯) শকুন্তলা
(১০) সীতার বনবাস
(১১) ভ্রান্তিবিলাস
(১২) মহাভারত
(১৩) সংস্কৃতভাষা প্রস্তাব
(১৪) বিধবাবিবাহ বিচার
(১৫) বহুবিবাহ বিচার

সংস্কৃত—

(১) উপক্রমণিকা
(২) ব্যাকরণকৌমুদী
(৩) ঋজুপাঠ তিন ভাগ
(৪) মেঘদূত
(৫) শকুন্তলা
(৬) উত্তরচরিত

ইংরেজী—

(১) Poetical Selections
(২) Selections from Goldsmith

(গ) যে সকল পুস্তকের স্বত্বাধিকার ক্রয় করা হইয়াছে।

(১) মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত শিশুশিক্ষা তিন ভাগ।

(২) রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত কুলীন কুলসর্বস্ব।

(ঘ) কাদম্বরী সটীক বাল্মীকি রামায়ণ প্রভৃতি মুদ্রিত সংস্কৃত পুস্তক।

(ঙ) নিজ ব্যবহারার্থ সংগৃহীত সংস্কৃত বাঙ্গালা হিন্দী পার্শী ইংরেজী প্রভৃতি পুস্তকের লাইব্রেরী।

(চ) কর্মটাঁড়ের বাঙ্গালা ও বাগান।

(স্বাক্ষর) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

PROBATE TO ONE OF THE EXECUTORS

The High Court of Judicature at Fort William in Bengal.

Hereby maketh known that on the eleventh day of February in the year one thousand eight hundred and ninety two the last will of Pandit Iswara Chandra Vidyasagar C. I. E. late a Hindoo inhabitant of the town of Calcutta deceased (a copy

and a translation whereof are hereunto annexed) was proved and registered before this Court and that administration of the property and credits of the said deceased and in any way concerning his said will was granted to Kirode Nath Singha at present residing at No 98 Upper Circular Road in Calcutta aforesaid one of the executors in the said will named (with effect within the Province of Bengal) he having undertaken to administer the said property and credits and to make a full and true inventory thereof and exhibit the same in this Court within six months from the date of this grant or within such further time as the Court may from time to time appoint and also to render to this Court a true account of the said property and credits within one year from the same date or within such further time as the Court may from time to time appoint.

Date at Fort William aforesaid this 9th day of August in the year one thousand eight hundred and ninety two.

Sd. Bel Chamber.
Registrar.

Sd. Sattyadhan Banerjee
Attorney } High Court Original Side. 8 August.

No 469. sold to Sattyadhan Banerjee of 10 Hasting Street Calcutta. Rs. one thousand only The 8th August 1892. Certified that a single stamp of the value of Rs. One thousand one hundred and seventy three only required for this document is not available, and that the smallest number of stamps which I can furnish, so as to make up the required amount, is as follows :

1	Stamp	paper	for	Rs.	1000	—
1	Do	Do	Do	Do	170	—
1	Label		for	Rs.	3	—
					1173	—

Sd. Preya Lall Sen, Sd. Bangsi Dhar Sur.
Treasurer, Callector of Stamp revenue Calcutta.

No. 469. sold to Sattydhan Banerjee of 10 Hastings Street Calcutta Rs. one hundred and seventy only. The 8th August 1892. Certified that a single stamp of the value of Rs. one thousand one hundred and seventy-three only required for this document is not available, and that the smallest number of stamps which I can furnish, so as to make up the required amount, is as follows :—

1—Stamp	paper	for	Rs.	1000 —,, —,,
1 Stamp	paper	for	Rs.	170 —,, —,,
1 Label	—	for	Rs.	3 —,, —,,
				1173 —,, —,,

Sd. Bangsi Dhar Sur Collector of stamp revenue, Calcutta.
Sd. Preya Lall Sen
Treasurer.

Filed 24 January 1893

Bank of Bengal
No 498 of 1892
Probate,

Copied by
Upendra Nath Bapli.

Examined by
BIPIN B. GUPTA
S/2/93.

এক্ষণে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমগ্র উইল পাঠক সমীপে উপনীত হইল।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অভিপ্রায় কার্যে কতদূর পরিণত হইয়াছে, এবং কার্যে পরিণতি হইবার পক্ষে কি সুবিধা বা বাধা ঘটিয়াছিল, তাহা জনসমাজে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ থাকায় এ স্থলে বিস্তারিত সমালোচনার আবশ্যক নাই। তবে এই উইল আদালতে কি প্রকারে সপ্রমাণ হইয়া কতদূর কার্যে পরিণত হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনচরিতে লিপিবদ্ধ থাকা একান্ত আবশ্যক। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুর কিছুদিন পরে উইল মহামান্য হাইকোর্টে প্রমাণীকৃত হইয়া ইং ১৮৯২ সাল ৯ই আগস্ট তারিখে শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষীরোদনাথ সিংহ মহাশয়কে তদনুসারে কার্য করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয়। উইলের লিখিত কার্য-দর্শী তিনজন ছিলেন। ভাগিনেয় পদপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বেণীমাধব মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বাবু কালীচরণ ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষীরোদনাথ সিংহ। ৺বেণীমাধব মুখোপাধ্যায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দেহত্যাগের পূর্বেই লোকান্তরিত হওয়ায় ও

শ্রীযুত কালীচরণ ঘোষ কার্যভার লইতে অস্বীকার করায় কেবল শ্রীযুত বাবু ক্ষীরোদনাথ সিংহ মহাশয়ই কার্যদর্শী পদে অভিষিক্ত হয়েন। উইল প্রমাণের দরখাস্ত হইলে কোনও পক্ষ হইতে উহার বিরুদ্ধে কোনও আপত্তি হয় নাই। অতঃপর যাহা ঘটিয়াছে তদ্বৃত্তান্ত মৎপ্রণীত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনচরিতের দ্বিতীয় সংস্করণে প্রকাশ করা যাইবে।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুর সময় তাঁহার উইলের উল্লিখিত ঋণ ছিল না। তবে কার্য কর্ম উপলক্ষে কোনও কোনও ব্যক্তির তাঁহার নিকট টাকা প্রাপ্য ছিল বটে, তাহা এস্থলে উল্লেখের আবশ্যক নাই। তাঁহার বাটীতে নিজ তহবিলে ও ব্যাঙ্কে প্রায় বিংশতি সহস্র টাকা জমা ছিল। যে সময়ে উইল হইয়াছিল, তৎকালে আয় কম ছিল, পরে যেমন আয় বৃদ্ধি হইতে লাগিল, বিদ্যাসাগরের দানও যথেষ্ট হইতে লাগিল। উইলের লিখিত তালিকা অপেক্ষা কি দেশস্থ কি বিদেশস্থ কি কলিকাতাস্থ অনেক দরিদ্র আত্মীয়ের নিরুপায় পরিবারগণকে মাসহারা দিতেন, এস্থলে সে সকলের নামোল্লেখ করা অনাবশ্যক। এই উইলের লিখিত অনেকেই বিদ্যাসাগরের জীবদ্দশায় লোকান্তরিত হইয়াছেন। সুতরাং সে সকলের আর মাসহারা দিতে হয় নাই।

পরিশিষ্ট

১২ পৃষ্ঠা ২৭ পংক্তি হইতে ১৩ পৃষ্ঠা ১ পংক্তি

'রামজয় তর্কভূষণ গৃহত্যাগের সময়ে যে পত্নী দুর্গাদেবীকে সন্তানসহ বনমালী-পুরে রাখিয়া গিয়াছিলেন, তিনি ঐ উমাপতি তর্কসিদ্ধান্তের তৃতীয়া কন্যা।'

চণ্ডীবাবু যাহা লিখিয়াছেন, তাহা ভুল। দুর্গাদেবী তর্কসিদ্ধান্তের পঞ্চমী বা কনিষ্ঠা কন্যা ছিলেন।

'জন্মভূমি' সংবাদপত্রের লেখক মহাশয় ৬২৫ পৃষ্ঠা। ২ কলম। ৪০।৪১ পংক্তিতে ঐরূপ ভুল করিয়াছিলেন, তজ্জন্য কোন ব্যক্তি প্রতিবাদ করেন।

এই পুস্তকের ৪৮নং প্রতিবাদে হরিণ সম্বন্ধে যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ লেখা হইয়াছে, তাহা ভালরূপে সাধারণের অবগতি জন্য এখানে সবিস্তার লেখা গেল।

দীনবন্ধু ন্যায়রত্নের রাখাল নামে এক পাচক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তৎকালে ঐ জেলার জজ সাহেব মহোদয়ের এক হরিণ ছিল। ঐ হরিণ খোলা থাকিয়া লোকের গাছ পালা খাইত এবং কখনও কখনও লোকের গৃহে প্রবেশ করিয়া নানা প্রকার দ্রব্যাদি নষ্ট করিত। জজ সাহেবের হরিণ, এজন্য কেহ ভয়ে কিছু বলিতে পারিত না। ঐ রাখাল একদিন হরিণের ঐরূপ অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া হরিণকে তাড়াইয়া দিবার মানসে একখণ্ড কাষ্ঠ ছুড়িয়া দেয়, দৈবঘটনায় ঐ কাষ্ঠখণ্ডের আঘাতেই হরিণটির মৃত্যু হয়। ঐ সংবাদ প্রাপ্তি মাত্রই জজ সাহেবের লোকেরা আসিয়া ঐ মৃত হরিণটিকে লইয়া যায় এবং ফৌজদারী আদালতে ঐ রাখালের নামে নালিশ রুজু হয়, আদালতের বিচারে রাখালের সামান্য অর্থ দণ্ড হয়। এক্ষণকার মহামান্য হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গামোহন দাশ মহাশয় তৎকালে ববিশালের জজ আদালতের উকীল ছিলেন। চণ্ডীবাবু! বরিশালের সংবাদ, দুর্গামোহন দাশবাবুকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কোন অনভিজ্ঞের কথায় এরূপ অযথা সংবাদ পুস্তকে লিখিলেন। এই হরিণ বধের পর দীনবন্ধু দুই বৎসরকাল বরিশালের ডেপুটীর কার্যে নিযুক্ত ছিলেন।

৯৫ পৃষ্ঠা ৪ পংক্তি

'সর্বানন্দ বিদ্যাবাগীশ নামে একজন অধ্যাপক সে সময়ে' ইত্যাদি

মৎপ্রণীত জীবনচরিতের ৭১ পৃঃ (বর্তমান গ্রন্থের ৫১ পৃঃ ৩২ পংক্তিতে) সর্বানন্দ ন্যায়বাগীশ আছে। চণ্ডীবাবু সর্বানন্দের বিদ্যাবাগীশ এই পদবীটি নূতন দিলেন কেন? আমরা সর্বানন্দের নিকট অধ্যয়ন করিয়া সন্তুষ্ট হই নাই, তজ্জন্য উঁহার বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগরের নিকট ও এডুকেসন কৌনসেলের সেক্রেটারি মহামান্য ডাক্তার ময়েট সাহেব মহোদয়ের নিকট আবেদন করিয়াছিলাম। বিদ্যাসাগরের কৌশলে ও অতিরিক্ত যত্নেই মদনমোহন তর্কালঙ্কার ঐ পদ প্রাপ্ত হন।

চণ্ডীবাবুর পুস্তকে অগ্রজ মহাশয়ের পত্নীর প্রতিকৃতি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহা কতদূর যুক্তিসঙ্গত তাহা বলিতে চাহি না, তবে হিন্দুসমাজের এখনও তেমন অবস্থা হয় নাই যাহাতে কুলকামিনীগণের প্রতিকৃতি সাধারণের সমক্ষে অবাধে প্রকাশ করা যায়। জননীদেবীর প্রতিকৃতি দেওয়ায় তত্দূর আপত্তিজনক হয় নাই, কারণ তিনি বৃদ্ধা। অগ্রজ মহাশয়ের পত্নীর প্রতিকৃতি সম্বন্ধে কেবল আমারই যে এই মত, তাহা নহে। অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি যাঁহাদের সঙ্গে এ বিষয়ের কথাবার্তা হইয়াছে, তাঁহাদেরও এই মত। আর পরিশেষে শ্মশানে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াকালীন যে প্রতিকৃতি লওয়া হয়, তাহাও গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট হওয়ায় শিষ্টের পরিচায়ক হয় নাই ইহা যদিও কথঞ্চিৎ পরিমাণে করুণ-রসের উদ্দীপক বটে, তথাচ ইহাতে অধিক পরিমাণে বীভৎস রসের উদ্রেক হইয়া থাকে।

